সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৪র্থ খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

৪র্থ খন্ড

সূরা আন্ নেসা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
মাওলানা কুতুবুল ইসলাম

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(৪র্থ খণ্ড সূরা আন নেসা)

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ

১৯৯৬

১২তম সংস্করণ

সফর ১৪৩২, জানুয়ারী ২০১১, পৌষ ১৪১৭

কম্পোজ

আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত ষাট টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition

Hafiz Munir Uddin Ahmed

4th Volume

(Surah An nesa)

Published by

Khadija Akhtar Rezayee

Director Al Quran Academy London

124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK

Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205

Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)

38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100

Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition

1996

12th Edition Safar 1432, May 2011

Price Tk. 260 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk

ISBN No-984 8490-36-2

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত **অনুরোধ,** এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে—

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহর ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি।

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবেই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আন নেসা (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ১৫
অনুবাদ (আয়াত-১-১৪) ৩৪
তাফসীর (১-১৪) ৩৮
মানবজাতির উৎপত্তি ৩৮
এতীমদের সম্পদ সংরক্ষণের বিধান ৪২
এতীম মেয়েদের স্বার্থ রক্ষা ৪৪
ইসলামে একাধিক বিয়ের অনুমতি ৪৫
দাসী বিয়ে প্রসংগ ৫২
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ৫৪
এতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ ৫৫
ইসলামে উত্তরাধিকার বন্টন ৫৬
উত্তরাধিকার আইনের মূলনীতি ৬১
উত্তরাধিকার বন্টন ৬৩
এমন ওয়ারিশ যার পিতা বা সন্তান কোনোটাই নেই ৬৭
শেরেকের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া ৬৮
উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আরো কিছু কথা ৭০
অনুবাদ (আয়াত-১৫-২৩) ৭২
তাফসীর (আয়াত-১৫-২৩) ৭৪
ব্যভিচার দমনে কঠোর পদক্ষেপ ৭৫
সমকামিতার শাস্তি ৭৬
রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা ৭৮
কখন তাওবা কবুল হয় ৮১
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ৮৩
দাম্পত্য সম্পর্কের মূলভিত্তি ৮৫
ঘর যদি ভাংতেই হয়...... ৮৬
যাদেরকে বিয়ে করা হারাম ৮৭
আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহর ৯১
অনুবাদ (আয়াত-২৪-৩৫) ৯৭
তাফসীর (আয়াত-২৪-৩৫) ১০০
পরিবার সমাজ ব্যবস্থার প্রথম বুনিয়াদ ১০১
যুদ্ধবন্দী নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ১০৪
বিয়ের কতিপয় মূলনীতি ১০৫
জাহেলী সমাজের বিয়ে ১০৮
নারীর অধিকার ১০৯
দাসী বিয়ে প্রসংগ ১১০
ইনসাফের ইসলামী দৃষ্টিভংগী ১১৩
পারিবারিক বিধানের পর্যালোচনা ১১৬
যৌণ অনাচার কিভাবে সভ্যতার বিপর্যয় ডেকে আনে ১১৮
কোরআনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ১২৬
বড়ো গুনাহ পরিহার করলে ছোটো গুনাহ ক্ষমার আশ্বাস ১২৯
ইসলামে নারী পুরুষের অবস্থান ১৩১
নারীর উপার্জন ও মালিকানা ১৩৬
শরীয়তের অনুমদিত চুক্তিসমূহ ১৩৮
সমাজে পুরুষের বিশেষ মর্যাদা ১৪০
নেককার স্ত্রীর গুণাবলী ১৪৭
অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার পদ্ধতি ১৪৯
সংশোধনের জন্যে শালিস ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ ১৫৪
অনুবাদ (আয়াত-৩৬-৪৩) ১৫৭
তাফসীর (আয়াত-৩৬-৪৩) ১৫৯
কর্মজীবনে তাওহীদের প্রভাব ১৬০
এহসানের পরিধি ১৬২
লোক দেখানো কাজের মূল্যায়ন ১৬৫
কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্র ১৬৭
মদপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রথম পর্যায় ১৬৮
পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মদের ছড়াছড়ি ১৬৮
আইয়ামে জাহেলিয়াতের অবস্থা ১৬৯
মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা ১৭১
অনাচার নির্মূল করণে কোরআনের নীতি ১৭৪
এই মহাবিপ্লব কিভাবে সম্ভব হলো ১৭৫
কিছু অপবিত্র অবস্থা ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন ১৭৭
তায়াম্মুমঃ পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি ১৭৯
অনুবাদ (আয়াত-৪৪-৫৭) ১৮৩
তাফসীর (আয়াত-৪৪-৫৭) ১৮৫
ইহুদীদের তাওরাত বিকৃত করণ ১৯০
রসূল (স.)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ ১৯৩
আহলে কেতাবদের প্রতি আল্লাহর ধমক ১৯৪
যে গুনাহর কোনো ক্ষমা নেই ১৯৬
তাগুতের সাথে কোনো আপোষ নেই ২০২
সত্য মিথ্যার সংঘাত চিরন্তন ২০৪
সকল বিধর্মীদেরই মঞ্চ অভিন্ন ২০৫
ইহুদীদের জঘন্য চরিত্র ২০৭
একটি ভয়াবহ শাস্তির চিত্র ২০৮
অনুবাদ (আয়াত-৫৮-৭০) ২১০
তাফসীর (আয়াত-৫৮-৭০) ২১২
আসল আমানত হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের আমানত ২১৮
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ২২০
ন্যায় বিচারের মানদন্ড ২২১
স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই ২২৩
পারস্পরিক মতভেদ নিরসনে কোরআনের মূলনীতি ২২৪
মানব রচিত আইনের কাছে বিচার চাওয়াই হচ্ছে তাগুতের অনুসরণ ২২৭
মানুষের প্রকৃতি ও মোনাফেকদের আচরণ ২৩০
রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ২৩২

একটি সহজ সরল জীবন বিধান	২৩৫
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামের তফাৎ	২৩৭
এই সোনার মানুষগুলো ছিলেন রসূলের সাথী	২৩৯
অনুবাদ (আয়াত-৭১-৮৬)	২৪১
তাফসীর (আয়াত-৭১-৮৬)	২৪৪
রসূলের যুগে মানুষদের শ্রেণীবিন্যাস	২৪৫
কোরআনের সমরবিদ্যা	২৪৮
ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৫২
মোনাফেকী ও দুর্বল ঈমানের ব্যাপারে কিছু কথা	২৫৬
মক্কী জীবনে যুদ্ধের হুকুম দেয়া হয়নি কেন	২৬০
মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই	২৬৩
মোনাফেকদের দৃষ্টিভংগী.	২৬৪
আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন	২৬৫
মোনাফেকদের ঘৃণ্য তৎপরতা	২৬৮
কোরআনের শিল্পগত সৌন্দর্য	২৬৯
মানবীয় বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা	২৭১
কিছু সমস্যা ও তার সমাধান	২৭৪
সালাম বিনিময়ের গুরুত্ব	২৭৬
অনুবাদ (আয়াত-৮৭-৯৪)	২৭৭
তাফসীর (আয়াত-৮৭-৯৪)	২৮০
আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রথম প্রচলন	২৮০
মোনাফেকদের ব্যাপারে কোরআনের নীতি	২৮২
মুসলমানদের মতভেদ নিরসন	২৮৩
মোনাফেকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ	২৮৫
ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি ইসলামের উদারনীতি	২৮৬
নিরপেক্ষ লোকদের ব্যাপারে কোরআনের নীতি	২৮৭
মোনাফেকদের জন্যে আরো কিছু ধমক	২৮৮
ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা	২৮৯
ইসলাম কখনো গণহত্যাকে সমর্থন করে না	২৯২
অনুবাদ (আয়াত-৯৫-১০৪)	২৯৪
তাফসীর (আয়াত-৯৫-১০৪)	২৯৭
আল্লাহর কাছে মোজাহেদের মর্যাদা	২৯৮
ইসলাম ও জেহাদ দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়	৩০০
কোরআনে হিজরতের প্রসংগ	৩০১
যখন হিজরত না করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়	৩০২
মোহাজেরদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা	৩০৫
সালাতে খওফ	৩০৭
যুদ্ধকালীন নামায	৩০৯
মোমেনের মনোবলের আসল উৎস	৩১১
অনুবাদ (আয়াত-১০৫-১১৩)	৩১২
তাফসীর (আয়াত-১০৫-১১৩)	৩১৩
অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন নিষিদ্ধ	৩১৩
ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো পাপ নেই	৩১৫
অনুবাদ (আয়াত-১১৪-১২৬)	৩১৮
তাফসীর (আয়াত-১১৪-১২৬)	৩২০
মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য	৩২১
জেনে শুনে সত্যের বিরোধীতা করা	৩২২
শয়তান মানবজাতির চিরশত্রু	৩২৫
কর্মফল নির্ধারণের মূলনীতি	৩২৬
অনুবাদ (আয়াত-১২৭-১৩৪)	৩৩০
তাফসীর (আয়াত-১২৭-১৩৪)	৩৩২
নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোরআন	৩৩৩
একটি সভ্য সমাজের গোড়া পত্তন	৩৩৬
দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় কোরআন	৩৩৮
একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা	৩৪১
আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব	৩৪৩
অনুবাদ (আয়াত-১৩৫-১৪৭)	৩৪৬
তাফসীর (আয়াত-১৩৫-১৪৭)	৩৪৯
সার্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোরআনের মিশন	৩৫৩
ঈমানের রূপরেখা সব যুগেই সমান	৩৫৬
ঈমান আনার পর কুফরী করার পরিণতি	৩৫৭
মোনাফেকদের পরিচয়	৩৫৯
মোমেনদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি	৩৬৪
মোনাফেকদের চরিত্রের আরো কিছু চিত্র	৩৬৭
মোনাফেকদের ভয়াবহ পরিণতি	৩৭১
তওবার দরজা খোলা	৩৭২
পঞ্চম পারার পরিশিষ্ট	৩৭৪
অনুবাদ (আয়াত-১৪৮-১৭০)	৩৭৮
তাফসীর (আয়াত-১৪৮-১৭০)	৩৮২
অশ্লীলতা প্রতিরোধে কোরআন	৩৮২
ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা	৩৮৫
ইহুদী জাতির লজ্জাজনক ইতিহাস	৩৮৮
ঈসা (আ.)-এর শুলবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্য	৩৯১
ইহুদী জাতির চরম হঠকারিতা	৩৯৩
ওহীর সিদ্ধান্ত ও মানবীয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা	৩৯৫
মোমেনদের অপরিহার্য দায়িত্ব	৪০০
যালেমরা কখনো হেদায়াতের আলো পায় না	৪০৫
অনুবাদ (আয়াত-১৭১-১৭৫)	৪০৮
তাফসীর (আয়াত-১৭১-১৭৫)	৪১০
খৃষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদের অভিশাপ	৪১১
সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক	৪১৭
কোরআনের সম্মোহনী শক্তি	৪১৯

সূরা আন নেসা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল বাকারার পর এ সূরাটি কোরআনে করীমের সবচেয়ে বড়ো সূরা। নযুলের দিক থেকে এটির স্থান হচ্ছে সূরা আল মোমতাহানার পর। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সূরার কিছু অংশ অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় নাযিল হয়েছে, আর কিছু অংশ তার পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময় অনুযায়ী সূরার ধারাবাহিকতার বিষয়টি চূড়ান্ত নয়, এ কথাটি আমি প্রথম পারায় সূরা বাকারার ভূমিকার মধ্যে আলোচনা করেছি। কোনো নির্দিষ্ট সূরার পুরো অংশ একই সময় একসাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সূরার আয়াতসমূহ অনেক সময় একই সাথে নাযিল হতো। তখন রসূল (স.) ওহী লেখকদের প্রত্যেকটি আয়াতকে তার নির্দিষ্ট সূরার সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিতেন। এই ধারার আলোকে একটি সূরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকতো, সূরা সমাপ্ত হতে দির্ঘদিন লাগতো। অর্থাৎ একই সূরার আয়াতসমূহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূরা আল বাকারায় এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা মাদানী যিন্দেগীর প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে, আর কিছু আয়াত এমনও রয়েছে যা রসূল (স.)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

সূরা আন নেসার অবস্থাও অনুরূপ। তার কিছু অংশ সূরা আল মোমতাহানার পর ষষ্ঠ হিজরীতে, আর কিছু অংশ অষ্টম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। এ সূরার সিংহভাগ অবশ্য নাযিল হয়েছে হিজরতের প্রথম দিকে। সম্ভবত এ সূরা নাযিল হওয়ার ধারা তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে অষ্টম হিজরীর পর পর্যন্ত জারি ছিলো, যখন সূরা আল মোমতাহানার শুরু ভাগ নাযিল হয়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন ব্যভিচারিণীদের হুকুম সম্বলিত আয়াতটি উল্লেখ করতে পারি।

‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করো। অতপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে তোমরা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় কিংবা আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের জন্যে কোনো পথনির্দেশ না করেন।’ (আয়াত ১৪)

এটা চূড়ান্ত সত্য যে, এই আয়াতটি সূরা আন নূরের সে আয়াতটির পূর্বে নাযিল হয়েছে যেখানে ব্যভিচারের শাস্তির কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

‘ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ। তাদের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের কোনো প্রকার অনুকম্পার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো, আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন প্রত্যক্ষ করে।’

সর্বশেষ আয়াতটি পঞ্চম হিজরী (মতান্তরে ৪র্থ হিজরী) ‘ইফক’ (হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ)-এর ঘটনার অব্যবহিত পরে নাযিল হয়েছে। উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে তাদের সম্পর্কিত আল্লাহর বিধান গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে পন্থা বাতলে দিয়েছেন তা হচ্ছে সে বিধানটি যা সূরা আন নূরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এই উদাহরণটির ন্যায় এই সূরায় অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এগুলো প্রায়ই সার্বিকভাবে তার নাযিল হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করে, আমি সূরা আল বাকারার ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এ সূরাটি মানবীয় চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে চিত্রায়িত করেছে। মুসলিম দলের গঠন, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এই দল ও সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইসলাম এভাবে চেষ্টা করেছে। এর সাথে এই সূরাটি নতুন ইসলামী সমাজে কোরআনের প্রভাবের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছে। কোরআনের আলোকেই মূলত সে সমাজের উৎপত্তি হয়েছে, আর এই বিধানের মাধ্যমেই তার ক্রমবিকাশ হয়েছে। এই সূরা মানব জাতির সাথে আল্লাহর বিধানের সম্পর্কের ধরন ও স্বভাব বর্ণনা করেছে, আর মানব অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং আল্লাহর দেয়া বিধানের আহ্বানে তার সাড়া দেয়ার মানসিকতাকেও চিত্রায়িত করেছে। এই বিধানের ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে তার পদচিহ্ন ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয়। এ দীর্ঘতম রাস্তা অতিক্রম করতে তাকে লোভ লালসা, কামনা বাসনা, ভয়-ভীতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার ন্যায় বড়ো বড়ো বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যে রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ, আর যেখানে ইসলামের শত্রুরা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

আমরা ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানে নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছি,

মদীনায় মুসলিম দলের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে যে সকল পরিবেশ পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছে, কোরআনে কারীমের তার মুখোমুখি হওয়া, আল্লাহর বিধানের প্রকৃতি বর্ণনা করা, যার ওপর মুসলিম দলের উৎপত্তি হওয়ার বিষয়টি রয়েছে। মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনা, যার ওপর ইসলামী দর্শন প্রতিষ্ঠিত, আর এ চিন্তা চেতনা থেকে যে মানদন্ড ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বর্ণনা, আল্লাহর যমীনে উক্ত আমানত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকার করা, আল্লাহপ্রদত্ত বিধান এবং তারই আলোকে গঠিত দলের শত্রুদের স্বভাব ও প্রকৃতি চিত্রায়িত করার বিষয়টিও আমরা দেখতে পাই। শত্রুদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও প্রচার মাধ্যম থেকে মুসলিম দলকে সতর্ক করা, তাদের আকীদা বিশ্বাসের বক্রতা এবং তাদের প্রচার মাধ্যমের নীচুতার বর্ণনা করাও এখানে শামিল রয়েছে। যেমনিভাবে আমরা সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের উল্লেখিত বিষয়সমূহ দেখেছি, তেমনিভাবে আমরা এই সূরায় কোরআনে মজীদকে যাবতীয় পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বাস্তবতার মুখোমুখী দেখতে পাই।

কিন্তু কোরআনে করীমের প্রত্যেকটি সূরার বিশেষ স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, যার দিকে তার সকল বিষয় নিবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক সূরার বিশেষ স্বকীয়তার দাবীর মধ্যে আবার নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোও রয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ, বিশেষ নিয়মে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তার সমন্বয় সাধন, যাতে তার বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ এবং যার মাধ্যমে তার স্বকীয়তার পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর মতো তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে আলাদা আলাদা।

আমরা এই সূরার দিকে তাকালে দেখতে পাই এবং উপলব্ধি করি যে, তা একটি জীবন্ত সত্ত্বা, তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তার বাস্তবায়নের জন্যে বিভিন্ন পন্থা ও মাধ্যম অবলম্বন করে। সূরার বিভিন্ন শব্দ, আয়াত এবং অনুচ্ছেদসমূহই এর মাধ্যম এবং উপকরণ, যার দ্বারা প্রত্যেকটি সূরা তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়। আমরা কোরআনের প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে

যেমন অনুভব করি, সেভাবে এ সূরার মধ্যেও একটি বিষয় অনুভব করি, আর তা হচ্ছে জীবন্ত সত্ত্বার সাথে তার ডাকে সাড়া দেয়া। সম্প্রীতি ও সহানুভূতির এমন অনুভূতি, যার গুণাবলী পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য সবই পৃথক, নির্দিষ্ট ও দিক-নির্দেশনার অধিকারী এবং যার মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য ও অনুভূতি লুকায়িত আছে।

যে জাহেলী সমাজ থেকে মুসলিম সমাজকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন করতে এই সূরা চেষ্টা করছে। তার আবর্জনাকে দূরে নিক্ষেপ করে তাতে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করা, জাহেলিয়াতের আবর্জনা ও জঞ্জাল থেকে তাকে পবিত্র করা এবং তার স্বকীয়তাকে পরিষ্কার করতে সূরা আন নেসা সর্বত্র চেষ্টা করেছে। আল্লাহর বিধানের স্বভাব বর্ণনার মাধ্যমেও তা করা হয়েছে– যার থেকে সে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়েছে। মোশরেক, আহলে কেতাব বিশেষ করে ইহুদী– যারা তার পার্শ্বে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের চিহ্নিতকরণ, দুর্বল ঈমানদার ও মোনাফেক চক্রের ঘাপটিমারা শত্রুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং ঘৃণ্য প্রচারের মুখোশ উন্মোচন করা, তাদের ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা, কর্মসূচী ও পদ্ধতি বর্ণনা করাও এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সূরাটি এর সাথে এও বলেছে যে সমস্ত বিধান ও নিয়ম-নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা ওপরে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়গুলো সীমিত ও নিয়ন্ত্রণ করবে, অতপর এগুলোকে মযবুত ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে।

আমরা এখানে জাহেলিয়াতের আবর্জনাকে নতুন বিধান, মূল্যবোধ এবং যথার্থতার সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থায় দেখতে পাই। একইভাবে আমরা জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহকে দেখতে পাই নতুন জীবন বিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহকে মুছে ফেলার চেষ্টায় সংগ্রামরত। এখানে আমরা আরো অবলোকন করি যে, যুদ্ধের ব্যাপারেও আল্লাহর প্রদত্ত বিধান এই কোরআনের মাধ্যমে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট রয়েছে। ভয়াবহতা, গভীরতা ও প্রশস্ততার দিক থেকে এ যুদ্ধ দুনিয়ার সাধারণ যুদ্ধ থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

আমরা যখন সে সমস্ত জাহেলী আবর্জনার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি যার কিছু কিছু জিনিস ইসলামী সমাজ জাহেলী সমাজ থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে– এ(র কয়েকটি দিকের বর্ণনা এই সূরায় এসেছে, আর বাকী দিকগুলোর বর্ণনা এসেছে অন্যান্য সূরায়।) তখন কখনো কখনো আমাদের বিস্মিত হতে হয়। এমনকি এ সমস্ত আবর্জনা এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় সে সমাজে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিজয়ীর বেশে উপস্থিত ছিলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সমস্ত আবর্জনার উপস্থিতি এখনও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান।

ইসলামী বিধান মুসলিম দলটিকে যে উঁচুস্থানে উন্নিত করেছে, তার দিকে তাকালে আমাদেরকে বিস্মিত হতে হয়। এ দুর্লভ বিধান মুসলিম দলটিকে নীচু আবর্জনাময় পরিবেশ থেকে বের করে এনে এক সর্বোচ্চ শৃংগে আসীন করেছে। এ দুর্লভ বিধানের অনুসরণ, অনুকরণ ব্যতিরেকে এ উঁচু আসনে আরোহণ করা মানব জাতির জন্যে কখনো সম্ভব নয়। একমাত্র এই অনুপম জীবন বিধানই মানব অস্তিত্বকে নীচুতা থেকে মুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে নম্রতা, ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা, স্থিতিশীলতার সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করাতে সক্ষম।

যে ব্যক্তি মানব জাতির ইতিহাসের এ অনুপম দৃশ্যের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তার সামনে মহান রেসালাতের জন্যে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের লেখাপড়া না জানা এই মূর্খ লোকদের নির্বাচনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হেকমতের একটি দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সেখানে তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চরিত্র, চিন্তা চেতনা, বুদ্ধি, অনুভব, বর্ণনা ও

বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উপায়-উপকরণসহ পূর্ণ জাহেলিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতো, যাতে করে তারা তাদের মাঝে এ বিধানের পরিপূর্ণ প্রভাব জমাতে পারে, যাতে করে তাদের মাঝে অলৌকিক মোজেযা সংঘটিত হওয়ার ধরনটি স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মোজেযার প্রদর্শন বিশ্বের অন্য কোনো বিধান ও মতাদর্শের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানবজাতি কোথায় ওই বিধানকে খুঁজে পাবে যে বিধান তাকে হাত ধরে বহু উঁচু আসনে বসিয়ে দেবে, অথচ তার পূর্বের অবস্থান যেখানেই থাকুক না কেনো– অতি উচ্চে বা অতি নীচে সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। সে বিধান হলো একমাত্র আল কোরআন। এ বিধান তার চরিত্র ও মানষিকতা গঠনে, তাকে দৃঢ়করণে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয়নে ভূমিকা রাখবে। মানুষ আপন অস্তিত্ব থেকে অন্য কোনো অস্তিত্বে পরিবর্তিত হয় না। তার সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং উন্নতি তার জীবনের সাথেই সংযুক্ত হবে, তার স্বভাব ও অস্তিত্বকে পরিবর্তন করবে, কিন্তু কখনো তাকে অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবে না। এখানে যা দেখা যায় আসলে এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক পরিবর্তন ও উন্নতি মাত্র। এ পরিবর্তন মহাসমুদ্রের তরংগের ন্যায় যা তার মূল জলীয় স্বভাবের কোনো পরিবর্তন করে না, এমনকি তা তার স্থায়ী স্রোত ও গতিতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এটি সব সময় স্থায়ী স্বাভাবিক উপায়-উপকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখানে কোরআনের বক্তব্যসমূহ স্থায়ী সুদৃঢ় মানবীয় অস্তিত্বেরই সম্মুখীন হয়, আর এটা ওই উৎসেরই তৈরী যা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে। তাই কোরআনী ভাষ্য ও বক্তব্য এখানে পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও জীবনের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও তার নিত্য নতুন পর্যায়ের সমস্যারও কোরআন মোকাবেলা করছে। অথচ মানুষ সর্বাবস্থায় তার মৌলিক উপাদানের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

মানুষের মাঝে এ ধরনের প্রস্তুতি ও নমনীয়তা দুটোই রয়েছে। অন্যথায় তার পক্ষে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পর্যায়ের মোকাবেলা করা সম্ভব হতো না। কেননা তার চার পাশে যা আছে সেগুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়। এ কারণেই মানব জাতির জন্যে রচিত আল্লাহর এ বিধানের কিছু স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে, কেননা এ বিধান সেই উৎস থেকেই এসেছে যেখান থেকে স্বয়ং মানুষ এসেছে। তিনিই এ বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মাঝে আমানত রেখেছেন এবং তিনি শেষদিন পর্যন্ত তার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান রাখবেন।

এমনিভাবেই এ বিধান ও কোরআনের বক্তব্য পৃথকভাবে প্রত্যেক মানুষকে এবং সার্বিকভাবে গোটা মানবজাতিকে উর্ধে আরোহনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়ে সর্বোচ্চ আসন পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এ বিধান ও কোরআনী বক্তব্যকে মানুষ কখনো পেছনের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না এবং এর কোনো একটিকে নিয়ে সে নীচের দিকেও নেমে আসতে পারবে না।

আমাদের নতুন সমাজটি পুরাতন জাহেলিয়াতের আরব সমাজের মতোই, এটি শিল্পোন্নত সভ্য সমাজ বলে কথিত নতুন জাহেলিয়াতের আমেরিকা ইউরোপের সমাজের মতো নয়। আল্লাহর বিধান এবং কোরআনী ভাষ্যে সব কিছুই রয়েছে এবং পরিণামে তা ওই সত্ত্বার খোঁজ পাবে, যে সত্ত্বা এ স্থান থেকে তাকে ধরে ওপর থেকে আরো ওপরে উঁচু থেকে আরো উঁচু আসনে নিয়ে যাবে, ইসলাম মানব ইতিহাসের কোনো এক জীবন্ত যুগে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে।

আসলে জাহেলিয়াত আমাদের ইতিহাসের বিগত সময়সমূহের মধ্যে থেকে একটিমাত্র অতীত সময়ের নাম নয়, বরং জাহেলিয়াত হচ্ছে প্রত্যেক যুগের সেই জীবন বিধানের নাম যেখানে মানুষ অন্য মানুষের দাসত্বে নিমজ্জিত হয়। এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান বিশ্বের সকল জীবন বিধান ও মতাদর্শের

মাঝেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সকল জীবন বিধান ও মতাদর্শ যাকে বিশ্ব মানবতা আজ গ্রহণ করছে, তা সবই জাহেলিয়াত ছাড়া কিছু নয়। এখানে মানুষ তার মতামত চিন্তা চেতনা, নীতি ও আদর্শ, মানদন্ড, মূল্যবোধ, বিধি বিধান, প্রথা ও রীতি-নীতি আরেক মানুষের কাছ থেকেই গ্রহণ করে থাকে। আর এটাই হচ্ছে যাবতীয় উপাদানসহ পূর্ণ জাহেলিয়াতের নাম। মোদ্দাকথা, ওটাই আসল জাহেলিয়াত যেখানে মানুষের দাসত্ব মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই জাহেলিয়াতের পরিচয় হচ্ছে মানুষ এখানে আল্লাহর এবাদাত ছেড়ে অন্য মানুষের দাসত্বে মগ্ন হবে।

ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন বিধান, যেখানে মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে। এখানে চিন্তা চেতনা, নীতি ও আদর্শ, মানদন্ড, মূল্যবোধ, বিধি বিধান, প্রথা ও রীতি নীতি সে গ্রহণ করে স্বয়ং রব্বুল আলামীন থেকে। মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাদের মাথা নত করে। তারা একমাত্র আল্লাহর নিয়ম কানুনের কাছে ধর্ণা দেয় , স্বাভাবিকভাবেই তারা যখন একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করবে তখন তারা মানুষের দাসত্ব থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত হবে।

এটাই হচ্ছে সকল প্রকারের জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য। এই সূরাটি অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কারভাবে এ দুয়ের মাঝে একটা ব্যবধান রচনা করেছে। যাতে তার মাঝে আর কোনো কোনো সন্দেহ বিদ্যমান না থাকে।

এটা জানা কথা যে, কোরআনে কারীমের প্রত্যেকটি আদেশ, নিষেধ ও নির্দেশিকা জাহেলী সমাজের কোনো না কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হচ্ছিলো। তার মাধ্যমে কোরআন তখনকার সমাজে বিদ্যমান কোনো প্রথাকে বহাল রাখার এবং কোনো কোনো প্রথাকে রহিত করার চেষ্টা করছিলো। এটা এমনিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো যাতে সাধারণভাবে মৌলিক বিধানের কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। তাই এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, এখানে 'ঘটনার বিশেষ প্রেক্ষিত বড়ো কথা নয়, শব্দের ব্যাপকতাই হচ্ছে ধর্তব্য বিষয়।' উল্লেখ্য যে, কোরআনের বক্তব্য সকল যুগে, সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পরিবেশে কাজ করার জন্যে এসেছে, আর এর মাঝেই লুকায়িত আছে কোরআনের মোজেযা। যেসব ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোরআনের এ বক্তব্য নাযিল হয়েছিলো মানব সম্প্রদায় সে অবস্থাসমূহের বারবার সম্মুখীন হচ্ছে। এই বিধান যা একদিন মুসলিম সমাজকে জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছিলো সেই বিধান বর্তমানেও যে কোনো সমাজকে অতি নীচু স্থান থেকে উদ্ধার করে অতি উঁচু অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম।

অধিকন্তু আমরা যখন কোরআনে কারীম অধ্যয়ন করি তখন তার থেকে তার আদেশ, নিষেধ এবং নির্দেশাবলীর আলোকে জাহেলী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোও আমরা জানতে সক্ষম হই, আমরা সেসব নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোও জানতে সক্ষম হই, যার মাধ্যমে কোরআনে মাজীদ ইসলামী সমাজ সৃষ্টি করতে চায়।

আমরা এই সূরায় জাহেলী সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে থেকে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যেসব জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে মুসলিম দলকে একবার উদ্ধার করার পর পুনরায় তারা সেই জাহেলিয়াতের মাঝে পড়ে গেছে। তার সাথে আমরা এ সূরায় নতুন কিছু বিষয়ও দেখতে পাচ্ছি যা কোরআন নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে দৃঢ়ভাবে মানুষকে উপহার দিতে চেষ্টা করেছে।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে অভিভাবকরা এতীম ছেলে বিশেষ করে এতীম মেয়েদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করছে। তাদের হক বিনষ্ট করছে। যে সমাজে ভালো সম্পদ খারাপ সম্পদের শুধু এ ভয়ে সাথে বদল করা হতো যে, এতীমরা যখন বড়ো হবে তখন তারা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। ধন সম্পদের মালিক ছোটো ছোটো এতীম মেয়েদেরকে

তাদের অভিভাবকরা বিয়ে করার মানসে ঘরের ভেতরে আটক করে রাখতো। এ কাজটি তাদের প্রতি কোনো আন্তরিকতার বশবর্তী হয়ে নয় বরং তাদের মালিকানাধীন সম্পদ কুক্ষিগত করার হীন উদ্দেশ্যেই করা হতো অথবা ছোটো এতীম মেয়েদেরকে অভিভাবকদের ছেলেদের সাথে একই উদ্দেশ্যে বিয়ে দেয়া হতো।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে শিশু, দুর্বল এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা হতো। মীরাসের প্রকৃত অংশ তাদেরকে দেয়া হতো না, বরং অস্ত্র চালাতে সক্ষম শক্তিশালী পুরুষরা, মীরাসের সিংহভাগ নিয়ে নিতো। দুর্বলদের ভাগ্যে নিতান্ত সামান্য কিছু অংশই জুটতো। এ সামান্য অংশ যা এতীম মেয়ে শিশু এবং বৃদ্ধা মহিলাদের ভাগ্যে জুটতো, তারই জন্যে আবার তাদেরকে ঘরে আটক করে রাখা হতো এবং বৃদ্ধ অভিভাবক অথবা অভিভাবকের পুরুষ শিশুর সাথে তাদের বিয়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হতো, আর এটা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করা হতো যাতে তাদের সম্পদ হাতছাড়া হয়ে না যায় এবং গরীবদের মাঝে তা বন্টিত না হয়।

এ সূরাতে আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যে সমাজ নারী জাতিকে তার উপযুক্ত মর্যাদার আসনে আসীন করেনি বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে তাদের সাথে তারা অন্যায় ও অবিচারমূলক আচরণ করেছে, তাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদের ক্ষতি সাধনের জন্যে নানাভাবে আটক করে রেখেছে। অধিকন্তু এ সমাজ যেমনিভাবে পুরুষ জাতিকে সম্পদের উত্তরাধিকার করেছে তেমনিভাবে তার অভিভাবক নারীকে উত্তরাধিকার করেনি। যখন মহিলাদের স্বামী মারা যেতো, তখন তার কাছে আসতো এবং তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভালো করেই জানতো যে সে (মহিলা) নিশ্চিতভাবে তারই জন্যে গচ্ছিতা ও রক্ষিতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারে অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারে কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখবে যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যাবে না, আবার তালাকপ্রাপ্তাও বুঝা যাবে না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে।

আমরা এমন একটি সমাজ এখানে দেখতে পাই, যেখানে নারী জাতির মর্যাদার অধপতনের কারণে পরিবারের বন্ধন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং তার নিয়ম-নীতিতে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো বহুতরো বিশৃংখলা। অধিকন্তু দত্তক ও অভিভাবকত্বের আইন-কানুনে বিশৃংখলা এবং আত্মীয়তা ও বংশ তালিকা বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতির সাথে তার সংঘর্ষও পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। সর্বোপরি সে সমাজে যৌন ও পারিবারিক সম্পর্কে ছিলো সীমাহীন নৈরাজ্য ও হাজারো অনিয়ম। এমনকি সবার সামনে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অশ্লীল বাক্য বিনিময় ও অবাধ যৌন মিলনও সেখানে বিদ্যমান ছিলো।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে সুদভিত্তিক লেনদেন, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হতো, মানুষের অধিকার হরণ করা হতো, আমানতের খেয়ানত করা হতো, মানুষের জান ও মালের ওপর আক্রমণ হতো। ন্যায়-ইনসাফ সে সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিলো। আর যদি কিছুটা ছিলোও তা আবার পেশী শক্তির অধিকারী ছাড়া অন্যদের ভাগ্যে জুটতো না। সে সমাজে লোক দেখানো মান মর্যাদা ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া ধন সম্পদ ব্যয় করা হতো না। আর এ দানের সম্পদ ধনী ও শক্তিশালীরা যতোটুকু পেতো, অসহায়, গরীব ও দুস্থদের ভাগ্যে সে পরিমাণ জুটতো না।

এগুলো ছিলো জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। সুন্দর করে এ সূরাটি তা বর্ণনা করেছে। এ ছাড়া তদানীন্তন আরব ও আশেপাশের অন্যান্য জাতির মধ্যে জাহেলিয়াতের যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছিলো তার বর্ণনা অন্যান্য সূরার মধ্যেও বিস্তারিত রয়েছে।

আবার জাহেলী সমাজ একেবারে মর্যাদা ও গুণাবলীবিহীন কোনো সমাজও ছিলো না-বরং তারও ছিলো অসংখ্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই সে সমাজের এক বিরাট অংশ রসূল (স.)-এর রেসালাতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলো। জাহেলী সমাজের মহৎ গুণাবলীকে জাহেলিয়াতের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তারা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেছিলো। যদি দ্বীন ইসলামের আগমন না ঘটতো, তাহলে জাহেলিয়াতের মহৎ গুণাবলীসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পাপ ও অপকর্মের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে একদিন এমনিই নিঃশেষ হয়ে যেতো, যার নামগন্ধও মানুষ জানতো না। এ নতুন বিধানের আগমন না ঘটলে আরব জাতি বিশ্বমানবতার সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই উপস্থাপন করতে সক্ষম হতো না। এ বিধান জাহেলিয়াতের বিকৃত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলে তার ওপর ইসলামের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে লাগলো এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত জাহেলী আরব জাতির মহৎ গুণাবলীকে একে একে উদ্ধার করতে লাগলো। এক্ষেত্রে জাহেলী যুগের আরব জাতির অবস্থা ছিলো অন্যান্য জাতির মতোই, কেননা কোনো রেসালাত তাদেরকে পায়নি এবং কোনো নতুন আকীদাও তাদেরকে জাগ্রত করেনি।

যে জাহেলিয়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্য থেকেই ইসলাম কিছুসংখ্যক লোককে বেছে নিলো। তাদের ভাগ্যে মহান রব্বুল আলামীন কল্যাণ রেখেছেন এবং তাদেরকে মানবজাতির নেতৃত্বের জন্যে তিনি নির্বাচন করেছেন। অতপর ইসলাম তার থেকে একটি ইসলামী দল বের করে আনে, তারপর তাকে দিয়ে একটি ইসলামী সমাজ গঠন করে। সে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অন্য কোনো জাতি ইতিপূর্বে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। আজও যদি মুসলিম জাতির মধ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তারাও পূর্বের ন্যায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হবে।

এই সূরার মাঝে আমরা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা ইসলামী বিধানকে জাহেলিয়াতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মুসলিম সমাজ এগুলোই দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে চায়। এ বিধান ও পরিবেশ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের হেফাযত করে এবং তাকে বর্তমান সমাজে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর।

আমরা এ সূরার শুরুতে যে সমস্ত জিনিসের বর্ণনা পাচ্ছি তা হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব ও তার তাওহীদের তাৎপর্য, মানুষ এবং যে মূল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টি করেছেন তার অভিন্নতার বর্ণনা, মানুষ পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য, তদুপরি এ সমস্ত বন্ধনকে মানব চিন্তায় বদ্ধমূল করার দীর্ঘ বর্ণনা এখানে রয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে এর বুনিয়াদ স্থাপন করা, যার ওপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজ পরিচালনা করা যায়, এক কর্তার অধীনে এক পরিবারের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংহতির মাধ্যমে দুর্বলদের হেফাযত করাও অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজকে ব্যভিচার, অত্যাচার এবং ফেতনা থেকে বাঁচানো এবং আল্লাহর প্রভুত্ব এবং মানবতার ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলিম পরিবার, মুসলিম সমাজ এবং মানব সমাজকে পরিচালনা করার বিবরণও এতে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (আয়াত ১)

সূরা আন নেসার প্রথম আয়াতে যে বাস্তবতা ও তাৎপর্যকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামী চিন্তা চেতনার মূল ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর ওপরই মানুষের সামষ্টিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। (ইনশাআল্লাহ তার বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট স্থানে করা হবে)।

ইসলামী সমাজ পরিচালনার এই স্তম্ভটির ওপর ভিত্তি করে ইসলামী দলের সংহতি ও সহাবস্থান সম্পর্কিত বাস্তব ও ব্যবহারিক কিছু বিধি বিধানও আমরা এই সূরায় দেখতে পাচ্ছি।

এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা উক্ত সূরায় অনুপ্রেরণাদানকারী কিছু নির্দেশিকা, ভীতিপ্রদ সতর্কতা ও নির্ধারিত নীতিমালা সম্বলিত বিধি বিধানও দেখতে পাচ্ছি। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও .... নিশ্চয় এটা গুরুতর অপরাধ।' (আয়াত ২)

'এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখো, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে .... অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।' (আয়াত ৬)

এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের ভয় করা উচিত। যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান সন্তুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশংকা করে .... সত্বরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।' (আয়াত ৯-১০)

বিশেষ করে নারী, শিশু, এতীম বালিকা এবং দুর্বল মহিলাদের হেফাযত, মীরাসে তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং জাহেলিয়াত ও তার অপমানকর অত্যাচারী রীতি-নীতির বর্বরতা থেকে উদ্ধার করার জন্যে আমরা উক্ত সূরায় অসংখ্য বিধি বিধান ও নির্দেশিকার দৃষ্টান্তসমূহ দেখতে পাই। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আশংকা করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও .... তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারো।' (আয়াত ৩-৪)

'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে ... এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'হে ঈমানদাররা, বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়.... অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের স্বাদ আস্বাদন করেছো এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অংগীকার গ্রহণ করেছে। (আয়াত ১৯-২১)

'লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন .... তোমরা যা ভালো কাজ করবে, তা আল্লাহ তায়ালা জানেন।' (আয়াত ১২৭)

এখানে এসে নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনামূলক আয়াতসমূহ নাযিল হয়। পরিবারকে গঠন ও সুবিন্যস্ত করা, প্রকৃতির প্রেরণায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সামাজিক ও বৈবাহিক (দাম্পত্য) জীবনে সাময়িক পরিবেশন ও পরিস্থিতির প্রভাব থেকে পরিবারের হেফাযতের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। এখানে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও এতীম বালিকাদের আলোচনা প্রসংগে আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে তা আলাদা কথা... তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (আয়াত ২২-২৪)

'পুরুষ নারীদের পরিচালক এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এ জন্যে যে, তারা তাদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমুন্নত মহীয়ান।' (আয়াত ৩৪-৩৫)

'যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে .... আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১২৮-১৩০)

দত্তক প্রথা বাতিল করার লক্ষ্যে বংশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোনো মনিব কিংবা ক্রীতদাস এবং একই পরিবারের সদস্যদের মাঝে উত্তরাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কের শৃংখলা বিধান করার জন্যে এ আয়াতগুলো নাযিল করা হয়, তাছাড়া সুদূরপ্রসারী সামাজিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বলিত নির্ধারিত বিধি বিধান এবং এর নীতি ও আদর্শ নিয়েও এই আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়।

এরশাদ হচ্ছে, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান ..... আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, সহনশীল।' (আয়াত ১১-১২)

'মানুষ তোমার কাছে জানতে চায়, অতপর তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাস সংক্রান্ত নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন .... আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত। (আয়াত ১৭৬)

'পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান সে সবের জন্যেই আমি অভিভাবক নির্ধারণ করে দিয়েছি ... আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (আয়াত ৩৩)

নারী জাতিকে পাপ পংকিলতা থেকে পবিত্র রাখার উপায় উপকরণ যোগান দেয়া এবং সমাজকে ব্যভিচার মুক্ত রাখার মানসে আমরা সেখানে শৃংখলার ব্যবস্থা দেখতে পাই। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা কুকর্মে লিপ্ত হবে, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারণ পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।' (আয়াত ১৫-১৬)

'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছে।'

সীমিত করণের উদ্দেশ্যে নয় বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এ থেকে কিছু এখানে কিছু কথা বর্ণনা করবো। সূরার পূর্বাপর প্রসংগে সকল নির্দেশনা ও বিধি বিধান স্ব স্ব স্থানে বর্ণিত হবে।

এরশাদ হচ্ছে,

'যে সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না, বরং তা থেকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।' (আয়াত-৫)

'সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতীম ও মেসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।' (আয়াত ৮)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস (ভক্ষণ) করো না .... এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।' (আয়াত ২৯-৩০)

তোমরা আকাংখা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ... নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।' (আয়াত ৩২)

'তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, মেসকীন, প্রতিবেশী.... তার ভাগ্যে খুব খারাপ সংগী জুটেছে। (আয়াত ৩৬-৩৮)

'হে মুসলমানরা! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকদের কাছে সোপর্দ করে দাও .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনেন।' (আয়াত ৫৮)

'যে লোক সৎ কাজের জন্যে কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে .... অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।' (আয়াত ১৪৮-১৪৯)

পারস্পরিক নিরাপত্তা, করুণা, উপদেশ, মহানুভবতা, আমানত, ইনসাফ, ভালোবাসা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে সুবিন্যস্ত করা, উক্ত সমাজ থেকে জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট জ ালকে মুছে ফেলা এবং ইসলামী বিধানের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মতো বিরাট একটা লক্ষ্য অর্জন করার পাশাপাশি আমরা এখানে অন্য একটি লক্ষ্যও দেখতে পাই। মুসলিম সমাজ জীবনে যার প্রভাব ও গভীরতা উপরোক্ত লক্ষ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যদিও এটা মূল ভিত্তি নয় যার ওপর প্রথম লক্ষ্যটি নির্ভরশীল। এই বিষয়টি হচ্ছে দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত অনুধাবন করা, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এমন সকল নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের নির্ধারিত অর্থ বুঝা এবং ঈমান ও ইসলামের নির্ধারিত সংজ্ঞার সাথে তার সংযোগ স্থাপন করা।

দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মূলত সে জীবন বিধানের নাম যাকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবতার জন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং দ্বীন হচ্ছে সে আদর্শের নাম যার ওপর গোটা জীবনের সকল কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়, আর এই বিধান রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর অনুসরণ এবং আনুগত্যের নাম, কেননা একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে আনুগত্য পাওয়ার এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই জীবন বিধান গ্রহণ করা এবং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করা যেতে পারে। সুতরাং মুসলিম সমাজে যেমন বিশেষ চিন্তা ভাবনা ও আকীদা বিশ্বাস রয়েছে তেমন তার রয়েছে বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব, আর সে নেতৃত্ব হচ্ছে রসূল (স.)-এর আদর্শে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা প্রচার করেছেন পরবর্তীতে তাই আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান নামে পরিচিত হয়েছে। এই সমাজের উল্লেখিত নেতৃত্বের অধীনতা ও নির্ভরশীলতাই মানুষকে ইসলাম তথা আত্মসমর্পণের গুণ দান করেছে এবং তা থেকেই মুসলিম সমাজের গোড়া পত্তন করেছে। নিরংকুশ অধীনতা ও আত্মসমর্পণ ছাড়া কখনো কেউ পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। এই অধীনতার শর্ত হচ্ছে, কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে ধর্ণা দিতে হবে। আল্লাহর রসূল (স.)-এর ফয়সালায় তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এই ফয়সালাকে মেনে নিয়ে তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই সত্যটি বর্ণনা করা এবং এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই সূরার বক্তব্য চূড়ান্তভাবে ও সুনিশ্চিতরূপে বিবৃত হয়েছে। এতে কোনো বিতর্ক, কোনো সন্দেহ, কোনো প্রতারণা অথবা কোনোরূপ জটিলতা ও সংমিশ্রণের অবকাশ নেই। কারণ এই বক্তব্য এতোই সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত যে, এতে কোনো বিতর্কের অবকাশই থাকে না।

এই মূলনীতির প্রতিষ্ঠা এই সূরার আরো অসংখ্য বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার বিস্তারিত পর্যালোচনা বক্তব্যের স্ব-স্ব স্থানে বিবৃত হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

এই সূরার প্রথম আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে এই মূলনীতি সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে, 'হে মানব সমাজ ... আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (আয়াত ১)

'তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। (আয়াত ৩৬)

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন না, যদি তার সাথে শরীক করা হয়... আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে বড়ো অপবাদই আরোপ করলো এবং মহাপাপে জড়ালো।' (আয়াত ৪৮)

উল্লেখিত মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে ও সুনির্ধারিত রূপে নিম্নের আয়াতগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং সেইসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন ... তখন তুমি মোনাফেকদের দেখবে, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে।' (আয়াত ৫৯-৬১)

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয়।' (আয়াত ৬৪)

'অতএব, তোমার মালিকের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের ... তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' (আয়াত ৬৫)

'যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে (মূলত) আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো .... সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্য স্থান।' (আয়াত ১১৫)

এভাবেই দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত, মুসলিম সমাজের নিয়ম পদ্ধতি এবং তার জীবন বিধান নির্ধারণ করা হয়। ঈমান শুধু আবেগ ও চিন্তা চেতনার নাম নয়, তদ্রূপ ইসলাম কিছু কথা বা প্রতীকের নাম নয় এমনি ঈমান কেবলমাত্র এবাদাত অনুষ্ঠান, দোয়া এবং নামাযের নামও নয়, বরং এগুলোর পাশাপাশি এবং সর্বাগ্রে হচ্ছে, এমন এক জীবন বিধান যা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, এমন এক আদর্শ যা মানবজাতিকে সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ করে, এমন এক নেতৃত্ব যার আনুগত্য করা হয় এবং এমন এক ব্যবস্থা যা নির্দিষ্ট বিধান, আদর্শ নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল থাকে। উল্লেখিত সব কিছু বাদ দিয়ে ঈমান, ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাংগ হতে পারে না।

এই মূলনীতির স্বীকৃতির ওপর এ সূরায় অসংখ্য নির্দেশনামা বেরিয়ে আসে, আর এর সবগুলো এই মৌলিক মূলনীতিরই শাখা প্রশাখা।

১. সমাজের যাবতীয় সামাজিক নিয়ম-নীতি এই বড়ো মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল এবং তা দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের শর্তের প্রতিও মুখাপেক্ষী। একথাগুলো ইতিপূর্বের উদাহরণগুলোতে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে সামাজিক এই নিয়ম নীতিগুলো শুধু নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলো হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর 'ইলাহ' হওয়ার স্বীকৃতি দেয়া, একমাত্র তাঁকেই এবাদাতের উপযুক্ত মনে করা এবং তাঁর মহান নেতৃত্ব থেকে নির্দেশ গ্রহণ করারই দাবী, অধিকন্তু আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত নিয়ম নীতি ও বিধি বিধানের আলোচনা করেছি তাকেও আমরা এই মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল দেখতে পাই এবং এই সত্যটির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে।

এই সূরার প্রথম আয়াত যা মানব ঐক্যের কথা বর্ণনা করে, মানব জাতিকে তার আত্মীয়তার বন্ধনের হেফাযতের আহ্বান করে এবং যাকে এই সূরার পরবর্তী সকল নিয়ম নীতির ও বিধি বিধানের জন্যে ভূমিকা স্বরূপ গণ্য করা হয়। তার সূচনা হয়েছে মানব সমাজকে তার প্রতিপালকের ভীতির দিকে আহ্বানের মাধ্যমে। যিনি তাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ১)

তদ্রূপ তার সমাপ্তিও হয়েছে আল্লাহভীতির প্রতি আহ্বান এবং মানব সমাজকে তাঁর পাহারাদারীর থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন।'

যে সমস্ত আয়াত এতীমদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সবাইকে উৎসাহিত করে এবং তাদের সম্পদের ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করে তার সমাপ্তি ঘটেছে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর হিসাব নিকাশের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, 'অবশ্য আল্লাহ তায়ালা হিসেব নেয়ার জন্যে নিজেই যথেষ্ট।'

পরিবারে উত্তরাধিকারের অংশ বন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশাকারে এসেছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ করেন। এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।'

উত্তরাধিকারের বিধি বিধানের সমাপ্তি নিম্নোক্ত পর্যালোচনা ও মন্তব্যের মাধ্যমেই হয়েছে।

'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ মতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন.... সে সেখানে চিরদিন থাকবে, তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (আয়াত ১৩)

এর যাবতীয় পারিবারিক বিধি বিধান ও নিয়ম নীতি সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে এ কথাগুলো নাযিল হয়। যেমন 'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করো যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (আয়াত ১৯)

'এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ..... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ২৪)

'যদি তাতে তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, ... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'

'তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।'

পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম মেসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মোসাফের ও নিজের দাস দাসীর প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহারের নির্দেশের পূর্বে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

আর এভাবে সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁরই বিধান থেকে উৎসারিত হয় এবং যাবতীয় বিষয় একমাত্র সে নেতৃত্বের দিকে ফিরে যায়, যার অনুসরণ ও অনুকরণ ও আনুগত্য পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

২. মোমেনদের তাদের এবং তাদের মোমেন দলের আনুগত্য করা উচিত। সুতরাং তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাবে না, যে মোমেন নয়। মোমেনদের বিধি-বিধান ও আদর্শ ও লক্ষ্যের যে অনুসরণ করে না এবং তাদের নেতৃত্ব থেকে যে নির্দেশাবলী গ্রহণ করে.... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১১৫-১১৬)

'হে নবী। সে সব, মোনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে .... যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে।' (১৩৮-১৩৯)

'হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না .... শীঘ্রই ঈমানদারদেরকে মহাপুণ্যদান করবেন।' (আয়াত ১৪৪-১৪৬)

৩. 'দারুল হরব' থেকে মুসলমানদের হিজরত করা ওয়াজেব, অতপর তারা মুসলিম দলের সাথে সে ভূখন্ডে গিয়ে মিলিত হবে যেখানে মুসলমানরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা মুসলিম নেতৃত্বের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, কুফুরীর পতাকাতলে নয়, অন্যথায় এটাকে মোনাফেকী অথবা কুফুরী নামে আখ্যায়িত করা হবে- যারা নিজের অনিষ্ট করে ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে .... নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার মানসে বের হয়, অতপর ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজেব হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অতীব অনুগ্রহশীল।' (আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯৭ ও ১০০)

৪. মুসলমানরা তাদের দুর্বল মুসলিম ভাইদেরকে ছাড়িয়ে আনা এবং উদ্ধারের জন্যে জেহাদ করবে। যারা 'দারুল হারব এবং কুফুরের' ঝান্ডা থেকে মুক্ত হয়ে 'দারুল ইসলাম' এ গিয়ে ইসলামী দলের .... নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭৫)

এই বিষয়টির পরক্ষণেই আসছে জান-মাল দ্বারা জেহাদে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করা, জেহাদে অংশগ্রহণে ব্যর্থ অসমর্থ্য লোকদের নিন্দা জ্ঞাপন সংক্রান্ত এক বিরাট বর্ণনা। এই বর্ণনাটি বক্ষমান সূরায় এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং যেখান থেকে এর সূচনা হয়েছে সেখান থেকে সূরার কোমল কণ্ঠ আস্তে আস্তে দৃঢ় হচ্ছে, তার সুর ধীরে ধীরে উচ্চমার্গে উঠে যাচ্ছে এবং নির্দেশ ও নিন্দার ভাষা আরো কঠোর হয়ে উঠছে।

ধারাবাহিকতার সাথে সূরাব্যাপী উল্লেখিত অভিযানের আলোচনা পর্যালোচনা করতে আমি সক্ষম হইনি। ধারাবাহিকতার বিশেষ গুরুত্ব ও নির্ধারিত কিছু মূল্য রয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করবো মাত্র। এ অভিযানের উদাহরণসমূহ সূরার স্ব স্ব স্থানে উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমি পেশ করবো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! (শত্রুর) মোকাবেলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থেকো। অতপর সুযোগ ও প্রয়োজন ... নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭১-৭৬)

'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকো, তুমি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো ... দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।' (আয়াত ৮৪)

'ঘরে বসে থাকা মুসলমান যাদের কোনা ওযর নেই এবং সে মুসলমান যারা জান ও মাল ... আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' (আয়াত ৯৫-৯৬)

'তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে .... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১০৪)

জেহাদের প্রতি উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করার এ অভিযানের পাশাপাশি মুসলিম শিবির ও অন্যান্য শিবিরের মধ্যে লেনদেন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত কিছু আচরণবিধি ও নিয়ম-নীতিও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

মোনাফেকদের মধ্যে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত কাজ এবং মদীনাবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করতো এবং কাজ শেষ করে তারা যখন মদীনা থেকে বের হতো তখন শত্রু শিবিরের বন্ধু হয়েই ফিরে আসতো। মোনাফেকদের ব্যাপারে মুসলমানদের দু'দল ও দু'মতে বিভক্ত হওয়ার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের তোমরাও তেমন কাফের হয়ে যাও। অতএব, তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না... তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ দান করেছি।' (আয়াত ৮৯-৯১)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।' (আয়াত ১০১-১০৩)

এই আয়াতসমূহ ইসলামী বিধানে নামাযের গুরুত্ব ও মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। আর এ জন্যেই ভয়ের অবস্থায়ও নামায পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে এই আয়াতসমূহ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ইসলামী বিধান পূর্ণাংগ হওয়ারও পরিচায়ক। এ কারণেই মুসলিম ব্যক্তি ও মুসলিম দল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকে।

জেহাদের আলোচনার পরক্ষণেই আসছে মোনাফেক ও মদীনার ইহুদীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের বিষয়টি যেখানে তারা আল্লাহর দ্বীন, মুসলিম দল ও মুসলিম নেতৃত্বের সাথে ভয়াবহ প্রতারণা করে, মুসলিম দলের বিরুদ্ধে চাল ও ষড়যন্ত্র আঁটে, ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধি বিধানের সাথে ইহুদী মূল্যবোধ ও নিয়ম পদ্ধতির সংমিশ্রণের বিরাট অভিযান চালায়। জেহাদ প্রসংগে যে সমস্ত আয়াত আমি উল্লেখ করেছি, তার মাঝে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে অভিযানেরও কিছু দিক রয়েছে। এখানে আমি এমন কিছু আয়াতের অবতারণা করবো যেগুলো মোনাফেকদের অবস্থা ও গুণাবলী চিত্রায়িত করে এবং তাদের স্বভাব ও প্রচার মাধ্যমের কথাও বর্ণনা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা মুখে মুখে বলে, আমরা তোমার অনুগত, ফরমাবরদার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে যখন... সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো।' (আয়াত ৮১-৮৩)

'যারা একবার মুসলমান হবার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে ... আর তোমরা তাদের জন্যে কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (আয়াত ১৩৭-১৪৫)

এই সূরার জেহাদের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের দিকে যদি তাকাই তাহলে এখানে অঘোষিত একটা যুদ্ধ আমরা দেখতে পাই। আর আহলে কেতাব (বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়) ও তাদের মিত্রসমূহের পক্ষ থেকে মুসলিম দল, ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী নেতৃত্বকে আক্রমণের মাধ্যমে সেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানেও উল্লেখিত যুদ্ধ ও সংঘাতের আলোচনা দেখেছি। সে সাথে আমরা যদি আল্লাহর বিধানের দিকে

তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এ বিধান ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝেও মুসলিম জাতিকে হাতে হাত ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে। ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে তাদেরকে সতর্ক করছে এবং তাদের শত্রুদের স্বভাব, শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধের ধরন, যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে সেই ভূমির প্রকৃতি এবং যুদ্ধের ক্ষতিকর কিছু দিক ও তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এই বিধান মুসলমানদেরকে অবহিত করছে।

কোরআনে করীমের অলৌকিক বাচনভংগী এবং পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষার নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটি যে, উল্লেখিত বক্তব্যসমূহ যদিও একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু আজও তা একইভাবে বিশ্বের সর্বস্থানের মুসলমান এবং তাদের চিরাচরিত শত্রুদের মাঝে স্থায়ী যুদ্ধের প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করছে। আদিকালের মুসলিম শত্রু এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের শত্রুদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বের শত্রুতার কারণসমূহ এবং বর্তমানকালের কারণসমূহের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। তার আকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং কারণসমূহ পৃথক উপায় উপকরণ এবং মাধ্যমের পরিবর্তন ছাড়া সত্যিকার অর্থে তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের মধ্যে কোনোপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, মুসলিম দলে ফাটল সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে সন্দেহের সৃষ্টি করা এখন পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয়ে আছে। এর মাধ্যমে তারা চাচ্ছে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করে মুসলমানদের ভাগ্যে পরিবর্তন সাধন করতে। তাদের ভূমি, ফসল, প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থকে পুরোপুরি দখল করে নিতে এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহর বিধান, মুসলিম নেতৃত্ব, সর্বোপরি ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করার মাধ্যমে মর্যাদার আসনে আসীন করার পূর্বে ইহুদীরা এই উভয় গোত্রকে এভাবেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলো।

যেরূপভাবে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানে মোশরেক ও মোনাফেকদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে সেভাবে এই সূরায়ও উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। স্ব স্ব স্থানে উক্ত বক্তব্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে। তবু আমি এখানে এ প্রচন্ড অভিযানের শুধু একটি দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এরশাদ হচ্ছে,

‘হে নবী! তুমি কি ওদের দেখোনি, যারা কেতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে ... দোযখের জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট।’ (আয়াত ৪৪-৫৫)

‘যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য করে এবং যারা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী .... তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।’ (আয়াত ১৫১-১৫২)

‘তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান .... জন্যে তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।’ (আয়াত ১৫৩-১৬১)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কিছু দিক ফুটে উঠেছে। কোরআনে কারীম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তার নিন্দা করেছে, এর সাথে এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার অসারতাও প্রমাণ করেছে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযান সেখানে তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যা দান এবং তাদেরকে ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মুসলিম দল এ সময় ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের চরম শিকার হয়েছিলো। এ জন্যেই কোরআন মাজীদ তাদের ষড়যন্ত্রকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার অসারতা প্রমাণ করেছে। এর সাথে কোরআন তার পেছনে লুকায়িত ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তাদের

ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যাসের দরুণ দীর্ঘ ইতিহাসে তারা কখনো হেদায়াত তথা সৎ পথের সামনে যে আত্মসমর্পণ করেনি সে কথা বর্ণনা করেছে।

মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওত ও রেসালাতের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছিলো ইহুদীদের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য, আর তা সম্ভবপর হয়েছে মুসলমানদেরকে তাদের নিরাপত্তা, নেতৃত্ব তথা শক্তিশালী আকীদা থেকে দূরে সরানোর মাধ্যমে। মুসলিম দলের অভ্যন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা এবং দুশমনদের শীসাঢালা প্রাচীরের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ইহুদীসহ মুসলিম দলের শত্রুদের অস্থির করে রাখে, অতপর তাদের চিন্তা চেতনা ও চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত হয় প্রথম তাদের বন্ধন ছিন্ন করার কাজে, এভাবে মুসলমানদের নেতৃত্ব নতুন করে মনের ইচ্ছা বাসনা এবং জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে।

অধিকন্তু আমরা এই সূরায় নবী করীম (স.)-এর রেসালাতের তাৎপর্যের বর্ণনাও দেখতে পাই। এ রেসালাত তখনকার আরববাসী বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের কাছে অপরিচিত, নতুন ও আশ্চর্যজনক কিছু ছিলো না, বরং তা ছিলো দলীল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এভাবে আগের রসূলদের কাছেও তিনি ওহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের নবীদেরকে যেমনিভাবে নবুওত এবং রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা দান করেছিলেন তেমনিভাবে তা নবী মোহাম্মদ (স.)-কেও দান করেছেন। সুতরাং তাঁর রেসালাত, ক্ষমতা এবং শাসন করার ব্যাপারে অভিনবত্ব কিছু নেই। রেসালাতের ব্যাপারে এসব কিছু অতি পরিচিত ব্যাপার। এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের সকল কথাই মিথ্যা ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ ভ্রান্ত ও অমূলক। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তাদের এই একই আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছিলো। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোনো মুসলমানের গুরুত্বারোপ করা ঠিক নয়।

কোরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত তাৎপর্য বর্ণনা করেছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আয়াতের অবতারণা করছি। স্ব স্ব স্থানে তার বিস্তারিত আলোচনা করবো। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'হে মোহাম্মদ, আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি .... আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ১৬৩-১৬৮)

'তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান থেকে লিখিত .... বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিলো।' (আয়াত ১৫৩-১৫৭)

'নাকি যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্যে তারা মানুষকে হিংসা করে.... অতপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে।' (আয়াত ৫৪-৫৫)

এই সূরায় মুসলিম সমাজের গঠন এবং তাকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে মুক্ত করা, দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের কতিপয় শর্তের বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু নিয়ম নীতিও নির্দেশিকার বিষয়ও এখানে প্রকাশ পায়, যা ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা এই সূরা নিরসন করেছে, ইসলামী চিন্তা চেতনার কিছু মৌলিক উপাদানও বর্ণনা করেছে। তার থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে সরিয়ে দিয়ে তাকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ঈসা (আ.) ও তার নেক মাতা সংক্রান্ত ইহুদীদের বক্তব্য নিরসনের পর এই সূরা আহলে কেতাব খৃষ্টানদের আকীদার বাড়াবাড়ির কথা বর্ণনা করেছে।

একই সাথে এ সূরা আল্লাহর একত্ব, এবাদাতের তাৎপর্য, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, মানুষের আয়ুর তাৎপর্য, তাকদীরের সাথে তাঁর সম্পর্ক, আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন তার পরিধি, তাওবার গন্ডি ও তার তাৎপর্য, কাজের নিয়ম-পদ্ধতি ও তার বিনিময় ও প্রতিফল এ জাতীয় বিশ্বাসগত উপাদানের বর্ণনাও এখানেও এসেছে। উল্লেখিত উপাদানগুলোর বর্ণনা এসেছে নিম্নের আয়াতগুলোর মধ্যে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'জেনে রেখো, আল্লাহর কাছে তাওবা গৃহীত হওয়ার অধিকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (আয়াত ১৭-১৮)

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান... দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (আয়াত ২৬-২৮)

'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে... সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।' (আয়াত ৩১)

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও বিনষ্ট করেন না, আরও যদি তা.... নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।' (আয়াত ৪১)

'তুমি কি সে সব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা.... সব বিষয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।' (আয়াত ৭৭-৭৯)

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না.... সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে গেলো। (আয়াত ১১৬)

'শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার..... তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।' (আয়াত ১২৩-১২৪)

'তোমাদের আযাব দিয়ে.... সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।' (আয়াত ১৪৭)

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য.... বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আয়াত ১৫০-১৫২)

'হে আহলে কেতাবরা! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি.... আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।' (আয়াত ১৭১-১৭৩)

যে নৈতিকতার ওপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো থেকে কিছু কথা এখানে বর্ণনা করবো। এগুলোর দিকে ইতিপূর্বেও ইংগিত করা হয়েছে। আসলে নৈতিক উপাদানই হচ্ছে ইসলামী চিন্তা-চেতনা এবং মুসলিম সমাজ গঠনের মূল বিষয়। এর থেকে জীবনের কোনো দিক ও তার কর্মতৎপরতাই মুক্ত নয়। আমি এখানে জীবনের মূল উপাদান থেকে অনুসৃত কিছু মৌলিক বিষয়ের দিকে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সাথে সূরার বিষয়বস্তুর দিকে আলোকপাত করবো। ইসলামী সমাজ মূলত এমন একটি সমাজ যা একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তা হবে এমন এক সমাজ যেখানে আল্লাহর দাসরা অন্য সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। ইসলামী বিধান ছাড়া বিশ্বের অপর সকল বিধান ও মতাদর্শেই এই দাসত্ব কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামী বিধানে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, তাতে কোনোপ্রকার অংশীদারিত্ব নেই। যেখানে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যও তাঁর বান্দাদের দান করা হয় না। যেখানে মানুষ তাঁর কোনো বান্দার আনুগত্য করে না। এই স্বাধীনতা থেকে মানুষের যাবতীয় মহৎ গুণাবলী এবং নীতি-নৈতিকতার যাত্রা শুরু হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহৎ গুণাবলী চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর চরিত্রে

চরিত্রবান হওয়া। সুতরাং এ চরিত্র সব সময় মোনাফেকী, লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটা হচ্ছে ইসলামের নীতি নৈতিকতা এবং মুসলিম সমাজের গুণাবলীর প্রধান ভিত্তি।

এ সূরায় প্রধান কয়েকটি ভিত্তির বর্ণনার পাশাপাশি নৈতিক উপাদানের কিছু দিকও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মুসলিম সমাজ হামেশাই এই বিষয়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যথা আমানত, ইনসাফ, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ না করা, সৎ কাজ, অন্যের কোনো কাজে কানাঘুষা ও ষড়যন্ত্র না করা, নির্যাতিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ খারাপ কথা প্রকাশ না করা, উত্তম সুপারিশ, উত্তম সালাম দেয়া, ব্যাভিচার বন্ধ করা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করা, দাম্ভিকতা, অহংকার, লোক দেখানো কাজ, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না করা। ইসলামী সমাজ আরো কিছু গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যথা-যিম্মাদারী সহযোগিতা, সৎ উপদেশ, ক্ষমা মহানুভবতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবতার সাহায্য ও বীরত্ব এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের আনুগত্য করা ইত্যাদি। অধিকাংশ বক্তব্যই ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এগুলো মানব সমাজের মৌলিক উপাদান ও ভিত্তিসমূহের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। তার বিস্তারিত আলোচনা আয়াতের স্ব স্ব স্থানে পেশ করা হবে। আমি এখানে এর সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকেই শুধু আলোকপাত করবো। এ বিষয়টির দিকেই দীর্ঘদিন থেকে মানবতা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে, কিন্তু সেখান পর্যন্ত সে কোনোক্রমেই পৌছতে সক্ষম হচ্ছে না, সেই সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছানো তুলনাহীন এই জীবন বিধানের ছায়াতলেই সম্ভব।

যে মুহূর্তে ইহুদী জাতি ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে কোরআনে কারীম মুসলিম জাতিকে আল্লাহর নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। সে জাতি তার আলোকে চিন্তা চেতনা চরিত্র, বিধান ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে উন্নীত হতে থাকে। কোরআন এক ইহুদীর ঘটনার অবতারণা করে, মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের কথা বলে জাতি ও দেশ নির্বিশেষে তাদের মাঝে নিরংকুশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নিরংকুশ আমানতদারী কায়েমের জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তায়লা এরশাদ করেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌছে দাও... কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।' (আয়াত ৫৮, ১৩৫)

অতপর কোরআনের কিছু আয়াত অত্যাচারী ব্যক্তির ওপর ইনসাফ জারী করার লক্ষ্যে নাযিল হয়। আনসার মুসলমানদের একটি দল যাদের অন্তরে তখন পর্যন্ত উন্নত নিয়ম-নীতি বদ্ধমূল হয়নি এবং তাদের অন্তরসমূহ জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে তখনো পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি। সুতরাং তারা গোত্রীয় ও রক্তের কারণে বর্ম চুরির অপবাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিয়েছিলো। তারপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, রসূল তাদের সাক্ষ্যের আলোকে ইহুদীর ওপর চুরির শাস্তির বিধান জারি করতে এবং প্রকৃত চোরকে মুক্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূল (স.)-এর প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও মদীনাবাসীদের প্রতি তিরস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে, যারা হিজরতের পর রসূলকে আশ্রয় দিয়েছিলো এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করেছিলো তাদের বিরুদ্ধেই ছিলো এই তিরস্কার। এই ক্ষোভ ও তিরস্কারের মাধ্যমে মদীনাবাসীদেরকে মানুষের অবিচার থেকে ইহুদী

ব্যক্তিকে মুক্ত করে তার ওপর ইনসাফ কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরা রসূলকে ভীষণভাবে কষ্ট দিতো, তারা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, রসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতো। এখানে সে ব্যক্তিকেও ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে ভুল ও অপরাধ করে নির্দোষ লোককে তাতে জড়াতে চেষ্টা করে। সর্বোপরি এখানে নৈতিকতার এক উচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেদিকে আরোহনকারী সিঁড়ির দিকে ইংগিতের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা রয়েছে।

এই আয়াতগুলো ইহুদী ব্যক্তির কথিত চুরির ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়। এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য কেতাব অবতীর্ণ করেছি.... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১০৫-১১৬)

সুতরাং বিশ্ব মানবতার জন্যে ইসলামী বিধান সম্পর্কে এ ছাড়া আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না যে, এ হচ্ছে সত্যি অতুলনীয় ও নযীরবিহীন এক বিধান। এটি বিশ্ব মানবতাকে অল্প সময়ের মধ্যে জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে উঠিয়ে উঁচু এবং সর্বোচ্চ শৃংগে আরোহন করাতে সক্ষম।

এই সূরার ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগির উল্লেখ আমি এখানেই শেষ করছি।

ইতিপূর্বে আমি ইসলামের চিন্তা চেতনা নির্দেশিকা ও বিধি-বিধানের দিকে সামান্য কিছু ইংগিত করেছি, আয়াতের স্ব স্ব স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই তৌফিক কামনা করি।

সূরা আন নেসা

আয়াত ১৭৬ রুকু ২৪

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ
تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى
اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۠ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى
اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ② وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى
فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ③ۭ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন (হে মানুষ), তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার (ও পাওনা) দাবী করো এবং সম্মান করো গর্ভ (ধারিণী মা)-কে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। ২. এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও, (তাদের) ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ জিনিসের বদল করো না, তাদের সম্পদসমূহ কখনো নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে হযম করে নিয়ো না, এটা (আসলেই) একটা জঘন্য পাপ। ৩. আর যদি তোমাদের এ আশংকা থাকে যে, তোমরা এতীম (মহিলা)-দের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও, কিন্তু যদি তোমাদের এই ভয় হয় যে, তোমরা (একের অধিক হলে তাদের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) একজনই (যথেষ্ট), কিংবা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত; (তাদেরই যথেষ্ট মনে করে নাও। মনে রেখো, সব ধরনের) সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই হচ্ছে (উত্তম ও) সহজতর (পন্থা)।

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ
هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ﴿٤﴾ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا
وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ، فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ، فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ، نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾

৪. নারীদের তাদের মোহরানার অংক একান্ত খুশী মনে তাদের (মালিকানায়) দিয়ে দাও; অতপর তারা যদি নিজেদের মনের খুশীতে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়, তাহলে তোমরা তা খুশী মনে ভোগ করতে পারো। ৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদকে (দুনিয়ায়) তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ হিসেবে বানিয়ে দিয়েছেন, তা এই নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সাথে ভালো কথা বলবে। ৬. এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো, তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে এবং তাদের বড়ো হবার আগেই (তাড়াহুড়ো করে) তা হযম করে ফেলো না, (এতীমদের পৃষ্ঠপোষক) যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন (এই বাড়াবাড়ি থেকে) বেঁচে থাকে (তবে হ্যাঁ), যদি সে (পৃষ্ঠপোষক) গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে যেন তা থেকে (নিজের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে, যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো, (যদিও) হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট! ৭. তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী; (উভয়ের জন্যে এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যখন (তার) আপনজন, এতীম ও মেসকীনরা (সেখানে) এসে হাযির হয়, তখন তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে। ৯. (এতীমদের ব্যাপারে) মানুষের (এটুকু) ভয় করা উচিত, যদি তারা নিজেরা (মৃত্যুর সময় এমনি) দুর্বল সন্তানদের পেছনে রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) তারা (এভাবেই) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব তাদের (ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং এদের সাথে (হামেশাই) ন্যায়-ইনসাফের কথাবার্তা বলা উচিত। ১০. যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

রুকু ২

১১. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের উত্তরাধিকারে) সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্যে বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, কিন্তু (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক; মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই যদি হয় (তার একমাত্র) উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই বোন (বেঁচে) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর) আগে সে যে

أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (১১) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن
لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (১২)

ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই (কিন্তু এ সব ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে); তোমরা জানো না তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী; (অতএব) এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী। ১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে); তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর আগে) তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে); যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা মাতাও নেই, (শুধু) আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ভাই বোন মিলে) তারা যদি এর চাইতে বেশী হয় তবে (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমান) অংশীদার হবে, অবশ্য (এ সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যা অসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ (পরিশোধ)-এর পরই (এ ভাগাভাগি করা যাবে), তবে (খেয়াল রাখতে হবে), কখনো উত্তারাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে তা যেন ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়, কেননা এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ; আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৩. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা; যে ব্যক্তি (এর ভেতরে থেকে) তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; (মূলত) এ হবে এক মহাসাফল্য। ১৪. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের না-ফরমানী করবে এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে, তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি।

তাফসীর

আয়াত ১-১৪

এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে শুরুর আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে। এটি মানব জাতিকে এক প্রভু ও এক সৃষ্টিকর্তার বন্দেগীর নির্দেশ করে, একইভাবে তা নির্দেশ করে তাদের এক মূল ও এক পরিবারের দিকে। ‘প্রাণকে’ এখানে মানবতার ঐক্যের বিন্দু এবং ‘পরিবারকে’ গোটা সমাজের ঐক্যের সূত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আত্মীয়তার বন্ধন ও পারস্পারিক সম্প্রীতি অটুট রাখার মানসিকতাও সৃষ্টি করে, যাতে করে তা এই ভিত্তিমূলের ওপর এক পরিবার অতপর গোটা মানবতার মাঝে পারস্পরিক দয়া-করুণা এবং সংহতির যাবতীয় দায়ভার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং সে মোতাবেক সকল প্রকার নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-বিধান প্রত্যাবর্তন করতে পারে যা এই সূরা নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

মানবজাতির উৎপত্তি

এই সূরার প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত বিধি-বিধান ও দায়ভারের দিক থেকে যারা পরিবারের মধ্যে দুর্বল অর্থাৎ যা কিছু এতীমের সাথে সম্পৃক্ত তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার সাথে এই সমস্ত বিধি-বিধান দুর্বল, এতীমদের সম্পদের প্রতি যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি সুবিন্যস্ত করেছে, একই পরিবারের সদস্যদের মাঝে উত্তরাধিকার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নস্তরের আত্মীয়স্বজনের অংশ সুনিশ্চিত করে। এ সমস্ত বিধি-বিধানের উৎপত্তি এসেছে এক বুনিয়াদী সূত্র থেকে যা সূরার প্রথম আয়াতটি অন্তর্ভুক্ত করেছে, সাথে সাথে এ বুনিয়াদের কিছু কথা আয়াতের শুরুতে, কিছু কথা মাঝখানে আবার কিছু শেষে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সেই বুনিয়াদটি হচ্ছে প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই, আইন-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করার অধিকারও তাঁর। এই অধিকার থেকেই প্রত্যেক বিধান ও নিয়মের উৎপত্তি হয়। এরশাদ হচ্ছে,

‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে .... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।’ (আয়াত ১)

এই আয়াতে তাকওয়ার গুণের সাথে গুণান্বিত একটি ‘মানব গোষ্ঠীকে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা এ জন্যে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যিনি তাদেরকে মাত্র একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের দু’জন থেকে তাদের বংশ বিস্তার করেছেন।

এ সাধারণ মর্মার্থগুলো আসলে অনেক বড়ো, গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি মানুষেরা তাদের কান ও অন্তরকে সেদিকে নিবদ্ধ করতো, তাহলে তাদের এ প্রচেষ্টা তাদের জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন সাধন করতে পারতো, তাদেরকে নানাবিধ জাহেলিয়াত থেকে. ঈমান, সৎপথ, তথা তাদের সভ্যতার দিকে স্থানান্তরিত করতে পারতো।

এই মর্মার্থগুলো মানুষের অন্তর ও চোখের সামনে নানা ধরনের চিন্তা গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মোচন করে,

১. সেই মূল তথ্যসমূহের একটি এই যে, মানবজাতি তার সৃষ্টির উৎসকে স্মরণ করবে, যিনি তাদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যারা এই নিগূঢ় তথ্যকে ভুলে যায়, তারা মূলত পৃথিবীর সকল বস্তুকেই ভুলে যায়। তারপর তাদের জন্যে আর কোনো বিষয়ই অটুট থাকে না।

অবশ্যই মানুষ সম্পূর্ণ অস্তিত্ববিহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে। কে তাদেরকে এখানে আনলো? নিশ্চয়ই তারা স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি। কারণ পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাদের অস্তিত্বই ছিলো না, তাদের কোনো ইচ্ছা পোষণ করার ক্ষমতা ছিলো না। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বাইরে অন্য একটি ইচ্ছা শক্তি তাদেরকে এ পৃথিবীতে এনেছে, তাদের সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করেছে। তাদের জন্যে এখানে আসার রাস্তা তৈরী করেছে। তাদের জীবন চলার পথ বাছাই করেছে। তাদেরকে তাদের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করেছে। তাদেরকে এর প্রস্তুতি ও যোগ্যতা দান করেছে এবং তাদেরকে এ সৃষ্টিজগতের সাথে আচরণ করার ক্ষমতা দান করেছে। তাদেরকে তাদের উপলব্ধি ব্যতিরেকেই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। এটা আল্লাহরই ইচ্ছা তিনি যা চান তা করতে পারেন।

যদি মানবজাতি এ বাস্তবতাকে স্মরণ করতো- যার থেকে তারা প্রায়শই অন্যমনস্ক থাকে তাহলে তারা শুরুতেই সঠিক পথের দিকে ফিরে আসতে পারতো। নিসন্দেহে এই ইচ্ছা যা তাদেরকে এক সময় এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, তাই এখানে তাদের জীবন চলার পথ অংকন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাস করার সব ক্ষমতা তাকে দান করেছে। সেই ইচ্ছাই তাদেরকে সমস্ত জিনিসের অধিপতি বানায়, তাদেরকে সকল বস্তুর সাথে পরিচিত করায়। তাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে আঞ্জাম দেয় এবং একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে যে, তিনি তাদের জীবনের উৎস অংকন করবেন, তাদের নিয়ম পদ্ধতি ও বিধি-বিধান রচনা করবেন এবং তাদের জন্যে মূল্যবোধ ও মাপকাঠি নির্ধারণ করবেন। কোনো ব্যাপারে মত-দ্বৈততা ও মতবিরোধ দেখা দিলে মানুষ তার বিধান, আদর্শ, মূল্যবোধ ও মাপকাঠির দিকেই ফিরে আসে। সুতরাং তারা একমাত্র সে বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যা মহান রাব্বুল আলামীন তাদের জন্যে বাছাই করেছেন।

২. এই বাস্তব সত্যটি এদিকে ইংগিত করে যে, এ মানবকুলের উৎপত্তি একটিমাত্র ইচ্ছা থেকেই হয়েছে, তাই মানুষরা সবাই একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ একই মূল থেকে এদের উৎপত্তি এবং একই বংশের সাথে এরা সম্পৃক্ত।

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন ... অগণিত পুরুষ ও নারী।'

মানবজাতি যদি এ মৌলিক সত্য কথাটি স্মরণ করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় বৈষম্য ও মতপার্থক্য শেষ হয়ে যেতো। এটাই পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা একই উৎসের এই সন্তানদেরকে পৃথক করে দিয়েছে, আত্মীয়তার সকল বন্ধনকেও ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে।

এ সত্য বিষয়টির উপস্থিতিই মানুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে যথেষ্ট, এর তিক্ত স্বাদ মানব জাতি ইতিমধ্যে ভালো করেই আস্বাদন করেছে। আজো আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে তারা এই স্বাদ গ্রহণ করে চলেছে। যে জাহেলিয়াত রং, বর্ণ ও জাতিতে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তা অস্তিত্বকে এ বৈষম্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, তা জাতি, সম্প্রদায় এবং গোত্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু এক মানবতা ও এক প্রভুত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

এ বাস্তব সত্যটির প্রতিষ্ঠা, স্থিতিশীলতা শ্রেণীগত দাসত্ব- যা বর্তমানে ভারতে বিদ্যমান রয়েছে ও যার কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে- তা দূর করার জন্যে যথেষ্ট হতো। সেই দাসত্ব ও বৈষম্যকে আধুনিক জাহেলিয়াত তার ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তি মনে করে, যার থেকে এমনিই সকল মানুষের উৎপত্তি, সে এক প্রভুর দিকে আমরা ফিরে যাবো- তাকে ভুলে যায়।

৩. আরেকটি সত্য যার দিকে লক্ষ্য করা উচিত তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা একই প্রাণ থেকে তার সংগিনীকে সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব সত্যটি যদি মানব জাতি উপলব্ধি করতো তাহলে আজ যে বেদনাদায়ক ভুল-ভ্রান্তির মাঝে মানব সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে, তার সামনে সঠিক কথা পরিবেশন করার জন্যে এটাই যথেষ্ট হতো। তারা আজ নারী জাতি সম্পর্কে নানাপ্রকার ঘৃণ্য চিন্তা-ভাবনা করে নারীকে পাপ-পংকিলতা ও অপবিত্রতার উৎস এবং অকল্যাণ ও বালা-মুসিবতের মূল মনে করে। অথচ নারী সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক থেকে প্রথম প্রাণী-যাকে আল্লাহ তায়ালা আদমের স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিস্তার করেছেন। সুতরাং মূল জন্মগত অভ্যাসের দিক থেকে এ নারী পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং পার্থক্য হচ্ছে তাদের প্রকৃতি এবং কর্মের দিক থেকে।

মানব জাতি এর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে হাবুডুবু খেয়েছে। এ জন্যেই ভিত্তিহীন চিন্তা-চেতনার প্রভাবে দীর্ঘকাল যাবত তারা নারী সমাজকে মনুষত্বের বৈশিষ্ট্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অতপর যখন তারা এ মারাত্মক ভুল শোধরাতে চেষ্টা করলো তখন আরেকটি ভয়াবহ একটি কথা তারা ভুলে গেলো যে, সে আসলেই মানুষ, আর মানুষের কল্যাণেই তার সৃষ্টি। এখানে এক অংগ অন্য অংগের পরিপূরক। দায়-দায়িত্বের দিক থেকে তারা সমকক্ষ দুই ব্যক্তি নয় বরং তারা একে অপরের পরিপূরক, স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘ গোমরাহীর পর মানুষ এ বাস্তব সত্যের দিকে এখন ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছে।

৪. এই আয়াতটি আরো নির্দেশ করে যে, মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে পরিবার, সুতরাং পরিবারের এ চারাগাছের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী শুরু করার সংকল্প করলেন। প্রথমে একটি প্রাণ সৃষ্টি করে তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করলেন। অতপর স্বামী স্ত্রীর একটি পরিবার গঠিত হলো। তারপর আল্লাহ তায়ালা এ উভয় থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিস্তার করলেন। যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা পোষণ করতেন তাহলে প্রথমেই অসংখ্য নারী-পুরুষ ও তাদের সাথীদের সৃষ্টি করতে পারতেন। ফলে প্রথমবারেই অগণিত পরিবার হয়ে যেতো। তখন প্রগাঢ় বন্ধন ব্যতিরেকে আত্মীয়তার কোনো বন্ধন তাদের মাঝে থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইলেন, তাই তিনি প্রভুত্বের বন্ধন থেকে শুরু করলেন, যা হলো মূলত সকল বন্ধনের মূল। আত্মীয়তার বন্ধনকে আল্লাহ তায়ালা আনলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। সুতরাং গঠিত হলো এ নর ও নারীর প্রথম পরিবার যারা এক প্রাণ, এক স্বভাব এবং এক সৃষ্টি থেকে দুনিয়াতে এলো। আল্লাহ তায়ালা প্রথম পরিবার থেকে অগণিত নারী-পুরুষ এ পৃথিবীতে বিস্তার করেন। সকলেই

প্রথমে প্রভুত্বের বন্ধন তারপর পরিবারের বন্ধনের দিকে ফিরে এলো। সেই পারিবারিক বন্ধনের ওপর আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব সমাজে বিধান প্রতিষ্ঠিত হলো।

ইসলামী বিধানে পরিবারের হেফাযত, তার বন্ধন প্রগাঢ় করা ও তার ভিত্তি মযবুত করার সাথে পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করতে পারে এ জাতীয় সকল উপায় উপকরণ থেকে পরিবারকে হেফাযত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উপায়-উপকরণের প্রথম দিকে রয়েছে নারী এবং পুরুষের ভূমিকাসমূহ ভুলে যাওয়া এবং উভয়ের ভূমিকায় সমন্বয় সাধন করে পরিবার গঠনে উভয়ের ভূমিকায় একে অপরের পরিপূরক এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া।

এই সূরাসহ অন্যান্য সূরায় ইসলামী বিধানে পরিবারের গুরুত্বের বৈশিষ্টসমূহের সমাহার ঘটেছে। জাহেলী সমাজে যে দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের দেখা হয়, আর যে বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের সাথে করা হয়, সে পরিস্থিতিতে পরিবারের কোনো শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামই জাহেলী সমাজের হীন দৃষ্টিকোণ এবং বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটিয়ে আদল ও ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫. সর্বশেষ সত্য বিষয়টি হচ্ছে এই যে, মানবজাতি এক প্রাণ ও এক পরিবার থেকে সারা বিশ্বে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করেছে। তার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার মাঝে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সে জাতির ইতিহাসে দু'টি ব্যক্তি কোথাও এমন পাওয়া যাবে না যে, যাদের মধ্যে সার্বিক দিক থেকে একে অপরের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। আকৃতি ও গুণাবলীতে পার্থক্য, স্বভাব, রুচি, চরিত্র ও অনুভূতিতে পার্থক্য, কাজের ধরনে পার্থক্য। অসংখ্য জনতার সমাহার থেকে এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সমাধানকারী আল্লাহর এক নযিরবিহীন ক্ষমতার দিকে ইংগিত প্রদান করে এবং তা মানুষের অন্তর এবং চোখকে জীবন্ত প্রাণবন্ত এক জাদুঘরে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেয়। তাদের অন্তর ও চোখ মানব সমাজের নানাবিধ দৃষ্টান্ত ভাবতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ এ ধরনের উদাহরণ পেশ করতে সক্ষম নয়। তাঁর ইচ্ছার কোনো অন্ত ও সীমা নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। একমাত্র সেই ইচ্ছাই এই দুর্লভ এক মূল থেকে অসংখ্য রকমারিত্ব ও পার্থক্যকরণে সক্ষম।

মানুষকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই এখানে উঁচু থেকে উচ্চতর আসনে আরোহণের একটা উপায়।

এই আয়াতের শেষের দিকে মানুষকে আল্লাহর ভীতি অর্জন করার জন্যে নির্দেশ করা হচ্ছে। যার নামে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে স্বীয় হক দাবী করে থাকে। আত্মীয়তার হক বিনষ্ট করা থেকেও তাকে ভয় করতে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার বন্ধনেই গোটা মানব জাতি আবদ্ধ। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক দাবী করে থাকো, আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট থেকে বিরত থাকো।'

'হে মানুষ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে থাকো এবং তা পূরণের জন্যে একে অপরকে তাঁর নামে দোহাই দিয়ে থাকো এবং তোমরা তাঁরই নামে একে অপরকে কসম খাইয়ে থাকো। তোমরা তোমাদের পারস্পরিক, সম্পর্ক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাকে ভয় করো।'

কোরআনে করীমে বহুল ব্যবহৃত হওয়ার কারণে 'তাকওয়া'-এর পরিভাষাটি সহজেই বোধগম্য এবং অতি পরিচিত। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্কের ভীতি একটি নতুন পরিভাষা, যা অন্তরে তার অনুভব্য ছায়াসমূহ মাত্র নিক্ষেপ করে। অতপর মানুষ এমন কোনো বস্তু পায় না যার দ্বারা সে ওই বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা করতে পারে। তোমরা আত্মীয়তার হক বিনষ্ট করা থেকে ভয় করো। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং তাতে ফাটল সৃষ্টি হয় এমন সব বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্যে তোমরা তোমাদের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করো। আত্মীয়স্বজনকে কষ্ট দেয়া এবং রাগান্বিত করা থেকে বিরত থাকো। আত্মীয়দের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সম্মান, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব বজায় রাখতে তোমরা সকলেই সচেষ্ট হও।'

প্রথম আয়াতের শেষাংশে এসে আল্লাহর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতি সচেতনতার কথা বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।'

আল্লাহর কড়া দৃষ্টি, সচেতনতা ও খবরদারী কতোই না ভীতিকর। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সচেতন, খবরদার ও কড়াদৃষ্টি নিবদ্ধকারী সত্ত্বা। তিনিই হচ্ছেন প্রতিপালক স্রষ্টা, যিনি তার সৃষ্টজীব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সব বিষয়ে খবর রাখেন, তাঁর কাছে গোপন বলতে কিছুই নেই। মানুষ প্রকাশ্যে ও গোপনে যা কিছু করে এমনকি মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন।

এতীমদের সম্পদ সংরক্ষণের বিধান

প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী এই সূচনা বর্ণনা করার পরক্ষণেই মহান রাব্বুল আলামীন ওই সমস্ত ভিত্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন– যার ওপর গোটা সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত। যেমন পরিবার ও দলের নিরাপত্তা বিধান করা, তাদের মাঝে দুর্বলদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা, নারীর অধিকার ও মর্যাদার হেফাযত করা, সাধারণ জনগণের সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং উত্তরাধিকারীদের মাঝে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি এমনভাবে বন্টন করা যাতে সকল সদস্যের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে কল্যাণ নেমে আসে।

তারপর আল্লাহ তায়ালা এতীমদের প্রসংগ টেনে তাদের অভিভাবকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন এতীমরা সাবালক হবে, তখন যেন অভিভাবকরা তাদের সম্পূর্ণ সম্পদ অক্ষত অবস্থায় তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয় এবং যেন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা এতীম বালিকাদেরকে সম্পদের লোভে তাদের অভিভাবকত্বে এনে তাদের বিয়ে না করে। নির্বোধ এবং অজ্ঞ লোকদের হাতে সম্পদ যেন হস্তান্তর করা না হয় যদি এই আশংকা হয় যে, তারা সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে, কেননা সে সম্পদ প্রকৃতপক্ষে জনগণের সম্পদ, তাতে রয়েছে তাদেরই সবার স্বার্থ, সেক্ষেত্রে এতীমদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকরা যেন সেই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বালেগ এতীমদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যাবর্তন না করে, বিশেষ করে সেখানে সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থাকে। তারা যেন মহিলাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও ন্যায় ইনসাফ ও সদ্ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখে। এরশাদ হচ্ছে,

'এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না ... বস্তুত হিসাব-গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ২-৬)

ওপরের এই কঠোর বক্তব্য আমাদের সামনে আরবের জাহেলী সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। সাধারণত দুর্বল বিশেষ করে এতীম ও মহিলাদের অধিকার হরণ ও বিনষ্ট করা ছিলো সেখানে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। জাহেলী সমাজের সব আবর্জনা কোরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত নব মুসলিম সমাজেও বিদ্যমান ছিলো। কোরআন এসে জাহেলী নিয়ম-পদ্ধতি ও

আচার-আচরণে কুঠারাঘাত করে এবং ধীরে ধীরে তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। কোরআন মুসলিম দলের অভ্যন্তরে নতুন চিন্তা-চেতনা, নতুন আবেগ-অনুভূতি, নতুন পরিভাষা এবং নতুন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর গোড়াপত্তন করতে শুরু করে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। তাদের ভালো মালের পরিবর্তে তাদের মন্দ মাল দিও না'।

যেমন তোমরা তাদের ভালো যমীন নিজের জন্যে রেখে তার পরিবর্তে তাদেরকে তোমাদের খারাপ যমীনটা দিয়ে দেবে! চতুষ্পদ জন্তু, সম্পদের ভাগ, মুদ্রা অথবা যে কোনো প্রকারের সম্পদ- এটা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমরা তাদের পুরো বা কিছু সম্পদ তোমাদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করো না। এটা বড়ো পাপ কাজ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ ধরনের বড়ো অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

এখানে বর্ণিত গর্হিত কাজগুলো এমন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো যে, পরিবেশকে এ আয়াতের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সম্বোধন করা হয়েছে। যে সব ব্যক্তিকে সম্বোধন করে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে এ সমস্ত গর্হিত কাজ বিদ্যমান ছিলো। এগুলো হচ্ছে জাহেলিয়াতের নিদর্শনসমূহের কিছু নিদর্শন। প্রত্যেক জাহেলিয়াতেই এগুলো বিদ্যমান থাকে। আমরা তার নযীর বর্তমান জাহেলিয়াতের যুগেও শহরে গ্রামে দেখতে পাচ্ছি। যাবতীয় আইনগত সতর্কতা এবং নাবালকদের সম্পদের তদারকীর জন্যে নিয়োজিত সরকারী সংস্থাসমূহের সচেতনতা সত্তেও অধিকাংশ অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকরাই বিভিন্ন পন্থা ও নানাবিধ ছল-চাতুরীর মাধ্যমে এতীমদের সম্পদ গ্রাস ও ভক্ষণ করছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহভীতি ছাড়া আইনগত বিধি-বিধান সচেতনতা ও সতর্ক দৃষ্টি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না। একমাত্র তাকওয়াই অন্তরের ওপর আভ্যন্তরীণ সতর্কদৃষ্টি যিম্মাদার হতে পারে। সম্পদ ও খাদ্য তাদের নিজেদের ধন-সম্পদ ও খাদ্য দূরে রাখতো। যে পাপ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দিয়েছেন,

'নিশ্চয় এটা বড়ো মন্দ কাজ।'

এ পৃথিবী ইসলামী বিধি-বিধান ও নিয়ম-শৃংখলার জন্যে ততোক্ষণ পর্যন্ত উপযোগী হয় না, যতোক্ষণ না তা প্রয়োগের জন্যে এর অধিবাসীদের অন্তরে তাকওয়ার পাহারাদারী নিয়োজিত হবে। এ তাকওয়ার বিধি-বিধান ও নিয়ম-শৃংখলার প্রতি তরংগায়িত হয় না। যতোক্ষণ না তা এমন সত্ত্বা থেকে উৎসারিত হবে যা সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং অন্তরের অতন্দ্র প্রহরী। এ সময় কোনো ব্যক্তি নিয়ম-শৃংখলা ভংগ করার ইচ্ছা পোষণ করলেও অনুভব করে সে আল্লাহর সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তার নির্দেশ অমান্য করছে। তার ইচ্ছার সাথে সে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়ত ও কাজ সম্পর্কে ভালো করেই অবগত আছেন। আর তখন তার পা নড়তে থাকবে, তার শরীরের অংগ-প্রতংগের জোড়াসমূহ কাঁপতে থাকবে এবং তার অন্তরে আল্লাহভীতির ঢেউ তরংগায়িত হতে থাকবে।

আল্লাহ তাবারাকা ও তায়ালা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালো করে অবগত আছেন, তাদের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল এবং তাদের মানসিক এবং শারীরিক গঠন সম্পর্কে তাঁর সবই জানা আছে, কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অধিকন্তু তিনি তাঁর বিধান, তাঁর আইন, তাঁর নিয়ম এবং তাঁর আদর্শকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে রচনা করেছেন। যাতে করে অন্তরে তার গুরুত্ব, প্রভাব ও ভয় উদ্রেক হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটা ভালো করেই জানেন যে, কোনো বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণ কখনো সম্ভব হবে না যতোক্ষণ না তা এমন

এক ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে-যাকে মানুষের অন্তর ভয় পায় এবং জানে যে সে ক্ষমতা ও সত্ত্বা গোপন রহস্য এবং অন্তরে লুকায়িত বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আর যখনই মানুষ মানব রচিত বিধানের আনুগত্য করবে যখনই পাহারাদারীর মধ্যে শৈথিল্য আসে এবং বাহানা ও ছলচাতুরীর সুযোগ দিয়ে তারা তা থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

এতীম মেয়েদের সার্থ রক্ষা করা

'আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না ... এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। (আয়াত ৩)

ওরওরাহ ইবনুয যোবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

'যদি তোমরা ভয় করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না।'

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, এর উত্তরে তিনি বললেন, হে আমার ভাগিনা। এই এতীম বালিকাটি তার অভিভাবকের গৃহে লালিত-পালিত হবে, সে তার সম্পদের শরীক হবে এবং তার ধন-সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্য তার কাছে পছন্দ হবে। অভিভাবক ইনসাফবিহীন মোহরে তাকে বিয়ে করতে চাইবে। অন্যরা তাকে যে মোহর দেবে তার চেয়ে সে আরো কম দিতে চাইবে। অতএব মোহরের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এমনকি তাতে সর্বোচ্চ সুন্নাত পালন করা ছাড়া তাদের বিয়ে ব্যবস্থা অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওরওয়া (রা.), হযরত আয়েশা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবারা রসূল (স.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

'তারা তোমার কাছে নারীদের বিয়ের অনুমতি চায়। বলে দাও আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে সে সিদ্ধান্তসমূহ জানিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা হচ্ছে ওই সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান যাদেরকে এমন অধিকার প্রদান করা হয়েছে– যা তোমরা তাদেরকে দিতে চাও না।'

হযরত আয়েশা (রা.) এই আয়াত (অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখো)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, তোমরা তাদের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করো। এ আয়াতে ওই সমস্ত লোকদের তাদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে, যারা শুধু তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের ব্যাপারেই আগ্রহী। কিন্তু যদি তারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তবে তাদেরকে বিয়ে করা জায়েয।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি সে সমস্ত চিন্তা-চেতনা এবং রসম-রেওয়াযকে আমাদের সামনে অংকন করে দিয়েছে। এটা জাহেলী সমাজে এমনকি শুরুর দিকে মুসলিম সমাজেও বিরাজমান ছিলো। অতপর কোরআন নাযিলের পর নতুন নির্দেশনার মাধ্যমে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এ হাদীসটি এতীমের বিয়ের বিষয়টি ব্যক্তির ওপরই ছেড়ে দিয়েছে,

'আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না।'

যদি এতীমের অভিভাবক তার প্রতি ইনসাফ না করার আশংকা করে তাহলে এ বিষয়টি সংকোচ, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তারপরও উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্য আসলেই ব্যাপক। এগুলো ইনসাফের সব কয়টি পর্যায় নির্ধারণ করে না। এক্ষেত্রে কাম্য হচ্ছে নিস্বার্থ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এটা মোহরের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে অথবা অন্য কোনো

বিবেচনার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। বিষয়টি এমন দাঁড়ালো যে, বর্তমান অভিভাবক শুধুমাত্র এতীম মেয়ের ধন-সম্পদের লোভেই তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে, এ জন্যে নয় যে, তার জন্যে তার অন্তরে ভালোবাসা রয়েছে, আর এ জন্যেও নয় যে, সে তার সাথে মানসিকভাবে জীবন যাপন করতে চাচ্ছে। অনেক সময় অভিভাবক ও এতীম মেয়েদের মতামত না নিয়েই তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন হয়, অনেক সময় দেখা যায় তাদের মধ্যে বয়সেরও অনেক পার্থক্য থাকে, সে ক্ষেত্রে এতীম মেয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লজ্জায় অথবা তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার স্বাধীন মতামতকে গোপন রাখে। এ জাতীয় আরো অনেক পরিবেশ ও পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না হওয়ার আশংকা থাকে। অপরদিকে কোরআন মানুষের অন্তরকে প্রহরী এবং তাকওয়াকে এর নিয়ন্ত্রণকারী সাব্যস্ত করছে। এ সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে পেশ করা হয়েছে যার ওপর আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত নির্দেশিকাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।'

যখন অভিভাবকরা তাদের অধীনস্ত এতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করার ওপর আশ্বস্ত না হবে তখন সন্দেহ থেকে দূরে থাকার লক্ষ্যে অপরাপর মহিলাদের বিয়ে করা উচিত।

ইসলামে একাধিক বিয়ের অনুমতি

আর যদি তোমরা আশংকা করো যে.... বজায় রাখতে পারবে না, তবে (তোমাদের জন্যে) একটিই। (আয়াত ৩)

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সে অবস্থায় বহু বিয়ের অনুমোদন দিয়েছেন, যখন সকল স্ত্রীদের মাঝে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। অন্যথায় এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। শর্ত ও সাবধানতা সাপেক্ষে বহু বিয়ের অনুমোদনের রহস্য ও কল্যাণ বর্ণনা করা এ যুগের জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন। এ যুগে মানুষ নিজেদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের চেয়ে বেশী জ্ঞানী বলে মনে করে। তারা দাবী করে যে, মানব জীবন, তার প্রকৃতি ও উপকারিতা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের স্রষ্টার চেয়েও অধিক। তারা এক্ষেত্রে স্বীয় ইচ্ছা-বাসনা ও অজ্ঞতা-অন্ধত্বতার ওপর নির্ভর করে কথা বলতো। যেন এমন কিছু পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা নতুন করে দেখা দিয়েছে যা শুধুমাত্র তারাই উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের এ দাবী যেমন অজ্ঞতা ও অন্ধত্বে পরিপূর্ণ তেমনি দম্ভ-অহংকার ও বেয়াদবীতেও ভরপুর। তার সাথে আরো ছিলো কুফরী ও গোমরাহী। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ সমস্ত অজ্ঞ, দাম্ভিক, নির্লজ্জ এই পথভ্রষ্টদেরকে তাদের কুকর্ম থেকে ফেরাবার মতোও কাউকে পাওয়া যায় না। তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধান নিয়ে দম্ভ করছে। তারা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর মাহাত্মের ওপর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধানের সাথে রূঢ় আচরণ করছে। এ সমস্ত কাজ তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ, অক্ষত ও বিজয়ীর বেশে সমাধা করে যাচ্ছে। এমনকি তারা এক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের শত্রু ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষ থেকে পুরস্কৃতও হয়েছে।

শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ে ইসলামে বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজ পরিষ্কার অথচ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করাই উত্তম। একই সাথে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়।

ইমাম বোখারী (র.) তার সনদে বর্ণনা করেন যে, গায়লান বিন সালামা আছ ছাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার অধীনে দশজন মহিলা ছিলো। রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে নিজের জন্যে চারজনকে বাছাই করো।

আবু দাউদ (র.) তার সনদে বর্ণনা করেন যে, উমায়রা আল আসাদী বলেন, যখন আমি ইসলামে দীক্ষিত হই, তখন আমার আটজন মহিলা ছিলো। রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে নিজের জন্যে চারজনকে বাছাই করো।

ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর মোসনাদে নাওফল বিন মোয়াবিয়া আদ দাইলামী সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার পাঁচ স্ত্রী ছিলো। রসূল (স.) আমাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে চারজনকে নিজের জন্যে রেখে একজনকে বিদায় করে দাও।

ইসলামের আগমনের পূর্বে বহু ব্যক্তির অধীনেই একাধিক স্ত্রী ছিলো। এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিলো না। ইসলাম এসে এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এক ব্যক্তি এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না। এর সাথে শর্তারোপ করে যদি সকল স্ত্রীর সাথে সে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে তার জন্যে একাধিক স্ত্রী রাখা বৈধ, অন্যথায় এক স্ত্রীই রাখতে হবে।

বস্তুত ইসলামের আগমন ঘটেছে বহু বিয়ের সীমা নির্ধারণের জন্যে-একে কিছুতেই ব্যাপক করার জন্যে নয়। বহু বিয়েকে ইনসাফের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্যে ইসলাম তাগাদা দিয়েছে, মানুষের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়ার জন্যে নয়।

এখানে প্রশ্ন আসছে যে, ইসলাম বহু বিয়েকে কেনইবা বৈধ বলে অনুমোদন দিলো? জবাবে বলা যায় যে, ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্যে গঠনমূলক জীবন বিধান, যা মানব জাতির প্রকৃতি ও গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি মানুষের বাস্তবতা ও প্রয়োজনের উপযোগী এবং স্থান, কাল ও অবস্থা নির্বিশেষে মানব জীবনের পরিবর্তনশীল পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিসন্দেহে ইসলাম এমন একটি গঠনমূলক বাস্তবসম্মত জীবন বিধান-যা মানব জাতিকে তার বর্তমান অবস্থা এবং অবস্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে উঁচু সিঁড়ি অতপর উঁচু শৃংগে আরোহণ করাতে চায়। ইসলামে মানুষের প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হয়নি এবং তাকে না জানার কোনো ভানও করা হয়নি। এখানে মানব জীবনের বাস্তবতাকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা এবং অবহেলা কিছুই করা হয়নি। আবার তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাতে কোনো প্রকার কঠোরতাও অবলম্বন করা হয়নি। তার প্রতি কোনোরকম উৎপীড়ণও করা হয়নি।

নিসন্দেহে ইসলাম এমন এক জীবন বিধান নয় যা শূন্য পান্ডিত্য প্রদর্শন, নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণিত করার জন্যে এসেছে। এ ধরনের আদর্শ মানুষের প্রকৃতি, বাস্তবতা এবং জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে বার বার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতপর এক সময় তা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।

এটা এমন একটা জীবন বিধান যা শুধু সমাজের পবিত্রতাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করে। এ বিধান এমন কোনো জগত সৃষ্টিতে সম্মত হবে না, যার কাজ হচ্ছে বাস্তবের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টিকে শুধু বিনষ্ট করে সমাজকে কলুষিত করা। এ বিধান এমন এক বাস্তব জগত সৃষ্টি করতে চায় যা ব্যক্তি ও সমাজের পবিত্রতা বিধানে সহায়ক হবে।

ইসলামী বিধানে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমাদের চিন্তার সামনে রেখে যদি আমরা বহু বিয়ের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা কী দেখতে পাই?

আমরা প্রথমে দেখতে পাই, প্রাচীন কাল ও বর্তমান কালের বহু সমাজের এমন কতিপয় বাস্তব চিত্র, যেখানে এখনো বিয়ের উপযুক্ত নারীর সংখ্যা বিয়ের উপযুক্ত পুরুষের চেয়ে অধিক, আর কিছু কিছু সমাজে এ ভারসাম্যের সর্বোচ্চ সংখ্যা একের ভাগে চারের অধিকও পড়েছে।

এ বাস্তব সত্যটি ইতিহাসে বরাবরই ঘটছে, একে অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তার সমাধান আমরা কিভাবে করবো? শুধু কি ঘাড় নেড়ে হাঁ'র সাথে হাঁ মিলিয়ে? কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে আমরা যদি তার অবস্থায় ছেড়ে দেই তাহলে যে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, এক সময় সে প্রয়োজনের চাহিদানুসারে কে তার সমাধান ও চিকিৎসা করবে?

ঘাড় নেড়ে কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। তদ্রূপ সমাজকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া যে- সে তার সমস্যার সমাধান নিজেই করবে- এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারে না, বিশেষ করে যে ব্যক্তি নিজেকে এবং মানবজাতিকে শ্রদ্ধা করে, তার কল্যাণ কামনা করে, সে তো পারবেই না। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি কার্যকর বিধান প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর সে পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদেরকে তিনটি সম্ভাবনার কোনো একটি সম্ভাবনার সম্মুখীন দেখতে পাবো।

১. বিয়ের যোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিয়ের যোগ্য মহিলাদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করবে। অতপর এমতাবস্থায় ভারসাম্যতার হিসেব অনুসারে বিয়ের যোগ্য মহিলাদের কিছু অংশ অবশ্যই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তাদের জীবন এমনভাবে কাটবে যে তারা জীবনে কোনো পুরুষকে চিনবেই না এবং তাদের সংগও কোনো দিন পাবে না।

২. বিয়ের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি বিয়ের যোগ্য নারীদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনের সাথে বৈধ পবিত্র বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অতপর সেখানে বাকী মহিলার মধ্যে থেকে এক বা একাধিক নারীর সাথে গোপনে সখ্যতা রাখবে অথবা তাকে উপপত্নী করে রাখবে। কারণ সমাজে যাদের ভাগ্যে বৈধ পুরুষ থাকবে না তাদের কী উপায় হবে? তখন তারা সে পুরুষটিকে তাদের অবৈধ বন্ধু হিসাবেই পেতে চাইবে।

৩. বিয়ের যোগ্য সকলেই কিংবা তাদের কেউ কেউ একাধিক বিয়ে করবে। এক্ষেত্রে সে পুরুষটি একাধিক মহিলাকে তার বৈধ স্ত্রী হিসেবে জানবে-গোপন সংগিনী হিসেবে নয়।

প্রথম সম্ভাবনাটি যদি কোনো মহিলার ওপর চেপে বসলে মানুষের প্রকৃতি তাকে তার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিপরীত হিসেবেই দেখতে পাবে যে, কিছু মহিলা জীবনে পুরুষ জাতিকে শুধু চিনবে কিন্তু তার সংগ কোনোদিন পাবে না। এই বাস্তব অসার আবেগপূর্ণ মতের বক্তা যদি একথা বলতে চায় যে, নারী তার জীবন যাপন ও জীবনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী নয় তাহলে বাস্তব অবস্থা হলো মানব জাতির প্রকৃতি সম্পর্কে আসলেই সে অজ্ঞ, নিজকে বুদ্ধিমান রূপে প্রকাশকারী, বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শনকারী। এ সমস্ত ভাসা ভাসা জ্ঞানের অধিকারীরা এক্ষেত্রে যা ধারণা ও কল্পনা করছে তার চেয়ে কোরআনের বক্তব্য অনেক বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত এবং অধিকতর সূক্ষ্ম। হাজারো কাজ এবং কামাই একটি নারীকে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী করে স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। হতে পারে সেই প্রাকৃতিক প্রয়োজনটি দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত চাহিদা অথবা আত্মিক ও বুদ্ধিগত। যেমন তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বন্ধু-বান্ধব ও সংগী-সাথীকে ভালোবাসা। অপরদিকে পুরুষটিও কাজ পাচ্ছে, কিন্তু এটা তার জন্যে যথেষ্ট নয় বরং সে এর সাথে বান্ধবী ও স্ত্রীর সংগও পেতে চায়, এক্ষেত্রে মহিলাটিও পুরুষের হবে, কেননা তারা উভয়ই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা ইসলামের নীতি দর্শন, ইসলামী সমাজের পবিত্র রীতি-নীতি এবং নারীর যাবতীয় মানবিক মর্যাদা বিরোধী, আর যারা সমাজে অপকর্মের বিস্তার চায় না তারাই আল্লাহর চেয়ে বেশী জানার ভান করে এবং তার বিধানের প্রতি একচোট নিতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে কেননা

তারা এমন কোনো সংস্থার মুখোমুখী হচ্ছে না, যারা তাদেরকে এ দুঃসাহসিকতা থেকে বাধা প্রদান করবে। বরং দ্বীনের সাথে প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার উৎসাহ উদ্দীপনা পুরস্কার পাবে।

তৃতীয় সম্ভাবনা যাকে ইসলাম নির্বাচন করছে এবং বাস্তব অবস্থার মোকাবেলার জন্যে তাকে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে এখানে কোনো বিষয়ের প্রতি শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেই চলবে না। তদ্রূপ বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শন, দাবী দাওয়াও তাতে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিসহ মানবজাতির সাথে ও ইতিবাচক বাস্তবতার সাথ তাল মিলিয়ে ইসলাম তৃতীয় সম্ভাবনাকেই পছন্দ করেছে। ইসলাম এ সম্ভাবনাকে বাছাই করার ক্ষেত্রে মানব জাতির নির্মল চরিত্র এবং পবিত্র সমাজের দিকেও লক্ষ্য রেখেছে এবং মানব জাতিকে অন্ধকার গহবর থেকে তুলে উঁচু সিঁড়ি, অতপর উঁচু শৃংগে আরোহণ করাতে ইসলাম তার বিধানের সাথে সমন্বয় সাধন করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটির বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মানব সমাজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত তথা পুরো ইতিহাসের দিকে তাকালে মানব জীবনে যে বাস্তব সত্যটি আমরা দেখতে পাই, যাকে অস্বীকার করা এবং উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়- তা হচ্ছে এই যে, পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়ার যৌন ক্ষমতা সত্তর এবং তার চেয়ে বেশী বয়স পর্যন্ত থাকে। অপরদিকে নারীর সেই ক্ষমতা পঞ্চাশের কোটায়ই শেষ হয়ে যায়। তাহলে দেখা গেলো পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমপক্ষে নারীর চেয়ে বিশ বৎসর বেশী থাকে, যেটা নারীর মধ্যে নেই। আর এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে, এদের উভয়ের পার্থক্য ও তাদের মিলনের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে বংশের সম্প্রসারণ করা এবং এর বিস্তারের মাধ্যমে আল্লাহর যমীন আবাদ করা। সুতরাং সাধারণ প্রকৃতির এই নিয়মের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, পুরুষের মাঝে সন্তান জন্ম দেয়ার অতিরিক্ত সময় থেকে উপকৃত হওয়া থেকে জীবনকে বঞ্চিত করা হবে। যেটা প্রাকৃতিক বাস্তব সত্যের সাথে এখানে সংগতিপূর্ণ, তা হচ্ছে এই যে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় ও সর্বপরিবেশের জন্যে এর অনুমোদনকে আইন হিসেবে পাস করা। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে 'অবশ্য করণীয়' ভিত্তিতে নয়- বরং 'সাধারণ বৈধতা'র ভিত্তিতে তা জারী থাকবে অর্থাৎ সে যদি চায় তা প্রয়োজনের তাগিদে এই অনুমোদনে সাড়া দিতে পারবে। প্রকৃতির বাস্তবতা এবং আইনের নির্দেশের মাঝে সামঞ্জস্য একমাত্র আল্লাহর বিধানের মাঝে সম্ভব যা মানব রচিত বিধানে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না, কেননা মানুষের পর্যবেক্ষণ কখনোই এতো গভীরে প্রবেশ করতে পারবে না, কাছে এবং দূরের সকল পরিবেশ পরিস্থিতি সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

উপরোক্ত তথ্যের সাথে যদিও সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়, তবুও অবস্থাসমূহের মধ্যে এটাও একটি বিষয়- যা আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই। যেমন পুরুষ যৌন মিলনে আগ্রহী কিন্তু স্ত্রী বয়োবৃদ্ধি অথবা রোগের কারণে তাতে আগ্রহী নয় কিংবা সক্ষম নয়। অথচ উভয়েই তাদের দাম্পত্য জীবনকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী, কেউ কারো থেকে পৃথকও হতে চায় না। আমরা এ ধরনের অবস্থার মোকাবেলা কিভাবে করবো?

আমরা কি শুধু দু'কাঁধ নাড়িয়ে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই দেয়ালে মাথা ঠুকরে মারার মাধ্যমে এ অবস্থার মোকাবেলা করবো? না আমরা শূন্য পান্ডিত্য প্রদর্শন এবং শট বুদ্ধিমান সাজার মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করবো?

নিসন্দেহে শুধু ঘাড় নাড়ানোতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আর বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শন ও নিজেকে বুদ্ধিমান রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা মানব জীবনের অবস্থা এবং তার প্রকৃত সমস্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আর তখনই আমাদেরকে পূর্বের ন্যায় ৩টি সম্ভাবনার কোনো একটির সামনে এসে দাঁড়াতে হবে।

১. আমরা পুরুষটিকে আইনের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রাকৃতিক কর্মতৎপরতা ও যৌন কর্মকান্ড পরিচালনা থেকে নিবারণ করবো এবং তাকে তার কাজে বাধা প্রদান করবো। আমরা তাকে বলবো, এই বয়সে যৌন ক্ষমতাটা অত্যন্ত দোষনীয় কাজ। এটা তোমার জন্যে একেবারেই শোভনীয় নয়। এটা তোমার স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

২. আমরা এই পুরুষটিকে স্বাধীন ছেড়ে দেবো যেন সে তার পছন্দসই যে কোনো মহিলার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে পারে এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে পারে।

৩. আমরা প্রয়োজনের তাগিদে উক্ত ব্যক্তিকে বহু বিয়ের অনুমোদন দেবো এবং তাকে তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়া থেকে বারণ করবো।

প্রথম সম্ভাবনা হবে সম্পূর্ণ তার প্রকৃতি বিরোধী, সাধ্যের বাইরের কাজ এবং সে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ধৈর্য ও তার পরিণামের সাথেও তা সাংঘর্ষিক। যদি আমরা তাকে আইনের বলে ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করি তাহলে তার পরিণাম হবে মারাত্মক। তার পরিণাম হচ্ছে, দাম্পত্য জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং জাহান্নাম সাদৃশ্য এ জীবনের দুর্ভোগ। আর ইসলাম এটাকে কখনো পছন্দ করে না, কারণ ইসলাম ঘরকে প্রশান্তি এবং স্ত্রীকে ভালোবাসা ও উভয়ের পোশাক মনে করে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা ইসলামের চারিত্রিক বিধানের বিরোধী এবং সকল প্রাণীর ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত মানুষের উপযোগী হওয়ার লক্ষ্যে তার উন্নতি পবিত্রতা এবং আত্মশুদ্ধি সাধনের এটা পরিপন্থী।

একমাত্র তৃতীয় সম্ভাবনাই বাস্তব প্রকৃতির প্রয়োজনের অনুরূপ, ইসলামের চারিত্রিক বিধানের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম স্ত্রীর জন্যেও এ ব্যবস্থা তার দাম্পত্য জীবন সংরক্ষণ করে, একসাথে জীবন যাপন করা এবং প্রথম যৌবনের স্মরণীয় স্মৃতি ধরে রাখার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীর আগ্রহ পূরণ করে এবং বাস্তবতার সাথে উন্নতির পানে পদক্ষেপ রাখার সাথে মানুষের জীবনকে সহজসাধ্য করে।

আরো একটি প্রাকৃতিক সমস্যা রয়েছে– যেটা গুরুত্বের সাথে আলোচনার দাবী রাখে। সেটা হলো স্ত্রী যদি বন্ধা হয় তাহলে বংশ রক্ষা ও দাম্পত্য জীবন এ দুটো একত্রে কিভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব! কেননা স্বামীর ঐকান্তিক ও স্বভাবগত আগ্রহ থাকে, যে তার বংশ বৃদ্ধি হোক। এ পরিস্থিতিতে স্বামীর সামনে দু'টি পন্থা ছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা অবশিষ্ট থাকে না।

১. বংশধারা টিকিয়ে রাখার প্রাকৃতিক আগ্রহের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সে তার পরিবর্তে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে।

২. সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে, তবে এর সাথে সে প্রথমা স্ত্রীর সাথেও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে অটুট রাখবে।

সম্ভবত বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শনকারী নর-নারীর একটি দল প্রথম পন্থা গ্রহণের প্রলাপই বকবে। কিন্তু ৯৯% স্ত্রী যারা স্বামীকে উক্ত পন্থা অবলম্বনে পরামর্শ দেবে তার– প্রতি অভিশাপ দেবে।

কেনো এ পন্থা বাহ্যত কোনো বিকল্প ছাড়াই তাদের সংসারকে ভেংগে চুরমার করে দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধ্যাত্ব প্রকাশ পাওয়ার পর খুব কম মহিলাই আছে যারা দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী হয়। আর অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, বন্ধা স্ত্রীদের ছোটো শিশুদের প্রতি মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসা অনেক বেশী থাকে। সুতরাং সে সন্তানের বুকফাটা আশায় তার স্বামীর জন্যে দ্বিতীয় স্ত্রী আনয়নের ব্যবস্থা করবে। অতপর তারা ঘরকে সরব ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে রাখবে। যদিও বিশেষ দিক থেকে তার বঞ্চিত হওয়ার কারণে তার নৈরাশ্য কিছুটা থেকেই যাবে।

আর এমনিভাবে যখন আমরা প্রকৃত পরিবেশ পরিস্থিতিসহ জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি, তখন দেখতে পাই যে, বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শনের প্রতি তা মোটেই কর্ণপাত করে না। প্রলাপ বকাতেও সাড়া দেয় না এবং ভাব গম্ভীর অবস্থার স্থানে ঘৃণ্য ঠাট্টা তামাশা এবং লজ্জাকর চুপি-চাপি বিহার-শ্রবন করে না। তখনই আমরা শর্ত সাপেক্ষে এই বহু বিয়ের অনুমোদনকে বিধিসম্মত করার মহান রহস্যের সুবিধেসমূহ দেখতে পাই। এরশাদ হচ্ছে,

'তবে তোমরা সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটি।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহু বিয়ের অনুমতি আসলেই মানুষের প্রকৃতি ও জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং নানাবিধ প্রয়োজনের চাপে ধ্বংস অথবা ক্লান্তির ঝোঁক থেকে সমাজকে তা হেফাযত করে। আর এই বিষয়টি দাম্পত্য জীবনকে বিশৃংখলা ও ত্রুটি থেকেও সংরক্ষণ করে, স্ত্রীকে অবিচার ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করে, পূর্ণ সতর্কতা ও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে নারীর মর্যাদাকে অটুট রাখে। অধিকন্তু সে শর্তটি প্রয়োজন ও চাহিদানুসারে ইনসাফকে নিশ্চিত করে।

নিসন্দেহে যে ব্যক্তি ইসলামের প্রেরণা ও নির্দেশ ভালো করে উপলব্ধি করে সে কখনো এ কথা বলবে না যে, একাধিক বিয়ে যেমনিভাবে চরিত্রহীন ব্যক্তিরা পতিতাদের কাছে যায় তদ্রূপ কিছু একটা। এটা মানুষ জৈবিক স্বাদ আস্বাদন করুক এবং কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক প্রয়োজনের মতো কোনো যুক্তি ছাড়া একাধিক বিয়ের বিপক্ষে তারা কিছুই বলবে না। নিসন্দেহে বহু বিয়ে একটা প্রয়োজন। তাই এ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সে অন্য প্রয়োজনের সন্ধান করবে। শর্তারোপ এবং সীমা নির্ধারণ ছাড়া কামনা বাসনার ওপর ছেড়ে দেয়না। কেননা ইসলাম দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে তার বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিশ্লেষণ করে।

যদি উত্তরসূরীদের মধ্যে থেকে একটি দল এই অনুমতি প্রয়োগে পথভ্রষ্ট হয়, যদি পুরুষ জাতি এই অনুমতি থেকে সুযোগের সন্ধান করতে গিয়ে দাম্পত্য জীবনকে জৈব স্বাদ আস্বাদনের বিষয়টাকে নাটকে রূপান্তর করতে চায়, যেমনিভাবে তারা খারাপ মেয়েদের কাছে গমনাগমন করে তেমনি মানসিকতা যদি তাদের স্ত্রীদের মাঝেও স্থানান্তরিত হতে থাকে, যদি তারা স্ত্রী জাতিকে এই সন্দেহযুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে থাকে, তাহলে এটা ইসলামের কোনো কাজ হবে না এবং তারা ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারীও না। নিসন্দেহে তারা এই নিম্নস্তরে পতিত হয়েছে কেননা তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে এবং তারা ইসলামের স্বচ্ছ, মূল্যবান চেতনাটা অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। তার একমাত্র কারণ এই যে, তারা এমন সমাজে বসবাস করছে যে সমাজ ইসলাম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না এবং যেখানে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিতও নেই। এমন সমাজ যেখানে

ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নয় যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম ও তার বিধানের আনুগত্য করবে। এটি এমন পরিবেশ যেখানে ইসলামের দিক-নির্দেশনা, নিয়ম-পদ্ধতি, আদব-কায়দা ও রসম-রেওয়ায সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই।

ইসলামী বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি থেকে পলায়নপর ইসলাম বিরোধী সমাজই এই বিশৃংখলার জন্যে প্রধানত দায়ী এবং নারী জাতির অধপতিত সন্দেহযুক্ত অবস্থানের জন্যে সেই সমাজই দায়ী। সেই সমাজ দাম্পত্য জীবনকে জৈব স্বাদ আস্বাদনের নাটকে রূপান্তরিত করার জন্যেও দায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি এ অবস্থার সংশোধন করতে চায় সে যেন মানব সমাজকে ইসলাম, তার বিধান ও আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনে। অতপর সে তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার দিকে ডাকবে। এই সংস্কার চায় মানব সমাজকে আংশিক ইসলামের দিকে না ডেকে পরিপূর্ণ জীবন বিধানের দিকে ডাকবে, কেননা ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান, আর তার ওপর আমল করতে হলে পরিপূর্ণভাবেই করতে হবে।

অধিক স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় ইনসাফ হচ্ছে লেনদেন, খোরপোষ, জীবন যাপন এবং যৌন মিলনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অন্তরের অনুভূতির ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন,

‘তোমরা কখনো নারীদেরকে এক সমান রাখতে পারবে না। যদি তোমরা এর আকাংখীও হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে রেখো না।’

কিছুসংখ্যক লোক এই আয়াত থেকে একাধিক বিয়ে হারাম হওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বিষয়টি আসলে তদ্রূপ নয়। আল্লাহর বিধান এমন হাস্যকর নয় যে, এক আয়াতে তিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে বিধান রচনা করবেন এবং অপর আয়াতে নিষিদ্ধ করবেন। এটা তো একটা এমন দৃষ্টান্ত যেন কাউকে ডান হাত দ্বারা কিছু দেয়া হলো এবং বাম হাত দ্বারা তা ছিনিয়ে নেয়া হলো। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না হওয়ার আশংকা হলে একাধিক বিয়ে বৈধ নয়। সুতরাং প্রথম আয়াতে ব্যঞ্ছনীয় ও কাম্য ইনসাফ হচ্ছে লেনদেন, আচার আচরণ, স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহন করা, জীবন যাপন করা, যৌন মিলন এবং বাহ্যিক সকল অবস্থায় এমনভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যে, স্ত্রীদের মাঝে ওপরে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে থেকে কোনোটির ব্যাপারেই কমতি না হয়। কোনো বিষয়ে যেন এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর ওপর প্রাধান্য দেয়া না হয়। এটা এমনভাবে হবে যেমনিভাবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নিজের জীবনে তা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মনের টান, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ভিন্ন কথা। কেননা রসূল (স.)-এর সংশ্রবে যারা ছিলেন এমনকি তাঁর স্ত্রীরাও ভালো করে জানতেন যে, তিনি আয়েশা (রা.)-কে খুব বেশী ভালোবাসেন। হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তিনি তাকে অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর প্রাধান্য দিতেন। আসলে অন্তর তো মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছায় নড়াচড়া করেন। রসূল (স.) তাঁর অন্তরকে ভালো করেই জানতেন। তিনি বলতেন, ‘হে আল্লাহ! এটা আমার অংশ, যার মালিক আমি, আর যেই জিনিস আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন সে ব্যাপারে তুমি আমাকে তিরস্কৃত করো না।’

আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, ইসলাম একাধিক বিয়ের নির্দেশ দেয়নি বরং তার অনুমতি দিয়েছে মাত্র। তার ওপর শর্তারোপ করেছে। ইসলাম শুধু মানব জীবনের বাস্তবতা এবং মানব প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই তার অনুমতি প্রদান করেছে। এই প্রয়োজন ও বাস্তবতা যা আমি উল্লেখ করেছি তার কিয়দংশ ইতিমধ্যে

আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো এ সমস্ত প্রয়োজন ও বাস্তবতার পেছনে এসব বিষয় ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজন্মে ও পরিবেশে প্রকাশ হয়। আল্লাহর এসব বিধান ও নির্দেশনার পেছনে কি রহস্য ও কল্যাণ নিহিত তা বুঝতে গিয়ে যুগে যুগে মানবজাতি তার অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। সে রহস্য ও কল্যাণ মানুষ সব সময় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, সেটাও ঠিক নয়।

'দাসী বিয়ে' প্রসংগ

এবার আমি দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করবো, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশংকার কথা এখানে নির্দেশ করে,

'আর যদি এরূপ আশংকা করো যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে (তোমাদের জন্যে) একটিই।'

অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে তাদের সকলের সাথে ন্যাংসংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, এমন যদি আশংকা হয় তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করাই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়। অথবা দাসীকেই গ্রহণ করতে হবে, বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী করে অথবা দাসী হিসেবে রেখে দিয়ে। দাসীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে- না দাসী হিসেবে রাখবে, এ ব্যাপারে কোরআনে কোনোটিই নির্দিষ্ট কিছু বলে দেয়নি।

ইতিপূর্বে আমি 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দাসীদের বর্ণনা প্রসংগে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এখানে দাসীদেরকে উপভোগ করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

নিসন্দেহে দাসীকে বিয়ে করার মাঝে তাকে পুনর্বাসন করা হয় এবং তার মানব মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর এ বিয়ে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে তার মনিব থেকে মুক্ত করার যোগ্য বানিয়ে দেয়। এমনকি যদি তার মনিব বিয়ের মুহূর্তে তাকে স্বাধীন নাও করে তবুও তার ঔরসে সন্তান জন্মাবার পর তাকে বিক্রয় করা তার মনিবের ওপর নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং মনিবের মৃত্যুর পর সে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাবে। আর তার সন্তান তো জন্ম থেকেই স্বাধীন!

বিয়ের বদলে তাকে দাসী হিসেবে রাখার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। যখন সে বাচ্চার মা হবে, তখন তাকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং মনিবের মৃত্যুর পর এমনিই সে আযাদ হয়ে যাবে। তাহলে যদি মনিব এই শিশুটিকে নিজের ঔরষজাত সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তার সন্তানও মুক্ত হয়ে যাবে, আর স্বাভাবিকভাবে কিন্তু এটাই ঘটে।

সুতরাং বিয়ে করা এবং শুধু দাসী হিসাবে গ্রহণ করা উভয়টিই তাকে স্বাধীন করার পন্থাসমূহের মধ্যে একটি প্রন্থা, যাকে ইসলাম বৈধ বিধান হিসাবে স্বীকার করেছে। বিস্তারিত না জানার কারণে হয়তো দাসী গ্রহণের বিষয়টি সামান্য খটকা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দাসী সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ সতী সাধ্বী স্বাধীন মুসলিম নারীদেরকে যখন যুদ্ধে বন্দী করা হয় তখন তাদের পরিণাম এই পরিণামের চেয়ে আরো ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুদ্ধের বন্দী দাসীদের জীবনেও তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা রয়েছে, যাকে কোনো বিধানেই অবহেলা করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যে বিধান মানব প্রকৃতি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখে সে তো নারীর এই চাহিদাকে মোটেই অবজ্ঞা করতে পারে না। সমাজে যাতে নিয়ন্ত্রণহীন নৈতিক অবক্ষয় এবং যৌন উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ না পায়, সেটা লক্ষ্য

রাখতে হবে। সহজ পথে না হলে তারা পতিতাবৃত্তি অথবা একত্রে মেলামেশার মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করতে চাইবে। জাহেলী সমাজে এমনিটই চালু ছিলো।

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বেশী দাসী রাখার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে এগুলো কিন্তু ইসলাম নয়, এটা ইসলামের কাজও নয় এবং ইসলামের নির্দেশ তো তা নয়ই। এমনকি তাকে ইসলামী বিধানের অংশ গণ্য করা ইসলামের প্রতি নিদারুণ অবিচার ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামী ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা ইসলামের বিধি-বিধান, চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-পদ্ধতি এবং মাপকাঠি থেকেই উদ্ভূত হয়। ইতিপূর্বে আমি এ কথাটা একাধিকবার আলোচনা করেছি। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য কথা। মুসলমান নামধারীরা সমাজে ইসলামের নিয়ম পদ্ধতি ও মাপকাঠি বহির্ভূত যা কিছু করে থাকে তাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা কিছুতেই বৈধ নয়, কেননা তা ইসলাম থেকে বিপথগামী হওয়ার নাম।

যে কোনো প্রজন্মে মুসলমানদের ও ইসলামের পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্য থাকে। কেননা মুসলমানরা ইসলামকে সৃষ্টি করেনি বরং ইসলামই মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছে। এখানে ইসলাম হচ্ছে মূল, আর মুসলমান হচ্ছে তার শাখা ও উৎপন্ন দ্রব্য মাত্র। অতএব, মুসলমানরা যা করছে অথবা যা বুঝছে, তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল অথবা ইসলামের মূল ব্যাখ্যাকে নির্ধারণ করে না, যতোক্ষণ না তা মানুষের বাস্তব অবস্থা ও তাদের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ইসলামী মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে। যার সাথে সকল প্রজন্মের মানুষ ও তাদের ব্যাখ্যাকে তুলনা করে দেখতে হবে যে তার সাথে ইসলামের কতটুকু মিল অথবা গরমিল রয়েছে।

জাগতিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অবশ্য তদ্রূপ নয়। কেননা মানব রচিত মতবাদ আসে মানুষের চিন্তা চেতনা থেকেই। আর এর ফলে মানব গোষ্ঠী যখন জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে, মানব রচিত মতবাদের ধারক বাহক সমর্থক রক্ষক হয়ে জীবন যাপন করলে মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী যতোবারই করুক না কেন- তাতে কিছুই আসে যায় না। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রথম নিদর্শন হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিধান ও নিয়ম-নীতি থেকেই তাদের যাবতীয় বিধান ও নিয়ম-নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই মৌলিক নীতি ছাড়া ঈমানের কোনো অর্থ নেই। কেননা জাহেলিয়াতে বসবাসকারী মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা তাদের নিয়ম-নীতিকেও পরিবর্তন করে দেয় এবং তা এমন সব ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে যা তারা নিজেদের জন্যে রচনা করে নিয়েছে এবং নিজেদের ওপরই তারা তা প্রয়োগ করে।

পক্ষান্তরে ইসলামী বিধান হচ্ছে এমন যে, একে কোনো মানুষ রচনা করেনি বরং তাকে তাদের প্রতিপালক, স্রষ্টা, রেযেকদাতা এবং মালিক তাদের জন্যে রচনা করেছেন। অতএব ইসলামী বিধানে মানুষ তার পূর্ণাংগ অনুসরণ করবে এবং তদানুযায়ী নিজেদের জীবন গড়বে। তখন তাদের অবস্থাই হবে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী অবস্থা। অন্যথায় তারা ইসলাম থেকে কিছুটা বিপথগামী হবে অথবা পুরোপুরি বিপথগামী হয়ে পড়বে। যার কোনোটাই ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং তা হবে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি।

ইসলামের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করার সময় অবশ্যই এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। এ বিবেচনার ওপরই ইসলামের ঐতিহাসিক দৃশ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এটা অপরাপর সকল ঐতিহাসিক দর্শন ও মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই যে কোনো মতবাদ বা দর্শনের আলোকে এটা বিচার করা যাবে না। ইসলামের ওপর এই দৃষ্টিভংগি প্রয়োগ করা তার স্বকীয় প্রকৃতির পরিপন্থী এবং তা প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ধারণে অসংখ্য ভয়াবহতার দিকেই তাকে পৌঁছে দেবে।

সর্বশেষে আয়াতটি যাবতীয় প্রক্রিয়ার রহস্য এভাবে বর্ণনা করছে,

'নিসন্দেহে তা অন্যায় অনাচার থেকে বেঁচে থাকা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, অবিচার ও পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার জন্যে অধিকতর সঠিক কাজ।'

এখানে এই শব্দটি দ্বারা এতীম মেয়েদেরকে বিয়ে থেকে বিরত থাকা বুঝানো হয়েছে, কথাটি আমরা পাচ্ছি আয়াতের শুরুতে,

'আর যদি তোমরা ভয় করো যে এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না .... এ বিষয়গুলো মেনে চললে তা হবে অবিচার ও অত্যাচারে জড়িত না হওয়ার সহজ উপায়। (আয়াত ৩)

এখানে একথাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ন্যায় ও ইনসাফের অন্বেষণ করাই হচ্ছে এই বিধানের মূল কথা, এর সকল শাখা-প্রশাখার উদ্দেশ্যও তাই। পরিবারে ন্যায়-ইনসাফের লালন ও চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা সমাজ গড়ার এটা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। সামাজিক জীবনের দিকে পদযাত্রার এটাই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেয়ার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মানুষের এ বয়সটাই মূলত যে কোনো অভ্যাসের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে এক উৎকৃষ্ট সময়। এই সময় যদি ন্যায়, ভালোবাসা এবং শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সেই সমাজে ন্যায়-ইনসাফ, ভালোবাসা-হৃদ্যতা ও শান্তি আসতে পারবে না।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তায়ালা এতীমদের প্রসংগ শেষ করার পূর্বেই পুনরায় নারীদের অধিকারের বিষয়টি বলতে শুরু করেছেন, অথচ সূরার প্রথম ভাগটিও তিনি একমাত্র নারীদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, এমনকি এই সূরার নামকরণও করা হয়েছে 'নারী' নামে। এরশাদ হচ্ছে-

'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশী মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোনো অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করো।'

এই আয়াত মোহরের মধ্যে নারীর সুস্পষ্ট ও ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণ করে। জাহেলী সমাজে বিভিন্ন পন্থায় এই অধিকার হরণ করে স্ত্রীর ওপর নানাভাবে যুলুম ও অবিচার করা হতো, এ আয়াত সেদিকেই ইংগিত করে। এখানে তার কয়েকটি দিক পেশ করা হচ্ছে,

১. স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তারা তার হাতে পৌঁছাতো না, মেয়ের অভিভাবকরা তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। নারী যেন বিক্রিযোগ্য সামগ্রী আর তার অভিভাবক হচ্ছে সেই বিক্রয়ের অধিপতি। এটা ছিলো অবশ্যই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়ায।

২. অভিভাবক তার অধিনস্থ কোনো মহিলাকে অপর ব্যক্তির কাছে এ শর্তে বিয়ে দিতো যে, সেও তার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে দেবে। এখানে নারীর অদল বদল চতুষ্পদ জন্তুর অদল বদলের মতো। ইসলাম এই বিয়েকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং আগ্রহ ও পছন্দের ভিত্তিতে দুইটি আত্মার মিলনকেই বিয়ের ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছে, আর মোহরকে সাব্যস্ত করেছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য হিসেবে। শুধু নারীই তা গ্রহণ করবে, তার অভিভাবক নয়। ইসলাম এই মোহরের নামকরণ এবং তার পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করেছে যাতে নারী একান্ত ব্যক্তিগত ও বৈধ অধিকার হিসেবে তা গ্রহণ করতে পারে। ইসলামে এর খেলাফ কিছুতেই করা যায় না। ইসলাম স্ত্রীকে তার অধিকার হিসেবে মোহর আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজেব করে দিয়েছে। দান ও উপহার সামগ্রী যেমন স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে কাউকে দেয়া হয় ঠিক তদ্রূপ এই মোহরও স্বামী তার স্ত্রীকে খুশী মনেই দেবে। অতপর স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার মোহরের কিছু অংশ অথবা পুরো

অংশ তার স্বামীকে দিয়ে দিতে চায়, তবে সে অধিকারও তার থাকবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর খুশী মনে ছেড়ে দেয়া ও মাফ করে দেয়া অংশ গ্রহণ করা এবং হালাল মনে করে তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করা স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ বৈধ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও বন্ধন হবে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও নিরংকুশ সম্পর্ক।

এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ত্রী ও তার মোহর প্রসংগ, জান-মালে তার অধিকার এবং তার সম্মান মর্যাদার ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের আবর্জনাদির মধ্যে থেকে এই আবর্জনাকে দূরীভূত করা হয়েছে। এর সাথে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নিরস ও আকর্ষণহীন করেনি। একইভাবে শুধু কঠোরতা ও কর্কশ ব্যবহারের ওপরও সেই সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করেনি। বরং ইসলাম পারস্পরিক বদান্যতা, সন্তুষ্টি, ভালোবাসা ও আন্তরিকভাবে দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্যে উভয়কেই নির্দেশ দিয়েছে।

এতীমের সম্পদ সংরক্ষণ

এতীম ও অপরাপর নারীদের বিয়ের প্রসংগ শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় এতীমদের সম্পদের বর্ণনা শুরু করেছেন। এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এতীমদের সম্পদ তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার মূলনীতি বর্ণনার পর এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার বিস্তারিতবর্ণনা করছেন।

এই সম্পদকে যদিও আমরা এতীমদের সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি কিন্তু তা হচ্ছে একদল লোকের সম্পদ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অন্যদের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্যে দান করেছেন। এ দলটি উত্তম পন্থায় এই সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মাত্র! সুতরাং একটি জনসমষ্টি প্রথমত সাধারণ সম্পদের মালিক হবে। এতীম অথবা তাদের উত্তরাধিকারীরা অনুমতি সাপেক্ষে সম্পদ বিনিয়োগের জন্যে ক্ষমতাবান হচ্ছে। তারা নিজেরা এ সম্পদ থেকে উপকৃত হতে থাকবে এবং তাদের সাথে সমষ্টিকেও উপকৃত করতে থাকবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সম্পদ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে সক্ষম হবে, ততোক্ষণ তার পরিচালনার যোগ্যতা রাখবে। এক্ষেত্রে তাদের অধিকার ও মালিকানা শর্ত সাপেক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূল সম্পদের অধিকারী এতীম এখনো অর্বাচীন-যারা সম্পদের পরিচালনা ও বিনিয়োগ ভালো করে জানে না, তাই তখন তাদের হাতে সম্পদ দেয়া যাবে না। কিন্তু তাদের মালিকানা অবশ্যই সেই সম্পদের মাঝে অটুট থাকবে। বয়সের কারণে তার ব্যবহার ও পরিচালনার অধিকার তাদের থাকবে না। সম্পদের ব্যবহার ও পরিচালনার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে যে পারিবারিক নিরাপত্তা ও সংহতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতীমের আত্মীয়তার শ্রেণী বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারে সক্ষম। পারিবারিক নিরাপত্তা ও সংহতি নিশ্চিত করাই এখানে সাধারণ নিরাপত্তার নিয়ম। অবুঝ এতীমের পূর্ণ অধিকার রয়েছে তার সম্পদে খাওয়ার ও পরার। এর সাথে ভালো ব্যবহার পাওয়ারও তার অধিকার রয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অবুঝদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।'

সাবালক হওয়ার পরই নির্বুদ্ধিতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। নির্বুদ্ধিতা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি কোনো গোপন রাখার বিষয় নয়। কোরআনের ভাষ্যের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা নির্ধারণ করার প্রয়োজন পড়ে না। কে নির্বোধ এবং কে বুদ্ধিমান মানুষ তা ভালো করেই জানে। নির্বোধের নির্বুদ্ধিতার এবং বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিচিতি এখানে

নানাভাবেই ফুটে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রে আচার আচরণও জনগণের সামনে গোপন থাকে না। তারপরও সাবালকত্ব চেনার জন্যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই করা হবে। কোরআনে কারীম 'বিয়ে' শব্দের মাধ্যমে সেদিকেই ইংগিত করেছে। বিয়ে এমন একটি কাজ যার জন্যে সাবালকত্ব একান্ত প্রয়োজন। এরশাদ হয়েছে,

'আর এতীমদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে.... অবশ্য হিসাব নেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। (আয়াত ৬)

কোরআনের বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্ত প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতা আমরা বুঝতে পারছি যার আলোকে এতীমরা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের বিষয়-সম্পত্তি তারা গ্রহণ করবে। তদ্রূপ বালেগ হওয়ার পর তাদের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এতীমদের ধন সম্পদ তাদের হাতে অতি দ্রুত সোপর্দ করা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারেও এখানে কড়াকড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সাথে আরো যে সমস্ত বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এতীমদের সম্পদ নিরাপদ অবস্থায় তাদের হাতে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া, তদারকির মুহূর্তে এ সম্পদ সংরক্ষণ করা, এতীমরা বড়ো হয়ে তাদের বিষয় সম্পত্তি গ্রহণ করার পূর্বে তা প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ না করা এবং দ্রুত তা খেয়ে না ফেলা। যদি অভিভাবক ধনী হয় তবে সে এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অভিভাবক গরীব হয় তবে সে অবস্থায় সংগত ও সীমিত পরিমাণই সে তা থেকে ভোগ করবে। সম্পদ প্রত্যার্পণের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। আল্লাহর সাক্ষ্য ও হিসাব নেয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এই আয়াতের সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে,

'অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।'

এখানে বর্ণিত কড়াকড়ি ও কঠোরতা, এতীমের সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা তাকে বিভিন্ন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সতর্ক করে দেয়ার মাধ্যমে এর প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। জাহেলী সমাজে দুর্বল, অসহায় এতীমদের সম্পদে কি ধরনের অবিচার ও যুলুম চলতো তাও এতে বুঝা যায়। তার সাথে এই বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে কি ধরনের কঠোরতা, তাগিদ এবং বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন সেই দিকে ইংগিত প্রদান করে এখানে কোনো পন্থায় অনিয়ম ও তামাশা করার উপায় নেই।

আর এমনিভাবেই আল্লাহর বিধান মানুষের অন্তর ও তাদের সমাজ থেকে জাহেলিয়াতের নিদর্শনসমূহ মুছে ফেলতে লাগলো, ইসলামের নিদর্শনসমূহকে আস্তে আস্তে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলো। সমাজ থেকে জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহকে একে একে মুছে তার জায়গায় ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বসাতে শুরু করলো। তাই আল্লাহর বিধান, আল্লাহভীতি ও তার তত্ত্বাবধানে নতুন সমাজ ও তার রসম-রেওয়ায, বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহকে গড়ে তুলতে লাগলো। শরীয়াতের বিধান বাস্তবায়নের জন্যে এ বিষয়গুলোকে ইসলাম সর্বশেষ নিরাপত্তা হিসাবে নির্ধারণ করেছে, আর এ যমীনে আল্লাহভীতি এবং তার কড়া তত্ত্বাবধান ছাড়া কোনো বিধানের নিশ্চয়তা নেই।

'আর আল্লাহ তায়ালাই হিসাব নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

ইসলামে উত্তরাধিকার বন্টন

জাহেলী সমাজের লোকেরা সাধারণত মেয়ে এবং শিশুদেরকে সামান্যই কিছু উত্তরাধিকার দিতো। কেননা তারা অশ্বারোহণ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। অথচ আল্লাহর বিধান আত্মীয়স্বজনের স্তর বিন্যাসে এবং পরবর্তীতে তার বর্ণিত অংশ

অনুযায়ী মৃতের সম্পদকে আত্মীয়স্বজনের অধিকার হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এটা একই পরিবারের সদস্যদের মাঝে নিরাপত্তা বিধান করা এবং সাধারণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামের দর্শনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা বিনা কষ্ট ও সাধনায় কোনো বস্তু অর্জন করার যে ফিকাহর বিধান রয়েছে তার সাথেও সংগতিপূর্ণ। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে তার আত্মীয়স্বজনের ভরণ পোষণের জন্যে আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত। একইভাবে নিকটাত্মীয় কাউকে হত্যা করলে সেই রক্তমূল্য (দিয়্যাত) পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং কাউকে আহত করলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার সাথে সংহতি প্রকাশ করতেও সে নির্দেশপ্রাপ্ত। সুতরাং ইনসাফ হলো যদি সেই আত্মীয় মারা যাওয়ার সময় কোনো সম্পদ রেখে যায় তবে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ইসলাম হচ্ছে সুশৃংখল পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধান, তার এই পরিপূর্ণতা ও সুশৃংখলতা অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য বন্টনে সর্বত্রই সুস্পষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

এটাই হচ্ছে সাধারণ উত্তরাধিকারের নিয়ম। আমরা যত্রতত্র উত্তরাধিকার নীতির ওপর হট্টগোল শুনতে পাই। মানব প্রকৃতি ও তার জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং আল্লাহর সাথে বাড়াবাড়ির দরুণই এটা সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে এর দ্বারা এমন কিছু মূলনীতি উপলব্ধি করা যাবে যার ওপর ইসলামের সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত এবং নিসন্দেহে তা এই হট্টগোলকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা, আর যাতে এ নিরাপত্তা মযবুত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্যে ইসলাম হামেশাই লক্ষ্য রেখেছে যেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানব অন্তরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক প্রবণতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রবণতাসমূহ আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিতে এমনি এমনিই সৃষ্টি করেননি বরং তাকে মানব জীবনে মৌলিক ভূমিকা পালন করার জন্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আর যেহেতু পরিবারের জন্যে কাছের ও দূরের বন্ধনসমূহ হচ্ছে তার বাস্তব ও প্রাকৃতিক বন্ধন, কোনো প্রজন্মই তাকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করেনি। এই বন্ধনসমূহ তাকে শক্তিশালীকরণ, তার প্রভাব ও মান উন্নয়নসহ তাকে সংরক্ষণকরণে সাহায্য করবে। সুতরাং ইসলামই পারিবারিক নিরাপত্তা, সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। উত্তরাধিকারের বিধানকে পরিবারের গন্ডিতে সে নিরাপত্তারই একটি প্রতীক নির্ধারণ করেছে। তার রয়েছে অর্থনৈতিক ও সাধারণ সমাজ ব্যবস্থার আরো অনেক কার্যকারিতা।

অতপর যদি এই পদক্ষেপ নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী যাবতীয় অবস্থা অনুধাবন করতে অপারগ ও অক্ষম হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এখানে দ্বিতীয় পদক্ষেপের আগমন ঘটে। তারপর যখন দ্বিতীয় পদক্ষেপও অপারগ হয় তখন সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকা শুরু হয়। ইসলামী রাষ্ট্রই তখন অভাবীদের ভরণ পোষণ ও পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত হয় এবং পরিবারও স্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী একটি দলের স্থলাভিষিক্ত হয়। এই কারণে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব প্রথমেই রাষ্ট্রের কাঁধে বর্তায় না। প্রথমত এ জন্যে যে পরিবার অথবা ছোটো গন্ডিতে নিরাপত্তা ও করুণাময় অনুভূতি সৃষ্টি করে, যার চতুর্পার্শ্বে সহযোগিতা ও সমবেদনার অকৃত্রিম গুণাবলী স্বাভাবিকভাবেই মজুদ পায়। আসলে এই অনুভূতিসমূহই হচ্ছে আমাদের মানবিক অর্জন, যাকে একজন মন্দ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অপরদিকে পারিবারিক নিরাপত্তা প্রকৃতির উপযোগী কিছু স্বাভাবিক প্রভাব এমনিই সৃষ্টি করে। ব্যক্তির এই অনুভূতি তার এ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রভাব আত্মীয়স্বজন বিশেষভাবে তার সন্তান সন্তুতির ওপর পতিত হবে। এই

অনুভূতিই পরিশেষে তাকে তার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতেও উৎসাহিত করে। তখন তার এই সফলতা হবে একান্তভাবে দলের জন্যে। কেননা ইসলাম ব্যক্তি ও দলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সুতরাং ব্যক্তির যাবতীয় প্রচেষ্টা পরিশেষে সমষ্টির প্রচেষ্টা বলে গণ্য হয়ে যাবে। এই শেষ নিয়মটি যে ব্যক্তি কষ্ট করেনি ও শ্রমও দেয়নি তাকে উত্তাধিকারী বানাবার যাবতীয় বাহ্যিক আপত্তিসমূহ নিরসন করে। এটা হচ্ছে উত্তরাধিকারীর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া। অতপর সে উত্তরাধিকারের যিম্মাদার যদি গরীব হয় আর উত্তরাধিকারী ধনী হয়, অবশেষে সেও তার সম্পদ সাধারণ নিরাপত্তা আইনের ভিত্তিতে প্রয়োজনের তাগিদে মালিক হয়ে যাবে।

উত্তরাধিকারকারী, উত্তরাধিকারীও তাদের সন্তানদের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্পদের ওপর সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমরা সম্পদের উত্তরাধিকারীত্ব কমিয়েও নেই, তথাপি আমরা তাদের মধ্যকার অন্যান্য সম্পর্ক উত্তরাধিকারিত্বকে কমাতে সক্ষম হবে না।

পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও সাধারণ আত্মীয়স্বজন তাদের ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতনী ও আত্মীয়স্বজনকে শুধু সম্পদেরই উত্তরাধিকারী করেন না। বরং তারা তাদেরকে ভালো মন্দের, সুস্থতা অসুস্থতার, বিচ্যুতি স্থিতিশীলতায় এবং মেধা নির্বুদ্ধিতারও উত্তরাধিকার বানায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একান্ত উত্তরাধিকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের জীবনে কোনো না কোনোভাবে তা প্রভাব সৃষ্টি করবেই। এ বিষয়টি তাদেরকে তার পরিণাম থেকে কখনো মুক্ত রাখবে না। সুতরাং ইনসাফ হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকারীও বানিয়ে যাবে। এর সাথে তারা তাদেরকে রোগ, বিচ্যুতি ও নির্বুদ্ধিতা এর কোনোটা থেকেও মুক্তি দেবে না। এমনকি এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও তার যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করেও তাদের এই সমস্ত উত্তরাধিকারীত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না।

মানব জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর মাঝে এছাড়া আরো বহুবিধ সামাজিক কল্যাণজনক কাজ রয়েছে যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই উত্তরাধিকারীত্বের বিধান রচনা করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশী এ অংশ নির্ধারিত।'

এটাই হচ্ছে সেই সাধারণ মূলনীতি যার মাধ্যমে ইসলাম নারী সমাজকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে পুরুষের মতোই তাদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে। এভাবে ইসলাম শিশুদের অধিকারও সংরক্ষণ করেছে, যাদের ওপর জাহেলী সমাজ যুলুম অত্যাচার করতো এবং তাদের অধিকারকে তারা অন্যায়ভাবে হরণ করতো। জাহেলী সমাজ ব্যক্তির যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনমূলক কাজে সে কতোটুকু অক্ষম সে দৃষ্টিভংগীতে তার উত্তরাধিকার ঠিক করতো। কিন্তু ইসলাম এ পর্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আল্লাহর বিধান নিয়ে যখন ইসলাম দুনিয়ায় এলো তখন ইসলাম প্রথমত মানব সমাজকে দেখলো তার মানবিক মূল্যবোধের আলোকে, আর এটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত মূল্য যা সমাজ কিংবা জাতির জন্যে ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়। দ্বিতীয়ত ইসলামই মানব জাতিকে পরিবার ও জনগণের জাতিকে পরিবার ও জনগণের গন্ডিতে একটি দায়িত্বশীল ও কর্তব্য পরায়ণ সৃষ্টি হিসেবেই দেখেছে।

উত্তরাধিকারী বানাবার ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু নিকটাত্মীয় লোক অন্য আত্মীয়দের বঞ্চিত করে। এখানে এমন কিছু আত্মীয় পাওয়া যায় যারা উত্তরাধিকারী নয়। কেননা তাদের মধ্যে যারা অতি নিকটের তারা আবার তাদের পরবর্তীদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কারণ অন্যত্র

বঞ্চিতদের জন্যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। একমাত্র তাদের মনোতুষ্টির জন্যে যারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের সময় উপস্থিত হবে তারা যেন নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে না করতে পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এটা পারিবারিক সম্পর্ক ও আন্তরিক হৃদ্যতা সংরক্ষণের জন্যেও দরকার। সাধারণ নিরাপত্তা বিধির সাথে মিল রেখে ইসলাম এতীম ও মেসকীনদের জন্যে অনুরূপ অধিকার নিশ্চিত করেছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতীম ও মেসকীনরা উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিন্তু সদালাপ করো।'

এ আয়াত প্রসংগে আগে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, এই আয়াতটি হচ্ছে 'মানসুখ' অর্থাৎ তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মীরাসের আয়াতসমূহ এই আয়াতের নির্দেশকে রহিত করেছে যেগুলো উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারণের জন্যে পরে নাযিল হয়েছে। অপরটি হচ্ছে, এই আয়াতটি 'মোহকাম' অর্থাৎ নির্দেশ এখনো বহাল। আরেক অভিমত হচ্ছে, এই আয়াতের হুকুমের ওপর আমল করা ওয়াজেব, কেউ কেউ বলেন 'মোস্তাহাব' তা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু আমি আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মতে আলোচিত প্রেক্ষাপটে আয়াতের ওপর আমল করা ওয়াজেব। কেননা একদিকে এর বক্তব্য মোতলাক বা ব্যাপক, অপরদিকে নিরাপত্তা বিধানের সাধারণ ইসলামী দর্শনের সাথে এটা সামঞ্জস্যশীল। আমি মনে করি এই আয়াতটি 'মোহকাম' তার হুকুম বহাল এবং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা ওয়াজেব। মনে রাখতে হবে এটা উত্তরাধিকারীদের নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত সম্পদের মাধ্যমেই কার্যকর হবে।

এতীমের সম্পদ জবর দখলের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী

উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারণের বর্ণনা শুরু করার পূর্বে এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার প্রতি সতর্ক করে এখানে দু'টি শক্তিশালী মর্মস্পর্শী বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১. এটি মানুষের পৈতৃত্ব, স্নেহ মমতা, দুর্বল সন্তান-সন্তুতির প্রতি তাদের স্বভাবগত টান ও ভালোবাসা এবং হিসাব নিকাশ নেয়ার একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহকে ভয়ের ব্যাপারে তার সুপ্ত অনুভূতিকে স্পর্শ করে।

২. এটি ভীতিকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যের বাইরে অবস্থিত জাহান্নাম ও দোযখের আগুন থেকে ভয় পাওয়ার অনুভূতিকেও স্পর্শ করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের ভয় করা উচিত, নিজেদের পেছনে দুর্বল অক্ষম সন্তান সন্তুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে.... তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' (আয়াত ৯)

এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য সন্তান-সন্তুতির প্রতি সংবেদনশীল পিতা-মাতায় অন্তকরণে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছিলো, যারা নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে এ ধারণা করেছিলো যে, তারাও দুর্বল ও অসহায়। তাদের প্রতি মমতা দেখানোর মতো এবং বিপদ আপদ থেকে হেফাযত করার মতো কেউ নেই। এতীমদের দায়-দায়িত্বও এভাবে জীবিতদের হাতে ন্যস্ত করা হতে পারে। ছোটো ছোটো এতীমদের দেখা শোনার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তাদের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর

ভীতির কথা তাদেরকে সদা স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের সন্তানদের জন্যে এমন ব্যক্তি জুটিয়ে দেবেন, যারা আল্লাহভীতি, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে তাদের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেবে। এতীমদের দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে এই উপদেশও দিতে হবে যেন তারা তাদের সম্পর্কে সংগত কথা বলে। তারা যেমনিভাবে এতীমদের ধন সম্পদকে হেফাযত করবে তদ্রূপ তাদেরকে হেফাযত করবে এবং ভালোভাবে লালন পালন করবে।

দ্বিতীয় মর্মস্পর্শী বক্তব্যটি আরো ভীতিকর। যেখানে রয়েছে পেটে আগুন ভর্তি করানোর দৃশ্য এবং জাহান্নামে প্রবেশ করানোর দৃশ্য। এতীমদের সম্পদ হচ্ছে আগুন আর অভিভাবকরা যেন এই আগুন খাচ্ছে। সুতরাং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেই আগুন তাদের পেট এবং চামড়াকে দগ্ধ করছে। যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে পারে তার ভেতর বাইরে শুধু আগুন আর আগুনই থাকবে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, সে আগুন আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের পেট এবং চামড়া তা উপলব্ধি করতে পারবে এবং পেট ও চামড়ার এভাবে জ্বলার দৃশ্যও তারা অবলোকন করতে থাকবে।

কোরআনের এই বক্তব্য মুসলমানদের অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। তা মুসলমানদের অন্তরকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকেও মুক্ত করে। কোরআনের বক্তব্য তাদের অন্তকরণকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে এর ফলে তারা এই আবর্জনাসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি সেই বক্তব্য এতীমদের সম্পদ স্পর্শ করা থেকে সতর্ক থাকা, আল্লাহর ভয় অর্জন করা, পাপ থেকে বিরত থাকা এবং ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক এতীমদের ধন সম্পদে আগুন দেখতে পায় এবং তারা এই সম্পদ স্পর্শ করাকে সাংঘাতিকভাবে ভয় করে।

আতা ইবনুস সায়িব সূত্রে সাঈদ বিন জোবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

'যারা এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে ...।'

তখন সাহাবাদের মধ্যে থেকে যাদের তত্ত্বাবধানে কোনো এতীম ছিলো তারা তাদের খাদ্য ও পানীয় বস্তু নিজেদের খাদ্য ও পানীয় বস্তু থেকে দূরে রাখতে লাগলো। তাদের অবস্থা এমন হয়েছিলো যদি কোনো ভালো জিনিস পেতো তা এতীমের জন্যে রেখে দিতো। তারা তা নিজেরা খেতো না, প্রায়ই নষ্ট হয়ে যেতো। তাদের এ অবস্থা আরো কঠোরতর হওয়ার পর সাহাবাদের একটি দল বিষয়টি রসূলের খেদমতে বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।'

'হে নবী! তোমার কাছে তারা এতীম সংক্রান্ত হুকুম জানতে চাচ্ছে। বলে দাও, তাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিলিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তো তোমাদেরই ভাই, বস্তুত অমংগলকামী ও মংগলকামীদেরকে আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আল্লাহ তায়ালা যদি ইচ্ছা করতেন তোমাদের ওপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন।'

অতপর তারা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন। এমনিভাবে কোরআনী বিধান তাদের অন্তকরণকে উন্নীত করে তোলে এবং তাকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকেও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

উত্তরাধিকার আইনের মূলনীতি

এবার আমি উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা শুরু করবো। আল্লাহ তায়ালা এই বিধান দিয়েছেন পিতামাতাকে, তাদের সন্তানদের সম্পদ দেয়ার এই নির্দেশ এ কথারই পরিচায়ক যে, তিনি পিতামাতার চেয়ে সন্তানদের প্রতি বেশী করুণাময়, দানশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ। তদ্রূপ এই নির্দেশ এ কথারও পরিচায়ক যে, পুরো বিধানের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি পিতামাতার চেয়ে বেশী করুণাময়, দানশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ। তিনিই পিতামাতা ও সন্তান সন্তুতি এবং আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বিচার ফয়সালা করেন। সুতরাং তাঁর বিধান গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। আসলে এটাই হচ্ছে দ্বীনের অর্থ, যার বর্ণনায় পুরো সূরাটি একান্ত যত্নবান- যা ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারের সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা শুরু করেছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।'

অতপর এই সাধারণ মূলনীতি এবং তার বাস্তবতার আলোকে তার শাখা-প্রশাখা ও অংশ বন্টন বর্ণনা শুরু করেছেন। উত্তরাধিকারের বর্ণনা এ দুইটি আয়াতের মাঝে বিস্তারিতভাবে এসেছে। প্রথম আয়াতটি উত্তরাধিকারদের মূল এবং শাখার সাথে নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় আয়াতটি স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকার ও 'কালালার' সাথে সংশ্লিষ্ট। 'কালালার' অবস্থার বর্ণনাকে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সূরার শেষ আয়াতে অবশিষ্ট নির্দেশ আসবে। (আমিও নির্দিষ্ট স্থানে তা বর্ণনা করবো)।

অংশ নির্ধারন

এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন .... আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।' (আয়াত ১১)

উপরোক্ত তিনটি আয়াত 'এলমুল ফারায়েয' তথা উত্তরাধিকার শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রসূল (স.)-এর হাদীসে তার কিছু শাখা প্রশাখার বর্ণনা এসেছে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদরা এই মূলনীতির প্রয়োগ করে অন্যান্য শাখা প্রশাখার ব্যাপারে ইজতেহাদ (গবেষণা) করেছেন। এই সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও অনুশীলনের স্থান এটা নয়। তার প্রকৃত স্থান হচ্ছে ফেকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ। আমি 'তাফসীর ফী যিলালির কোরআন'-এ কোরআনী বক্তব্যের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী জীবন বিধানের যে মূলনীতি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে শুধু তার পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হবো। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান।'

এই সূচনাটি সেই মূলনীতির দিকে ইংগিত দান করে যার দিকে 'ফারায়েয' সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাবর্তিত হয়। তদ্রূপ এই সূচনা এইদিকে ইংগিত করে যে, পিতামাতা তার সন্তানদের প্রতি যতোটুকু ক্ষমতাবান, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী অনুগ্রহশীল। যখন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কোনো কিছু নির্ধারণ করেন, তখন পিতামাতাদের চেয়ে বেশী মংগলজনক কিছুই তিনি তাদের জন্যে নির্ধারণ করেন।

এখানে বর্ণিত দু'টি অর্থ পরস্পর সংযুক্ত ও পরিপূরক। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এই নির্দেশ দান করেছেন। তিনিই মানুষের মাঝে মীরাস বন্টন করেছেন। একইভাবে তিনিই সর্ববিষয়ে নির্দেশ করছেন এবং সমগ্র উপজীবিকাকে তিনিই বন্টন করছেন। আল্লাহর কাছ থেকেই সকল

ব্যবস্থাপনা, বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি আসে। তাঁর কাছ থেকেই মানুষ তাদের জীবনের যাবতীয় বিধিবিধান গ্রহণ করে। এখানে আলোচনা হচ্ছে তাদের সম্পদ ও পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি সন্তান সন্তুতির মাঝে বন্টন করার নীতিমালা। এটা হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ দ্বীন (জীবন বিধান)। মানুষ যদি জীবনের যাবতীয় বিষয়াদি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা থেকে গ্রহণ না করে তবে তাদের জন্যে কোনো দ্বীন থাকতে পারে না। তারা যদি জীবনের খুঁটিনাটি ও ছোটো বড়ো কিছু আল্লাহ তায়ালা থেকে গ্রহণ না করে তাহলে সেখানে শেরেক, কুফুরী এবং জাহেলিয়াত তার প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ ইসলামের আগমন ঘটেছেমানব জীবন থেকে এর মূল শেকড় উৎপাটনের জন্যে।

আল্লাহ তায়ালা যেই জিনিসের নির্দেশ করছেন, যা কিছু তিনি মানুষের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, মানব জীবনে যে বিষয়ের ফয়সালা তিনি করছেন তা মানুষের জন্যে একান্ত উপযোগী। হোক না তা একান্ত ব্যক্তি জীবনে ধন-সম্পদ ও উত্তরাধিকার বিষয় সংক্রান্ত কোনো ছোটো বিষয়! মানব জাতির এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমরাই আমাদের জন্যে একটি আইন তৈরী করেছি এবং আমরা আমাদের স্বার্থ ভালো করেই বুঝি। এটা ভ্রান্ত এক ধরনের ঔদ্ধত্য। আল্লাহর চেয়েও বেশী জানার ভান করা এবং এমন অযৌক্তিক দাবী নির্লজ্জ ও মূর্খ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।'

আল আওফি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহর নবী এই আয়াতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ, নারী ও পিতামাতার অংশ বর্ণনা করেন তখন সাহাবীরা অথবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, নারীকে চারের এক অথবা আটের এক মেয়েকে দুই এর এক এমনকি ছোটো শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কেউ জেহাদে অংশগ্রহণ করে না। তারা কিভাবে মালের অংশ পেতে পারে? অতএব তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে চুপ থেকো, কোনো কথা বলো না, সম্ভবত রসূল (স.) তা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে তা পরিবর্তন করার জন্য বলবো। অতপর তারা রসূল (স.)-এর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয়। অথচ সে অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের মাঠে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মীরাস দেয়া হয়, যে কোনো কাজেই আসে না ... জাহেলী যুগে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতো একমাত্র তাদেরকে সম্পত্তিতে ভাগ দেয়া হতো, আর যারা বয়স্ক তাদেরকে গনীমতের ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া হতো।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এটা ছিলো জাহেলী সমাজের একশ্রেণীর আরবাসীর যুক্তি তর্ক। এই জল্পনা করা এবং যুক্তি তর্ক আল্লাহর বিধান ও ইনসাফপূর্ণ সুনিপুণ বন্টনের সাথে সাংঘর্ষিক। একইভাবে এটা বর্তমান জাহেলী সমাজের একশ্রেণীর লোকেরও যুক্তি যা আল্লাহর বিধান ও বন্টনের সাথেও সাংঘর্ষিক। বর্তমান জাহেলিয়াত আরব জাহেলিয়াতের যুক্তিকে সামান্য একটু বদল করে একথা বলেছে যে, সন্তানরা কোনো প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেনি তাদেরকে আমরা কিভাবে গনীমতের মাল দিতে পারি? পুরাতন জাহেলিয়াতেও তদ্রূপ ছিলো। এখানে উভয় (পুরাতন ও বর্তমান জাহেলিয়াত) দলই বন্টনের সঠিক দর্শন ও রহস্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ এবং এক্ষেত্রে শিষ্টাচারকেও তারা অবলম্বন করেনি। উভয় দলই অজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারকে একত্রে সন্নিবেশিত করেছে।

'একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।'

ছেলে মেয়ে ছাড়া মৃত ব্যক্তির যদি অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে সেক্ষেত্রে মেয়ে এক ভাগ আর ছেলের দু'ভাগ- এ নিয়মের ভিত্তিতেই ভাই বোন সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।

এখানে পুরুষকে নারীর ওপর প্রাধান্য দেয়া অথবা কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষপাতিত্ব করা উদ্দেশ্য নয়। বরং পারিবারিক কাঠামো এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ এবং মহিলার দায়িত্বভার, ভারসাম্যতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই এর উদ্দেশ্য।

পুরুষ নারীকে বিয়ে করে। অতপর সে তার এবং তার সকল সন্তান সন্তুতির ব্যয়ভার বহন করে। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা তার সাথেই থাকুক উভয় ক্ষেত্রেই এটা ঠিক। অপরদিকে স্ত্রীর ওপর অন্য কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকে না। বিয়ের পূর্বে অথবা পরে যে কেউই তার দায়িত্বে থাক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে তার স্বামী ও সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। সুতরাং একজন পুরুষ পারিবারিক কাঠামো এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কমপক্ষে মহিলার ব্যয়ভারের চাইতে দ্বিগুণ ব্যয়বার বহন করার জন্যে আইনগতভাবেই বাধ্য। এটাই ইনসাফ। এভাবে এ সুনিপুণ বন্টন ব্যবস্থা সামগ্রিক লাভ ও লোকসানের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি হবে।

উত্তরাধিকার বন্টন

এবার মূল থেকে শাখার দিকে উত্তরাধিকার বন্টন শুরু হচ্ছে,

'অতপর যদি এর অধিক মেয়ে হয়, তবে তাদের জন্যে তিন ভাগের দুই ভাগ যা মৃতব্যক্তি রেখে যায় এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে থাকবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।'

মৃতের যদি কোনো পুরুষ সন্তান না থাকে, শুধু দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে, তবে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ থাকবে। আর যদি তার একটিমাত্র মেয়ে সন্তান থাকে, তবে তার জন্যে হবে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক। অতপর অবশিষ্ট সম্পদের মালিক হবে নিকট আত্মীয়রা। যেমন, পিতা বা দাদা বা আপন ভাই (সহোদর ভাই) বা বৈপিত্রেয় ভাই বা চাচা বা মূলের কোনো পুত্র সন্তান।

কোরআনের ভাষ্য, 'অতপর যদি মেয়ে দুইয়ের অধিক হয় তবে তাদের জন্যে থাকবে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ।'

মেয়ে সন্তান দুইয়ের অধিক হলে এই আয়াত তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ ধার্য করছে। কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ শুধু দুই মেয়ের জন্যে সাব্যস্ত করাটা হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সূরার শেষ দিকের আয়াতে বর্ণিত দুই বোনের ওপর হুকুমের ওপর 'কেয়াস' (অনুমান) করে তা গ্রহণ করা হয়েছে।

যেই হাদীসের মাধ্যমে দুই মেয়ের মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওপর দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মালিক হওয়ার কথা তা নিম্নরূপ, ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা আব্দুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আ'কীল থেকে এবং তিনি জাবের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, একদিন সা'দ ইবনুর রাবীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এরা দুইজন হচ্ছে সা'দ ইবনুর রাবী'র মেয়ে। তাদের পিতা ওহুদের যুদ্ধের দিন আপনার সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছেন। তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে ফেলেছে, তাদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের বিয়ে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন। অতপর যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হলো, তখন

রসূল (স.) তাদের চাচা, সা'দের ভাইকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'তুমি সা'দের সম্পূর্ণ সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দুই মেয়েকে, এক অষ্টমাংশ তার স্ত্রীকে দিয়ে দাও। আর বাকী সম্পদ তুমি রেখে দাও।'

সা'দের দুই মেয়েকে রসূলুল্লাহ (স.) তার সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দেয়াই এ কথার পরিচায়ক যে, মেয়ে দুই বা ততোধিক হলে তাদের অংশ হবে দুই তৃতীয়াংশ।

উপরোক্ত বন্টনের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, যখন অপর আয়াতের দুই বোনের হুকুম নাযিল হয়,

'যদি মৃতের শুধু দুইজন বোন থাকে তবে তাদের উভয়ের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ',

তখন এর ওপর কেয়াস করে দুই মেয়ের হুকুম নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এক মেয়েকে এক বোনের সমতুল্য ধরা হয়েছে।

সন্তান সন্ততিদের অংশ বর্ণনার পর পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত অবস্থায় সন্তান সন্ততি থাকুক বা নাই থাকুক। এরশাদ হচ্ছে,

'মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ থাকবে, যদি মৃতের কোনো পুত্র সন্তান থাকে। কিন্তু যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই শুধু তার ওয়ারিস হয় তবে মায়ের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ এবং যদি ভাই থাকে তবে তার মায়ের জন্যে থাকবে এক ষষ্টাংশ।'

পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা থাকতে পারে তা এই,

১. সন্তান সন্ততিদের সাথে তাদের পিতা-মাতা প্রত্যেকেই এক ষষ্টাংশের ওয়ারিস হবে। বাকী সম্পদের ওয়ারিস পুত্র সন্তান অথবা পুত্র সন্তানরা হবে, তার সাথে মৃত এক বোন অথবা একাধিক বোন এই মূল সম্পদের ভিত্তিতে শরীক হবে- 'একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান।' যদি মৃতের এক মেয়ে ছাড়া অন্য কোনো সন্তান না থাকে, তবে উক্ত মেয়ে পাবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্টাংশ। নিকটাত্মীয় (আছাবা) হওয়ার দরুন পিতা অবশিষ্ট ষষ্টাংশ পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পিতার দু'টি অংশ একটি পিতার নির্ধারিত অংশ, অপরটি 'আছাবা' (সরাসরি সম্পর্কযুক্ত) হওয়ার অংশ। মৃতের দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকলে তারা সমস্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক ষষ্টাংশ পাবে।

২. যদি মৃতের কোনো সন্তান, ভাই, স্বামী বা স্ত্রী কেউ না থাকে তাহলে পিতা-মাতাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। সে ক্ষেত্রে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। 'আছাবা' হওয়ার দরুন পিতা অবশিষ্ট বাকী অংশ। সুতরাং পিতা পাবে মাতার দ্বিগুণ। মৃতের ওয়ারিস পিতা-মাতার সাথে যদি স্বামী বা স্ত্রী থাকে, তবে স্বামী পাবে অর্ধেক সম্পত্তি, আর যদি স্ত্রী থাকে তবে সে পাবে এক চতুর্থাংশ। মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মতভেদ অনুসারে এ অংশ সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হতে পাবে অথবা স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্টাংশে এক তৃতীয়াংশ হতে পারে। মাতা তার অংশ নেয়ার পর পিতা অবশিষ্ট অংশের মালিক হবে এ শর্তে যে, তার অংশ মায়ের অংশ থেকে কম হবে না।

৩. যদি পিতা-মাতার সাথে একাধিক সহোদর, বৈপিত্রেয় অথবা বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তবে সে ভাইরা কিছুই পাবে না। কেননা পিতার হক তাদের আগে এবং পুরুষ সন্তানের পর সে নিকট 'আছাবা'। এতদসত্তেও তারা মাতাকে আড়াল করে এক তৃতীয়াংশ থেকে তার অংশ এক ষষ্টাংশে নামিয়ে আনবে। এক্ষেত্রে মা শুধু এক ষ্টাংশই পাবে, আর পিতা পাবে বাকী অংশ। যদি মৃতের

স্বামী বা স্ত্রী কেউই না থাকে, এমতাবস্থায় যদি মৃতের সন্তান বা একাধিক ভাই না থাকে, যেমনিভাবে মা এক তৃতীয়াংশ সম্পদ পায়, ঠিক তেমনিভাবে এক ভাই থাকলেও এক তৃতীয়াংশই পাবে। তাকে সে এ অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

উপরোল্লেখিত অংশসমূহ মৃতের ওয়ারিসরা তার ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধ করার পরই পাবে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'মৃত ব্যক্তি যা ওসীয়ত করে গেছে তা পূরণ করা ও ঋণ পরিশোধ করার পর।'

আল্লামা ইবনে কাসীর এ প্রসংগে তার তাফসীরে বলেন, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম সমাজ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, ঋণের দাবী ওসীয়তের আগে। সুতরাং ওসীয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।' ঋণকে প্রথমে পরিশোধ করার দাবী স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত। কারণ এটা অপরের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই মৃত ব্যক্তি যেহেতু সম্পদ রেখে গেছে সেহেতু করযদাতার প্রাপ্য পরিশোধ করা আগে প্রয়োজন। করযদারকে করযমুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করেছে। আসলে অন্তরকে পাপ কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত রাখা, আচার আচরণ এবং লেনদেনে আস্থা সৃষ্টি করা এবং দলবদ্ধ জীবনে শান্তি আনার ভিত্তিতেই মানব জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যে করযকে করযদারের ঘাড়ে এমনভাবে রাখা হয়েছে, তাকে পরিশোধ ব্যতিরেকে মৃত্যুর পরও সে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারছে না।

আবু কাতাদা (রা.) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনার এ ব্যাপারে কি অভিমত, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করি, তাহলে আমার এ জেহাদ কি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবে? প্রত্যুত্তরে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হাঁ, যদি কেউ ধৈর্য সহকারে সওয়াবের উদ্দেশ্যে জেহাদ করে এবং যুদ্ধের মাঠ থেকে পেছনে ফিরে না পালিয়ে আসে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে রসূল (স.) একই উত্তর দিলেন এবং বললেন, কিন্তু যদি কারো ঋণ থাকে! অতপর তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম, মালেক, তিরমিযী এবং নেসায়ী স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

আবু কাতাদা থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদিন তিনি রসূল (স.)-এর দরবারে জানাযার উদ্দেশ্যে এক মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসলেন। তখন রসূল (স.) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা নিজেরাই তোমাদের ঋণগ্রস্ত ভাইয়ের জানাযার নামায পড়ে নাও (আমি পড়াবো না)। তখন আবু কাতাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ দায়িত্ব আমার ওপর। রসূল (স.) বললেন, তুমি তা পরিশোধ করবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন হাঁ, আমি তা পরিশোধ করবো। তখন রসূল (স.) তার জানাযার নামায পড়ালেন।

অপরদিকে ওছীয়তও পুরা করতে হবে যেহেতু মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর ওছীয়তের ব্যবস্থা এ জন্যে রাখা হয়েছে যে, যেখানে এক ওয়ারিসের কারণে অন্য কেউ এমনিই বঞ্চিত হয়। কখনো কখনো বঞ্চিতরা অভাবগ্রস্ত হয় আবার কখনো তাদের এবং উত্তরাধিকারদের মাঝে সম্পর্ক প্রগাঢ় করার দরকার হয় এবং হিংসা বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তাই নিরসনে পারিবারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে- যাকে আপোষের মধ্যে আনা জরুরী। এক্ষেত্রে এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, ওয়ারিসের জন্যে এক-তৃতীয়াংশের উর্ধে ওসীয়ত করা যাবে না। এখানে এই বিষয়ে গ্যারান্টি ও নিরাপত্তা রয়েছে যে উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করলেই ওসীয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারদের ওপর যুলুম করতে পারবে না এবং পুরো সম্পত্তি যেমনি খুশী তেমনি কাউকে দিয়েও যেতে পারবে না।

আয়াতের শেষের দিকে এ ব্যাপারে কয়েকটি উদ্দেশ্যের বর্ণনা এসেছে।

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। ওসব রহস্য সম্পর্কে তার জানা আছে।'

প্রথম বর্ণনা হচ্ছে ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আত্মার প্রশান্তির জন্যে কোরআনের দৃষ্টিভংগী বলা। কেননা এমন লোকও আছে যেখানে পৈতৃক টান তাদেরকে পিতার ওপর পুত্রকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত করে। কেননা পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে বেশী। তাদের মাঝে অবশ্য এমন লোকও আছে যারা নৈতিক ও চারিত্রিক অনুভূতির মাধ্যমে এ দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হয়। এ কারণে সে পিতাকে প্রাধান্য দেয়। অপরদিকে এমন লোকের অস্তিত্বও রয়েছে যে স্বাভাবিক দুর্বলতা ও নৈতিক অনুভূতির মাঝে দোদুল্যমান থাকে। কখনো পরিবেশ ঐতিহ্যগত কারণে নির্ধারিত দিক-নির্দেশনা চাপিয়ে দিতে চায়। উত্তরাধিকারের বিধান যখন নাযিল হয়েছে তখন কেউ কেউ এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর কিছু কিছু দিকের প্রতি আমরা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। অতপর আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির অন্তরে আল্লাহর নির্দেশ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করার একটা প্রশান্তি ঢেলে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর। বান্দারা জানেন না যে তাদের আত্মীয়স্বজনদের মাঝে কে কতোটুকু পাবে কিংবা কোনটা তাদের জন্যে বেশী উপকারী।

এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারী তা তোমরা জানো না।'

দ্বিতীয় হচ্ছে এর মূল বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার প্রসংগটি। কারণ এটা কোনো মনগড়া বা আত্মীয়তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, বরং এটা হচ্ছে দ্বীন ও বিধান সংক্রান্ত বিষয়।

'এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ।'

আল্লাহ তায়ালা পিতা পুত্র উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের রেযেক ও সম্পদ দান করেছেন। তিনিই সব নির্ধারণ করেন। তিনিই সব বন্টন করেন। তিনিই এর বিধান রচনা করেন। মানুষের বিধান রচনা করার এবং নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাদের স্বার্থটাও ঠিক মতো চিনে না।

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সব রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত।'

আর শেষে এসে যেটা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে তৃতীয় বক্তব্য, এর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সব ফয়সালা মানুষের স্বার্থে আর এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এটা এমন স্বার্থ যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালাই বিধান রচনা করার জ্ঞান, অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনিই হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। মানুষ তা ভালো করে জানেও না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের অংশ নির্ধারণ করেন। কারণ তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়। আর মানুষ নিজেদের কামনা বাসনার অনুসরণ করে।

মীরাসের বিষয়টি শেষ করার পূর্বে এভাবেই সতর্কতা ও সাবধানবানী এসেছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে এই বিধান, এই আইন কানুন ও নিয়মাবলীর উৎস কোনো মানুষ নয় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আর তিনিই হচ্ছেন বিশ্বাস ও আকীদাগত কেন্দ্রবিন্দু, যা দ্বীনের গোটা কাঠামো নির্ধারণ করে। আল্লাহর কাছে বিচার ফায়সালার জন্যে যাওয়া, তার থেকেই তা গ্রহণ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা, 'এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সব রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

অতপর আল্লাহ তায়ালা এ পর্যায়ের অবশিষ্ট কয়েকটি কথাও বর্ণনা করছেন।

'আর তোমাদের অংশ হবে অর্ধেক যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। .... আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে সে সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও তোমাদের করে আসা ওসীয়তের পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।' (আয়াত ১২)

এখানে বর্ণনাভংগি খুবই স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যদি তার ছেলে মেয়ে অর্থাৎ কোনো সন্তান না থাকে। তবে স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর যদি সন্তান থাকে, ছেলে হোক বা মেয়ে এক বা একাধিক- তবে স্বামী সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। স্ত্রীর ছেলেসন্তানরাও নিজ সন্তানের অংশ অর্ধেক থেকে এক চতুর্থাংশে নামিয়ে আনবে। তদ্রূপ স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসের সন্তানরাও স্বামীর অংশ অর্ধেক থেকে এক চতুর্থাংশে নামিয়ে আনবে। মৃতের ঋণ পরিশোধ ও ওসীয়ত পূরণ করার পর তার বাকী সম্পত্তি ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করা হবে।

স্ত্রীর দুই হোক বা তিন বা চার অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে একই স্ত্রীর সমান, আর সকলেই এক চতুর্থাংশ অথবা এক অষ্টমাংশে শরীক হবে।

এমন ওয়ারিশ যার পিতা বা সন্তান কোনোটাই নেই

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বশেষ বিধান হচ্ছে, 'কালালা'র বিধান। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি কোনো পিতা পুত্রহীন পুরুষ বা নারী সম্পদ রেখে মারা যায়.... সে ওছীয়ত পূরণ করা ও ঋণ পরিশোধ করা এবং তাকে অনিষ্ট না করেই এটা করতে হবে। (আয়াত ১২)

কালালার অর্থ, যে মৃতের পিতা বা সন্তান নেই অর্থাৎ যার পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী কেউ নেই। 'কালালা' বলা হয় মৃতের এমন ওয়ারিসকে– যারা মৃতের উর্ধতন বা অধস্তন কেউ নয়। এদের সাথে মৃতের সম্পর্ক নিকটতম নয়। এ সম্পর্কটা আসল সম্পর্কের মতো নয়, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে 'কালালা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে আমার নিজ অভিমতটুকু ব্যক্ত করবো, যদি তা সঠিক হয় তবে বুঝতে হবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তিনি বললেন, 'কালালা' হচ্ছে সে ব্যক্তি যার সন্তান ও পিতা কেউ নেই। অতপর যখন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) চলে গেলেন তখন হযরত ওমর ফারুক (রা.) বললেন, আমি এক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দিকের অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করতে লজ্জাবোধ করছি, ইবনে জরীর ও অন্যান্যরা উক্ত হাদীসটি সা'বী থেকে বর্ণনা করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে লিখেন, এমনিভাবে আলী ও ইবনে মাসউদ এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে আব্বাস ও যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সা'বী আন নাখায়ী, হাসান, কাতাদা, জাবের বিন যায়েদ এবং হাকামও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মদীনা, কুফা ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামরাও একই কথা বলেছেন। এরা তার ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

'যদি কোনো পিতা-পুত্রহীন পুরুষ বা নারী কিছু সম্পদ রেখে মারা যায় এবং যদি তার এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে তাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্যে উক্ত সম্পদের এক ষষ্টাংশ এবং তারা যদি অধিক হয় তবে তা তার এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে।'

এখানে মৃতের বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি তারা সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই বোন হয় তাহলে তারা এই সূরার শেষ আয়াতের বর্ণনানুসারে ওয়ারিস হবে। একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান পাবে। পুরুষ হোক বা মহিলা তাদের প্রত্যেকে এক ষষ্টাংশ

নয়। অত্র আয়াতের বিধান বৈপতিত্রেয় ভাই বোনদের জন্যে নির্ধারিত। কেননা তারা পুরুষ বা মহিলা প্রত্যেকেই নির্ধারিত অংশ এক ষষ্ঠমাংশের ওয়ারিস হবে আছাবার অংশ নয়। আর তা হচ্ছে পুরো সম্পত্তি অথবা কোরআনে বর্ণিত নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর যা অতিরিক্ত থাকে তা নিয়ে নেয়া।

'যদি তারা অধিক হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে।'

ওয়ারিসের সংখ্যা ও প্রকার যতো বেশীই হোক না কেন এতে কোনো তারতম্য হবে না। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে, তারা সমতার ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশে এই শর্তে অংশীদার হবে, এক পুরুষ দুই মহিলার অংশের সমান পাবে। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই এখানে গ্রহণযোগ্য। কারণ এটা সেই নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা এই আয়াতের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে তাদের উভয়েই পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠমাংশ পাবে।'

সুতরাং বৈপিত্রেয় ভাই বোনরা বিভিন্ন দিক থেকেই অপরাপর উত্তরাধিকারদের থেকে স্বতন্ত্র।

১. তারা পুরুষ ও মহিলার অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান।

২. তারা উত্তরাধিকারী হবে না, কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি এমন হয় যে, তার সন্তান ও পিতা না থাকে, তাহলে তারা পিতা, দাদা, নিজ সন্তান এবং ছেলের সন্তানের বর্তমানে ওয়ারিস হবে না।

৩. বৈপিত্রেয় ভাই বোন অধিক হওয়া সত্তেও তারা এক তৃতীয়াংশের বেশী পাবে না বরং তারা সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে এবং ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে তাতে সকলেই সমান হকদার হবে।

'সে যা কিছু ওসীয়ত করেছে তা পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর কারো অনিষ্ট না করে তারা বাটোয়ারা হবে।'

আর এমনিভাবে এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। মীরাসের এই অংশসমূহ আল্লাহর বিধান, আর তার উৎসও তিনি। এটা মানুষের মনগড়া কিছু নয় এবং মানুষের মনের কামনা-বাসনার বিষয়ও নয়, বরং তার উৎপত্তি হয়েছে জ্ঞান থেকে। সুতরাং তার অনুসরণ করা ওয়াজেব কেননা এটি উৎসারিত হয়েছে এমন এক উৎস ও সত্ত্বা থেকে, একমাত্র যার হাতে রয়েছে বিধান রচনা করা ও তা বন্টন করার অধিকার। একমাত্র তাঁরই রয়েছে নির্ভুল জ্ঞান।

শেরেকের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতি যার ওপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা থেকেই সব কিছু গ্রহণ করার নীতি। অন্যথায় এটা আল্লাহকে অস্বীকার করা, আর অবাধ্য হওয়া এবং এই মহান দ্বীনের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়ারই নামান্তর। আর এটাকে এই সূরায় মীরাসের অংশ ও ওসিয়তের ওপর চূড়ান্ত ঘোষণা হিসেবে নিম্নেবর্ণিত দুই আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা একটা সীমারেখা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর আদেশ মতো চলে না ... তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (আয়াত ১৩)

এ সমস্ত বিধান যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান ও হেকমত মোতাবেক মৃতের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বন্টন করা এবং পারিবারিক সম্পর্ককে সুসংহত করা, পরিবারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রচনা করেছেন। তার সবগুলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নির্ধারিত সীমারেখা, যাকে তিনি এ ব্যাপারে ফয়সালাকারী এবং চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এই

বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্যই হচ্ছে বেহেশতে চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ ও বিরাট সাফল্য অর্জনের উপায়। যেমনিভাবে সীমালংঘন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর অবাধ্য হওয়া স্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ এবং অপমানজনক শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে আল্লাহর অসংখ্য বিধানসমূহের মাঝে মীরাসের বিধানের ন্যায় ছোটো একটি বিধান, যা তার অসংখ্য সীমারেখার মধ্যে একটি। এই একটিমাত্র সীমারেখার অবাধ্যতার কারণে কেনইবা এতোসব জঘন্য পরিণাম বর্তাবে?

নিসন্দেহে বিষয়টি সে ব্যক্তির কাছেই খুব বড়ো বলে মনে হবে, যে সেই কাজের মাহাত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

এই সূরার অসংখ্য আয়াতে এই (মীরাছের) বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, যার বর্ণনা সামনে আসছে। আমি সূরার ভূমিকাতেও এদিকে কিছুটা আলোকপাত করেছি। সে সমস্ত আয়াত দ্বীনের অর্থ, ঈমানের শর্ত এবং ইসলামের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছে। মীরাসের এই দুই আয়াতের শেষে যে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আয়াতের সন্নিবেশ হয়েছে সে আলোকেই বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

ইতিহাসের শুরু থেকে আল্লাহ তায়ালা মানবতার হেদায়াতের জন্যে যখন বিভিন্ন রসূলকে পাঠিয়েছেন তখন থেকে ইসলামসহ আল্লাহর যাবতীয় বিধানে যে বিষয়টি প্রশ্ন আকারে দেখা দিয়েছিলো তা হচ্ছে, এই যমীনের প্রভু কে? আর মানব জাতির প্রতিপালক কে? আর এই দুই প্রশ্নের জবাবে দ্বীন ও মানব জাতির সকল বিষয় এসে যাবে। তার একমাত্র উত্তর হবে সকল কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টিজগতে এর কোনো অংশীদার নেই এর নামই হচ্ছে ঈমান, ইসলাম এবং দ্বীন। অপরদিকে এই যমীনের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতিপালন যদি তাঁর সৃষ্ট জীবের অন্যান্য অংশীদার অথবা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য শরীকদের জন্যে নির্ধারণ করা হয়, এটাকেই বলে শেরেক বা প্রকাশ্য কুফরী।

পক্ষান্তরে প্রভুত্ব যদি একমাত্র আল্লাহর জন্যে নিবেদিত হয়, তার নাম আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব অর্জন করা, আনুগত্য করা এবং একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানব জাতির জন্যে তাদের জীবন বিধান বাছাই করেন, তাদের চলার বিধি-বিধান রচনা করেন, তিনি তাদের মাপকাঠি, মূল্যবোধ, তাদের জীবনের অবস্থা এবং তাদের সমাজের নিয়ম কানুন নির্ধারণ করেন। আল্লাহর বিধানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষে উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার কোনোই অধিকার নেই। এই অধিকার প্রভুত্বের জন্যে সংরক্ষিত।

অপরদিকে প্রভুত্ব অথবা প্রতিপালকত্ব যদি আল্লাহর সৃষ্টির কারো জন্যে পূর্ণাংগ বা আংশিকভাবে নিবেদিত হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে অংশীদারীত্ব প্রতীয়মান হয়। বান্দা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য অর্জন করতে চায়, তার দাসত্ব এবং আনুগত্য করতে চায় তাহলে তাই হবে শেরেক। উপরোক্ত কাজগুলো নানাবিধ আদর্শ, নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ এবং মাপকাঠির অনুসরণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে যা মানুষ নিজেরা রচনা করেছে। এই বিধান রচনা করতে গিয়ে তারা আল্লাহর কেতাব, তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের শরণাপন্ন হয়নি বরং তারা তার বদলে অন্যান্য জিনিসের শরণাপন্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চেয়েছে। সুতরাং তাদের দ্বীন, ঈমান ও ইসলাম কিছুই নেই বরং তাদের মাঝে যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে শেরেক, কুফুরী, ফাসেকী এবং অবাধ্যতা।

এক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। সুতরাং কোনো এক বিষয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া অথবা পুরো শরীয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা সমান কথা। কেননা ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যানুসারে শরীয়তের যে কোনো একটি বিধান যেমন দ্বীন- তেমন তার পুরো শরীয়তও দ্বীন। এক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম থেকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, মানব সমাজ যতোই দাবী করুক না কেন যে, তারা পুরাপুরি দ্বীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, আর তাদের মুখে যতোই উচ্চারিত হোক না কেন যে তারা মুসলমান। তাদের এই মুখের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। বরং তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য দেয়া হবে যে, প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্ব আল্লাহর জন্যে নিরংকুশ করা হয়েছে নাকি তাতে আল্লাহর সাথে সৃষ্ট জীবের শরীক করা হয়েছে কিংবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সৃষ্ট জীবের কাউকে আইন দাতা, বিধান দাতা, প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্বের জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছে।

এখানে বর্ণিত অবস্থাটি বাস্তব সত্য, যার প্রতি এই শেষ কথাটি ইংগিত করছে এবং তা নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যথা ওয়ারিসদের মাঝে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ বন্টন। এই বাস্তব সত্য, যার ওপর এই সূরার অসংখ্য আয়াত নির্ভর করছে। এই আয়াতগুলো এই বাস্তব সত্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট ও চূড়ান্তভাবে উপস্থাপন করেছে যা কোনো প্রকার বিবাদ-বিতন্ডা ও ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে না।

এই বাস্তব সত্যটি সে সমস্ত লোকের কাছেও স্পষ্ট হওয়া উচিত, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধারক ও বাহক হিসাবে দাবী করে, অথচ বাস্তবে সার্বজনীন ইসলাম থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে! আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আরো কিছু কথা

'পুরুষের জন্যে তাদের অর্জিত সম্পদে অংশ রয়েছে। তদ্রূপ মহিলাদেরও অংশ রয়েছে তাদের অর্জিত সম্পদে।'

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে,

'পুরুষের জন্যে রয়েছে দুই মহিলার অংশের সমতূল্য।'

উপরোক্ত দুইটি আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান সম্পর্কে আলোচনার পরও এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

ইসলামে উত্তরাধিকার বিধান হচ্ছে এমন ইনসাফপূর্ণ বিধান, যা প্রথমত তার প্রকৃতি, তার পারিবারিক ও মানবিক জীবনের সাথে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিষয়টি আমাদের কাছে তখনি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যাবে যখন আমরা উত্তরাধিকার বিধানকে পৃথিবীর অপরাপর বিধানের সাথে আমরা তুলনা করে দেখবো। ইতিপূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াতে মানুষরা তা দেখতে পেরেছে।

এটা এমন এক বিধান, যা মানুষের পারিবারিক নিরাপত্তার দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখে এবং পারিবারের প্রত্যেককে তার প্রাপ্যানুসারে অংশ বন্টন নিশ্চিত করে। সুতরাং পিতা-মাতার ন্যায় কোরআনে বর্ণিত নির্ধারিত অংশসমূহের অধিকারীদের অংশ দেয়ার পর মৃতের আছাবারাই হচ্ছে উত্তম ওয়ারিস, কেননা তারাই মৃতের নিরাপত্তা ও হেফাযতের নিকটতম ব্যক্তি এবং প্রয়োজনে তারাই মৃতের পক্ষ থেকে দিয়াত এবং জরিমানা আদায় করে। অতএব এ বিধান পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এটা এমন এক বিধান যা এক প্রাণ থেকে গোটা মানব পরিবারের গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ বিধান মহিলা ও শিশুকে নিছক মহিলা ও শিশু হওয়ার কারণে বঞ্চিত করে না, কেননা এ বিধান সবার কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এই বিধান নর-নারী একজনকে আরেকজনের ওপর অহেতুক প্রাধান্য দেয় না। তার পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বের পরিমাণানুসারে তাকে প্রাধান্য দেয়।

এটা এমন এক বিধান যা মানব প্রকৃতির অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তাই সন্তানকে তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ওপর প্রাধান্য দেয়, কেননা এই বিধান হচ্ছে নতুন প্রজন্মের সম্প্রসারণ ও তাদের জাতি সত্ত্বা সংরক্ষণের মাধ্যম। এতদসত্ত্বেও উর্ধতন উত্তরাধিকারী (পিতা-মাতা, দাদা-দাদী)দেরও আবার বঞ্চিত করা হয় না, একইভাবে অপরাপর আত্মীয়স্বজনদেরও বঞ্চিত করা হয় না। বরং প্রকৃতির মূল চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

এটা এমন এক বিধান যা মানুষের চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বভাবের সাথে তাকে এমনভাবে খাপ খাইয়ে দেবে যে সে তার উত্তরসূরী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং এভাবেই তাদের বংশধারা চলতে থাকবে। অধিকন্তু এই উত্তরাধিকার বিধান তার উত্তরসূরী বংশকে এ কাজের ফল থেকেও কখনো বঞ্চিত করাবে না। এর ফলে দেখা যাবে, তার পরিবার পরিজন পরবর্তীতে তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের উত্তরাধিকারী হবে। আর এই আশ্বাসই তাকে বেশী বেশী পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করবে এবং মুসলিম উম্মার জন্যে তা অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা বয়ে আনবে।

পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এটা এমন এক বিধান যা নির্জীব সম্পদকে প্রজন্মের মাঝে সুষম বিবরণ ও বন্টনের নিরাপত্তা বিধান করে। সুতরাং এটা সম্পদের স্ফীতি এবং অধিক পরিমাণ সম্পদ কিছুসংখ্যক লোকের হাতে একত্রিকরণের কোনো সুযোগকে অব্যাহত রাখেনি, অথচ অপরাপর বিধি-বিধানেই তাই কিন্তু রয়েছে। কিছু বিধানে এই উত্তরাধিকারকে শুধু বড়ো ছেলের জন্যে সংরক্ষণ করে অথবা তাকে নির্ধারিত কিছু লোকের মাঝে সীমিত করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই এখানে এই বন্টনের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। অবশ্য এ হস্তক্ষেপের মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়, কেননা মানুষের মনে লোভ-লালসা এবং কৃপণতার ব্যাধি রয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পদের স্থায়ী এই বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিতরণ এর মাধ্যমে এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় যে এতে মানবীয় প্রকৃতির অনেকগুলো সমস্যার একসাথে সমাধান হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও মানুষের বিধানের মৌলিক পার্থক্য।

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج
فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ
اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا
فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ
لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا
الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

রুকু ৩

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্ম নিয়ে আসবে তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চার জন লোক যদি (ইতিবাচক) সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না মৃত্যু এসে তাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন। ১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা শাস্তি দেবে, (হাঁ) তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু। ১৭. আল্লাহ তায়ালার ওপর শুধু তাদের তাওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা ভুলবশত গুনাহের কাজ করে, অতপর (জানামাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী। ১৮. আর তাদের জন্যে তাওবা (করার কোনো অবকাশই) নেই, যারা (আজীবন) শুধু গুনাহের কাজই করে, এভাবেই (গুনাহের কাজ করতে করতে) একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন সে বলে (হে আল্লাহ), আমি এখন তাওবা করলাম, (আসলে) তাদের জন্যেও (কোনো তাওবা) নয় যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا
وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের জন্যে কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের পণ্য বানানো বৈধ নয়, (বিয়ের সময় মোহর হিসেবে) যা তোমরা তাদের দিয়েছো তার কোনো অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে তোমরা তাদের আটক করে রেখো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোনো ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত না হয়, তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো, এমনকি তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো, এমনও তো হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না তার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন। ২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীকে আরেকজন স্ত্রী দ্বারা বদল করার সংকল্প করেই নাও, তাহলে (মোহর হিসেবে) বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিলেও তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ো না; তোমরা কি (তাদের ওপর মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছো? ২১. তোমরা (মোহরানার) সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিভিন্নভাবে) তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছো, (তাছাড়া এর মাধ্যমে) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলো (যা তোমরা ভেংগে দিয়েছো)। ২২. নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের পিতা (পিতামহ)-রা বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না, (হ্যাঁ, এ নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এটি (আসলেই) ছিলো এক অশ্লীল (নির্লজ্জ) কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

রুকু ৪

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইদের মেয়ে, বোনদের

الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ

نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز

فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ

الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

মেয়ে, (আরো হারাম করা হয়েছে) সেসব মা– যারা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ (খাওয়ার সাথী) বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ঔরসজাত মেয়েরা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে, (অবশ্য) যদি তাদের সাথে তোমাদের (শুধু বিয়ে হয়ে থাকে কিন্তু) তোমরা কখনো তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই, (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে; (উপরন্তু বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর দুই বোনকে একত্র করাও (হারাম করা হয়েছে), তবে যা কিছু (এর) আগে সংঘটিত হয়ে গেছে (তা তো হয়েই গেছে, সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান।

তাফসীর

আয়াত-১৫-২৩

এই সূরার প্রথম অধ্যায়টি এ মাত্র সম্পন্ন হয়েছে, এই অংশটি পরিবার ও দলের গন্ডিতে এতীমদের জান মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করা ও তাকে সুবিন্যস্ত করার কাজটি আঞ্জাম দিয়েছে। পরিবারের গন্ডিতে উত্তরাধিকার বিধানটি আলোচিত হয়েছে। এসব কিছু মূলত এই বিধানকে তাদের মূল উৎসের দিকেই ফিরিয়ে নেয়, আর তা হচ্ছে, মানবতার জন্যে আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা, একই প্রাণ থেকে সমস্ত মানবকুলকে সৃষ্টি করার তাঁর ইচ্ছা, পরিবার ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে মানব সমাজকে প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিচার ফয়সালা বাস্তবায়ন করা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, পরিশেষে আনুগত্য ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে তাদের সকলকে প্রতিদান দেয়া।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজ জীবনকে সুবিন্যস্ত করা এবং তাকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে মুক্ত করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর এ মহৎ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে সমাজকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখা এবং নারী পুরুষের অশ্লীল কাজে মগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকার নীতিমালা প্রণয়ন করার মাধ্যমে। এর সাথে তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যে, ব্যক্তির জন্যে যে এসব কাজ থেকে ফিরে আসতে চায় এবং পবিত্র হতে চায়। সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

ও মহৎ রাখা, নারীকে তার দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা জাহেলী সমাজে নারীর অপমান, লাঞ্ছনা, কঠোরতা ও অত্যাচার উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলো। সমাজ যাতে একটি মযবুত সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সমাজের ভিত্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলাম সে ব্যবস্থাই করেছে। পরিশেষে এই অধ্যায়টি ইসলামী বিধানের হারাম ও হালাল বর্ণনার মাধ্যমে পরিবার জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেছে।

এই বর্ণনার মাধ্যমে এই সংক্রান্ত আলোচনা এই খন্ডে সমাপ্ত হবে।

ব্যভিচার দমনে কঠোর পদক্ষেপ

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো .... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।' (আয়াত ১৫-১৬)

মূলত ইসলাম তার স্বীয় পদ্ধতিতে সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে ইসলাম প্রথমে এখানে ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে সমাজ থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রাখার পন্থা বাতলিয়েছে, বিশেষ করে যাদের দ্বারা ব্যভিচারজনিত এ পাপটি সংঘটিত হবে, এরা আসলেই বিকৃত রুচিসম্পন্ন। হযরত লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরাও এক বিকৃত যৌন কাজে লিপ্ত হয়েছিলো, তারাও এক ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়। এখানে পুরুষদের কষ্টের প্রকার ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। ইসলাম সমস্ত ব্যাভিচারিণী মহিলা ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন পুরুষদের একই ধরনের শাস্তির বিধানের কথা ঘোষণা করেছে। আর তা হচ্ছে যেনার শাস্তি বেত্রাঘাত, যা কোরআনে সূরা আন নূর এ বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত বিধি বিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে দোষণ ও কলুষতা থেকে রক্ষা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।

প্রত্যেকটি অবস্থায় ও প্রত্যেকটি শাস্তির বিধানে ইসলামী শরীয়ত সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ধারণা কল্পনা ও সন্দেহের বশিভূত হয়ে বিচার করা দুষ্কর। কেননা গুরুত্বপূর্ণ শাস্তির বিধানসমূহ মানব জীবনে ব্যাপক ও ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো.... আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো পথনির্দেশ বলে না দেন।' (আয়াত-১৫)

কোরআনের এই বক্তব্যে পূর্ণ সূক্ষ্ম ও সতর্কতা বিদ্যমান রয়েছে, কেননা 'তোমাদের নারীদের মধ্যে থেকে' শব্দের মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে যাদের ওপর এই শাস্তি আরোপিত হবে। তদ্রূপ এই আয়াতটি 'তোমাদের মধ্যে থেকে' শব্দের মাধ্যমে মুসলিম স্বামীদেরকে নির্দিষ্ট করছে, যাদেরকে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনায় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ মুসলমান পুরুষদেরকে। সুতরাং কোরআনে করীমের এই বর্ণনানুসারে ব্যভিচার সংঘটিত ও প্রমাণিত হলে তাদের ওপর যে শাস্তি আরোপিত হবে তা এখানে নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে সেসব ব্যক্তিরাও নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যাদের কাছে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সাক্ষ্য চাওয়া হবে।

ইসলামে মুসলিম মহিলারা যখন কোনো ত্রুটি বা অপরাধে পতিত হয় তখন সেখানে অমুসলিম পুরুষদেরকে সাক্ষী হিসেবে তলব করে না। বরং মুসলিম সমাজের চারজন পুরুষকে তালাশ করে যারা এই সমাজে বসবাস করে, যারা এই বিধানের (ইসলামী বিধানের) আনুগত্য করে, তার নেতৃত্বের আনুগত্য করে, সর্বোপরি ইসলামী আইনের বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

বলে বিবেচিত হয়। তারা জানে তাতে কী আছে এবং তা কার কাছ থেকে এসেছে। চার জন মুসলিম সাক্ষী প্রয়োজন, 'তোমাদের মধ্যে থেকে' শব্দ দ্বারা তাই বুঝা গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে অমুসলিমের সাক্ষী বৈধ নয়, কেননা সে মুসলমান মহিলার ইযযত আবরুর ব্যাপারে মোটেই নিরাপদ নয় এবং সে তার আমানতদারী এবং আল্লাহ ভীতির ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ত নয়, অধিকন্তু এই সমাজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা এবং তাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থ ও মর্যাদার ব্যাপারেও সে নিরাপদ নয়। সুতরাং ইসলাম বিরোধী বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সমাজে ইসলামী বিচার ফয়সালা প্রবর্তন করলে তথা ব্যভিচারের শ্রেণীভেদে বেত্রাঘাত অথবা পাথর মারা চালু করলে সর্বোপরি এই অপরাধের যথার্থ সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলে সমাজের যাবতীয় নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকবে।

'অতপর যদি তারা (এই মর্মে ইতিবাচক) সাক্ষ্য প্রদান করে (যে তারা সত্যই যেনা করেছে) তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখো।'

যাতে ব্যভিচারিণী মহিলারা সমাজে মিশে গিয়ে সমাজকে কলুষিত ও দূষিত না করতে পারে। যাতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং অন্য কোনো প্রকার কর্মতৎপরতায়ও জড়িত না হতে পারে।

'যে পর্যন্ত মৃত্যু তাকে তুলে না নেয়।'

ঘরে আবদ্ধ ও আটক থাকাবস্থায়ই তাদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে নতুন কোনো আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এই আইনই বলবৎ থাকবে।

অর্থাৎ যতোক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থার অথবা তাদের শাস্তির এই বিধানের পরিবর্তন না করেন বা তিনি তাঁর মর্জি অনুসারে তাদের ব্যাপারে কোনো ফয়সালা নির্ধারণ না করেন। এই কোরআনী ভাষ্যটি এই কথার সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে যে, যে শাস্তির বিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে তা কোনো স্থায়ী চূড়ান্ত নির্দেশ নয়, বরং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির নির্দেশ। এ ব্যাপারে স্থায়ী একটি নির্দেশ আসার কামনা করা হচ্ছিলো। বাস্তবে ঘটেছিলোও তাই। এক সময় সে নির্দেশ পাল্টে গেলো, যার বর্ণনা সূরা আন নূর ও রসূল (স.)-এর হাদীসে এসেছে। অবশ্য অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে এ কঠোর নিরাপত্তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.) বলেন, মোহাম্মদ বিন জাফর (র.) উবাদা বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর অবস্থা এমন ছিলো, যখন তাঁর কাছে ঐশী বাণী নাযিল হতো, কিংবা তার প্রভাব তার ওপর পড়তো তখন তিনি অস্থির হয়ে যেতেন এবং তাঁর চেহারার রং পাল্টে যেতো।

সমকামিতার শাস্তি

পরিশেষে একদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর ওহী নাযিল করেন। ওহীর সে বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমরা এ ব্যাপারে আমার থেকে ফয়সালা ও নির্দেশ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পথনির্দেশ করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকো। আর যদি কুমার কুমারী উক্ত কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে একশত বেত্রাঘাত করে এক বৎসরের জন্যে তাদের দেশান্তরিত করো। উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য সুনান প্রণেতারা বিভিন্ন সূত্রে কাতাদা, ওবাদা বিন সামেত, তিনি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স.) এ অপরাধের অপরাধীদের পাথর মেরেছেন,

বেত্রাঘাত করেননি। তদ্রূপ রসূলুল্লাহ ইহুদী পুরুষ ও মহিলার ঘটনায়ও একই ফয়সালা করেছেন যাদের ব্যাপারে তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিলো। অতএব, রসূল করীম (স.)-এর ব্যবহারিক কাজও এ কথার পরিচায়ক যে, এটাই এ পর্যায়ে সর্বশেষ নির্দেশ।

সংশোধন হলে শাস্তির প্রয়োজন নেই

'তোমাদের মধ্যে থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো। অতপর যদি উভয়ে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী দয়ালু।'

আল্লাহর ভাষ্য, 'তোমাদের মধ্যে থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়।'

এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে, তারা হচ্ছে সে দু'জন পুরুষ যারা বিকৃত যৌন কাজে লিপ্ত হয়, এটা মোজাহেদ (র.)-এর অভিমত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস সাঈদ বিন যোবায়র প্রমুখ ব্যক্তি কোরআনের ভাষ্য 'তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো'- এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'গাল মন্দ করা, অপমান ও অপদস্থ করা এবং জুতা মারা।

'অতপর যদি তারা উভয় তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করা' বলতে ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভংগি, কাজ এবং ব্যবহারে মৌলিক পরিবর্তনকে বুঝায়, অতপর এমনটি প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তি বন্ধ হয়ে যাবে এবং জনসমষ্টি এই দুই বিকৃত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির শাস্তি থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হচ্ছে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার অর্থ, অর্থাৎ শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকা।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

এই আয়াতে গভীর সূক্ষ্ম একটি ইংগিত রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, যিনি শাস্তির বিধান রচনা করেছেন তিনিই তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করলে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ করছেন। সুতরাং শাস্তির বেলায় মানব সমাজের কাছে ক্ষমা নামক কিছুই নেই। বরং তারা এখানে শুধু আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাই বাস্তবায়ন করে। তিনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাওবা কবুল করেন এবং তাওবাকারীদের ওপর করুণা বর্ষণ করেন।

এই সূক্ষ্ম ইংগিতের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বান্দাদের অন্তরকে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মিলিয়ে দেয়া এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের সাথে মেলামেশা করার জন্যে তার প্রতি নির্দেশনা দেয়া। যখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু তখন বান্দাদের উচিত তারা যেন পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও দয়াবান হয়। কেননা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তাওবা করে তারা নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে। অপরাধের ব্যাপারে নমনীয়তা কিংবা ব্যভিচারে লিপ্তদের প্রতি করুণা করা নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে করুণার প্রশ্নই ওঠে না। বরং করুণা হচ্ছে তাওবাকারী, পবিত্র এবং সংশোধিত ব্যক্তিদের প্রতি। তাদেরকে সমাজে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে তাদের অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিয়ে লজ্জা না দেয়া ও দোষারোপ না করার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই নমনীয়তা। যখন অপরাধীরা তাওবা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করেছে তখন অপরাপর মুসলমানদের উচিত, তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, নতুন করে সম্মানজনক জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা এবং তাদের অতীত অপরাধকে ভুলে যাওয়া। যাতে করে তাদের অন্তকরণে আগের অপরাধের শাস্তির ভয় উদ্রেক না হয়। বিশেষ করে যখন তারা সমাজের সাধারণ মানুষদের সম্মুখীন হয় তখন যেন আগের পরিস্থিতির কথা কেউ তাদের স্মরণ না করায়। মুসলমানরা যদি তাওবা করার পরও সমস্ত অপরাধীদের সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ না করে তাহলে তারা হতাশায় ভেংগে পড়ে

পুনরায় পাপ পংকিল জীবনে ফিরে যাবে। যাতে তাদের দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস হবে, ঈমানের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, সমাজ দূষিত হবে, এ সাথে তাদের নিজেদের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে।

অতপর উপরোক্ত শাস্তির বিধানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রসূলুল্লাহ (স.) থেকে সরাসরি এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা যাদেরকে লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায় অশ্লীল ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, তাদের উভয়কে অর্থাৎ সমকামী ব্যক্তিদ্বয়কে হত্যা করো।

রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা

অশ্লীলতা থেকে মুসলিম সমাজকে পবিত্র করার জন্যে ইসলামী বিধানের গুরুত্ব এই নির্দেশসমূহে স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের গুরুত্ব প্রদানের কাজটি ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই চলে আসছে। এ কারণে ইসলাম এক্ষেত্রে মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করেনি। তদ্রূপ সেই শাসন ক্ষমতার অপেক্ষাও করেনি, যা আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাই এক সময় ইসলামী বিধান প্রয়োগের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে। আমরা যদি কোরআনে করীমের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা মক্কী সূরা আল ইসরাতে যেনাতে লিপ্ত হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা যেনার কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।'

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল মোমেনূনে আল্লাহ তায়ালা এরূপ নির্দেশ করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'মোমেনরা সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্র এবং যারা নিজেদের যৌনাংগসমূহের হেফাজত করে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না।'

হুবহু এই উক্তিটি আল্লাহ তায়ালা সূরা 'আল মায়ারেজে'ও পুনরাবৃত্তি করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ নির্দেশগুলো যখন আসছিলো তখন পর্যন্ত মক্কা মোকাররামাতে ইসলামী রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা মক্কী জিন্দেগীতে এই অপরাধের শাস্তির কোনো ইসলামী রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, তখনই আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত অপরাধের শাস্তির বিধান রচনা করে সমাজকে কলুষমুক্ত করা এবং অপরাধ প্রতিহত করার জন্যে শুধু নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশনাকে যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ ইসলাম হচ্ছে একটি বাস্তব জীবন বিধান। তিনি তখন দেখালেন যে, শুধু নিষেধাজ্ঞা নির্দেশনাবলী এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তার সাথে আরো দেখানো হলো যে দ্বীন (জীবন বিধান) রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দ্বীন হচ্ছে এমন এক জীবন বিধান বা বিধি ব্যবস্থা যার ওপর মানুষের ব্যবহারিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। দ্বীন কোনো আত্মিক অনুভূতির নাম নয়– যা কর্তৃত্ব, বিধান, নির্ধারিত আদর্শ এবং নির্দিষ্ট সংবিধান ছাড়া মানব অন্তরে অবস্থান করবে।

যেদিন থেকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস মক্কার কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরে দৃঢ়মূল হলো তখন থেকেই এই আকীদা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল জাহেলিয়াতকে প্রতিরোধ করতে লাগলো এবং তা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করলো, অতপর যখন মদীনাতে নির্ধারিত শরীয়তের ওপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যমীনে আল্লাহর বিধান সীমিতকালে হলেও কায়েম হলো তখন ইসলাম স্বীয় উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর পাশাপাশি শাস্তি ও সংশোধনের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে সমাজকে হেফাযত করার কাজে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে লাগলো।

ইসলাম শুধু অন্তরের আবেগপূর্ণ বিশ্বাসের নাম নয় বরং এটি তার পাশাপাশি এমন এক শাস্তি ও ক্ষমতার নাম যা আবেগপূর্ণ কিছু বিশ্বাসকে বাস্তব জীবনেও প্রয়োগ করে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা সমস্ত জীবন বিধানের অবস্থা ছিলো এক ও অভিন্ন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় এই যে, কিছু লোকের অন্তরে ভুলবশত এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এমন কিছু আসমানী দ্বীন রয়েছে যা বিধান, ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্ব ক্ষমতা ছাড়াই বুঝি নাযিল হয়েছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এমনটি কখনো হয়নি। দ্বীন হচ্ছে জীবন বিধান, একটি ব্যবহারিক বাস্তব বিধান। যেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে, একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই সে এ বিধান গ্রহণ করবে, তাঁর থেকে আকীদাগত চিন্তা চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করবে। এভাবে তারা তাঁর থেকেই বিধি বিধান গ্রহণ করবে যা তাদের বাস্তব জীবনকে সুবিন্যস্ত করবে। এই বিধি বিধানের ওপর যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাকে ক্ষমতা বলে মানব জীবনে প্রয়োগ করবে এবং এই বিধানের বহির্ভূত এবং এই বিধানের বিরোধীদেরকে শিক্ষা ও শাস্তি দুটোই দেবে। এই কর্তৃত্ব সমাজকে জাহেলিয়াতের পংকিলতা ও অপবিত্রতা থেকে হেফাযত করবে। যাতে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহরই নৈকট্য প্রমাণিত হয়। সমস্ত দ্বীন হবে নিরংকুশভাবে আল্লাহর জন্যেই যেখানে কোনো অবস্থাতেই এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া উপাস্য কেউ থাকবে না। যেমন অন্যান্য মতবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যারা মানুষের জন্যে বিধান রচনা করে এবং তাদের জন্যে মূল্যবোধ, মাপকাঠি, বিধি বিধান এবং নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে। অতএব, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তিনি-যিনি ওপরের বর্ণিত সব কিছুই রচনা করেন। আর আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে থেকে কেউ যদি উপরোক্ত বিধি বিধান রচনা করার ক্ষমতা আছে বলে দাবী করে সে যেন এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজের জন্যে মানুষের ওপর প্রভুত্ব দাবী করলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এমন কোনো দ্বীন নেই যা মানুষকে প্রভু হওয়ার এই দাবী করার অনুমতি দেবে। শুধু আবেগপূর্ণ বিশ্বাস হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো বিধান আসেনি, যাতে ব্যবহারিক বিধান ও কর্তৃত্বের কথা মজুদ নেই।

ইসলাম এমনিভাবে বিধান রচনা করে, তার প্রয়োগে শাস্তি ও শিক্ষা দেয় এবং এর মাধ্যমেই সমাজকে পবিত্র করে। মদীনাতে ইসলাম তারই প্রকৃত প্রয়োগ করছিলো। আমরা ইতিপূর্বে এই সূরায় বর্ণিত নির্দেশাবলীতে এগুলো দেখতে পেয়েছি।

আল্লাহর ইচ্ছানুসারে নানা পরিবর্তিত অবস্থায় এ সমস্ত বিধান এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। অশ্লীলতা ও ব্যভিচার প্রতিরোধ করার বাহ্যিক কড়াকড়ি এবং তা থেকে সমাজকে পবিত্র করার গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে এখানে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আসলে সর্বকালে জাহেলিয়াতেরই এটা ছিলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা আমরা বর্তমান জাহেলিয়াতেও দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে নিয়ম কানুন ও নিয়ন্ত্রণহীন যৌন উচ্ছৃংখলতা ও পাশবিক আচরণ। উচ্ছৃংখল এই যৌন সম্পর্ককে তারা মনে করে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের মতে কট্টর গোঁড়া লোক ছাড়া কেউই এই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারে না এবং তার বিরুদ্ধাচরণও করতে পারে না।

জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা কিন্তু সার্বিক মানবিক স্বাধীনতার ব্যাপারে আবার উদারতা প্রকাশ করে, কিন্তু তারা তাদের এই পাশবিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সামান্যতম উদারতাও প্রকাশ করতে রাযি নয়। কখনো কখনো তারা সে স্বাধীনতা পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে সম্মত হয়। কিন্তু তাদের এই পাশবিক স্বাধীনতাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুমার্জিত করতে যারাই এগিয়ে আসে তারা তাদেরকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়।

জাহেলী সমাজসমূহে যাবতীয় যন্ত্র মাধ্যমগুলো নৈতিক বাঁধ ভেংগে ফেলে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃংখলা ধ্বংস করে মানব মনে পাশবিক কামনা বাসনাকে সুন্দর করে দেখানোর কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে এবং এর জন্যে চমকপ্রদ কিছু নাম রেখে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই যৌন স্পৃহাকে জাগ্রত করে। অতপর নিয়ন্ত্রণ ও বাধনহীন যৌন কাজের দিকে ঠেলে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা একে অপরকে সাহায্য করে, পরিবার ও সমাজের নিয়ম শৃংখলা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের বিধি বিধানকে অপমানিত করা, সুষ্ঠু প্রাকৃতিক আবেগ অনুভূতিকে নীচ ও হীন করা যা উলংগ কামনা বাসনা থেকে উৎসারিত হতে থাকে। এ সব কিছু জাহেলিয়াতের নীচ ও ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য বই আর কিছুই নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এগুলো থেকে মানুষের আবেগ অনুভূতি এবং মানব সমাজকে পবিত্র করার জন্যেই ইসলামের আগমন হয়েছিলো, আর সর্বযুগে ও সর্বকালে প্রত্যেক জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য ছিলো এগুলোই। যে ব্যক্তি জাহেলী আরবের প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কায়সের কবিতাগুলো পড়বে সে দেখবে গ্রীক ও রোমান কবিতার সাথে এর কোনো তফাৎ নেই। এসব কবিতার মাঝে যা সে খুঁজে পাবে তার দৃষ্টান্ত আধুনিক আরব ও অনারব জাহেলিয়াতের সাহিত্যে ও শিল্পে সর্বত্র মজুদ রয়েছে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আধুনিক ও প্রাচীন জাহেলিয়াতের রীতি নীতি, নারীদের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা, প্রেমিকদের নির্লজ্জতা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং সহ অবস্থানের উচ্ছৃংখলতা পর্যালোচনা করবে সে এ উভয়ের মাঝে একটা সাদৃশ্য ও সম্পর্ক খুঁজে পাবে। অধিকন্তু সে দেখতে পাবে এসবগুলো একই চিন্তা চেতনা থেকে উৎসারিত। এর জন্যে নানা সাদৃশ্যপূর্ণ বুলি ও শ্লোগানও একই ধরনের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যভিচার ও পংকিলতায় ভরপুর এ সমাজকে ধ্বংস করে দেয়ার মাধ্যমেই এ সভ্যতাগুলোর পাশবিক আচার-আচরণের সমাপ্তি হয়ে থাকে। এ দৃষ্টান্ত আমরা পুরাতন গ্রীক রোমান পারস্য এমনকি বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য দুনিয়ার সভ্যতাসমূহে দেখতে পাচ্ছি। এ সমস্ত সভ্যতা শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছা সত্তেও এখন তা পতন ও ধরাশায়ী হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা সেখানকার বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে চিন্তা ও অস্থিরতার মাঝে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এটা তারা ভালো করেই জানে যে, তারা এখন আর এই ধ্বংসাত্মক স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

এ ধরনের কঠোর ও নির্মম পরিণাম চোখে দেখা সত্তেও সর্বযুগে ও সর্বকালে জাহেলিয়াতের নিমজ্জিত মানব সমাজ হতাশার অতল গহ্বর ও জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যায়, তারা প্রয়োজনে তাদের সম্পূর্ণ মানবিক স্বাধীনতা হারানোকেও মেনে নিতে পারে। কিন্তু তারা তাদের এই পাশবিক স্বাধীনতার সামনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হোক এটা কোনোরকমেই গ্রহণ করতে পারে না। তারা দাসত্ব প্রথাকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে সম্মত হয় কিন্তু এই পাশবিক আচার আচরণের অধিকার হারাতে সম্মত নয়।

আসলে এর নাম স্বাধীনতা ও প্রগতি নয় বরং তা হচ্ছে জৈবিক আকর্ষণের দাসত্ব ও পশুত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। শুধু তাই নয়, বরং তারা তার চেয়েও অধম! প্রাণীরা এ ব্যাপারে প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের যৌন চাহিদার বিশেষ মুহূর্ত ও মওসুম থাকে, যা এই পশুকুল কখনো লংঘন করে না এবং তা কেবল বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং স্ত্রী জাতীয় প্রাণীটি বিশেষ মুহূর্তে ও মওসুম ছাড়া পুরুষ জাতীয় প্রাণীকে গ্রহণ করে না। আর পুরুষ জাতীয় প্রাণীটি স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর ওপর তখনই চড়াও হয় এবং তার সাথে মিলিত হতে চায়, যখন সে এজন্যে প্রাকৃতিকভাবেই প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে বুদ্ধি বিবেক দান করেছেন এবং তার বিবেককে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তারপরও মানুষ যখনই তার এই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় তখন সে তার বুদ্ধি বিবেকের

চাপের মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতপর সে তার সত্ত্বায় লুকায়িত প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হয় না। প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার চাহিদার দিকে ধাবিত হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাপ পংকিলতা থেকে সমাজকে পবিত্র করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে এমন আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যা তাদের এসব কিছুর বলগাহীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজন এমন কর্তৃত্বের যা উক্ত আকীদা বিশ্বাস থেকে উৎসারিত, এমন ক্ষমতার যা বেহায়া, নির্লজ্জ ও ব্যভিচারী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা ও শাস্তি দেবে, এভাবে মানব অস্তিত্বকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে এবং তাকে পশুত্বের নীচ গহ্বর থেকে উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে সম্মানিত মানুষের মর্যাদার আসীনে পুনরায় আসীন করাবে।

জাহেলিয়াতের মাঝে যে মানব সমাজ বসবাস করে তারা সঠিক আকীদা ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধান ছাড়াই জীবন যাপন করে। তাই পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতে ডুবন্ত বিবেকবান লোকেরা আজ মুক্তির জন্যে চিৎকার করছে, কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দিচ্ছে না। কারণ বাতাসে উড়ে চলা বাক্যসমূহের আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না, যার পেছনে কার্যকরী কর্তৃত্ব এবং শাস্তির বিধান নেই। গীর্জাগুলো চিৎকার করছে। ধর্মের ধারক বাহকরা চিৎকার করছে, কিন্তু তাদের ডাকেরও জবাব দেয়ার মতো কেউ নেই। হারিয়ে যাওয়া আকীদা বিশ্বাসের আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না, যার পেছনে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা তাকে হেফাযত করবে এবং তার নির্দেশ ও বিধি বিধানকে বাস্তবায়ন করবে। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত মানবগুলো অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নীচ গহ্বরের দিকে সবেগে ধাবিত হচ্ছে যেখানে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিয়ম নীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে আকীদা ও বিধান দিয়েছেন, তারও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

সভ্যতার এই ধ্বংসই হচ্ছে তার নিশ্চিত পরিণাম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে যতোই শক্তিশালী এবং তার ভিত্তিসমূহকে যতোই মযবুত মনে হোক না কেন, ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবেই। এমন অবস্থা দেখা দিলে সভ্যতা শুধু কল-কারখানা এবং তার উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

আমরা যখনই এই বাস্তবতার গভীরতা উপলব্ধি করি, তখন আমরা মানব জাতিকে ধ্বংস থেকে হেফাযত করার লক্ষ্যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার শাস্তির কঠোরতায় ইসলামের মাহাত্বের একটি বড়ো দিক উপলব্ধি করি, মানব জীবন তার এই মানবিক ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এমনিভাবে আমরা আবিষ্কৃত যন্ত্র ও মাধ্যমগুলোর অপরাধের ভয়াবহ একটি দিকও বুঝতে সক্ষম হই। এগুলো অশ্লীলতার প্রশংসা ও তার শোভা বর্ধন করা, পাশবিক কামনা বাসনাকে তার বাঁধন থেকে ছেড়ে দেয়া এবং তাকে কখনো শিল্প, কখনা স্বাধীনতা ও কখনো প্রগতি নাম দিয়ে মানব জীবনের ভিত্তিসমূহকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে দেখতে পাই। মানব জাতিকে ধ্বংস করার যতো মাধ্যম রয়েছে এর প্রত্যেক মাধ্যমকে তার মূল নাম- 'অপরাধের' সাথে নামকরণ করা উচিত। একইভাবে অপরাধের মোকাবেলা করার জন্যে শাস্তি ও উপদেশ দেয়ার জন্যে তাকে নিয়োজিত করা উচিত। ইসলাম এ কাজটাকে তার পরিপূর্ণ বিধানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে।

কখন তাওবা কবুল হয়

ইসলাম ভুল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত নর নারীদের সম্মুখে আশার দ্বারসমূহ বন্ধ করে না এবং সে তাদেরকে সমাজ থেকে বিতাড়িতও করে না। যারা তাওবা করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে চায় সে বরং তাদের জন্যে রাস্তা প্রশস্ত করে এবং নানা ধরনের মহৎ আচরণের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে। যখন তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে

তখন তাদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর ওপর ওয়াজেব হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্যে এর চেয়ে বড়ো করুণা আর কি হতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে.... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (আয়াত ১৭)

তারা কখনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাওবার সেই হুবহু আলোচনা এখানেও আসতে পারে। কিন্তু এই সূরার বর্ণনাভংগির উদ্দেশ্যের সাথে তা কিছুটা ভিন্ন, আর তা হচ্ছে তাওবার প্রকৃতি ও মাহাত্ম বর্ণনা করা। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যে তাওবা কবুল করেন এবং যাকে কবুল করা নিজের ওপর ওয়াজেব করেছেন, তা হচ্ছে সে তাওবা যা মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ মানুষ যখন পাপ পংকিলতার মাঝে নিমজ্জিত হওয়ার পর পুরোপুরি লজ্জিত হয় এবং নিজ কাজের জন্যে অনুশোচনা করতে গিয়ে পবিত্র হওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা তার মনে জাগে এবং সঠিক পথে চলার খালেছ নিয়ত করে, সর্বোপরি অনেক আশা ভরসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে- তখনই আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করেন। অতপর তাওবার পর তার অবস্থা এমন হয় যেন তার মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা হলো।

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতপর অনতি বিলম্বে তারা তাওবা করে। এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ।'

'যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে' এ ব্যাপারে ওলামাদের প্রায় সকলেই একমত যে 'জাহালত' অর্থ হেদায়াত থেকে পথভ্রষ্ট হওয়া তার সময় দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক। এ অবস্থায় যারা অনতিবিলম্বে তাওবা করে, তারা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যাদের সামনে মৃত্যু স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই তারা আল্লাহর দরবারে তাওবা করে। এই তাওবা হচ্ছে লজ্জিত হওয়া, পাপ এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া এবং নেক কাজের নিয়ত করা, আর এটাকেই বলা হয় মনের নতুন জীবন এবং মনের নতুন জাগরণ। এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী। সব রহস্য জানেন, তিনি তার সমস্ত কাজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সমাধান করেন, তাঁর দুর্বল বান্দাদেরকে পবিত্র সারিতে ফিরে আসার তিনি সুযোগ দেন, তাদেরকে তিনি কখনো প্রাচীরের পশ্চাতে ফেলে রাখেন না, তারা প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ হেফাযত ও দয়ালু আশ্রয়ের কামনা করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুর্বল বান্দাদের পেছনে ধাওয়া করেন না এবং তাদেরকে তাড়িয়েও দেন না, বিশেষ করে যখন তারা কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে বে-নিয়ায ও অমুখাপেক্ষী, তাদের তাওবা তাঁর কোনো উপকারে আসে না। বরং তা তাদের নিজেদেরই উপকারে আসে এবং তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজ ও তাদের ব্যক্তি জীবনকে এটা সংশোধন করে দেয়। অতপর তাওবা করে পাক সাফ হয়ে পবিত্র সারিতে ফিরে আসা তাদের জন্যে সহজ হয়।

'আর এমন লোকদের জন্যে ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তাওবা করছি।'

এই তাওবা হচ্ছে অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তির তাওবা, যাকে পথভ্রষ্টতা ও অপরাধ বেষ্টন করে আছে। সে এখন মুমূর্ষ অবস্থায় তাওবা করছে, যার পর পাপ কাজ ও অপরাধ করার সুযোগ নেই। কেননা এই তাওবা তার অন্তরে ও জীবনে কোনো স্থিরতা ও সততা সৃষ্টি করবে না এবং তার অন্যায় আকর্ষণেও কোনোপ্রকার পরিবর্তন সাধন করবে না।

আল্লাহ তায়ালা তাওবার দ্বার এ জন্যে উন্মুক্ত রেখেছেন, যাতে করে অপরাধীরা এর মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে, যেখানে তারা পথভ্রষ্টতার অস্থিরতা থেকে নিজেদের চৈতন্য ফিরে পাবে। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন- যেন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের পথভ্রষ্ট পাল থেকে এ জন্যে উদ্ধার করেছেন যেন তিনি তাদের আয়ু দীর্ঘায়িত করলে তারা সৎ কাজ করতে সক্ষম হয়।

'আর তাওবা নেই তাদের জন্যে, যারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।'

এটা এ জন্যে যে, তারা তাদের ও তাওবার মাঝে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তারা ক্ষমার যাবতীয় সুযোগ বিনষ্ট করে দিয়েছে।

'তাদের জন্যে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'

আল্লাহ তায়ালা অপরাধীদের জন্যে শাস্তির যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করে রেখেছেন, সে শাস্তি তাদের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষা করছে।

অপরাধীদের জন্যে আল্লাহর এই বিধান শাস্তির ক্ষেত্রে বড়োই কঠোর, আবার এ বিধান অপরাধীর জন্যেও তার দ্বার উন্মুক্ত রাখে, যাতে করে একটা ভারসাম্যতা রক্ষা পায় এবং তার প্রভাব মানব জীবনে এসে পতিত হয়, মূলত এ কাজটা অতীতে বা বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধানই করতে সক্ষম হয়নি।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে নারী প্রসংগ।

আরব জাহেলিয়াতসহ বিশ্বের যাবতীয় জাহেলিয়াত নারী জাতির সাথে দুর্ব্যবহার ও খারাপ আচরণ করে আসছিলো। তারা তাদের মানবিক অধিকার স্বীকার করতো না, তাকে পুরুষ জাতির সমান স্থানে রাখতো না, তারা তাদের বেচাকেনার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে। তারা নারী জাতিকে পাশবিক ভোগের সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। মানুষকে বিভ্রান্ত করা, তাদের প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা, উলংগ প্রেম নিবেদন এবং কামনা বাসনা করার সামগ্রী হিসেবে তারা তাকে ব্যবহার করতো। অতপর ইসলাম এসে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করলো, তাকে পরিবারের কাঠামোর ভেতরে এবং মানব সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ফিরিয়ে দিলো। ইসলাম তাকে সেই আসনে আসীন করলো যা তার সাধারণ মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা সূরার শুরুতে সেদিকেই ইংগিত করেছেন, 'যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তার সংগিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'

অতপর ইসলাম দাম্পত্য জীবনে মানবিক আবেগ অনুভূতির স্তরকে পশুত্ব থেকে মানবতার উঁচুস্তরে উন্নীত করে এবং তাকে সম্মান, ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সৌন্দর্যের ছায়াতলে আশ্রয় দান করে। সর্বোপরি ইসলাম তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও বন্ধনকে দৃঢ় মযবুত করে, যাতে করে তা সংঘর্ষ, আঘাত ও উত্তেজনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার সেজে বসা তোমাদের জন্যে হালাল নয় ... এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।' (আয়াত ১৯)

ইসলাম আরব জাতিকে অধপতনের গহ্বর থেকে উদ্ধার করে সুউচ্চ আসনে আসীন করেছে। এর আগে জাহেলী সমাজের অবলা নারীরা নানাবিধ যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতো। আর এগুলো মনে করা হতো নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে। তন্মধ্যে এক প্রকারের নির্যাতন ছিলো যে, জাহেলী সমাজের কেউ মারা গেলে তার ওয়ারিসরা যেমন তার চতুষ্পদ জন্তু ও সম্পত্তির মালিক

হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো, ঠিক যেমনটি করে তারা তার চতুস্পদ জন্তু ও মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ বিক্রি করতো, আবার ইচ্ছা করলে তারা তাকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে আটক করে রাখতো, সে তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়েই নিজকে মুক্ত করতো।

জাহেলী সমাজের নারী নির্যাতনের আরেকটি পন্থা ছিলো, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে মারা যেতো তখন তার অভিভাবক এসে তার ওপর একখন্ড কাপড় নিক্ষেপ করতো। এই এক খন্ড কাপড় দিয়ে সে তাকে অপর পুরুষের সাথে বিয়ে বসা থেকে বিরত রাখতো। মালে গনীমতের মালিকানার মতো সে তার মালিক হতো, অতপর যদি সে সুন্দরী ও রূপসী হতো তবে সে তাকে বিয়ে করতো, আর যদি সে কুৎসিত হতো তবে সে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আটক রাখতো যাতে সে তার ওয়ারিস হতে পারে বা তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে অন্য কেউ তার কাছ থেকে ছুটিয়ে দেয়। স্বামীর মৃত্যুর পর অভিভাবকরা তার ওপর কাপড় নিক্ষেপ করার পূর্বে যদি পিত্রালয়ে চলে যেতে সক্ষম হতো তবে সে নিজকে অভিভাবকের এই নির্যাতন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে নিজেকে হেফাযত করতে সক্ষম হতো।

তাদের মাঝে এমন প্রথাও ছিলো যে, স্বামী নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্যত্র তার মর্জির বিরুদ্ধে বিয়ে করতে দিতো না, এতে করে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানার পুরো বা কিয়দংশ ফেরত দিয়ে নিজেকে তার কাছ থেকে মুক্ত করে নিতো। আবার কখনও স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা স্ত্রীকে পরিবারের কোনো নাবালক শিশুর জন্যে আটকে রাখতো। অতপর সে শিশু বড়ো হয়ে তাকে বিয়ে করতো।

জাহেলী যুগে এমন ঘটনাও দেখা যেতো যে, এতীম মেয়ে সাবালক হওয়া সত্ত্বেও তার অভিভাবক তাকে তার ছোটো নাবালক ছেলে সন্তানের কাছে বিয়ে দেয়ার জন্যে আটকে রাখছে পরে নাবালক শিশু বড়ো হলে তাকে সে বিয়ে করতো, আর তারই মাধ্যমে সে তার সমস্ত সম্পদের মালিক হতো।

এমনি নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা আমরা জাহেলী যুগে দেখতে পাই। যেখানে নারীকে ভোগের সামগ্রী ও পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। তার সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো, যেখানে নারী পুরুষের সম্পর্ক ছিলো ব্যবসায়ী ও তার চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় পুরুষরা নারীদেরকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে এভাবেই বিক্রি করে দিতো এবং তাদেরকে মনে করতো হাতের খেলনা। ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে এ সমস্ত আচরণ তার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

ইসলাম তার আবির্ভাবের পর নারী পুরুষের সম্পর্ককে নীচু গহবর থেকে উদ্ধার করে সম্মানিত উঁচু আসনে আসীন করেন, এটাই বনী আদমের মর্যাদার উপযোগী ও তার সাথে সাম স্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা এদের গোটা মানব জাতির ওপর সম্মানিত করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষ এবং মানুষের জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী এবং ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা সম্মান দিয়েছেন, ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত কোনো বিধান, মতবাদ ও মতাদর্শ তা দিতে সক্ষম হয়নি।

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা যেমন সম্পত্তি, পণ্য সামগ্রী ও চতুস্পদ জন্তুর ওয়ারিস ও মালিক হয় তেমনি করে তার স্ত্রীর মালিক ও ওয়ারিস হওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একইভাবে

ইসলাম নারী জাতিকে তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঘরে আবদ্ধ রাখাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হাঁ, যদি নারী কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার শাস্তিস্বরূপ তাকে ঘরে আটক করা ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তির চূড়ান্ত নির্দেশ ও বিধান জারী হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত বৈধ ছিলো। ইসলাম নারী জাতিকে স্বামী বাছাই করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে। সে নারী যেই হোক না কেন, কুমারী, বিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা। ইসলাম সর্বাবস্থায় নারী জাতির সাথে ভালো ব্যবহার করা পুরুষ জাতির ওপর ফরয করে দিয়েছে। এমনকি স্ত্রী অপছন্দ হলেও স্বামীকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য না হয়। ঠিক সেই অবস্থাতেও ইসলাম স্বামীকে আশার বাণী শুনায় এবং বলে যে, 'এমনও তো হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যেই অনেক বেশী কল্যাণ দান করবেন।' যাতে সে ক্রোধের বশীভূত হয়ে প্রথমেই দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ককে ছিন্ন না করে এ জন্যে তাকে একথা বলা হয়েছে। সে যদি তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্ত্রীকে তালাক না দেয়, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ারা তাতেই তার মংগল রেখেছেন। আর এদিকেই আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে ইংগিত করেছেন। (আয়াত ১৯)

দাম্পত্য সম্পর্কের মূলভিত্তি

এই আয়াতের শেষ কথাটি মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়, ক্রোধের লেলিহান শিখা থেকে তাকে শান্ত করে করে এবং অপছন্দের তীব্রতা থেকে তাকে সুস্থির করে। সে যেন তার আত্মাকে শান্ত সুস্থির পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং যাতে স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক পাখীর পালকের ন্যায় বাতাসে উড়ে না যায়- সে জন্যেই এ ব্যবস্থা। এ সম্পর্ক সুদৃঢ় হাতল ও মযবুত অবলম্বনের সাথে সম্পৃক্ত, যা আসলেই স্থায়ী, ভাংগবার বা হারিয়ে যাওয়ার কিছু নয়, আর এ অবলম্বন মোমেনের অন্তর ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। এ অবলম্বন হচ্ছে সর্বাধিক শক্তিশালী, মযবুত ও স্থায়ী।

ইসলাম মানুষের ঘরকে বাসস্থান, নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা, করুণা ও হৃদ্যতার নিদর্শন মনে করে এবং এ সম্পর্ককে নিরংকুশ পছন্দের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ইসলাম স্বামীদেরকে সম্বোধন করে বলছে, অতপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করো, যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন। যাতে করে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষেত্রে তারা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। মনে এ ধরনের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জাগার সাথে সাথেই যেন এ সম্পর্ক হঠাৎ করেই ছিন্ন না করে এবং যাতে সে দাম্পত্য জীবনের বাধনকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকতে পারে, প্রবৃত্তির প্রথম তাড়ণায় সাড়া দিয়ে যেন তা ভেংগে না ফেলে এবং সর্বোপরি সে বৃহত্তম মানব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব যেন সংরক্ষণ করে সে জন্যেই একথাটা বলা হয়েছে। সুতরাং সে যেন এ সম্পর্ককে কখনো মনের আকস্মিক পরিবর্তন এবং উড়ন্ত ইচ্ছার নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন না করে সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর একটি বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি একজন ব্যক্তিকে- যে তার স্ত্রীকে ভালো না বাসার দরুন তালাক দিতে উদ্যত হয়েছিলো- বলেছিলেন, তোমার ধ্বংস হোক! স্বামী স্ত্রীর বন্ধন কি ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনোভাবে হতে পারে?

আজ কোথায় সে সম্পর্কে সংরক্ষণ এবং কোথায়ই বা সে লজ্জা?

এই সস্তা বুলি কতোই না তুচ্ছ, যা ভালোবাসার নামে বৃথা পান্ডিত্য প্রদর্শনকারী এবং নিজেদের বুদ্ধিমান রূপে প্রকাশকারী ব্যক্তিরা আওড়াচ্ছে? তারা প্রেম ও ভালোবাসার নামে স্বামী

স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ককে ভেংগে চুরমার করাকেই শুধু বৈধ করে না। বরং স্বামী স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকেই বৈধ করছে। এক্ষেত্রে এ প্রশ্নের অবতারণা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে কি আসলেই ভালোবাসে না?

সদা পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র আবেগ অনুভূতি এবং বিকৃত পাশবিক আকর্ষণের চেয়ে মহৎ কোনো অর্থ তাদের তুচ্ছ অন্তকরণে যেন উদিতই হয় না। নিশ্চিতভাবে একথা বলা যেতে পারে তাদের অন্তকরণে এ কথার উদ্রেক কখনো হয় না যা মানব জীবনে মহানুভবতা, মানবতা, সৌন্দর্য এবং ধৈর্য জাতীয় অনেক মহৎ গুণের মতো অনেক বড়ো। অবাধ প্রেমের কাছে তার দুর্বল, চিন্তা চেতনায় অসার মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মানুষের সামনে তাই তারা এগুলোকে উপস্থিত করছে। তাদের অন্তরে কখনো আল্লাহর চিন্তা প্রবেশ করে না। তারা তাদের সুসজ্জিত জাহেলিয়াতের আবরণে আল্লাহ তায়ালা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সুতরাং তাদের অন্তকরণ, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের যা বলেছেন তা বুঝতে সক্ষম নয়,

'অতপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে তোমরা হয়তো এমন এক জিনিস অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'

ঘর যদি ভাংতেই হয়

মূলত একমাত্র ঈমানী আকীদা বিশ্বাসই মানবজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তার গুরুত্বের দিকগুলোকে সমুন্নত করে এবং তার জীবনকে পশু প্রবৃত্তি, দানবসুলভ লোভ লালসা এবং অসার তুচ্ছতা থেকে উর্ধে উঠায়।

হাঁ যথাসম্ভব ধৈর্য সহিষ্ণুতা, আপ্রাণ চেষ্টা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করার পরও যখন একথাটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাওয়া এখন সত্যিই দুষ্কর, বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং এই স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা নিতান্তই প্রয়োজন, তখন একেবারে সর্বশেষ পরিস্থিতিতে কোনোরূপ আকস্মিকতা অবলম্বন করা ছাড়াই তালাকের পন্থা প্রয়োগ করবে এবং স্ত্রীকে তার সমুদয় মোহরের অর্থ এবং ওয়ারিস হিসেবে তার প্রাপ্য সম্পদ নিয়ে যেতে দেবে। তার থেকে কিছুই ফেরত নেবে না, তার সম্পদ যতো প্রচুর এবং যতো অঢেলই হোক না কেন? এ সময় তার পাওনা থেকে কিছু গ্রহণ করা প্রকাশ্য গুনাহ এবং নিশ্চিত গর্হিত কাজ। (আয়াত ২০)

সবশেষে আল্লাহ তায়ালা এখানে অনুপ্রেরণাদানকারী বর্ণনাও আবেগময়ী ছোঁয়ার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের কিছু প্রতিবিম্ব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। (আয়াত ২১)

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'আফদা' (গমন করা, স্বাদ আস্বাদন করা) ক্রিয়াকে নির্ধারিত কর্মবাচ্য ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। তাকে শর্তবিহীন তথা অনির্দিষ্ট রেখেছেন, যাতে তার যাবতীয় অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তার সকল প্রতিবিম্ব ও ইংগিতের প্রতি তিনি আলোকপাত করেছেন, শুধু দৈহিক মিলন ও যৌন স্বাদ আস্বাদনের মাঝেই একে সীমিত রাখেননি। বরং তার মাঝে তিনি আবেগ অনুভূতি, চিন্তা চেতনা, গোপন রহস্য, দুখ বেদনা এবং পারস্পরিক সাড়ার যাবতীয় দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা 'আফদা' শব্দটিকে শর্তবিহীন রেখে একে অনেক ব্যাপক করেছেন, যাতে এ শব্দটি দাম্পত্য জীবনের অসংখ্য চিত্র ও অগণিত ঘটনা অংকিত করতে পারে। উপরোক্ত শব্দটি আসলেই এ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। যেমন ভালোবাসার প্রতিটি শিহরণ, হৃদ্যতাপূর্ণ প্রতিটি দৃষ্টি, দৈহিক সম্পর্কের প্রতিটি স্পর্শ মিলন ও দুঃখ বেদনা ও আশা আকাংখার প্রতিটি মুহূর্ত- বর্তমান বা ভবিষ্যতের প্রতিটি চিন্তা পরিকল্পনা, ফেলে আসা স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি বিষয় ও ঘটনাবলীর প্রতি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নবজাতকের আগমনের প্রতিটি অনুভূতির সাক্ষ্য এর সবকয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'অথচ তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছো ও (পরস্পর পরস্পরের) স্বাদ আস্বাদন করেছো।'

এই অনুপ্রেরণা দানকারী আল্লাহর বাণীটি ইতিপূর্বে বর্ণিত যাবতীয় চিন্তা চেতনা ও আবেগ অনুভূতির সমাহারকে একত্রিত করেছে, এতোসব কিছুর পর সেখানে মোহরের বৈষয়িক ছোটো বিষয়টি একেবারেই ক্ষীণ ও গৌন হয়ে যায়। তাই পুরুষ তার স্ত্রীকে মোহর সহ যা কিছু দিয়েছে তা বা তার কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করে। কেননা সে ব্যক্তি তখন বিচ্ছেদের মুহূর্তে অতীতের আবেগ ও অনুভূতির রাজ্যে একসাথে বসবাস করার অনেক স্মরণীয় ঘটনাবলীর মাঝে হারিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা নানা চিত্র ঘটনা ও আবেগ অনুভূতির পাশাপাশি আরেকটি উপাদানকে এখানে সন্নিবেশিত করেছেন এবং তা হচ্ছে এই যে,

'নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অংগীকার গ্রহণ করেছে।'

তা হচ্ছে আল্লাহর নামে এবং তাঁর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার। পাকা মযবুত প্রতিশ্রুতি, যার মর্যাদাকে মোমেনের অন্তকরণ ছোটো ও হেয় করে দেখে না, তাই আল্লাহ তায়ালা এখানে ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলেছেন, তারা যেন সে পাকা প্রতিশ্রুতির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে।

যাদেরকে বিয়ে করা হারাম

এই অনুচ্ছেদের শেষ দিকে আল্লাহ তায়ালা পিতা-পিতামহের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাকে অকাট্য ভাষায় নিষেধ করেছেন। অথচ তা আইয়ামে জাহেলিয়াতে বৈধ হালাল ছিলো। আরবের জাহেলী সমাজে কখনো কখনো স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের নাবালক শিশু সন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখা হতো। অতপর যে সাবালক হয়ে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতো। পক্ষান্তরে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সাবালক সন্তান থাকলে, সে যেমন পিতার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তেমনি উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিতো। ইসলাম এসে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। (আয়াত ২২)

মূলত সন্তানের জন্যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার মাঝে তিনটি হেকমত ও রহস্য লুকায়িত রয়েছে। আমরা মানুষরা অবশ্য শরীয়তের প্রত্যেক বিধানের রহস্য ও হেকমত সম্পর্কে অবগত নই, আর আসলে এই হেকমত উপলব্ধি করা না করার মাঝে আমাদের বিধানকে মেনে নেয়া, তার আনুগত্য করা এবং তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদির কোনোটাই নির্ভর করে না। আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে, আল্লাহ তায়ালা এই বিধান রচনা করেছেন, এতেই আমরা বিশ্বাস করি তার পেছনে কিছু না কিছু রহস্য ও কল্যাণ লুকায়িত রয়েছে।

এ তিনটি হেকমত হচ্ছে এই,

১. পিতার স্ত্রীর আসন হচ্ছে মায়ের আসনের মতো।

২. পুত্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতাকে তার সমকক্ষ যেন মনে না করে। স্বামীরা সাধারণত তার স্ত্রীর প্রথম স্বামীকে প্রকৃতিগত ও স্বভাবগতভাবেই ঘৃণা ও অপছন্দ করে। এক্ষেত্রেও ছেলে তার পিতাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে।

৩. পুত্রের জন্যে পিতার স্ত্রী ওয়ারিস হওয়ার ধারণাকে অপনোদন করা। জাহেলী যুগে এ ধরনের ওয়ারিস হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিলো, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য একটা বিষয়, যা একই প্রাণ থেকে উৎসারিত হওয়ার কারণে স্বামী স্ত্রীর মর্যাদাকে নীচু করে দেয়। তাদের একজনকে অপমানিত ও লজ্জিত করা অপরজনকে অপমানিত ও লজ্জিত করারই নামান্তর।

প্রকাশ্য এই তিনটি হেকমতের সাথে আরো অগণিত অপ্রকাশ্য হেকমত থাকতে পারে এবং সে প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তায়ালা এই কাজটিকে নিতান্ত ঘৃণ্য, অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ ও হীন পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার ফায়সালা করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে সেসব নারীদের বর্ণনা এসেছে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এটা হচ্ছে পরিবার ও সমাজকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখল করার পদক্ষেপ। (আয়াত ২২, ২৪)

যে সব মহিলার সাথে বিয়ে হারাম তা আদিম ও আধুনিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিচিত। নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার কারণ এবং নিষিদ্ধ মহিলাদের স্তর ও প্রকারভেদ বিভিন্ন জাতির কাছে বিভিন্ন রকম, আদিম জাতিসমূহের কাছে তার পরিধি ছিলো প্রশস্ত। উন্নত জাতির কাছে এসে তা সীমিত হয়ে গেছে।

দ্বীন ইসলামে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে তারা হচ্ছে সেসব মহিলা, যাদের কথা এই আয়াত এর পূর্ববর্তী আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, হারাম নারীদের মধ্যে কোনো কোনো নারী এমন আছে যারা কোনো অবস্থাতেই হালাল হয় না। তাদেরকে 'মোহাররামাতে আবাদীয়্যা' (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোনো কোনো নারী আবার চিরতরে হারাম নয়। কোনো কোনো অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায় তাদেরকে 'মোহররামাতে মোয়াক্কাত' (সাময়িক হারাম) বলা হয়।

হারাম নারীদের প্রকারভেদ ১. বংশগত হারাম, ২. দুধ পান করানোর কারণে হারাম, ৩. শ্বশুরালয় সম্পর্ক তথা বিয়ে করার কারণে হারাম।

ইসলাম এ ক্ষেত্রে যাবতীয় শর্তকে বাতিল ঘোষণা করেছে যা এ ব্যাপারে অপরাপর সমাজে প্রচলিত ছিলো। যেমন কিছু শর্ত এমন ছিলো যা রং, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তার বৈষম্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আবার কিছু শর্ত ছিলো যা একই জাতি এবং একই দেশে একই শ্রেণী সামাজিক অবস্থানের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

আত্মীয়তার কারণে ইসলামী বিধানে যাদেররকে বিয়ে করা হারাম তারা চার প্রকার,

১. মূল সূত্র- তা যতোই উর্ধে যাক না কেন! আপন ও সৎ উভয় প্রকার মা, অনুরূপভাবে দাদী ও নানী যতোই উর্ধের হোক না কেন তাকে বিয়ে করা হারাম। এরশাদ হচ্ছে,

'আপন মায়েদেরকে বিয়ে করা তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে।'

২. শাখা সূত্র যতো নিচের দিকেই যাক না কেন! স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যা এবং পুত্রের কন্যা যতোই নীচে যাক তাদের বিয়ে করা হারাম। মোটকথা মেয়ে, নাতনি, মেয়ের নাতনি এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের কন্যাদেরকেও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।'

৩. পিতা মাতার নিম্নগামী শাখা প্রশাখা। সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। একইভাবে ভ্রাতৃষ্পুত্রী, ভাগিনী ও তাদের নিম্নবর্তিনীর সাথেও বিয়ে করা হারাম।

৪. দাদা নানা ও তাদের উর্ধস্তনদের সরাসরি শাখা প্রশাখা। ফুফু অর্থাৎ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনেরা খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনদের সাথে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে পিতা, দাদা ও নানার সকল প্রকার ফুফুদের বিয়ে করাও নিষিদ্ধ। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের ফুফু ও খালা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।'

পক্ষান্তরে দাদা নানার পরোক্ষ শাখা প্রশাখার মাঝে বিয়ে শাদী হালাল। তাই চাচা ফুফু, চাচী ফুফী এবং খালু খালার সন্তান সন্ততির মাঝে বিয়ে শাদী বৈধ।'

শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক তথা বিয়ে করার কারণে হারাম নারীরা আবার পাঁচভাগে বিভক্ত,

১. স্ত্রীর উর্ধগামিনী মূলসূত্র, স্ত্রীর মায়েরা অর্থাৎ শাশুড়ী, দাদী শাশুড়ী ও নানী শাশুড়ী ইত্যাদি উপরের দিকের মহিলাদের সাথে বিয়ে করা বৈধ নয়। শুধু বিয়ে সংঘটিত হওয়ার কারণেই এরা হারাম হয়ে যাবে। সে স্ত্রীর সাথে পুরুষটির দৈহিক মিলন হোক বা না হোক, এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদের তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।'

২. স্ত্রীর নিম্ন সম্পর্কীয় শাখা প্রশাখা, স্ত্রীর সর্বপ্রকার কন্যা। দৌহিত্রী ও পৌত্রী প্রভৃতি নিম্নবর্তিনীদের সাথে বিয়ে হারাম। আর এরা কিন্তু হারাম হবে তখন যখন এই স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটবে।

'তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছো সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। তাদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তবে এ বিয়েতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।'

৩. পিতা, পিতামহ ও মাতামহ প্রভৃতি উর্ধগামীদের স্ত্রী। পিতা দাদা নানাদের উর্ধগামীদের স্ত্রীদের সাথে বিয়ে জায়েয নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'যে নারীকে তোমাদের পিতা পিতামহ বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা।'

অর্থাৎ জাহেলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা তার স্ত্রীকে বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে নিতো, আর এ বিয়ে ছিলো তখন সামাজিক নিয়ম। কিন্তু ইসলাম আগমনের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং 'একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন।

৪. ছেলে ও নাতিনদের স্ত্রী ইত্যাদি। ছেলের বৌ নাতির বৌয়ের সাথে বিয়ে করা হারাম। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের জন্যে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে।'

ঔরসজাত পুত্রের শর্ত আরোপের মাধ্যমে জাহেলী সমাজে পালক পুত্রের স্ত্রীকে যে হারাম করা হয়েছিলো তা রহিত করা হয়েছে। ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে হারাম করা হয়েছে এবং পালক সন্তানদেরকে তাদের সত্যিকার বাপের নাম সংযুক্ত করে ডাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর বর্ণনা সূরা আল আহযাবে এসেছে। এই শর্ত আরোপের মাধ্যমে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, পালক পুত্রের বিধবা অথবা তালাক দেয়া স্ত্রী বিয়ে করা (পালক) পিতার জন্যে হারাম নয়। শরীয়তে কেবলমাত্র সে পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম, যে তার নিজ ঔরসজাত।

৫. স্ত্রীর বোন, তাকে বিয়ে করা কিন্তু সাময়িকভাবে হারাম, যতোদিন পর্যন্ত স্ত্রী জীবিত থাকে এবং স্বামীর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। একই সাথে দু'বোনকে বিয়ে করা হারাম। এরশাদ হচ্ছে, 'দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু তা অতীত হয়ে গেছে (তা আলাদা)'

জাহেলী যুগে যা হয়েছে তা ধর্তব্য নয়।

বংশ, রক্ত ও বিয়ে সম্পর্কের কারণে যারা যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। আর এটি নয়টি সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. দুধমা ও তার উর্ধতমা মূল সূত্র। এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের সে মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে।'

২. দুধকন্যা ও তার মেয়ে তা যতোই নিচে যাক। হাদীসে এসেছে 'পুরুষের দুধকন্যা হচ্ছে সেই নারী যাকে তার স্ত্রী– স্ত্রী হিসাবে থাকাকালীন সময়ে দুধ পান করিয়েছে।' (আল হাদীস)

৩. দুধবোন ও তার নিম্নগামিনী কন্যা। নির্দেশ এসেছে, 'তোমাদের দুধবোনদেরকে তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।'

৪. দুধফুফু এবং খালা। (দুধখালা হচ্ছে দুধমাতার বোন, আর দুধ ফুফু হচ্ছে দুধ মায়ের স্বামীর বোন)।

৫. স্ত্রীর দুধমাতা (যে তার স্ত্রীকে শৈশবে দুধ পান করিয়েছে) এবং উর্ধগামিনী মূল বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যেরূপ হারাম হয়ে যায়, একইভাবে এখানেও স্ত্রীর বিয়ে হবার সাথে সাথে তা হারাম হয়ে যাবে।

৬. স্ত্রীর দুধ কন্যা (যাকে স্ত্রী তার বিয়ের পূর্বে দুধ পান করিয়েছে) এবং তার নিম্নগামী সন্তানের কন্যারা আর এই হারাম হওয়া কার্যকর হবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর থেকে।

৭. দুধপিতা বা দাদা ও তার উর্ধগামীদের স্ত্রী, (দুধ পিতা হচ্ছে সে যার স্ত্রী থেকে শিশুটি দুধ পান করেছে।)

৮. দুধ ছেলে ও তার নিম্নগামীদের স্ত্রী।

৯. স্ত্রী এবং দুধ বোন বা দুধফুফু বা খালা অথবা এমন কোনো মহিলাকে একসাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করা, দুধ পান করার কারণে যার সাথে বিয়ে হারাম।

এই নয় প্রকারের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের মহিলাদের হারাম হওয়া কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। অবশিষ্ট মহিলাদের হারাম হওয়া রসূলে করীম (স.)-এর হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম তা দুধ সম্পর্কের কারণেও হারাম।

ইসলামী বিধান অনুসারে এসব মহিলাদের সাথে বিয়ে সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কোরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য ও হারামের বিশেষ কোনো কারণের কথা উল্লেখ করেনি। এক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হয় তা হচ্ছে, পরবর্তীদের উদ্ভাবন, তাদের অভিমত ও মূল্যায়ন।

এ সমস্ত মহিলার সাথে বিয়ে নিষেধ হওয়ার সাধারণ কোনো কারণ থাকতে পারে আবার বিশেষ শ্রেণীর মহিলার জন্যে বিশেষ কারণ অথবা কতেক শ্রেণীর মাঝে যৌথ কোনো কারণ থাকতে পারে। এগুলো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে বিয়ে হওয়া সন্তান সন্তুতিকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে। কেননা দুর্বলতা ও বংশগত উপাদানগুলো এক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে শেকড় গেড়ে মযবুতভাবে বসে যায়। অপরপক্ষে বিয়ে শাদী যদি স্বীয় বংশের লোকদের মাঝে না হয়ে নতুন নতুন বংশের লোকদের সাথে হয়, তাতে নতুন নতুন রক্তের সঞ্চার হয় এবং উন্নতমানের উপাদান তাতে সংযোজন হয়। এর ফলে প্রজন্মে নিত্যনতুন উপাদান এবং প্রাণ সঞ্চার হয়।

অথবা উদাহরণস্বরূপ এটাও বলা যেতে পারে হারাম ঘোষিত মহিলাদের কোনো কোনো শ্রেণী যেমন মা, মেয়ে, বোন, খালা, কন্যা তদ্রূপ দুধ পান করার কারণে তাদের সমকক্ষ মহিলারা, স্ত্রীর মায়েরা ও মেয়েরা এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে, দয়ামায়া এবং শ্রদ্ধা সম্মানের।

সুতরাং সে সম্পর্ক যাতে দাম্পত্য জীবনে কখনো ঝগড়া কলহ, মনোমালিন্য মতবিরোধ দেখা দেয়, যা তালাক ও পারস্পরিক বিচ্ছেদ পর্যন্ত পৌছুতে পারে এবং স্থায়ী সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরিয়ে আবেগ অনুভূতিকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করে তাকে পরিহার করতে বলা হয়েছে।

এক্ষেত্রে এটাও বলা যায় যে, বিয়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পরিবারের পরিধি সম্প্রসারণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের গন্ডি ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে। সুতরাং সে সম্পর্ক এসব নিকটাত্মীয়দের মাঝে হওয়ার প্রয়োজন নেই। এদেরকে তো আগেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। হাঁ, যার সম্পর্ক নিকটাত্মীয়দের থেকে দূরে, তাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক বৈধ।

এসব মহিলার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ যাই হোক না কেন-যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন সেহেতু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তার মাঝে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত আছে। আমাদের রহস্য জানা না জানা এক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। আল্লাহর হুকুম সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার আনুগত্য ও বাস্তবায়ন ওয়াজেব হওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি কোনো ত্রুটি ঘটাবে না। ঈমান কোনো ব্যক্তির অন্তরে প্রতিষ্ঠিতই হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে আল্লাহর বিধানের প্রতি রুজু হবে। অতপর সে তার অন্তরে এ বিধান গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা পাবে না।

এই হুকুম বর্ণনাকারী কোরআনী বিধানের সর্বশেষ সাধারণ বক্তব্যটি অবশিষ্ট রয়ে গেলো, আর তা হচ্ছে এ সকল নিষিদ্ধ মহিলারা জাহেলী সমাজের রসম রেওয়ায ও ঐতিহ্যেও হারাম ছিলো। সে দু'অবস্থা হচ্ছে, ১. পিতা যে সমস্ত নারীকে করেছে ২. দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করা।

কিন্তু ইসলাম যখন এ সমস্ত মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম করেছে তখন এই নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের প্রথা ও প্রচলনের প্রতি নির্ভর করেনি। করেছে তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর ওপর নির্ভর।

নিষিদ্ধ নারী সম্পর্কিত বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতা ও লৌকিকতার বিষয় নয় বরং পুরো বিষয়টিই দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়টি উপলব্ধি করা পুরো দ্বীন এবং সে মূলনীতি উপলব্ধি করার নামান্তর, যার ওপর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, আর তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং তাকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নিরংকুশ করার মূলনীতি।

আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহর

নিসন্দেহে দ্বীন (ইসলাম) আমাদের জন্যে একথা বলে দিয়েছে যে, কোনো বস্তুকে হালাল ও হারাম করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কেননা এ দুটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্টসমূহের মাঝে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং হালাল ও হারাম করা আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তিনিই হালালকে হালাল করেছেন এবং হারামকে হারাম করেছেন। তিনি ছাড়া আর কারোই বিধান রচনা করার অধিকার নেই। এটাই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীর সমার্থক।

ইতিপূর্বে জাহেলিয়াত যে সমস্ত বস্তুকে হালাল এবং হারাম সাব্যস্ত করেছিলো ইসলাম তাকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে। কেননা তা শুদ্ধ করার উপযোগী নয়। শুরু থেকেই তার কোনো মূল্য ছিলো না। ইসলাম এসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নতুন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং পূর্বের সকল নির্দেশকে রহিত করেছে এই মনে করে যে, যেন এর কোনো নির্দেশই ইতিপূর্বে মজুদ ছিলো না, পূর্বের নির্দেশগুলো এমন জাহেলিয়াত থেকে এসেছে, যার এ ধরনের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতাই নেই- সে তো প্রভু নয়। অতপর ইসলাম নতুন করে বিভিন্ন নির্দেশ দিতে লাগলো। যদি ইসলাম

জাহেলিয়াতের হালাল করা কোনো বস্তুকে হালাল এবং হারাম করা কোনো বস্তুকে হারাম করে থাকে, তার মানে এটা নয় যে, ইসলাম সে জাহেলিয়াতের নির্দেশের ওপর নির্ভর করে নির্দেশ দিয়েছে। জাহেলিয়াতের সকল নির্দেশাবলীকে ইসলাম তার আগমনের সাথেই বাতিল করেছে। কারণ এ নির্দেশাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি, নির্দেশ দেয়ার নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র তারই রয়েছে।

হালাল এবং হারামের ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিভংগি ও মূলনীতি মানব জীবনের সকল বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত করে, তার পরিধি ও গন্ডি থেকে মানব জীবনের কোনো কিছুই বহির্ভূত নয়। আল্লাহর বিধানানুসারে তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা পাওয়া ছাড়া বিয়ে বন্ধন, খাওয়া দাওয়া, পোশাক আশাকের নড়াচড়া, কাজ কর্ম, চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ের কোনোটাকেই হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা এই বিশ্বজগতের কারোর নেই।

ইসলাম ছাড়া যাবতীয় অন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যা মানব জীবনের ছোটো ও বড়ো বস্তু বা বিষয়কে হালাল বা হারাম বলে ফতওয়া দেয়, তা নিসন্দেহে এ দৃষ্টিতে বাতিল। এগুলোকে নতুন করে পরিশুদ্ধও করা যাবে না।

ইসলাম হালাল এবং হারামের ব্যাপারে তার নির্দেশ চালু করেছে। ইসলাম তার নিয়ম কানুনও প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ইসলাম হুকুম রচনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, রীতি নীতিকেও সুবিন্যস্ত করেছে।

কোরআনে কারীম এই দর্শন ও মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। এই ব্যবস্থাটি হালাল এবং হারামের ক্ষেত্রে পুরোপুরিই জাহেলিয়াতে ডুবে আছে। এমন লোকদের সাথে ইসলাম বারবার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন নিন্দা ও বিস্ময়ের সুরে এদের প্রশ্ন করছে?

‘তুমি বলো! আল্লাহর সাজ সজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্য বস্তুসমূহকে- কে হারাম করেছে?’ (সূরা আল আ’রাফ আয়াত ৩২)

তুমি বলো! এসো, আমি তোমাদেরকে সেসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন।’ (সূরা আল আনয়াম আয়াত ১৫২)

তুমি বলো! যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্যে কোনো হারাম খাদ্য পাই না, যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত বাদে ...। (সূরা আল আনয়াম আয়াত ১৪৫)

কোরআনে করীমের এই নিন্দাসূচক বাক্যের মাধ্যমে মানব জাতিকে এই মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কোনো কিছুকে হালাল এবং হারাম করার অধিকার রাখেন। আল্লাহর বিধানানুসারে তার থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী, জাতি এমনকি সকল মানব সমাজেরও এ ব্যাপারে কিছু করার অধিকার নেই। কোনো কিছু হালাল ও হারাম করা তথা বৈধ করা বা অবৈধ করাই হচ্ছে শরীয়ত (বিধান) ও দ্বীন, আর যে সত্ত্বা হালাল এবং হারাম করেন তিনি হচ্ছেন দ্বীনের মালিক ও দ্বীন রচনাকারী। মানব সমাজকে সেই দ্বীনেরই অনুসরণ করতে হবে। হালাল এবং হারাম নির্ধারণকারী সত্ত্বা যদি হন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং, তাহলে বোঝা যাবে যে সত্যিই মানুষ তাঁর এবাদাত করছে। অর্থাৎ মানুষ এর ফলে আল্লাহর দ্বীনের মাঝে অবস্থান করবে। আর যদি তার জীবনে বৈধ অবৈধ নির্ধারণকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে তারই এবাদাত করছে অর্থাৎ তারা তার দ্বীনে

অবস্থান করছে- আল্লাহর দ্বীনে নয়। তারা সে ব্যক্তির জীবন বিধানানুসারে জীবন পরিচালনা করছে, আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধানানুসারে নয়।

এক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, প্রভুত্ব ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ। দ্বীন এবং তার ব্যাখ্যা, ঈমান এবং তার পরিধি, বিশ্ব জুড়ে যারা নিজেদেরকে মোমেন এবং মুসলমান হিসেবে দাবী করছে, তাদের দেখা উচিত তারা হালাল হারামের ব্যাপারে, আল্লাহর প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব ও জীবন বিধান এর কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে।

আমরা এখানে সূরা আন নেসার এ খন্ডে অবস্থান করছি। এই খন্ডটি সূরার অধিকাংশ উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং আলোচ্য বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর প্রতি আমি চতুর্থ খন্ডের শুরুতে সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছি।

আমরা এই খন্ডে বর্তমান সূরার মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়াদির অসংখ্য উপাদান একত্রে দেখতে পাই।

প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই, পরিবারের কার্যাবলীকে সবিন্যস্ত করা, দৃঢ় ভিত্তির ওপর পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে দাম্পত্য জীবনের অস্থায়ী পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা, তাকে এবং তার সাথে সমাজকে ব্যভিচারের প্রসার থেকে পবিত্র করা এবং পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে এমন সব কিছু থেকে হেফাযত করা।

আমরা এই পাঠে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম নীতির অবশিষ্টাংশ দেখতে পাই, যা আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের সাথে জড়িত। সমাজে নারী পুরুষের মালিকানা অধিকার এবং উত্তরাধিকারের কিছু নির্দেশাবলীকেও এই পাঠ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই নিয়ম নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সমাজকে জাহেলী জীবন বিধান থেকে ইসলামী জীবন বিধানে স্থানান্তরিত করা। জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ মুছে ফেলে, তার জায়গায় নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করা, মুসলিম দলকে জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে একদম উঁচু শৃংগে আরোহন করানো এবং সে আসনে তাকে আসীন রাখা।

অতপর আমরা দ্বিতীয় পাঠে ইসলামী চিন্তা চেতনার নিয়ম নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে প্রত্যাবর্তন দেখতে পাই, এটি ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের শর্ত বর্ণনা করে, যা এই নতুন জনসমষ্টির অভ্যন্তরে সামাজিক নিরাপত্তার শৃংখলার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত পরিবারের সংকীর্ণ গন্ডি থেকেই এ নিরাপত্তা শুরু হয়। অতপর তা সম্প্রসারিত হয়ে মানবকূলের সব অসহায় ও দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করে। বদান্যতা, নিরাপত্তা ও সংহতির নির্দেশের পাশপাশি আমরা এখানে কৃপণতা, সম্পদের বড়াই, নেয়ামত গোপন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে লৌকিকতা প্রদর্শনের কুৎসা বর্ণনা দেখতে পাই।

আবার এই পাঠে আমরা দেখতে পাই, এবাদাতের সাহায্যে মনস্তাত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করা এবাদাত অনুশীলনের জন্যে পবিত্র হওয়া এবং মদকে অপবিত্র গণ্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-যা এবাদাতের পবিত্র অবস্থার সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। আসলে এটা ছিলো মদকে হারাম করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ কাজগুলো প্রজ্ঞাময় ও প্রশিক্ষণমূলক জীবন বিধান অনুসারেই সম্পন্ন হয়েছিলো।

তৃতীয় পাঠে আমরা এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থেকে আহলে কেতাবদের সাথে তাদের অবস্থানকে দেখতে পাই, আরো দেখি তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে প্রতারণামূলক কাজের একটি বিস্তারিত তালিকা, তাদের প্রতারণা ও দুরভিসন্ধির

একটি বর্ণনা, তাদের আচার আচরণের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা। তাদেরকে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা এবং তাদের পরকালের খারাপ পরিণাম ও বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা ইত্যাদির বহু কিছু আমরা এখানে দেখতে পাই।

চতুর্থ পাঠে আমরা দ্বীনের অর্থ, ঈমানের অর্থ এবং ইসলামের সংজ্ঞার একটি চূড়ান্ত বর্ণনা দেখতে পাই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি, আনুগত্য, অনুসরণ এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুসলমানদের পদ্ধতি, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধানের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে ধর্না দেয়া আল্লাহর রসূলের নির্দেশের আনুগত্য ও অনুসরণ করার কথা বর্ণনার বিবরণ এখানে রয়েছে। আরো রয়েছে আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা। মানুষের মাঝে ইনসাফের সাথে বিচার ফয়সালা করা এবং মানব জীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর যমীনে মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্যের বর্ণনা। ইতিপূর্বে বর্ণিত এ বিষয়গুলো হচ্ছে মূল ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বশর্ত। এখানে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে সে সমস্ত ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি, যারা মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে, অথচ ঈমানের প্রথম ও প্রধান শর্তকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে না, আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে মানার উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবং তার রসূল (স.)-এর কাছে বিচার ফয়সালা কামনা করা। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই শর্ত কোনো ব্যক্তির জীবনে না পাওয়া যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে মোমেন হতে পারে না।

অতপর আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখতে পাই, জেহাদের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের হেফাযত করার লক্ষ্যে মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্দেশনা দেয়া। মোনাফেক এবং বিলম্বে জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দা জ্ঞাপন করা জেহাদের সুমহান উদ্দেশ্য লক্ষসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে শক্তিশালী মোমেনদেরকে দুর্বল অসহায় ঈমানদারদেরকে দারুল কুফর (কুফরী আইন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র) থেকে উদ্ধার করে দারুল ইসলাম (ইসলাম পরিচালিত রাষ্ট্র) এ স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। অতপর তাদেরকে আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করা, ভয় ভীতি থেকে অন্তরকে পবিত্র করার লক্ষ্যে আয়ু এবং তাকদীরের সঠিক তত্ত্ব বর্ণনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ পাঠের শেষদিকে রসূল (স.)-কে তার অন্য কোনো সাথী না থাকলেও জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা দ্বীন ইসলাম এবং মযবুত আল্লাহরই জীবন বিধান আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠা করতে জেহাদের বিকল্প নেই।

জেহাদ প্রসংগে আমরা ষষ্ঠ পাঠে ইসলামী বাহিনী, চুক্তিবদ্ধ বাহিনী ও ইসলাম বিরোধী বাহিনীর মাঝে অসংখ্য আন্তর্জাতিক লেন দেনের বর্ণনা দেখতে পাই। এই বিষয়টি শক্তি, কঠোরতা এবং বিজয়ী হওয়ার বিষয়ের সাথেই জড়িত নয়- বরং তা বিভিন্ন বাহিনীর সাথে তার মানবীয় সম্পর্ক সুসংহত রাখার জন্যে তৈরী করা নানাবিধ শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠিত করার অংশ বিশেষ।

সপ্তম পাঠে আমরা জান মালের মাধ্যমে জেহাদ করার বর্ণনা দেখতে পাই। আর এই বর্ণনা এসেছে সেসব লোকদের নিন্দা বর্ণনা করার মাধ্যমে। যারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী ঝান্ডা উড্ডীয়মান থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফুর থেকে তারা হিজরত করে দারুল ইসলামে যাচ্ছে না, বরং সেখানেই অবস্থান করতে চাইছে যেখানে তাদের দ্বীনের আলো ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এই পাঠে আরো যেসব বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মোমেনদেরকে জেহাদ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা এবং তাদের হুংকারে দুর্বলতা প্রকাশ না করার প্রতি উৎসাহিত করা। মোমেন এবং কাফেরদের প্রকৃত অবস্থান এবং উভয় পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরিণাম বর্ণনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম পাঠে সেই ইহুদীর ঘটনায় ইসলামের ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যাকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হয়েছিলো। অতপর যখন এই অপরাধের বিপক্ষে এবং ইহুদীর সপক্ষে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহুদীকে নির্দোষ বলে আয়াত নাযিল হয়। এর সাথে ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ধরনের চক্রান্ত করেছে তারও বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ইসলামী ইনসাফ ও ন্যায় বিচার হচ্ছে সেই ইনসাফ- যা ভালোবাসা অথবা শত্রুতার দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয় না। এটা হচ্ছে এমন এক উঁচুস্তর যেখানে মানব জাতি একটি উঁচু বিধানের ছায়াতলে আসা ছাড়া পৌঁছাতে সক্ষম হয় না।

নবম পাঠে যে সমস্ত জিনিসের বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে শেরেক কুসংস্কারসমূহ এবং ঘৃণ্য চিন্তা চেতনা এবং তার ভ্রষ্ট প্রভাব। এর সাথে আবার আল্লাহর ইনসাফ থেকে অবাস্তব কিছু আশা করা। এটা অহেতুক আশা এবং কল্পনার ভিত্তিতে নয়, কাজের ভিত্তিতে বিনিময় ও প্রতিদান প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ কথা নিশ্চিত করা যে, একমাত্র ইসলামই দ্বীন এবং এটিই ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত।

দশম পাঠে নারী ও তাদের অধিকার, এতীমদের অধিকার এবং অসহায় দুর্বলদের অধিকারসমূহের পূর্ণ আলোচনা এসেছে। ইতিপূর্বে তার আলোচনা সূরার শুরুতেও একবার করা হয়েছে। এর সাথে আরো যে সমস্ত বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে, স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীর পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার বর্ণনা, স্ত্রীদের সাথে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে কাম্য ন্যায়বিচারের সীমা বর্ণনা করা, যাকে ছাড়া জীবন যাপন কখনো শান্তিময় হতে পারে না। যদি কোনো কারণবশত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে ফাটল সৃষ্টি এবং সংশোধন দুষ্কর হয়ে যায় তখন বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাই মংগল বলে বিবেচিত হয়।

পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ নির্দেশের ওপর পর্যালোচনা করা, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এই বিধি বিধান ও নির্দেশাবলীকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আকাশ যমীনে তার মালিকানা এবং উভয়কে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে তার অসীম ক্ষমতাকে মানুষের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে। এই জিনিসগুলোর উল্লেখ বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ হওয়া এবং তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রকৃত সার্বভৌমত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ারই পরিচায়ক। অতপর যখন আল্লাহভীতি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয় তখন মোমেনদেরকে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ বর্ণনার দ্বারা ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ থেকে সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়েছে, আর এটাই কোরআনে কারীমের চিরন্তন পদ্ধতি।

পরিশেষে আসছে এ অংশের সর্বশেষ পাঠ। তার মধ্যে যে সমস্ত জিনিসের বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে নেফাক ও মোনাফেকদের নিন্দাজ্ঞাপন, মোমেনদের সঠিক ঈমানের প্রতি আহ্বান করা। এখানে মোমেনদেরকে মুসলিম সম্প্রদায় ও তার নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং মোনাফেক ও ইসলামের শত্রুদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা সামাজিক সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে সৌজন্যমূলকভাবে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শৈথিল্য ও অবহেলা প্রদর্শন করা থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর এটাকে নেফাকের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম আলামত বলে দেখানো হয়েছে। মোনাফেকদের স্থান হচ্ছে জাহান্নামের নীচু গহ্বরে, আর একমাত্র মোনাফেকরাই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঠের শেষভাগে যার মাধ্যমে পঞ্চম পারায় সমাপ্তি ঘটেছে তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ, বান্দার সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং পথভ্রষ্ট ও অপরাধী লোকদের শাস্তি দেয়ার মতো হেকমত সম্পর্কিত প্রভাব বিস্তারকারী মর্মার্থ বর্ণনা করা। আল্লাহর জন্যে তার সৃষ্টি জীবকে শাস্তি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি তারা ঈমান আনে ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 'তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সমুচিত মূল্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।'

এই বর্ণনা সতিই আশ্চর্যজনক, যা অন্তরকে আল্লাহর করুণা ও মানুষের শাস্তি দেয়া থেকে তার মুখাপেক্ষিতার অনুপ্রেরণা দান করে। অবশ্য যদি মানবজাতি তার বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এ তার মর্যাদা রক্ষা করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিন্তু তারাই কুফুরী ও আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারের মাধ্যমে এবং যমীন ও জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের জন্যে শাস্তি ক্রয় করেছে।

এভাবেই সূরার এই অংশটি সূরার মূল্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সন্নিবেশিত করেছে যা ইতিপূর্বে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। পরবর্তীতে প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسٰفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاٰتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ

২৪. নারীদের মাঝে বিয়ের দুর্গে অবস্থানকারীদেরও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে), তবে যেসব নারী (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত, এ হচ্ছে (বিয়ের ব্যাপারে) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান, এর বাইরে যে সব (নারী) রয়েছে, তাদের তোমাদের জন্যে (এ শর্তে) হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (মোহর) বিনিময় আদায় করে দেবে এবং তোমরা (বিয়ের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে, তোমরা অবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে (নিয়োজিত) হবে না; অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা এর মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের (মোহরের) বিনিময় ফরয হিসেবে আদায় করে দাও, (অবশ্য একবার) এ মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে (পরিমাণের) ওপর তোমরা উভয়ে একমত হও, তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী, ২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক ও সামাজিক) সামর্থ না থাকে, তাহলে সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়; তোমাদের ঈমান সম্পর্কে তো আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন; (ঈমানের মাপকাঠিতে) তোমরা তো একই রকম, অতপর তোমরা তাদের (অধিকারভুক্তদের) অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক তাদের যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা যেন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়–(স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে) পরপুরুষকে আনন্দদানের কাজে নিয়োজিত না থাকে, অতপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেয়া হলো, তখন যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তখন) তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারিণী স্বাধীন (সম্ভ্রান্ত) নারীদের ওপর (আরোপিত শাস্তির) অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে, (শুধু) তাদের জন্যেই এ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ
عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَيُرِيدُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ
يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا
وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

(রেয়াত)-টুকু (দেয়া হয়েছে); কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো, অবশ্যই তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু।

রুকু ৫

২৬. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে খুলে খুলে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের– তোমাদের পূর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা (অনুগ্রহ) করতে চান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী। ২৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হতে চান, (অপরদিকে) যারা নিজেদের (পাশবিক) লালসার অনুসরণ করে, তারা চায় তোমরা, সে ক্ষমার পথ থেকে, বহুদূরে (নিক্ষিপ্ত হয়ে গোমরাহ) থেকে যাও। ২৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে বিধি নিষেধের বোঝা লঘু করে (তোমাদের জীবন সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। ২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (কখনো) তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, (হ্যাঁ,) ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবান। ৩০. যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই (হত্যার) কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এ কাজ একেবারেই সহজ (মোটেই কঠিন কিছু নয়)। ৩১. যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটোখাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে আমি তোমাদের প্রবেশ করাবো।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿৩২﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿৩৩﴾ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ
بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ
حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ
وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا
عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿৩৪﴾

৩২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনের ওপর আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তোমরা (তা পাওয়ার) লালসা করো না, যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো তা তাদেরই অংশ হবে; আবার নারীরা যা কিছু অর্জন করলো তাও (হবে) তাদেরই অংশ; তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ (পাওয়ার জন্যে) প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যেই অভিভাবক বানিয়ে রেখেছি; যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অংগীকার রয়েছে তাদের পাওনা (পুরোপুরিই) আদায় করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের ওপর সাক্ষী হয়ে আছেন।

রুকু ৬

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী, কারণ আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, (পুরুষের এই মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হচ্ছে, (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে; অতএব সতী-সাধ্বী নারী হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের (ইযযত-আবরু ও অন্যান্য) সব অদেখা কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে; আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে তোমরা আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা সংশোধিত না হয় তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, তবে যদি তারা (এমনিই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান!

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং তার (স্ত্রীর) পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, (আসলে) উভয়ে যদি নিজেদের নিষ্পত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (পুনরায় মীমাংসায় পৌঁছার) তাওফীক দেবেন, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই সম্যক জ্ঞানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।

তাফসীর

আয়াত ২৪-৩৫

প্রকৃতির নিয়ম নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন করা ও তাকে সুবিন্যস্ত করা সম্পর্কে সূরায় সেসব কথাবার্তা এসেছে এ অধ্যায়টি তার পরিপূরক। মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এই পরিপূরকটি বিধি বিধানের বর্ণনার লক্ষ্যে দুইটি স্থান ছাড়া অন্য কোনো স্থানকে এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না। এই মৌলিক বিষয়টি সুবিন্যস্ত করার ওপর শান্ত প্রাকৃতিক পথে যেমন মানব জীবনের গতিধারা অব্যাহত থাকা নির্ভর করে, তেমনি এর ওলট পালটের মাধ্যমে সমাজে বড়ো ধরনের বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়।

এই পাঠে যেসব নারীর সাথে বিয়ে হারাম এবং যাদের ওপর গড়ে ওঠা নিষ্কলুষ একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান তথা নারী পুরুষের সমাহারকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন বলে বলা হয়েছে। তার সাথে এই পাঠটি এ কথাও বর্ণনা করে যে, এই পদ্ধতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা লুকায়িত রয়েছে এবং এই পদ্ধতি কতোটুকু নির্মল ও পবিত্র। উপরন্তু এই পাঠ পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা এবং স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যসমূহকেও নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে।

পারিবারিক কাঠামো সুবিন্যস্ত করার সাথে সাথে সম্পদের ব্যাপারে মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কিছু মূলনীতি এখানে বর্ণিত হয়েছে। নিজের অর্জিত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং অনাত্মীয়দের সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার দরুন যে সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে তাতেও নর নারীর অধিকারের বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।

সাধারণ যে বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, পূর্বাপর এই প্রসংগগুলো এসব নিয়ম শৃংখলা ও বিধি বিধান এবং ঈমানের প্রধান বুনিয়াদের মাঝে একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই বুনিয়াদ হচ্ছে এ কথাটি জানা যে, সকল নিয়ম শৃংখল ও বিধি বিধানের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবি মূলত এটাই। প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভিভাবকত্ব, সার্বভৌমত্ব, মানব জাতির জন্যে বিধান রচনা করা এবং সে সমস্ত নিয়ম নীতি ও বুনিয়াদ প্রণয়ন করা যার ওপর মানব জীবন ও তার যাবতীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।

আগের প্রসংগটি এই সূক্ষ্ম সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি করে এবং প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা বলে তাকে সতর্ক করে। এর সাথে বিষয়টি এ কথারও ইংগিত বহন করে যে, সকল প্রকার নিয়মনীতি, বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎস হচ্ছেন মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা। আর এটা আসলেই অত্যন্ত অর্থবহ একটি ইংগিত। আল্লাহর বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর

ব্যাপক জ্ঞান ও সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা। এই বৈশিষ্ট্য যেহেতু মানুষের মাঝে নেই, তাই সে মানুষ আরেক মানুষের জীবনের জন্যে মৌলিক বিধান রচনা করার কখনো উপযোগী হতে পারে না। এ অবস্থায় দুর্ভাগ্য তখনই মানুষের সাথী হয় যখন সে প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে পড়ে। দলীল প্রমাণ ছাড়া শূন্যমাঠে ভবঘুরের ন্যায় যত্রতত্র ঘুরাফেরা করে এবং অজ্ঞতা, প্রবৃত্তি ও গোঁয়ার্তুমীর ওপর নির্ভর করে ধারণা করে যে, আল্লাহর পছন্দের চেয়ে উত্তম কিছু সে নিজের ও জীবনের জন্যে নির্বাচন নিজেই করতে সক্ষম।

এখানে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় যা প্রসংগের পুনরাবৃত্তি করছে তা হচ্ছে, মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া বিধান সে সমস্ত বিধান সহজ ও স্বাভাবিক মানবীয় প্রকৃতির নিকটবর্তী। মানুষ নিজের জন্যে তাকে সহজ বিষয় হিসেবেই পেয়েছে। এই বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে আসলেই করুণাস্বরূপ। তাই মানব জাতির স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তা মানুষের জন্যে রচনা করেছেন। এ কারণেই মানবজাতি যদি কখনো এ বিধান এড়িয়ে চলে তাতে শুধু কষ্ট ও দুর্ভোগই নেমে আসে না বরং অবনতি, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাও তাদের ওপর নেমে আসে।

কোরআনের কথাকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার সময় আমরা ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে এ তত্ত্বের প্রমাণ দেখতে পাই। এটা আসলেই একটা সত্য ঘটনা। কত ভালো হতো যদি জাহেলিয়াতকে মানুষ অন্তর থেকে তাকে মুছে ফেলতো এবং চোখ দু'টোকে তার ব্যাপারে অন্ধ না করে ফেলতো।

পরিবার সমাজ ব্যবস্থার প্রথম বুনিয়াদ

সধবা স্ত্রী লোকেরা হারাম নারীদের তালিকাভুক্ত। কেননা, তারা অপর পুরুষের হেফাযতে আছে। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তারা সতী ও সধবাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা নিজ স্বামী ছাড়া অন্যদের জন্যে হারাম, তাদেরকে বিয়ে করা অন্যের জন্যে কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। এর মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রথম বুনিয়াদ রচিত হচ্ছে, অর্থাৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে পরিবারের ভিত্তিতে যেখানে অনেকগুলো পরিবারের সমন্বয় ঘটবে। পরিবারগুলো বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ এবং বংশধারার মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকবে। সাধারণত যৌন সম্পর্কের প্রসার, ব্যভিচারের ব্যাপ্তি এবং সমাজ কলুষিত হওয়ার মাধ্যমেই এসব মিশ্রণের উৎপত্তি হয়।

যে পরিবার ব্যবস্থা বিয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নির্দিষ্ট মহিলা নির্দিষ্ট পুরুষের জন্যে নির্ধারিত হয়, সেখানে নারীর সতীত্বের সম্পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণ থাকে। এটাই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, মানব প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রয়োজনগুলো আসলে মানুষ হওয়ার কারণেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের জীবনের এমন অনেক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে যা প্রাণীর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের চেয়ে মহৎ ও বড়ো। এই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেমনিভাবে মানব সমাজের সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে, তেমনি সে সমাজের জন্যে সব শান্তি, অন্তরের শান্তি, ঘরের শান্তি এবং পরিশেষে সমাজের শান্তি নিশ্চিত করে।

মানব শিশুর লালন পালনে অপরাপর প্রাণীর বাচ্চা থেকে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। একইভাবে মানব শিশু তার প্রশিক্ষণের জন্যেও অধিক সময়ে মুখাপেক্ষী থাকে। এর মাধ্যমেই সে উন্নত জীবনের প্রয়োজনসমূহকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যেগুলোর কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে।

আমরা যদি প্রাণী জগতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, প্রাণীর যৌন চাহিদার উদ্দেশ্য ও যৌন মিলন বংশবৃদ্ধি ও তার অব্যাহত ধারাবাহিকতার মাঝেই সীমিত। কিন্তু মানবজাতির যৌন চাহিদার উদ্দেশ্য শুধু এরই মাঝে সীমিত নয় বরং তা আরো গভীরতম উদ্দেশ্যের দিকে সম্প্রসারিত। এ লক্ষ্য হচ্ছে নারী পুরুষের মাঝে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করা, যাতে মানব শিশুর জীবনের হেফাযত করা এবং তার খাদ্য ও প্রয়োজনসমূহ অর্জন করতে প্রস্তুত করা, তাকে লালন পালন করা, প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাতে মানবীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যোগান দেয়া সম্ভব হয়। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তাকে সমাজ জীবনে অবদান রাখার জন্যে যোগ্য করে তোলে এবং অব্যাহত মানব উন্নয়নের দায়িত্বভার বহনে অংশগ্রহণ করার জন্যেও তাকে প্রস্তুত করে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, যৌন স্বাদ আস্বাদন করা এবং যৌন চাহিদা পূরণ করাই জগতের নারী পুরুষের জীবনের প্রথম ও প্রধান উপাদান নয়। বরং তা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি মাধ্যম। প্রকৃতি একে উভয়ের মাঝে সংযোজন হিসেবে স্থাপন করেছে। তার লক্ষ্য হচ্ছে বংশবৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতায় অংশ গ্রহণের জন্যে যৌন মিলনের পর তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান রাখার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য, তাদের মিলনের ফল হিসাবে আগত বংশের কর্তব্য এবং সার্বিকভাবে মানব সমাজের কর্তব্য। স্বীয় বংশকে এ পরিমাণ প্রশিক্ষণ দেয়া, যার মাধ্যমে সে মানুষ হিসেবে তার দায়িত্বভার বহন করা এবং তার অস্তিত্বের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

এসব বিবেচনা নারী পুরুষের সম্পর্ক ও মিলনকে পরিবারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, আর এটা হচ্ছে অনুপম ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রকৃতি একটি নারীকে একটি পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট করাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে তার সাথেই এ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। ইসলাম শুধু যৌনভোগ মনের কামনাকেই বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেনি। বরং দায়িত্ব কর্তব্যকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তাকে দীর্ঘস্থায়ী করা, আবার বিশেষ প্রয়োজনে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও জরুরী বিষয় মনে করে।

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা এবং পরিবার যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতি কোনো অবজ্ঞা প্রদর্শন করা খুবই মারাত্মক, কেননা এ পরিবর্তনশীল কামনা বাসনা এবং অদম্য কামভাবকে বৈধ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের স্থলে রাখার চেষ্টাও অপরাধমূলক প্রচেষ্টা বৈ আর কিছুই নয়। এটা এ জন্যে নয় যে, এ প্রচেষ্টা মানব সমাজে অনিয়ম, উচ্ছৃংখলতা, ব্যভিচার ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায় বরং এটি মূলত এ সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে এবং যে ভিত্তির ওপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত তাকে ভেংগে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়।

এ থেকে আমরা অপরাধের পরিধি উপলব্ধি করতে পারি, যাকে সস্তা লেখকরা ও হীন প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদের মাঝে ছড়াচ্ছে আর তা হচ্ছে পারিবারিক সম্পর্ককে ছোটো ও হেয় প্রতিপন্ন করা। তাদের মতে এটা হচ্ছে কামনা বাসনা, উত্তেজিত আবেগ ও অবাধ্য প্রবৃত্তি। এ ব্যাপারে আমরা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বক্তব্যে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করতে পারি। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসা ছাড়া কি কোনো ঘর সংসার ও বিবাহ বন্ধন সম্ভব হতে পারে?'

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং কোরআনে করীম এক্ষেত্রে যে শিক্ষা দিয়েছে হযরত ওমর ফারুক (রা.) স্বীয় বক্তব্যে তার থেকেই সাহায্য নিয়েছেন।

'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে তোমরা জেনে রেখো হয়ত তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (সূরা নেসা ১৯)

মূলত এ নির্দেশ হচ্ছে যথাসম্ভব ঘরকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। অন্তরের প্রবৃত্তিকে দমন করা ও তার চিকিৎসা করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্যে বলা হয়েছে। ঘরকে টিকিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে, নতুন প্রজন্মকে হেফাযত করা এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে পরিবর্তনশীল আবেগ, অদম্য প্রবৃত্তি এবং ক্ষণস্থায়ী কামনা বাসনা থেকে সংরক্ষণ করা।

এই গভীর দৃষ্টিকোণটির আলোকে ভোগবাদী প্রগতির ঝান্ডাবাহীদের বড়ো বড়ো হুংকার ও বুলির তুচ্ছতা ও অদূরদর্শিতা নিঃশেষ হয়ে যায়, বিশেষ করে যারা এ ধরনের দাম্পত্য জীবনের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর বৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ করে এবং তাদের ব্যাপারে গোটা মানব জাতির আমানতের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর সে আমানত হচ্ছে, নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে লালন পালন করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে তারা উন্নত মানব জীবনের চাহিদানুসারে নিজেরা বেড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সস্তা মানের লেখক ও দুষ্ট প্রচার মাধ্যমগুলো এমন সময়ে একজন নারীকে পুরুষ বন্ধু গ্রহণ করার জন্যে উৎসাহিত করে যখন তার অন্তর কোনো কারণ তার স্বামী থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছে। তারা সে নারীর অবৈধ সম্পর্ককে পবিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়। তারা স্বামী স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ককে দেহ বিক্রি করার তথাকথিত চুক্তিনামা হিসাবে আখ্যায়িত করে।

আল্লাহ তায়ালা সতী সধবা নারীদেরকে হারাম নারীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা, আর ওপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা ছিলো ভোগবাদী প্রকৃতির দাবীদারদের কথা, যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি সামর্থকে সমাজের পবিত্র বন্ধন নষ্ট করা এবং তাতে ব্যভিচার ও নৈতিক অবক্ষয় প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছে। 'আল্লাহ তায়ালা সত্য কথা বলেন এবং সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করেন।'

এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেও এ নিদের্শকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করার কতেক প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে চালানো হয়েছে। আল্লাহর এই অপছন্দনীয় মাপকাঠি, মূল্যবোধ, নিয়ম নীতি ও চিন্তা চেতনা একটি সমাজের জন্যেই রচনা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা জীবনের জন্যে যে সমস্ত বুনিয়াদ ও বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার বদলে নতুন বুনিয়াদ ও বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত দিক নির্দেশনা ছাড়া অন্য দিক নির্দেশনার প্রতি মানব জাতি ও তার জীবনকে ধাবিত করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টার হোতারা ধরে নিয়েছে যে, তারা ইসলামী সমাজের নিয়ম শৃংখলা ভেংগে চুরমার করে ফেলবে এবং মুসলিম দেশসমূহে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস, নীতি নৈতিকতা এবং সামাজিক বন্ধন বিলুপ্ত হওয়ার পথে তাদের সামনে এমন আর কোনো প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে। কেননা এগুলোই সে সমস্ত দেশে তাদের লোভ লালসা এবং কামনা বাসনা পূরণের পথে বাধা হয়ে আছে। আসলে এই দুর্ঘটনার পরিধি আরো বেশী। তারা শুধু মুসলিম সমাজের রীতি নীতি ও বুনিয়াদই নয়, গোটা মানব সমাজের রীতি নীতি ও বুনিয়াদকে ভেংগে চুরমার করে ফেলতে চায়, তারা প্রকৃতির নিয়ম নীতি ও ভিত্তিসমূহকে ভেংগে চুরমার করে ফেলতে চায়, যার ওপর মানব জীবন আজ প্রতিষ্ঠিত আছে, তার সাথে তারা মানব সমাজকে সেসব উপাদান থেকেও বঞ্চিত করতে চায়, যা আল্লাহর বৃহত্তর আমানতকে বহন করে

চলেছে, আর তা হচ্ছে উন্নত মানব জীবনের আমানত। এই অদম্য-অবাধ কামনা বাসনার ঝড়, পরিবর্তনশীল প্রবৃত্তি এবং ক্ষণস্থায়ী কামভাব থেকে পরিবারকে শান্ত ও নিরাপদ রাখা এবং এই পরিবেশে পুরো মানব জাতিকে সে পবিত্র আমানতের সাথে গড়ে ওঠার জন্যে যোগ্য নাগরিকদের হাতে ছেড়ে দেয়া থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এমনিভাবেই একদিন গোটা মানব জাতির ওপর অভিশাপ নেমে আসে, কেননা তারা স্বীয় কামনা বাসনা চরিতার্থ করা এবং যৌন স্বাদ আস্বাদন করার লক্ষ্যে নিজেই নিজেকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। তার বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপরও অভিশাপ নেমে এসেছে। একইভাবে আল্লাহর ফয়সালাও সমস্ত ব্যক্তির ওপর নাযিল হয়েছে যারা তাঁর বিধান, প্রকৃতি ও দিকনির্দেশনা থেকে দূরে সরে গেছে। আর গোটা মানব জাতি তাদের কৃতকর্মের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির ওপর মোমেন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কোনো করুণা বন্টন করেন তবে তা ভিন্ন কথা। যারা আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস ও স্বীকার করে, তার দেয়া জীবন বিধানকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মানুষকে হাত ধরে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করার আগ্রহ পোষণ করে তারা মানব সমাজকে নির্মূলকারী অনিষ্ট থেকে হেফাযত করবে। তারা একেই নিজেদের জন্যে নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, তারা মুসলিম দেশসমূহকে ভেংগে চুরমার করে ধ্বংস করে দেবে, যাতে তাদের অপচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা ভেংগে পড়তে পারে, কিছু সস্তা নিম্নমানের লেখকরা এবং এদের হীন প্রচার মাধ্যমগুলোই এসব অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধবন্দী নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

'এবং নারীদের মধ্যে তারা ছাড়া সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ।'

এটা সেসব দাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদেরকে যুদ্ধে বন্দী করে আনা হতো। অথচ তারা 'দারুল কুফুর ওয়াল হারবে' (কাফেরদের দেশে) বিবাহিত স্ত্রী ছিলো। 'দার' তথা দেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের কাফের স্বামীদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তারা এখন 'দারুল ইসলামে', এখন তাদের কোনো স্বামী নেই। সুতরাং নতুন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তাদের পবিত্রতার প্রমাণের জন্যে একটি মাসিক ঋতুই তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে, যার মাধ্যমে তারা গর্ভশূন্য প্রমাণিত হবে। অতপর যদি তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা হালাল ও বৈধ। অথবা তাদের যারা মালিক হবে তারাই তাদের সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হবে- তারা মুসলমান হোক বা নাই হোক।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' দ্বিতীয় খন্ডে এই দাসত্বের বিষয়ে ইসলামের অবস্থানের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একইভাবে ১৯তম খন্ডে সূরা মোহাম্মদেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে সমস্ত স্থান অধ্যয়ন করা যেতে পারে। সূরায়ে মোহাম্মদ-এর সে আয়াতটি ছিলো এই,

'অবশেষে তোমরা যখন কাফেরদেরকে যুদ্ধে পূর্ণরূপে পরাভূত করো, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতপর হয় তাদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের কাছ হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করো, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে।' (আয়াত ৪)

এক্ষেত্রে আমি শুধু এতোটুকুই বলতে চাই যে, যুদ্ধ বন্দীদেরকে ক্রীতদাস বানানোর বিষয়ে মুসলমানরা তাদের শত্রুদের সাথে এমন আচরণ করতো, ঠিক যতোটুকু দাসত্বের মূলনীতির

ভিত্তিতে তাদের সাথে করা প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু মুসলমানরা সে সমস্ত কাফের বন্দীদের সাথে তাদের তুলনায় সব সময়ই ভালো ব্যবহার করেছে।

ক্রীতদাস প্রথাকে শুধু মুসলমানদের পক্ষে এককভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিলো না, কেননা বন্দীদেরকে ক্রীতদাস বানানো তখন ছিলো একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম। একতরফা মুসলমানরা তা বন্ধ করে দিলে শুধু মুসলমান বন্দীরাই ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হবে। অপরপক্ষে কাফের অমুসলিম বন্দীরা স্বাধীন থেকে যাবে। আর যদি এ নিয়ম একবার প্রচলিত হয়ে যায় তাহলে কাফের শিবিরের পাল্লা মুসলিম শিবিরের ওপর ভারী থেকে যাবে এবং তখন বিধর্মী শিবিরগুলো মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করার জন্যে উৎসাহী হবে।

এ অবস্থায় মুসলিম সমাজে কাফের মহিলারা যখন বন্দী হয়ে আসবে, তখন ইসলাম তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে? তার জবাবে যদি বলা হয় এ সমস্ত বন্দী মহিলাদের জীবন শুধু খাওয়া দাওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাহলে মানুষের প্রকৃতি কখনো এটা মেনে নেবে না, বরং সেখানে প্রকৃতির একটি বিশেষ চাহিদা অপূরণীয় থেকে যাবে, যা পূরণ করা তখন অতীব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে, আর তা হচ্ছে তাদের যৌন চাহিদা মেটানো। অন্যথায় তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে, যা পুরো সমাজকে অপবিত্র ও নষ্ট করে দেবে। ওদিকে মুসলমানদের জন্যে মোশরেক নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয়, কেননা মুসলমান পুরুষ ও মোশরেক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ হারাম, সুতরাং এক্ষেত্রে এই একটি পথ ছাড়া অন্য কোনো পথই অবশিষ্ট থাকলো না যে, যেহেতু তারা মোশরেক, বিয়ে ছাড়াই তাদের সাথে সহবাস করা এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধ করে নেই, আর এটা সম্ভব এ সমস্ত মোশরেক নারীদের একটি মাসিক ঋতু অতিবাহিত করার পর তারা গর্ভশূন্য তা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে। 'দারুল কুফর ওয়াল হারবে' অবস্থিত তাদের স্বামীদের অবস্থান ও বন্দী হওয়ার মাধ্যমে এ সম্পর্ক এমনিই ছিন্ন হয়ে যায়।

বিয়ের কতিপয় মূলনীতি

নিষিদ্ধ ঘোষিত নারীদের বর্ণনা করার পর হালাল নারীদের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, এ বর্ণনার পূর্বে কোরআনে করীমে হারাম এবং হালাল করার মূলনীতি এবং হারাম এবং হালাল করার মূল উৎসের মাঝে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়। এখানে হারাম ও হালাল করার উৎস বলতে সে উৎসকে বুঝানো হয়েছে যে উৎস ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হারাম বা হালাল নির্ধারণ করা অথবা মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান রচনা করার অধিকার নেই।

'এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম।'

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে দেয়া ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি এবং হুকুম, এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় এটাই। নফসের অনুসরণ, সামাজিক প্রথার আনুগত্য কিংবা পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্যের নিয়ন্ত্রণ কোনোটাই এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কেতাব, বিধান ও হুকুম। একমাত্র আল্লাহর কেতাবই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য উৎস, যার থেকে তোমরা হালাল এবং হারামের বিধান গ্রহণ করো। তার পক্ষ থেকে যা তোমাদের ওপর ফরয করা হয়, তা তোমরা সংরক্ষণ করো এবং আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের ওপর ফরয করেছেন এবং যার অংগীকার তিনি করেছেন তা তোমরা তার কাছে গ্রহণ করো।'

এ আয়াতগুলোতে কোরআনে কারীমে যাদেরকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, তারা জাহেলিয়াতেও হারাম ছিলো। সহোদর দুই বোনকে একসাথে একত্রিত করা এবং পিতার

বিবাহিতা স্ত্রীকে বিয়ে করা ছাড়া জাহেলী প্রথাতে অন্য কোনোটিই বৈধ ছিলো না, এমনকি জাহেলী রীতি নীতিতেও পিতা, দাদা ও নানার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা অপছন্দীয় ছিলো। আর একাজকে সে সমাজে গযব এবং অসন্তুষ্টির কাজ হিসাবেও আখ্যায়িত করা হতো। অতপর যখন কোরআনে করীমে তার আগমনের পর এ সমস্ত হারাম নারীদের নিষিদ্ধ করার প্রথা প্রতিষ্ঠিত করলো তখন কোরআন কিন্তু এদের হারাম করার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের রীতি নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করেনি বরং বলেছে,

'এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম।'

এই হচ্ছে এক পর্যায়ের শেষ কথা। আকীদা ও ফেকাহ সংক্রান্ত মূলনীতির বর্ণনার জন্যে এ ক্ষেত্রে আরো চিন্তা গবেষণা করা প্রয়োজন। এ গবেষণা আমাদের বাস্তব জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রেই কাজে আসবে।

নিসন্দেহে ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র মূলনীতি যার ওপর বিশ্বমানবতার বিধান রচনা করা নির্ভরশীল তা হচ্ছে আল্লাহর বিধান। কেননা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ। যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একক উৎস তিনি। সুতরাং যে বিধান এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা সম্পূর্ণ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য এটি নতুন করে সংশোধনযোগ্যও নয়। জাহেলিয়াতের সকল চিন্তা চেতনা, মূল্যবোধ, মাপকাঠি, রীতি নীতি, বিধি বিধান ও নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত। কারণ জাহেলিয়াত তার কোনো কিছুই সঠিক মূলনীতি থেকে গ্রহণ করেনি।

ইসলাম যখন জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলাম আগমনের সাথে সাথে তাই জাহেলিয়াতের সকল অবস্থা সকল মূল্যবোধ, সকল বিধি বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা তা হচ্ছে সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত যা কোনো অবস্থায়ই সংশোধনযোগ্য নহে। এক্ষেত্রে ইসলাম যদি কোনো জাহেলী নীতিকে বহাল রাখে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তাকে আল্লাহর হুকুম ও অনুমোদন দ্বারাই বহাল রাখা হয়েছে। তার সাথে এটা ধরে নিতে হবে যে, জাহেলিয়াতে যা ছিলো তা খসে পড়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

যদি ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পর্কিত কোনো বিষয় আগে কোনো সামাজিক রীতি নীতিকে সমর্থন করে, তখন সে রীতি নীতিকে আল্লাহর নির্দেশে তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও শক্তি দান করা হয়। অতএব এ সমস্ত বিষয়ে সে সামাজিক প্রথা ও রীতি নীতির মাঝে একটা ক্ষমতা এসে যায়। এক্ষেত্রে যে শক্তি গ্রহণ করা হয় তা আসে বিধান রচনাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে- মানুষ বা পরিবেশ থেকে নয়। কোনো সামাজিক রীতি নীতিকে বহাল রাখা বা তার সাথে একমত হওয়া অর্থ এটা নয় যে, সে পরিবেশ সামাজিক প্রথাকে কোনো রকম ক্ষমতা দান করা হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা তা কখনো নয় বরং বিধান রচনাকারী আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রথাকে বিধানের অংশ হিসেবে গণ্য করার কারণেই তাতে ক্ষমতা আসে। অন্যথায় সে প্রথা ভ্রান্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং থাকবে। কেননা, এ প্রথা আল্লাহর নির্দেশ তথা একমাত্র ক্ষমতার উৎস থেকে কোনো বিধান গ্রহণ করেনি, আল্লাহ তায়ালা সে সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ করছেন যেসব ব্যাপারে জাহেলিয়াত বিধান রচনা করেছে অথচ তাতে আল্লাহর অনুমোদন নেই,

'তাদের কি এমন অংশীদার দেবতা আছে যারা তাদের জন্যে সে বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি?'

এ আয়াত এ কথার দিকেই ইংগিত করে যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে বিধান রচনাকারী।

এই মূলনীতির প্রতিই এই উপসংহারটি ইংগিত করেছে, 'এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম।' কোরআনে করীমের যাবতীয় বক্তব্য তার বিধান রচনা করার প্রতিটি প্রসংগ এই মূলনীতিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। যখনই বিধান হিসেবে কোরআনে কারীমের আলোচনা আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই উৎসের আলোচনাও এসে যায় যে, কোনো উৎস এ বিধানকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। আর যখন কোরআন পাকের জাহেলী বিধি বিধান, নিয়ম কানুন, রীতি নীতি ও চিন্তা চেতনার আলোচনা আসে, তার সাথেই একথার উল্লেখ করা হয়, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারোই বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।' (সূরা ইউসুফ ৪০)

এই আয়াতে জাহেলী বিধান ভ্রান্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এ সমস্ত বিধানের উৎপত্তি সঠিক উৎস থেকে হয়নি।

এখানে যে মূলনীতিটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি, এটা মূলত ইসলামী বিধানের পরিচিত মূলনীতি নয়, ইসলামী বিধানের পরিচিত মূলনীতি হচ্ছে, সকল বস্তুরই মূল হচ্ছে হালাল হওয়া, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার নিষিদ্ধতার ওপর কোনো বক্তব্য বা প্রমাণ না পাওয়া যায়। সকল জিনিসের মূল হচ্ছে হালাল এই মূলনীতিও আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এটা মূলত সে মূলনীতির কথাই বলে যা আমরা ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। এখন আমরা জাহেলিয়াতের ওই সমস্ত বিধি বিধান সম্পর্কে আলোচনা করছি, যা আল্লাহর রচিত বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করেই প্রণয়ন করা হয়েছে, এই মূলনীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। হাঁ, যদি আল্লাহর বিধান এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে বহাল রাখে, তবে তা অন্য কথা। তখন সে বিধান আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে বৈধতা ও ক্ষমতা গ্রহণ করে।

কোরআনে হাকীম এই নিষিদ্ধ নারীদের বর্ণনা এবং আল্লাহর হুকুমের সাথে তার সংশ্লিষ্টতার বর্ণনা শেষ করার পর নতুন কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা শুরু করেছে যেখানে মানুষ বিয়ের মাধ্যমে তাদের প্রকৃতির চাহিদার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হবে। সে পদ্ধতির বর্ণনাও করা হয়েছে, যে পদ্ধতিতে নারী পুরুষ একত্রিত হওয়াকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন, যার ফলশ্রুতিতে ঘর সংসার গড়ে উঠবে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং সাগ্রহে স্বামী স্ত্রী মিলিত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করবে।

'এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ ও কুশলী।' (সূরা নেসা ২৪) হারাম ঘোষিত এ নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারীদের সাথে বিয়ে বৈধ। যারা বিয়ে করতে আগ্রহী তারা মোহর দিয়ে বৈবাহিক পদ্ধতিতে দেয়ার মাধ্যমে নারীদেরকে গ্রহণ করবে, বিয়ে ছাড়া তাদের ইযযত আবরুকে সম্পদের মাধ্যমে ক্রয় করার জন্যে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে-ব্যভিচারের জন্যে নয়।' বাক্য শেষ করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত বাণীকে শর্ত হিসেবে পেশ করেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা শর্তটিকে শুধু 'হাঁ' বোধক আকৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে বলে তার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা এরপর 'না' বোধক একটি শর্তারোপ করেছেন যে- ব্যভিচারের জন্যে নয়। অধিক স্পষ্ট ও গুরুত্বারোপ করার জন্যেই এটা করা হয়েছে। উপরন্তু এ শর্তের মাধ্যমে আল্লাহ

তায়ালা দু'টি চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন। প্রথমত, বৈধ সম্পর্ক যা আল্লাহ তায়ালা চান এবং পছন্দ করেন এবং তা হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, অবৈধ সম্পর্ক, যা তিনি অপছন্দ করেন এবং তার থেকে বিরত থাকার জন্যে মানব জাতিকে তিনি নির্দেশ করেন তা হচ্ছে, নারীকে বিবাহপূর্ব বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তার সাথে ব্যভিচারের সম্পর্ক স্থাপন করা। আর এ উভয় সম্পর্কই জাহেলী সমাজে স্বীকৃত ছিলো।

জাহেলী সমাজের বিয়ে

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

'জাহেলী সমাজে বিয়ে প্রথা চার ভাগে বিভক্ত ছিলো,

১. কেউ কেউ আজকের বিয়ের মতো পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষের পিতা বা অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোহর দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করতো।

২. স্ত্রী মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্বামী তাকে বলতো, তুমি এবার অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে পণ্য অর্থাৎ বীর্য ক্রয় করো। অপর কথায় তুমি তার সাথে সহবাস করো। সে ব্যক্তির সাথে স্ত্রী যতোদিন সহবাস করবে স্বামী ততোদিন তাকে দূরে রাখবে, এমনকি তাকে স্পর্শও করবে না। অতপর যখন সে মহিলা অপর পুরুষের বীর্য দ্বারা গর্ভবতী হওয়া নিশ্চিত হবে, তখন স্বামী ইচ্ছা করলে তার সাথে দৈহিক মিলন করতো। এটা এ জন্যে করা হতো, যাতে সন্তানের বংশ সংভ্রান্ত ও উঁচু হয়। উপরোক্ত বিয়ের নাম ছিলো পণ্য বীর্য-ক্রয় করার বিয়ে।

৩. কতেক লোক একজন মহিলার ওপর চড়াও হয়ে তার সাথে সহবাস করতো, এতে করে সে গর্ভবতী হওয়ার পর এই মহিলা সন্তান প্রসব করলে সে লোকদেরকে তার কাছে ডেকে পাঠাবে যারা তার সাথে যৌন মিলন করেছিলো। ডাকলে তার কাছে আসা ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সকলে তার কাছে এসে সমবেত হলে, তখন সে সকলকে সম্বোধন করে বলতো, তোমরা আমার সাথে কি আচরণ করছো তা তোমরা সকলেই জানো, যার ফলশ্রুতিতে আমি এ বাচ্চা প্রসব করেছি। অতপর উক্ত মহিলা তাদের মধ্যে থেকে পছন্দসই কারো দিকে ইংগিত করে বলবে, এটা হচ্ছে তোমার সন্তান। তখন সেই সন্তান এই লোকের হয়ে যাবে। অস্বীকার করার তার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৪. অসংখ্য পুরুষ নির্দিষ্ট এক মহিলার সাথে সহবাস করতো, পতিতা হওয়ার দরুণ কাউকে সে নিষেধ করতো না। কারণ জাহেলী যুগে পতিতারা তাদের ঘরের সামনে কোনো চিহ্ন বা ঝান্ডা লটকিয়ে রাখতো, যাতে মানুষ সে চিহ্ন দেখে তাদের ঘরে প্রবেশ করতে পারে। অতপর তাদের মধ্যে থেকে কেউ গর্ভবতী হওয়ার পর যখন সন্তান প্রসব করতো, তখন অসংখ্য লোক তার পাশে জড়ো হয়ে কিছু অভিজ্ঞ লোকদের ডাকতো। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সন্তানকে নির্ধারিত ব্যক্তির বলে ঘোষণা দিতো। সে ক্ষেত্রে সে পুরুষের অস্বীকার করার মতো কোনো পথ অবশিষ্ট থাকতো না।'

তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার ছিলো প্রকাশ্য ব্যভিচার। কোরআনে কারীম তার থেকে বিরত থাকার জন্যে মানুষকে নির্দেশ করেছে। প্রথম প্রকার নির্দেশ হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। আল্লাহ তায়ালা এ পন্থা অবলম্বন করার জন্যে মানুষকে নির্দেশ করছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিয়ের ব্যাখ্যা কিভাবে দেবো- তা আমি জানি না।

বিশ্বজনীন গ্রন্থ কোরআনে হাকীম বিয়ের যে পন্থাকে এখানে অংকন করছে এবং যা আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করা, যার মধ্যে রয়েছে সতীত্বের হেফাযত, সংরক্ষণ ও

নিজেকে কলুষিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখা, অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীর পবিত্রতা বহাল রাখা এবং সতীত্বের সংরক্ষণ করা। কোরআনের এক পাঠ পদ্ধতি অনুসারে শব্দটি হবে কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য অর্থাৎ 'মুহসেনীন' এর কর্মবাচক বিশেষ্য হচ্ছে 'মুহসানীন'।

উভয় প্রকারে পড়াই শুদ্ধ 'মুহসানীন' পড়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, সৎ থাকার উদ্দেশ্যে, পাপ মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে।

আর 'মুহসানীন' পড়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, পবিত্র ও নির্মল। এ দু'অর্থই পবিত্র ও নির্মল অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য। ঘর, পরিবার ও সন্তানদের সংরক্ষণ করা এবং এ প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় মযবুত ও স্থায়ী করা, এগুলো এসব ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে, 'মোসাফেহীন' আরবী ব্যাকরণে এটি মূল 'সিফাহ' ধাতু থেকে উদ্ভূত। তার মূল অক্ষর তিনটি 'সিন, ফা, হা'। তার অর্থ হচ্ছে, নীচু ও ঢালু ভূমিতে পানি নিক্ষেপ করা। এটি যখন ব্যাকরণের অন্য প্রকৃতিতে আসবে তখন তার অর্থ হবে, নারী পুরুষ উভয়ে যৌথভাবে জীবনের পানি ঢালবে, (একে অপরের সাথে সহবাস করবে) একটি জাতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দেয়া, তার প্রশিক্ষণ, লালন পালন এবং সংরক্ষণের এই কাজগুলো নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। অথচ তা না করে তারা জীবনের পানি ঢালাঢালি তথা বীর্যপাত করে বেড়াবে, সাময়িক যৌন স্বাদ আস্বাদন করবে এবং ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করবে এটা আল্লাহ তায়ালা চান না। এ অবস্থায় তারা বৈধ সম্ভোগের ধার ধারবে না, বরং যে কোনো উপায়েই হোক তাদের যৌন চাহিদা মেটাবে। তারা অপবিত্রতা থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করবে না, সন্তানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে না এমনকি তারা ঘরকেও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করবে না।

এমনিভাবে কোরআনের এই বাক্যটি দুটি শব্দের মাধ্যমে দুই প্রকার জীবনের পূর্ণাংগ দুটি চিত্র সমাজের সম্মুখে চিত্রায়িত করেছে। এ দুটি চিত্রের মাঝে যেটিকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন তাকে তিনি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন এবং তাকে ভালো হিসেবে তিনি মানব সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর যে চিত্রটি তিনি অপছন্দ করেন তাকে কুৎসিত ও বিকৃত করে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। বাস্তব জীবনে তিনি এ দুই চিত্রের প্রত্যেকটির মর্মার্থ, বাস্তবতা ও যথার্থতা বর্ণনা করেছেন। আর এটা হচ্ছে কোরআনে কারীমের বর্ণনার অভিনবতার একটি দৃশ্য।

নারীর অধিকার

সম্পদ ও মোহরের বিনিময়ে নারীকে অন্বেষণ করার শর্ত বর্ণনা করার পর আরও একটি চিত্র কোরআনে হাকীমে অংকন করা হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে,

'অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান করো।'

কোরআনে কারীমের এই আয়াতে মোহরকে নারীর সাথে মিলিত হবার নির্ধারিত হক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অতপর হারাম ঘোষিত নারীদের ছাড়া হালাল নারীদেরকে ভোগ করতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করবে, তার জন্যে উত্তম পন্থা হচ্ছে, একমাত্র বিয়ে শাদীর মাধ্যমে সে নিজকে পবিত্র রাখার লক্ষ্যে নারীকে গ্রহণ করবে এবং বিনিময়ে স্ত্রীকে নির্ধারিত মোহর দান করবে। নারীকে মোহর দেয়া পুরুষের ওপর ফরয-এটা নফল ঐচ্ছিক বা দয়া নয়। এটা নারীর এমন এক অধিকার যা আল্লাহ তায়ালা পুরুষের ওপর ফরয করেছেন। পুরুষের এমন ক্ষমতাই নেই যে, সে কোনো বিনিময় ছাড়া তার স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। জাহেলী সমাজের কোনো কোনো অবস্থায় বিনিময় ছাড়া বিয়ে শাদী অনুষ্ঠিত হতো জাহেলী যুগে শিগার বিয়ের পদ্ধতিতে বিনিময় ও

দান প্রথা চালু ছিলো, ইসলামে এ ধরনের বিনিময়ের শর্তারোপ করা স্বামীর জন্যে বৈধ নয়। উল্লেখ, শিগার বিয়ে পদ্ধতি হচ্ছে, পুরুষ একজন নারীকে এ শর্তে বিয়ে করবে যে, তার পরিবর্তে মেয়ের অভিভাবককে তার একটি নারী। যেন তারা উভয়েই এককেটি চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কিছু।

নারীর অধিকার ও তার আবশ্যকতা বর্ণনার পর সে বিষয়ের বর্ণনা শুরু হচ্ছে যার ওপর স্বামী স্ত্রী তাদের যৌথ দাম্পত্য জীবনের চাহিদা এবং পারস্পরিক আবেগ অনুভূতিকে একত্রিত করতে সম্মত হয়েছে।

'তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি মোহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।'

মোহর নির্ধারণের পর তা হবে মহিলার নিরংকুশ অধিকার এবং এ হিসেবে মোহর সাব্যস্ত হওয়ার পর, যেমনি সে তার নিজস্ব ধন সম্পদে অধিকার খাটায় ঠিক তদ্রূপ মোহরের ওপরও অধিকার খাটানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। এরপর যদি স্ত্রী পুরো মোহর বা আংশিক মোহর মাফ করে দেয় তাতে কোনোপ্রকার দোষ বা গুনাহ নেই। এমনিভাবে যদি স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীর মোহর বৃদ্ধি করে তাতেও কোনোপ্রকার দোষ নেই। কেননা, এটা স্বামীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক্ষেত্রে মূল কথা হলো মোহর নির্ধারণের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হওয়া। এরপর যদি স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে কোনোপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে কোনো ধরনের দোষ বা গুনাহের কারণ নেই। অতপর এই আয়াতের সমাপনী বক্তব্যটি এর বিধি বিধানকে তার মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট করছে, বিধানের মধ্যে কি হেকমত, কতোখানি যথার্থতা লুকায়িত আছে তাও বর্ণনা করছে।

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ, কুশলী।'

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই উল্লেখিত বিধান রচনা করেছেন। তিনি এ বিধান রচনা করার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও হেকমতের সাহায্য নিয়েছেন। কেননা তিনিই জানেন বান্দা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোথা থেকে বিধান ও নিয়ম নীতি গ্রহণ করবে। বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বিভিন্ন সমস্যাসমূহ তারা কিভাবে মোকাবেলা করবে তাও তিনি জানেন। অতপর তাদের জ্ঞান ও হেকমাত পরিপূর্ণ উৎসের প্রতি আশ্বস্ত করানো হচ্ছে, সেখান থেকে মানব জাতি তাদের প্রয়োজনীয় বিধান গ্রহণ করে থাকে

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ, কুশলী।'

দাসী বিয়ে প্রসংগ

যদি কোনো ব্যক্তির মুসলমান স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ যোগাড় হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে সে সক্ষম না হয়, যদি সে মানসিক অথবা নৈতিক অবক্ষয়ের আশংকা করে, তখন সে দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। (আয়াত ২৫)

নিসন্দেহে এ দ্বীন মানুষের প্রকৃতি, শক্তি সামর্থ, বাস্তবতা এবং তার প্রয়োজনের সীমারেখার গন্ডিতে তার সাথে আচরণ করে। আর এ দ্বীন যখন একজন মানুষকে তার জাহেলী জীবনের নীচু থেকে হাত ধরে ইসলামী জীবনের সুউচ্চ আসনে আরোহণ করায়, তখন সে তার প্রকৃতি, শক্তি সামর্থ, বাস্তব অবস্থা এবং তার প্রয়োজন ও চাহিদাকে কখনো ভুলে যায় না। বরং সে এই উঁচু শৃংগে আরোহণ করার পথে উল্লেখিত সকল বিষয়কে সাথে নিয়েই চলে। এ দ্বীন জাহেলিয়াতের অবস্থাকে কখনো সত্যিকার অবস্থা হিসেবে মনে করে না। কেননা জাহেলিয়াতের অবস্থা হচ্ছে সর্বদাই নিম্নগামী। ইসলাম এসেছে মানবতাকে জাহেলিয়াতের নীচু অবস্থান থেকে উঁচু আসনে আসীন করার জন্যে। ইসলাম মনে করে উন্নতির ওপর মানুষের শক্তি সামর্থ থাকা ও মানুষের অবস্থানসমূহের একটি বাস্তব অবস্থা। জাহেলিয়াতের নর্দমায় নিক্ষেপ হওয়াটা কোনো বাস্তবতাই

নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে জাহেলিয়াতের পংকিলতা ও নর্দমা থেকে উর্ধে ওঠার ব্যাপারে ক্ষমতাবান হওয়া। একমাত্র নিখিল বিশ্বের স্রষ্টাই মানুষের বাস্তব অবস্থাসমূহকে ভালো করে জানেন। মানুষের পুরো তথ্যও তিনি জানেন। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার অন্তরের আকুতি বিকৃতিও ভালো করে জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অনেক সময় বিধর্মীদের পক্ষের কিছু লোক বন্দী হতো। অতপর মুসলমানরা কোনো বিনিময় ছাড়া বদান্যতা প্রকাশ করে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দিতো। আবার কখনো মুসলমান এবং তাদের সাথে যুদ্ধরত তাদের শত্রুদের মাঝে নানাবিধ পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে সম্পদের বিনিময়ে অথবা মুসলিম কয়েদীদের মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হতো। পূর্ববর্তী আয়াতে ইসলাম এই ধরনের কিছু বাস্তবতারই সম্মুখীন হয়েছে এবং তার সমাধান এভাবে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি ক্রীতদাসীদের মালিক হবে সে মানবীয় চাহিদা পূরণ করার জন্যে তাদের সাথে দৈহিক মিলন করবে। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ যদি বন্দী নারী মোমেন হয় তাহলে বিয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে সহবাস করবে। অন্যথায় 'দারুল হারবে'র বিবাহিতা নারীদের একটি মাসিক ঋতু অতিক্রান্ত করার পর তারা গর্ভশূন্য প্রমাণ হওয়ার পর বিয়ে ছাড়াই তাদেরকে ভোগ করবে। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে মনিব ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্যে সে সমস্ত নারীদেরকে উপভোগ করা বৈধ করেনি। হাঁ, যদি কেউ তাদেরকে বিয়ে করে ভোগ করে তাহলে অন্য কথা আর বিয়ে তো একজনের সাথেই সম্ভব। এমনিভাবে ইসলাম টাকা পয়সার বিনিময়ে মুসলিম সমাজে তাদের ইযযত আবরু বিক্রি করা বৈধ করেনি। তদ্রূপ ইসলাম এটাও বৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করেনি যে, মনিব তাদেরকে মুক্ত করে দেবে, আর তারা মুসলিম সমাজের পতিতাবৃত্তি চালিয়ে যাবে।

এই আয়াতে বাঁদী দাসীদের সাথে বিয়ে সংক্রান্ত নিয়ম নীতি ও এর বৈধ পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে।'

বস্তুত সামর্থ থাকা অবস্থায় একজন স্বাধীন রমণীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম মুসলমানদের উৎসাহিত করে থাকে। কারণ স্বাধীনতা একজন স্বাধীন রমণীর জন্যে রক্ষাকবচ। এই স্বাধীনতাই তাকে শিক্ষা দেয়, কিভাবে স্বীয় মান সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে এবং কিভাবে নিজ স্বামীর মান মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এখানে তাদেরকে 'সতী সাধ্বী' বলা হয়েছে, বিবাহিতা বলা হয়নি। কারণ পূর্বের আয়াতে বিবাহিত মহিলাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এখানে এ শব্দ দিয়ে স্বাধীন মহিলা, সতী সাধ্বী মহিলাদের কথা বুঝানো হয়েছে। স্বাধীন নারীদের মাঝে সম্ভ্রমবোধ আত্মমর্যাদাবোধ থাকে, তাদের জীবনে নিরাপত্তা থাকে, পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদা থাকে। পারিবারিক মান মর্যাদার ব্যাপারে তারা সদা সচেতন থাকে। তাই তারা অনৈতিকতা ও অশালীনতা পরিহার করে চলে। এ সকল বৈশিষ্ট্য যেহেতু একজন দাসীর মাঝে কখনো থাকে না, তাই সতীত্বের গুণও এদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকার কথা নয়। এমনকি বিয়ের পরও তাদের মাঝে দাসত্বের সেই কলুষ ও আবিলতা থেকে

যায়। সুতরাং একজন স্বাধীন নারীর মাঝে সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার যে সুযোগ থাকে তা কোনো বাঁদী দাসীর বেলায় থাকে না। অধিকন্তু, পারিবারিক মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ও তাদের মাঝে অবশিষ্ট থাকে না। সর্বোপরি এদের গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় সমাজ তাদেরকে স্বাধীন রমণীর গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তানদের তুলনায় কিছুটা নিচু দৃষ্টিতে দেখে। কাজেই তাদের সাথে দাসত্বের একটা ছাপ কোনো না কোনোভাবে থেকেই যায়। আর যে সমাজে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সমাজে এসব কয়টি দিকই বিদ্যমান ছিলো।

এ সকল দিক বিবেচনা করেই ইসলাম চায় না যে, কোনো স্বাধীন মুসলিম পুরুষ সামর্থ থাকা সত্তেও কোনো বাঁদী দাসীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হোক। বরং সামর্থ না থাকলে এবং অপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়লে কেবল তখনই একজন দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হলে, পদস্খলনের ভয় দেখা দিলে তখন আর ইসলাম মানুষের সাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। তাই এমন পরিস্থিতিতে মালিকানাধীন কোনো মোমেন দাসীর সাথে বিয়েকে বৈধ বলে ঘোষণা করে।

এ ক্ষেত্রে সেই সকল দিক বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা স্বাধীন নারীদের বিয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। প্রথমত তাদেরকে মোমেন হতে হবে,

'সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিয়ে করবে।'

দ্বিতীয়ত, তাদের পারিশ্রমিক অবশ্য কর্তব্যরূপে তাদেরকেই পরিশোধ করে দিতে হবে তাদের মনিবদেরকে নয়।

তৃতীয়ত, এই মোহর তথা পারিশ্রমিক হবে মোহরানা আকারে এবং বিয়ের মাধ্যমেই তাদেরকে ভোগ করতে হবে, রক্ষিতা বা বেশ্যা হিসেবে নয়। তাই বলা হয়েছে,

'তারা ব্যভিচারিণী ও উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না।'

তৎকালীন সমাজে স্বাধীন রমণীদের সাথে এ জাতীয় যৌন সম্পর্কের প্রচলন ছিলো, যার উল্লেখ হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একইভাবে ক্রীতদাসীদের মাঝে বেশ্যাবৃত্তির প্রচলনও তখন ছিলো। তৎকালীন সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের বাঁদী দাসীদেরকে দেহ বিক্রির মতো নোংরা পন্থায় উপার্জন করার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতো। মদীনার মোনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্তেও স্বীয় মালিকানাধীন চার চার জন দাসীকে এই পন্থায়ই অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করতো। জাহেলী যুগের এই অবশিষ্ট পংকিলতা থেকে আরব জাতি তথা সমগ্র মানবতাকে মুক্ত ও পবিত্র করার জন্যেই ইসলামের আগমন ঘটেছে।

একই সাথে ইসলাম স্বাধীন পুরুষ এবং সে সকল ক্রীতদাসীদের মাঝে জীবন যাপনের কেবল একটি পথের সন্ধানই দিচ্ছে সেটা হলো বিয়ে। কারণ, এই বিয়েই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে একটি ঘর ও একটি পরিবার গঠনের জন্যে একজন নারী নিজেকে একজন পুরুষের হাতে সঁপে দেয়। জন্তু জানোয়ারের ন্যায় অবাধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে নয়, আর এই বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর আবশ্যকীয় রূপে মোহরানা নামক একটা আর্থিক দায় দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে- রক্ষিতা বা বেশ্যার পারিশ্রমিকরূপে নয়। এমনিভাবে বিয়ে নামক এই সম্পর্ককে সেই দাস প্রথার যুগেও জাহেলিয়াতের পংকিলতা থেকে পবিত্র রেখেছে। এই পংকিলতায় মানব সমাজ ততোই নিমজ্জিত হবে, যতো বেশী সে জাহেলিয়াতের প্রতি ধাবিত হবে, আকৃষ্ট হবে। যেমনটি বর্তমান যুগে হচ্ছে। কারণ বর্তমানে সব জায়গায় জাহেলিয়াতেরই জয় জয়কার চলছে, ইসলামের নয়।

ইনসাফের ইসলামী দৃষ্টিভংগী

আয়াতের এই অংশটুকুর আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, পবিত্র কোরআন ইসলামী সমাজে একজন স্বাধীন পুরুষ ও একজন ক্রীতদাসীর মানবীয় সম্পর্কের রূপটিকে কি ভাষায় ও ভংগিতে বর্ণনা করছে এবং ইসলামী সমাজ বিষয়টির যখন সম্মুখীন হয় তখন সেটিকে এই জীবন বিধান কি দৃষ্টিভংগিতে দেখে। এখানে তাদেরকে দাসী বা বাঁদী বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং উল্লেখ করা হয়েছে 'যুবতী' বলে।

কেননা সে যুগে সকল দেশ ও সমাজে দাস দাসীর ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস ও বিবেচনা বিরাজিত ছিলো, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভংগিই ইসলাম পোষণ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব হিসেবে একজন স্বাধীন ও ক্রীতদাসের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। একই মূল থেকে মানব জাতির উদ্ভব। এখানে পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে মানবতার বন্ধন, ঈমানের বন্ধন। বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছে। তোমরা পরস্পর এক।'

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, সে সকল ক্রীতদাসী যাদের মালিকানাভুক্ত ছিলো তাদেরকে মনিব বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'অভিভাবক'। এরশাদ হয়েছে,

'তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো।'

লক্ষণীয় যে, এ সকল ক্রীতদাসীর মোহরানার অর্থ তাদের মনিবদের প্রাপ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি, বরং তাকে তাদের নিজেদেরই অধিকার রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই তাদের সকল উপার্জনের ওপর তাদের মনিবদের যে একচ্ছত্র অধিকার তৎকালীন সমাজে একক নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিলো, তা থেকে এই মোহরানার অর্থ বাদ পড়ছে। কারণ, এটা উপার্জন নয়, বরং এটা তার একজন পুরুষের সাথে সম্পর্কজনিত অধিকার। তাই বলা হয়েছে, 'তাদের মোহরানা পরিশোধ করে দাও।'

এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মূলত ইসলাম বাঁদী দাসীদেরকে সম্মানিত করেছে, তাদেরকে দেহ বিক্রির মতো ঘৃণ্য পেশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাদেরকে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এই যে সম্মান এই যে সুবিবেচনা এ সবকিছুই করা হয়েছে কেবল সে সকল বাদী দাসীদের মানবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। অথচ তারা এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাস করতো, যখন প্রকৃত মানবতার ছিলো সত্যিই বড়ো অভাব।

জাহেলী যুগে দাস দাসীদের প্রতি যে অমানবীয় দৃষ্টিভংগি পোষণ করে তাদেরকে সকল অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত রাখা হতো, সেই তুলনায় তাদের প্রতি ইসলামের যে করুণা ও মানবীয় মর্যাদার দৃষ্টিভংগি ছিলো তার প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে, ইসলাম তাদেরকে কতটুকু মানবীয় মর্যাদায় স্থান দিয়েছে। কারণ ইসলাম দাসত্বের ন্যায় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির কারণে কাউকে এই মানবীয় মর্যাদা থেকে কখনো বঞ্চিত করে না।

এই ক্ষেত্রে ইসলাম যে কতটুকু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছে তা কেবল তখনই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে, যখন তুলনা করে দেখা হবে যে, আধুনিক জাহেলিয়াতের এই যুগে বিজয়ী সেনারা বিজিত সম্প্রদায়ের নারী ও যুবতীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করে থাকে। যৌন দাসীদের কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা আছে। আরও জানা আছে বর্তমান জাহেলিয়াতের বিজয়ী সেনারা বিজিত সমাজে কি ধরনের নোংরামি ও কলুষের জন্ম দিয়ে থাকে, যার দুষ্ট প্রক্রিয়া থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও সমাজ জীবন মুক্ত হতে পারে না!

এর পরের অংশে বিয়ের পরও কোনো দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার জন্যে তুলনামূলক নমনীয় শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এই নমনীয় শাস্তি তার অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। কারণ, সে একজন স্বাধীন সতী নারীর তুলনায় চারিত্রিকভাবে দুর্বল। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও তার দুর্বল। এমতাবস্থায় কোনো আর্থিক বা পারিবারিক মর্যাদার লোভে আকৃষ্ট হয়ে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া তার বেলায় বিচিত্র কিছুই নয়। সুতরাং এই দিকগুলো বিবেচনা করেই ইসলাম তাদের একজন অবিবাহিত স্বাধীন মহিলার শাস্তির অর্ধেক শাস্তির বিধান করেছে।

এটা জানা কথা যে, একমাত্র বেত্রাঘাতের শাস্তিই হচ্ছে এমন শাস্তি যা বিভাজনযোগ্য। আর এই বিভাজন পাথর নিক্ষেপের মতো শাস্তির বেলায় সম্ভবপর নয়। কাজেই কোনো বিবাহিত ক্রীতদাসী ব্যভিচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে একজন কুমারী স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে কুমারী দাসীর শাস্তি কি হবে সে বিষয়ে শরীয়তের আইনবিদদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ তার বেলায়ও কি বিচারক একজন কুমারী স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তির রায় দেবেন? অথবা তার মনিবই তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে অর্ধেক শাস্তিরও কম শাস্তি প্রদান করবে? এই মতবিরোধের সুরাহা শরীয়তের আইনশাস্ত্রে করা হয়েছে। তবে আমরা এই 'ফী যিলালিল কোরআন'-তাফসীরে সে মতই গ্রহণ করবো যাতে মানুষের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং একই সময় তাতে অপরাধীর সংশোধন ও সুমার্জনেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলাম দাসত্ব জীবনের নিম্ন মর্যাদাকে অধিক শাস্তি বিধানের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেনি যেমনি তৎকালীন জাহেলী সমাজে করা হতো। তৎকালীন সমাজে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী অথবা উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের লোকদের মাঝে ব্যবধান করা হতো। ফলে একজন উচ্চবর্ণের অপরাধী লঘু শাস্তি পেতো, পক্ষান্তরে একজন নিম্নবর্ণের অপরাধী পেতো কঠিন ও নির্মম শাস্তি।

রোমান আইনের বিধান মতে শ্রেণী যতোই নিম্নের হবে, শাস্তি ততোই কঠোর হবে। তাতে বলা হয়েছে, 'কেউ যদি কোনো সুশালীনা বিধবা অথবা সতী কুমারীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ে এবং সে যদি হয়ে থাকে উচ্চ বংশের, তাহলে তার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, আর যদি সে কোনো নিম্ন বংশজাত হয়ে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হবে বেত্রাঘাত ও দেশান্তর।'

অপরদিকে 'মনুশাস্ত্র' নামে খ্যাত হিন্দু বিধান মতে 'কোনো ব্রাহ্মণ মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ করলে বিচারক কেবল তার মস্তক মুন্ডন ব্যতীত আর কিছুই করতে পারবে না। তবে অ-ব্রাহ্মণ হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে হবে। আর যদি কোনো অচ্ছ্যুত ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছিত করার জন্যে হাত বা লাঠি প্রসারিত করে, তাহলে তার হাত কেটে ফেলে দেয়া হবে।'

ইহুদী সমাজে কোনো ভদ্র ঘরের সন্তান চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। পক্ষান্তরে কোনো নিচু বংশের সন্তান হলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো।

ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ইসলামের আগমন হয়েছে। অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করুক সে উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব এবং এই শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম অবশ্যই অপরাধীর গোটা অবস্থা ও পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখে, আর এ কারণেই একজন বিবাহিতা দাসীর শাস্তি একজন অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর অর্ধেক রাখা হয়েছে আবার তাদেরকে শাস্তি থেকে একেবারে মুক্তও করে দেয়া হয়নি। তদ্রূপ পরিস্থিতির চাপে পড়ে

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতাকে লুপ্ত বলে গণ্য করা হয়নি। কারণ এটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। অপরদিকে তার বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে তাকে একজন স্বাধীন রমণীর শাস্তির সমপর্যায়ের শাস্তিও প্রদান করা হয়নি। কারণ উভয়ের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের ও ভিন্ন প্রকৃতির। তদ্রূপ জাহেলী সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এখানে কেবল দুর্বলদের সাথেই কঠোরতা প্রদর্শন করে না।

আধুনিক জাহেলিয়াতের এই কুপ্রভাব আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে বর্ণ বৈষম্যের আকারে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সেখানে উচ্চশ্রেণীর একজন শ্বেতাংগীর বেলায় যা ক্ষমাযোগ্য তা একজন দুর্বল শ্রেণীর অশ্বেতাংগীর বর্ণের বেলায় নয়। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের রূপ চিরকালই অভিন্ন, আর ইসলামের রূপও চিরকালই অভিন্ন।'(১)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, বাঁদী দাসীদের সাথে বিয়ে কেবল তাদের জন্যে বৈধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যারা পাপে লিপ্ত হওয়ার বা দুর্ভোগে নিপতিত হওয়ার আশংকা করে। তবে এর সম্ভাবনা না থাকলে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। কারণ এ জাতীয় বিয়ের মাঝে সমস্যা ও অসুবিধা রয়েছে যার প্রতি ইতিপূর্বে ইংগিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

'তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে। আর যদি ধৈর্যধারণ করো, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম।'

আল্লাহ তায়ালা চান না তাঁর বান্দারা ব্যভিচারে লিপ্ত হোক, তারা ভোগান্তির সম্মুখীন হোক এটাও তিনি চান না এবং তিনি এও চান না যে, তারা কোনো বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত হোক। যে বিধান তিনি স্বয়ং বান্দাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, সে বিধান যেহেতু তাদের কাছে উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার দাবী করে, কাজেই এই দাবী এই চাওয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের মানবীয় প্রকৃতির সীমারেখার মাঝেই হতে হবে এবং হতে হবে তাদের সুপ্ত শক্তি সামর্থ ও বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে। এই হিসেবে এটা একটি সহজ সরল বিধান যা মানবীয় প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখে, তার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে এবং দরকারসমূহকে বিবেচনা করে। একই সময় এই বিধান অধপতিত পংকিলতায় নিমজ্জিত কোনো ব্যক্তিকে বাহবাও দেয় না এবং তাদের গুণকীর্তনও করে না। তদ্রূপ পাপাচারের উর্ধে অবস্থান করার মতো প্রচেষ্টার অভাব অথবা লালসা ও প্রলোভন দমনের অভাবের অপরাধ থেকে অব্যাহতিও তাদেরকে প্রদান করে না।

এখানে ইসলাম যে নীতি ও পন্থা অবলম্বন করে তা হলো, যতোদিন পর্যন্ত না স্বাধীন সতী নারীকে বিয়ে করার সামর্থ লাভ করতে না পারে ততোদিন ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। কারণ সে সকল স্বাধীন নারীই প্রকৃত স্ত্রী হওয়ার যোগ্য। তাদের দ্বারাই সুষ্ঠু পরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবার গঠিত হতে পারে। তারাই সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারে। তাদের পক্ষেই স্বামীর মান-মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। তবে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে কেবল তখনই বাঁদী দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি থাকবে। এক্ষেত্রে আবার সেসব বাঁদীর মর্যাদা ও স্থানকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে তাদেরকে 'বাঁদী' না বলে 'যুবতী' বলা হয়েছে। তাদের মনিবদের স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের অংগ হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের ঈমানকেই সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি গণ্য

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অবশ্য এখন বর্ণবাদ কিছুটা কমে এসেছে, কিন্তু এসব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্ণবাদ যে অভিশাপ ছড়িয়েছে তার থেকে মুক্তির কোনো লক্ষণ বিশ্বের কোথাও দেখা যাচ্ছে না, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিচিত বৃটেনে বছরে কতো হাজার বর্ণবাদী ঘটনা ঘটে সেখানকার পত্র পত্রিকার পাতা উল্টালেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।-সম্পাদক

করা হয়েছে। এই একই উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে মোহরানা আবশ্যকীয়রূপে ধার্য করা হয়েছে, যেন তাদের এই সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্ক রূপে পরিগণিত হয়– রক্ষিতা বা বেশ্যার সম্পর্ক রূপে নয়।

অপরদিকে তাদের পাপাচারের জন্যেও তাদেরকে দায়ী করা হয়েছে। তবে নম্রতার সাথে তাদের অবস্থাকে বিবেচনা করে। কারণ আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন 'অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' বাঁদী দাসীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হওয়ার পর এবং দাসীদের ক্ষেত্রে শাস্তি লঘু করার বিষয়ের পর এই ক্ষমা ও দয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এই স্থানটি হচ্ছে সে দুটো গুণাবলী উল্লেখ করার জন্যে অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। কারণ ভুল যেখানে, সেখানেই আল্লাহর ক্ষমা, অক্ষমতা যেখানে, সেখানেই আল্লাহর দয়া।

পারিবারিক বিধানের পর্যালোচনা

এরপর আলোচ্য এই (৫ম রুকুর) শুরু থেকেই বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইসলামী বিধানে পরিবার সম্পর্কে যে পথনির্দেশনা এসেছে সেগুলো নিয়েই এ পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। মুসলিম সমাজকে জাহেলী জীবনের হীনতা থেকে উদ্ধার করে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করাই সেসব বিধি ব্যবস্থার লক্ষ্য। মুসলিম উম্মাহর মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক মানকে উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর কী কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন এই পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যারা প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী মতো চলতে চায় এবং আল্লাহর বিধান লংঘন করতে চায়, তারাই বা মুসলিম জাতিকে কোন গন্তব্যে নিয়ে যেতে চায়? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি... আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। বস্তুত মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আয়াত ২৬, ২৭, ২৮)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্নেহ ও কৃপা করেন। তাই তার আইন কানুনের নিগুঢ় উদ্দেশ্য কী তা তিনি বর্ণনা করেন এবং তাঁর বিধানে তাদের জন্যে যে কল্যাণ ও মংগল রয়েছে তা তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং এতোটা উচ্চ মর্যাদা দেন যে, তাদের কাছে তার আইন ও বিধানের উদ্দেশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করেন।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান ...।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর আইনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও রহস্য তোমাদের কাছে উন্মোচন করতে চান। তিনি চান যে, তোমরা এর উদ্দেশ্য ও রহস্য বুঝতে পারো, তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো এবং উন্মুক্ত চোখ ও মনমগয নিয়ে তাকে হৃদয়ংগম করো। আল্লাহর বিধান কোনো গোলকধাঁধা বা দুর্জেয় ও দুর্ভেদ্য রহস্য নয়, আর তা কোনো হঠকারী আদেশ নিষেধও নয় যে, তার কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য থাকবে না। তার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা তোমাদের আয়ত্তাধীন। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানার তোমাদের অধিকার রয়েছে। এই উক্তি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে যে কতো সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং কতো আদর ও স্নেহসিক্ত করা হয়েছে, তা শুধু আল্লাহর প্রভুত্ব ও বান্দার দাসত্বের স্বরূপ ও পরিধি যারা বোঝে তারাই উপলব্ধি করতে পারে।

'আর তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে জানাতে চান।' ....

অর্থাৎ আল্লাহর বিধান শুধু তোমাদের ওপরই প্রবর্তিত হয়নি, বরং এ বিধান সর্বকালের সকল মানুষের জন্যেই আল্লাহর মনোনীত। এ বিধানের মূলনীতিগুলো অপরিবর্তিত ও অধিকৃত।

মৌলিকত্বের দিক দিয়ে তা সর্বকালে একইরকম। তার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। তিনি তোমাদেরকে পাপের পথ থেকে ফিরে আসার পথ প্রদর্শন করতে চান এবং সেই পথ সহজ ও সুগম করতে চান।

'আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।'

বস্তুত তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই সেসব আইন ও বিধানের উৎস। তাঁর অসীম ও নির্ভুল জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বলেই এসব নির্দেশ তৈরী হয়েছে। তোমাদের সত্ত্বা ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে এবং তোমাদের জন্যে কি কি কল্যাণকর ও উপযোগী সে সম্পর্কে তাঁর রয়েছে নির্ভুল জ্ঞান, আর তাঁর রচিত বিধানের প্রকৃতি ও বাস্তবায়নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকসমূহ সম্পর্কে তাঁর রয়েছে যথার্থ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা।

'আর আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদেরকে ক্ষমা করতে এবং যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় যেন তোমরা সর্বতোভাবে বিপথগামী হও।'

এই ক্ষুদ্র একটিমাত্র আয়াত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রচিত বিধান দ্বারা মানুষের কী উপকার করতে চান, আর প্রবৃত্তির পূজারী ও আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরাই বা কী চায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর বিধানকে যারাই লংঘন করে, তারা প্রবৃত্তির অনুসারী ছাড়া কিছু নয়। বিধান বলতে যা বুঝায়, তা আত্মসংযম, দৃঢ়তা ও সতর্কতামূলক বিধান। এর বাইরে প্রবৃত্তির গোলামী, স্বেচ্ছাচারিতা, ভ্রষ্টতা, বিপথগামী ও পাপাচার ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তাঁর বিধান উপহার দেন, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, তার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই- তাদেরকে ক্ষমা করা, তাদেরকে সুপথ দেখানো এবং পদস্খলন থেকে রক্ষা করা। তাদেরকে তিনি উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করতে চান।

পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসারীরা কী চায়? তারা চায় মানব জাতিকে আল্লাহর অনুমোদিত ও অপছন্দনীয় পথে নিয়ে যেতে। সঠিক নির্ভুল ও উন্নতর পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করাই তাদের উদ্দেশ্য।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে বিশেষ ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে পরিবারকে সংগঠিত করা, সমাজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা, নারী ও পুরুষের মিলনের জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র নির্মল নিষ্কলংক ও পবিত্র পন্থার সন্ধান দেয়া। এই পন্থা ছাড়া আর সকল পন্থাকে নিষিদ্ধ করা এবং হৃদয় মনের কাছে তাকে ঘৃণ্য ও ধিক্কারযোগ্যরূপে চিহ্নিত করা। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে আল্লাহ তায়ালাই বা কী চান আর প্রবৃত্তির অনুসারীরাই বা কী চায়, সেটাও পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর কাম্য কী তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনা এবং সর্বাবস্থায় মুসলিম সমাজের কল্যাণই আল্লাহর কাম্য।

পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির গোলামদের ইচ্ছা হলো প্রতিটি জৈবিক কামনা ও চাহিদাকে চরিতার্থ করার অবাধ ও লাগামহীন স্বাধীনতা প্রদান করা এবং তাকে নৈতিক, ধর্মীয় অথবা সামাজিক সকল প্রকারের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। তারা চায় সমাজে যৌন অনাচার অবাধে চলতে থাকুক। যে সমাজে যৌন উন্মাদনা ও উত্তেজনা মানুষের হৃদয়ের শান্তি কেড়ে নেয়, স্নায়ুকে উদ্বিগ্ন করে, পরিবারকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, ইযযত আবরু ও সতিত্বকে বিপন্ন করে এবং পরিবার ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে যে সমাজে উদ্দাম যৌনতায় ভেসে গিয়ে মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হয়

এবং, বল কিংবা স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কোনো নিয়ম নীতি নারী পুরুষের যৌন মিলনকে বাধাগ্রস্ত করে না। এমন একটি সমাজই তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এতোসব অরাজকতা ও অনাচারকে তারা শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে চালু করতে চায়। অথচ এটা স্বাধীনতা নয়, এটা উদ্দাম স্বেচ্ছাচার ও বন্য পাশবিকতা।

বস্তুত এটাই সেই সর্বাত্মক বিপথগামিতা, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সতর্ক করেছেন। একেই তিনি প্রবৃত্তির অনুসারীদের দ্বারা মানব জাতির অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এটা থেকে তাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। নৈতিক অধপতনের দিক দিয়ে মুসলিম সমাজকে জাহেলিয়াতের পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্যে তাদের চেষ্টার অবধি ছিলো না। অথচ মুসলিম সমাজ আল্লাহর নির্মল ও নির্ভুল বিধানের কল্যাণে নৈতিক দিক দিয়ে জাহেলী সমাজের চেয়ে অনেক উন্নত ও অতুলনীয় ছিলো। নিম্নমানের নাটক সিনেমা ও অন্যান্য সাজ সর াম দ্বারা আজও মুসলিম সমাজকে জাহেলী সমাজে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। পাশবিক স্বেচ্ছাচারের পথে যে বাধাবিঘ্ন এখনো অবশিষ্ট আছে তা ধ্বংস করার প্রয়াস চলছে। আল্লাহর বিধান ছাড়া এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। একটি সংঘবদ্ধ মোমেন জামায়াত এই বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করলেই সমাজ জাহেলিয়াতের প্রত্যাবর্তনের বিপদ থেকে ইনশাআল্লাহ রক্ষা পাবে।

যৌন অনাচার কিভাবে সভ্যতার বিপর্যয় ডেকে আনে

এই পর্যালোচনার পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের জন্মগত দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দুর্বল মানুষদেরকে আল্লাহর বিধানে বেশ কিছু রেয়াত দেয়া হয়েছে এবং ক্ষতি ও কষ্টের কারণ দূর করে তাকে সহজ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা চান, তোমাদের ভার লাঘব করতে, বস্তুত মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুর্বল করে।'

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত জীবনের এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে, বিশেষ করে এতে যেসব আইন ও বিধি ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে উদার নীতির ছাপ সুস্পষ্ট। এতে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির দাবী ও চাহিদাকে স্বীকার করা হয়েছে, সেইসব দাবী ও চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেগুলোর শক্তিকে উত্তম ফলদায়ক ও কল্যাণকর ক্ষেত্রে এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশে সুষ্ঠু প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ তা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা দমনে তাদের ওপর এমন কোনো কঠোর চাপ প্রয়োগ করেননি, যাতে তারা মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট পায় এবং এর ফলে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়। অনুরূপভাবে জৈবিক দাবী ও চাহিদা মেনে নিতে গিয়ে তাকে অধপতনের সীমাহীন ও লাগামহীন স্বাধীনতাও দেননি।

অপরদিকে জীবনের সাধারণ ও সামগ্রিক ক্ষেত্রের জন্যে আল্লাহর যে পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক বিধান প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়েছে, তাতেও উদারতার মনোভাব সুস্পষ্ট। কেননা, তাতে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি, স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ এবং প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তার সকল গঠনমূলক শক্তিকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তাকে এমন বর্ম পরানো হয় যা তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে।

অনেকের ধারণা, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা, বিশেষত নারনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি মেনে নেয়ারই শামিল, আর যারা প্রবৃত্তির লালসার অনুগামী তাদের সাথে চলা সহজ ও আরামদায়ক। কিন্তু এটা মস্তবড়ো একটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে

একেবারেই বাধামুক্ত ও লাগামহীন ছেড়ে দেয়া, সকল কাজে শুধুই জৈবিক আনন্দ অন্বেষণ করা, জৈবিক আনন্দই যখন সবকিছুর প্রথম ও শেষ কথা তখন কর্তব্যের আর কোনো গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে না। 'দায়িত্ব ও কর্তব্য'-কে ঝেটিয়ে বিদায় করা, পশু জগতে যৌন মিলনের পথে যা কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, মনুষ্য জগতেও যৌন মিলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার চেয়ে বেশী কিছু নয়-এটা স্থির করে নেয়া নর নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাবতীয় নৈতিক বিধি নিষেধ ও সামাজিক দায় দায়িত্বকে জলাঞ্জলি দেয়াটা অবশ্যই বাহ্যত আনন্দদায়ক, সুখকর ও স্বাধীনতামুখী কাজ বলে মনে হয়। অথচ তা ঘোরতর কষ্টদায়ক, অসুখকর ও বিব্রতকর। আর সমাজ জীবনেই শুধু নয়, বরং প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এর কুফল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে।

যেসব সমাজ নর নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে লজ্জা, নৈতিকতা ও ধর্মের বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সেইসব মানুষের জীবনে এর কুফল কিরূপ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে, তা চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়। আর সেইসব সমাজের দৃশ্যাবলীই হৃদয়বানদের হৃদয়কে আতংকিত করার জন্যে যথেষ্ট। ইতিহাস সাক্ষী যে, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেলেল্লাপনা, অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে এক এক করে ধ্বংস করে দিয়েছে। গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা পারস্য সভ্যতার ধ্বংসের মূল কারণ ছিলো এই যৌন উচ্ছৃংখলতা। এই উচ্ছৃংখলতা ও বেলেল্লাপনায় সবাইকে এক সময় টেক্কা দিয়ে ছিলো ফরাসী জাতি। ভয়াবহ অধপতন থেকে এ জাতি ধ্বংসের লক্ষণ প্রায় পুরোমাত্রায় পরিস্ফুটিত। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি আমেরিকা, সুইডেন এবং ইল্যান্ডেও এইসব লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে।(২)

যৌন উচ্ছৃংখলতার এই লক্ষণসমূহ ফ্রান্সে অনেক আগেই দেখা দিয়েছিলো এবং ১৮৭০ সাল থেকে নিয়ে এ যাবত যে কয়টা যুদ্ধে ফ্রান্স যোগ দিয়েছে, তার প্রতিটিতেই তাকে এই কারণেই পরাজিত হতে হয়েছে। আজও তার গতি যে পরিপূর্ণ ধ্বংসের দিকেই ধাবিত সেটা তার যাবতীয় আলামত থেকেই পরিস্ফূট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে আলামতগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে, তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

'ফরাসী জাতির যৌন উচ্ছৃংখলতার প্রথম কুফল ছিলো তাদের দৈহিক শক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি এবং ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বল হতে থাকা। কেননা, সার্বক্ষণিক উত্তেজনা তাদের স্নায়ুকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। যৌন লালসার গোলামী তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার উপক্রম করেছিলো। গোপন ব্যাধির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব তাদের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ফরাসী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর পর সেনাবাহিনীর জন্যে একান্ত জরুরী স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থের প্রয়োজনীয় মানকে কমিয়ে চলেছে। কেননা, সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে ফরাসী জনগণের মধ্যে শক্তি ও স্বাস্থ্যের ঈপ্সিত মানে উত্তীর্ণ যুবকদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো। ফরাসী জাতির শারীরিক শক্তি সামর্থের ঘাটতির মাত্রা নির্ণয়ে এ তথ্য এতো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মানদন্ড যে, তা তাপ নির্ণয়কারী যন্ত্রের মতোই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করে।(৩) শারীরিক শক্তি ঘাটতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো গোপন

(২) প্রায় চার দশক আগে যখন এই বই লেখা হয়েছিলো তখন যাদের মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে তারা এখন পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।-সম্পাদক

(৩) আজকাল আমেরিকায় বরং প্রায় এর চেয়েও খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানে সামরিক বিভাগে নিয়োগ করার মতো বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রতি সাত জনের মধ্যে ৩ জনই নানা যৌন রোগের কারণে সামরিক চাকুরীর অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছে।—সম্পাদক

মরণ ব্যাধি। এর একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম দু'বছরে সেনাবাহিনীর যেসব সদস্যকে সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার দরুন সরকার চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলো, তাদের সংখ্যা ছিলো পঁচাত্তর হাজার। মধ্যম আকৃতির একটিমাত্র সেনা ছাউনিতে একই সময়ে ২৪২ জন সৈনিক একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। এই দুর্ভাগা জাতির অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। এ জাতি যখন জীবন মরণ সংকটের সম্মুখীন ছিলো, যখন তার প্রতিটি সৈনিকের দেশের স্থিতি ও প্রতিরক্ষার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিলো। যখন তার সম্পদের প্রতিটি ফ্রাংককে সংরক্ষণ করা কর্তব্য ছিলো এবং পরিস্থিতি যখন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি, সময় ও যাবতীয় সহায় সম্পদকে দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় করার দাবী জানাচ্ছিলো, তখন সেই জাতির হাজার হাজার তরুণ সন্তান শুধুমাত্র আমোদ ফুর্তিতে নিমজ্জিত থাকার দরুণ দেশ রক্ষার কাজে অক্ষমতা ও পংগুত্ব বরণ করে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলো। অভাগা ফরাসী জাতি শুধু এইটুকু ক্ষতি স্বীকার করেই নিস্তার পায়নি, বরং জাতীয় সম্পদের একটি অংশকে সেইসব পংগু ও অক্ষম তরুণদের চিকিৎসায় ব্যয় করতেও বাধ্য হয়েছিলো, আর তাও হয়েছিলো সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে।

'ডা. লিরে নামক খ্যাতনামা একজন অভিজ্ঞ ফরাসী চিকিৎসক বলেন, ফ্রান্সে প্রতি বছর কেবল সিফিলিস ও সিফিলিসজনিত রোগে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার ব্যক্তি মারা যায়। ফরাসী জাতির জন্যে যক্ষার পর এ রোগই সবচেয়ে বড়ো প্রাণঘাতী, আর এটি হচ্ছে বহুসংখ্যক গোপন ব্যাধির মধ্যে মাত্র একটি ব্যাধির ধ্বংসলীলা।'

ফরাসী জাতির জনসংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ যৌন মিলনে সম্মতির সহজলভ্যতা, নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অরাজকতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা এবং সন্তান ও ভ্রূণ পরিত্যাগের প্রবণতা সেখানে পরিবারের গঠন ও সংরক্ষণের অবকাশ রাখছে না। তাই বিয়ে ও সন্তান প্রজননের হার দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এভাবে ফ্রান্স ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আজকের ফ্রান্সে বিবাহিত নারী পুরুষের হার হচ্ছে প্রতি শ'তে সাতজন কি আটজন। এ থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন ফরাসীদের মধ্যে বিয়ে না করা লোকের সংখ্যা কতো বেশী। আবার এই স্বল্পসংখ্যক বিবাহিত লোকের মধ্যে সেইসব ব্যক্তির সংখ্যা আরো কম, যারা বিয়ে দ্বারা সতীত্ব রক্ষা ও সৎ জীবন যাপনের উদ্দেশ্য পোষণ করে। বরঞ্চ সতীত্ব ও সততা ব্যতীত অন্য সবকিছুই এখন তাদের কাছে সহজলভ্য। এমনকি তাদের অনেকেরই বিয়ের উদ্দেশ্য থাকে বিয়ের আগের অবৈধ সন্তানকে বৈধ করা। বল বিউরো লিখেছেন, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীতে এরূপ প্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, বিয়ের আগেই হবু স্বামীর কাছ থেকে এই মর্মে অংগীকার আদায় করে নেয়া যে, বিয়ের আগে তার পেটে যে সন্তান জন্মেছে, তাকে হবু স্বামী নিজের বৈধ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করবে। 'একবার এক মহিলা 'সীন' নগরীতে নাগরিক অধিকার আদালতে এই মর্মে আরযী দাখিল করলো যে, 'আমি আমার স্বামীকে এই শর্তে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলাম যে, বিয়ের আগে তার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আমি যে সন্তানগুলো জন্ম দিয়েছি, শুধু সেগুলোকে বৈধ করা। এটাই ছিলো আমার বিয়ের উদ্দেশ্য। স্ত্রী হিসেবে তার ঘর করার ইচ্ছা আমার তখনো ছিলো না, এখনো নেই। এ জন্যে বিয়ের দিন অপরাহ্নেই আমি আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করেছি এবং আজ পর্যন্ত তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করিনি। কেননা, আমি কখনো তার সাথে দাম্পত্য জীবন যাপনে ইচ্ছুক ছিলাম না।'

'প্যারিসের একটি উপশহরের কলেজের অধ্যক্ষ লবোল বিয়োর্ড বলেন, সাধারণ তরুণরা বিয়ের মাধ্যমে তাদের ঘরেও ব্যভিচার চালু করতে চায়। কেননা, তারা দশ বছর বা তারও বেশী সময় লাগামহীন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ভবঘুরে জীবন কাটায়। এরপর তাদের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সেই ছন্নছাড়া স্থিতিহীন জীবনে তাদের ক্লান্তি এসে যায়। ফলে কোনো এক নির্দিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করে। এর মাধ্যমে আসলে তারা বাইরের স্বেচ্ছাচারমূলক লাগামহীন যৌনতা আর গৃহাভ্যন্তরের শান্তশিষ্ট জীবনকে মিলিয়ে একাকার করতে চায়।*

এভাবেই ফ্রান্সের অধপতন ঘটেছে। এভাবেই সে প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এভাবেই সে ক্রমান্বয়ে সভ্যতার মঞ্চ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এবং এমনিভাবে একদিন হয়তো তার অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে। অবশেষে আল্লাহর অমোঘ বিধান বাস্তব রূপ লাভ করবে। তবে সেটা মানুষ যতো দ্রুত দেখতে চায়, হয়তো বা তার চেয়ে বিলম্বেও ঘটতে পারে। এ পাপের রাজ্যে অপেক্ষাকৃত নবীন যে দেশগুলো এখনো ধ্বংসের আলামত ততো স্পষ্ট নয়, সেখানকার বিরাজমান অবস্থার কিছু নমুনাও তুলে ধরছি,

সাম্প্রতিককালে সুইডেন সফরকারী জনৈক সাংবাদিক সুইডেনে প্রেম প্রণয়ের স্বাধীনতা, বস্তুগত সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এবং সেখানকার সমাজে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছু বিবরণ দেয়ার পর বলেন, 'এ কথা সত্য যে, জাতিকে চমকপ্রদ অর্থনৈতিক মানে উন্নীত করা, এর শ্রেণী বিভেদ দূর করা এবং জীবনে যতো রকমের সমস্যা ও দুঃখ দুর্বিপাক কল্পনা করা যেতে পারে তা থেকে দেশবাসীর মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদেরও চূড়ান্ত স্বপ্নসাধ, আর আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই স্বপ্নসাধই পূরণের চেষ্টায় নিয়োজিত, তখন প্রশ্ন জাগে যে, এই স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের পর তার অন্যান্য ফলগুলোকেও কি আমরা মেনে নিতে পারবো? এই আদর্শ সমাজের কালো দিকটাকে কি আমরা গ্রহণ করবো? 'অবাধ প্রেম প্রণয়' এবং পরিবারের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব কি আমরা মেনে নিতে পারবো?'

আসুন, আমরা পরিসংখ্যানের আলোকে কথা বলি।

'জীবনে স্থিতিশীল অবস্থান পরিবার গঠনে উৎসাহ প্রদানকারী এতোসব উপকরণ থাকা সত্তেও সুইডেনের লোকসংখ্যা বিলীন হওয়ার পথে। যে দেশ মেয়েদের বিয়েতে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দেয়, অতপর তার সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত জীবনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, সেই দেশ ধীরে ধীরে আদৌ সন্তান জন্ম না দেয়ার পথে এগুচ্ছে!

এরই পাশাপাশি বিবাহিতদের হার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, আর বেড়ে চলেছে অবৈধ সন্তানদের শতকরা হার। আরো লক্ষণীয় যে, শতকরা বিশ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ আদৌ বিয়েই করে না।'

'শিল্পায়নের যুগ এবং সেই সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া সুইডেনে শুরু হয়েছে ১৮৭০ সালে। সেই বছর অবিবাহিত মায়েদের হার ছিলো শতকরা সাতজন।' ১৯২০ সালে এসে এই হার দাঁড়ায় শতকরা ১৬। পরবর্তী পরিসংখ্যান আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে নিসন্দেহে তা ক্রমবর্ধমান।'(৫)

'সুইডেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ 'অবাধ প্রেম প্রণয়' সম্পর্কে একাধিক জরিপ চালিয়েছে। এসব জরিপ থেকে জানা গেছে যে, যুবকরা ১৮ বছর বয়সে পা দেয়ার আগে এবং বিয়ে ছাড়াই

(৪) 'আল হেজাব' (পর্দা) ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

(৫) স্মরণ রাখা দরকার যে এই তাফসীর লেখা হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে।—সম্পাদক।

যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, আর যুবতীরা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে ১৫ বছর বয়সের আগেই। শতকরা ৯৫ জন যুবক-যুবতী ২১ বছর বয়সের মধ্যেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।

'অবাধ প্রণয়ের দাবীদারদের যখন সন্তোষজনক কোনো খবর দিতে চাই, তখন আমাদের বলতে হয় যে, এইসব যৌন সম্পর্কের শতকরা মাত্র সাতটি হয়ে থাকে বাগদত্তাদের সাথে, শতকরা ৩৫টি প্রেমিকদের সাথে এবং শতকরা ৫৮টি ঘটে অস্থায়ী বান্ধবীদের সাথে। যখন আমরা বিশ বছরের নীচের নারীর যৌন সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রেকর্ড করি, তখন দেখতে পাই যে, এগুলোর মধ্যে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ হয় স্বামীর সাথে, শতকরা ২৭ ভাগ হয় বাগদত্তাদের সাথে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ হয় সাময়িক পুরুষ বন্ধুদের সাথে।

তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সুইডেনের শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা বিয়ের আগে পূর্ণাংগ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে আসে এবং শতকরা ২০ ভাগ জীবনে কখনো বিয়ে করে না।'

স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে বিলম্বিত হয়। এর ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। 'অবাধ প্রেম প্রণয়ের' পক্ষে সুইডেনবাসীর যুক্তি এই যে বিয়ের পর বিশ্বাসঘাতকতাকে সুইডিস সমাজ যে কোনো সভ্য সমাজের মতোই ঘৃণার চোখে দেখে। এটা আলবত সঠিক কথা, আমরা এ কথা অস্বীকার করি না, তাই বলে এই ওজুহাতে এই নৈতিক অবক্ষয়কে কিভাবে মেনে নেয়া যায়। তারা তাদের জনসংখ্যা বিলুপ্তির পক্ষে এবং তালাকের আতংকজনক সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অবশ্য তারা কোনো যুক্তি প্রদর্শন করে না।

'সুইডেনের তালাকের হার সারাবিশ্বে সর্বোচ্চ। প্রতি ছয়টি বা সাতটি বিয়ের একটি তালাকের পর্যবসিত হয়। আর এটি হচ্ছে সুইডেনের সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান। প্রথমে এই হার কম ছিলো। এখন তা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯২৫ সালে এক লাখ সুইডেনবাসীর মধ্যে ২৬টি তালাক সংঘটিত হতো। ১৯৫২ সালে এই হার ১০৪তে এবং ১৯৫৪ সালে ১১৪তে উপনীত হয়। এর কারণ এই যে, শতকরা ৩০টি বিয়েই পরিস্থিতির চাপে অনন্যোপায় অবস্থায় সংঘটিত হয়, আর তাও কনের গর্ভবতী অবস্থায় এ ধরনের চাপের অধীনে সংঘটিত বিয়ে স্বভাবতই সাধারণ বিয়ের মতো স্থায়ী হতে পারে না। সুইডিশ আইনে স্বামী স্ত্রী উভয়ে চাইলে অতি সহজে কিংবা তাদের একজনে চাইলে সামান্য কারণেও তালাক দিতে পারে। এ কারণে তারা তালাক দেয়ার উৎসাহ পায় বেশী।

সুইডেনে প্রেম প্রণয়ের স্বাধীনতার পাশাপাশি আরো একটা স্বাধীনতা আছে, যা অধিকাংশ সুইডেনবাসী ভোগ করে থাকে। সেটি হচ্ছে আল্লাহকে না মানা ও বিশ্বাস না করার স্বাধীনতা। গীর্জার কর্তৃত্ব থেকে সর্বাত্মক স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন সুইডেনেও ছড়িয়ে পড়েছে। এটি নরওয়ে এবং ডেনমার্কেও ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকরা এই স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করেন এবং নতুন প্রজন্মের মনমগযে তা বদ্ধমূল করেন।

'নতুন প্রজন্ম এমনিতেই বিকৃতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে। আর এই নতুন আন্দোলন সুইডেন ও অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশের নতুন বংশধরদের অধিকতর বিকৃতির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাদের ধর্মহীনতা তাদেরকে বিকৃতির দিকে এবং মদ ও মাদকদ্রব্য সেবনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অনুমান করা হয় যে, পিতা মাদকসেবী এমন পরিবারের শিশুর সংখ্যা অন্তত ১ লাখ ৭৫ হাজার। আর এ সংখ্যা সামগ্রিকভাবে মোট শিশুর শতকরা ১০ ভাগ। কিশোর মাদকসেবীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। ... সুইডিশ পুলিশ ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের যে কিশোরদেরকে বদ্ধ মাতাল অবস্থায় পাকড়াও করে তাদের সংখ্যা ১৫ বছর আগে একই কারণে গ্রেফতারকৃতদের

তুলনায় তিনগুণের সমান। আর কিশোর কিশোরীদের মধ্যে মদ খাওয়ার অভ্যাস ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এর ফলশ্রুতিতে একটি আতংকজনক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুইডেনের প্রাপ্তবয়স্কদের এক-দশমাংশই হচ্ছে মানসিক বৈকল্যের শিকার।

'সুইডেনের ডাক্তাররা বলেন যে, তাদের রোগীদের শতকরা ৫০ ভাগ এমন মানসিক বৈকল্যের শিকার, যা তাদের দৈহিক রোগের অনিবার্য ফল। আর একথা সন্দেহাতীত যে, অবাধ স্বাধীনতা অব্যাহত থাকলে এই মানসিক বৈকল্য বিপুলভাবে বাড়বে, পরিবার ধ্বংসের উপকরণ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের বংশ লোপ পাওয়া সম্ভাবনা দেখা দেবে। ...'

আমেরিকার অবস্থা এর চেয়ে মোটেই উন্নত নয়। সেখানে ক্রমেই অশুভ সংকেত ও কুলক্ষণসমূহ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অথচ মার্কিন জাতি এসব কুলক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। কিন্তু বাহ্যিক অবয়ব যতোই সুদর্শন হোক না কেন, ধ্বংসের উপাদানগুলো এ জাতির দেহাভ্যন্তরে যথারীতি সক্রিয় রয়েছে এবং অত্যন্ত ত্বরিতগতিতে কাজ চালিয় যাচ্ছে। এ থেকে বুঝা যায় বাহ্যিক চাকচিক্য সত্তেও আভ্যন্তরীণ ধ্বংস প্রক্রিয়া কতো দ্রুত গতিশীল।

যারা তাদের শত্রুদের কাছে বৃটেন ও আমেরিকার গোপন সামরিক তথ্য বিক্রি করে, তাদের সম্পর্কে জানা গেছে যে, তাদের অধিকাংশই কিন্তু অর্থাভাবের কারণে এ কাজ করে না, বরং যৌন বিকৃতির কারণেই তারা এ কাজ করে, আর এই বিকৃতি তাদের সমাজে প্রচলিত যৌন অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতারই ফলশ্রুতি।

কয়েক বছর আগের কথা। মার্কিন পুলিশ একটি বিরাট সংঘবদ্ধ দলের সন্ধান পেয়েছিলো। বিভিন্ন শহরে তাদের শাখা সক্রিয় ছিলো এবং উকিল ও ডাক্তারসহ সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের কাজ ছিলো, স্বামী অথবা স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত প্রমাণিত করে তালাক কার্যকর বলে গ্রহণ করার শর্ত হিসেবে ধার্য করেছিলো। এভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে পক্ষ অপর পক্ষকে অপছন্দ করে সে এই কুচক্রী দলটির সাহায্য নিয়ে তাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পাকড়াও করার পর তার ওপর নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আসলে সেই অপরাধী চক্রটিই তাকে নিজেদের ফাঁদে আটকে দেয়।

অনুরূপভাবে এও অনেকের জানা যে, সেখানে এমন কিছু কার্যালয় রয়েছে যার কাজ হলো স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীদের এবং স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া স্বামীদের অনুসন্ধান চালানো। অথচ সেটি এমন একটি সমাজ, যেখানে স্বামী জানে না যে, বাসায় ফিরে সে স্ত্রীকে বাসায় পাবে, না দেখবে যে, সে নতুন কোনো প্রেমিকের হাত ধরে উধাও হয়ে গেছে। আর স্ত্রীও জানে না যে, তার সকালে বেরিয়ে যাওয়া স্বামী আবার বাড়িতে ফিরে আসবে, না অধিকতর আকর্ষণীয় ও সুন্দরী কোনো নারী তাকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। সেটা এমন এক হতচ্ছাড়া সমাজ, যেখানে পরিবারগুলো নিরন্তর এরূপ অস্থিরতার মধ্যেই জীবন ধারণ করে থাকে এবং উদ্বেগের তীব্রতায় কারো স্নায়ু বিন্দুমাত্র স্বস্তি পায় না।

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সামরিক প্রধান এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকার প্রতি সাতজন যুবকের মধ্যে ছয়জনই নৈতিক অধোপতনের কারণে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছে।

অথচ পঁচিশ বছর আগেও একটি মার্কিন পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো,

'তিনটি শয়তানী উপকরণ আমাদের পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই তিনটি একত্রে বিশ্ববাসীর জন্যে জাহান্নাম প্রজ্বলিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে অশ্লীল ও

নৈতিকতা বিবর্জিত সাহিত্য, যা নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতাকে ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিস্ময়করভাবে দ্রুততার সাথে এই সাহিত্যের প্রচলন ঘটেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে চলচ্চিত্র বা সিনেমা। এটা জনগণের মধ্যে শুধু যে যৌন আবেগ উস্কে দেয় তাই নয়, বরং এ বিষয়ে তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষাও দেয়। তৃতীয়টি হচ্ছে, সাধারণ নারী সমাজের চারিত্রিক অধপতন, যার প্রতিফলন ঘটে তাদের পোশাক পরিচ্ছদে, নগ্নতায়, মাত্রাতিরিক্ত ধূমপানে এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশায়। যতোই দিন যাচ্ছে, আমাদের সমাজে ক্রমেই এই তিনটি খারাপ উপাদানের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি ঘটছে। এই উপাদানগুলো পরিণামে খৃষ্টীয় সমাজ সভ্যতার পতন ও সর্বশেষে তার বিলুপ্তিকে অনিবার্য করে তুলবে। আমরা যদি অবিলম্বে এ উপাদান কয়টির বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি রোধ না করি, তাহলে আমাদের ইতিহাসের পরিণতি যে রোমান জাতি এবং তাদের পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাসের মতোই হবে, তা সুনিশ্চিত। প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করা এবং নারী, মদ ও নাচগানে মত্ত থাকার কারণেই ওই জাতিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা এই যে, আমেরিকা উক্ত তিনটি উপাদানের বিস্তৃতি রোধ করা তো দূরের কথা, ওগুলোর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, এক সময় রোমান জাতি এই পথে চলেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিলো। (৬)

আমাদের যুবকদের অধপতনকে আমরা যাতে সহজভাবে মেনে নেই, সে জন্যে অপর এক সাংবাদিক আমেরিকা বৃটেন ও ফ্রান্সে তরুণ সমাজের বিপথগামিতার চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে,

'মার্কিন কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্ণর ঘোষণা করেছেন যে, রাজ্যে তিনি যে সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন, তাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে এই বিকৃতির সংশোধন। গভর্ণর কৃষি খামার গঠন এবং সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধি ও ক্রীড়া সমিতি ইত্যাদি উদ্যোগ নেন।' তবে তিনি এও জানান যে, কোকেন ও হিরোইনসহ যেসব মাদক সেবনের প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রতিকার তার কর্মসূচীর আওতায় পড়ে না। এ কাজটাকে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের জন্যে রেখে দেন।

ইংল্যান্ডে বিগত দু'বছরে পথেঘাটে মেয়েদের ওপর বিশেষত অল্পবয়স্কা তরুণীদের ওপর ধর্ষণ বা বলাৎকারজনিত অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলাৎকারকারীরা হচ্ছে কিশোর। কোনো কোনো ঘটনায় ধর্ষণকারী ধর্ষিতা কিশোরী বা তরুণীকে গলা টিপে মেরে লাশ বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে, যাতে সে অপরাধের কথা ফাঁস না করে, কিংবা পুলিশ অপরাধীকে দেখিয়ে দিতে বললে সে দেখিয়ে দিতে না পারে।'

'মাস দু'য়েক আগের কথা। এক বৃদ্ধ শহরতলীর পথ ধরে নিজের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, রাস্তার এক পাশে গাছের নীচে এক কিশোর এক কিশোরীর সাথে পশুসুলভ যৌন আচরণে লিপ্ত।' ...

বৃদ্ধ তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং কিশোরকে নিজের লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন এবং তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, এ কাজটি এমন প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে করা ঠিক নয়। কিশোরটি উঠেই বৃদ্ধকে প্রবল জোরে পেটের ওপর লাথি মেরে ধরাশায়ী করে ফেললো। তারপর বৃদ্ধের মাথায় জুতো দিয়ে ক্রমাগত পেটাতে পেটাতে মাথা চূর্ণ করে ফেললো। কিশোরটির বয়স ছিলো ১৫ বছর আর কিশোরীটির বয়স ১৩ বছর।

---

(৬) 'আল হেজাব' (পর্দা) ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

নৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী মার্কিন কমিটির প্রদত্ত তথ্যানুসারে মার্কিন জনগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন গোপন মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। (এটি পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিনের ন্যায় এন্টিবায়োটিক ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার আগেকার কথা)।

'ডানভার' নগরীর বিচারপতি লান্ডাসী লিখেছেন যে, প্রতি দু'টি বিয়েতে একটি সেখানে তালাক সংঘটিত হয়।'

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলেক্সিস কারেইল স্বীয় 'রহস্য ঘেরা জীব মানুষ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

আমরা শিশুদের উদরাময়, সূক্ষ্ম, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, জ্বর প্রভৃতি রোগের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছি, কিন্তু বিকারগ্রস্ততা ও পুরুষত্বহীনতা এই দুটো ব্যাধি এখন ওইগুলোর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধির সংখ্যা এখন প্রচুর। কোনো কোনো মার্কিন রাজ্যের স্বাস্থ্য সদনে চিকিৎসাধীন পাগলের সংখ্যা অন্য সব কটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগীদের চেয়ে বেশী। পাগল হওয়ার মতো স্নায়বিক বৈকল্য ও মানসিক দুর্বলতার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিকে নির্জীব ও পরিবারকে ধ্বংস করার কাজে উক্ত রোগ দু'টির অবদান সবচেয়ে বেশী। মানসিক বৈকল্য বা মস্তিষ্ক বিকৃতি মানব সভ্যতার জন্যে সংক্রামক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত নিজেদের মনোযোগ প্রধানত এই রোগের মধ্যে সীমিত রেখেছেন।

জাহেলিয়াতের পংকে নিমজ্জিত দিশাহারা মানব জাতি প্রবৃত্তির পূজারীদের আনুগত্য করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করার কারণে যে শোচনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছে, এ হলো তার কিছু নমুনা।(৭) আল্লাহর বিধানের উদার নীতির অনুসরণ করা হয়েছে, জন্মগতভাবে দুর্বল মানুষের দায়িত্বের গুরুভার লাঘব করা হয়েছে। তাকে তার ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তাকে নিরাপদ পথ দেখানো হয়েছে এবং তাওবা, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় অবহিত করা হয়েছে। এ কথাই বলা হয়েছে ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে। যেমন আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদেরকে ক্ষমা করতে, আর যারা প্রবৃত্তির ...।

---

(৭) আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে সাইয়েদ কুতুব শহীদ এই পরিচ্ছেদে পশ্চিমী দুনিয়ার বিয়ে তালাক ও যৌনতার ছড়াছড়ি সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন, তার তুলনায় সেসব দেশের যৌন পাগল মানুষগুলো এখন বহু দূর এগিয়ে নির্ঘাত ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন জরিপের নতুন কিছু তথ্য আমি তাফসীরের বিভিন্ন স্থানের টীকায় সংযোজন করেছি। কিন্তু পাঠকদের হাতে যখন এ তাফসীর পৌঁছুবে তখন এই ভয়াবহ তথ্যগুলোও পুরানো হয়ে যাবে। যেমন ১৯৬৪ সালের দিকে ইউরোপের মধ্যে সুইডেনে তালাকের হার ছিলো সর্বোচ্চ, এখন সে স্থান দখল করে নিয়েছে গ্রেট বৃটেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী লন্ডনের ল্যামবেথ কাউন্সিলে অবৈধ সন্তানের হার প্রতি ৩ জনে ১ জন।

আমেরিকার তথ্যগুলো আরো করুণ। সে ব্যাপারে অল্প বিস্তর তথ্য তো আমাদের পত্র পত্রিকায়ও রীতিমতো ছাপা হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে, গোটা পশ্চিমী দুনিয়া আজ ধ্বংসের অতল পংকে নিমজ্জিত। আল্লাহর আইনের বাইরে চলে দুনিয়ার মানুষগুলো আজ পশুত্বের এতো নীচু স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, সেখান থেকে উদ্ধারের কোনো আপাতত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ভয়াবহ ধ্বংসই আজ মনে হয় এদের একমাত্র ডেস্টিনী! ইতিহাসে গ্রীক রোমান ব্যাবিলন-এদের কারো ধ্বংসকেই তাদের বড় বড় দালান কোঠা, প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও বিলাসী জীবন ধারার কোনোটাই রক্ষা করতে পারেনি।

নিত্য নতুন কিছু তথ্যের জন্যে উৎসাহী পাঠকদের আমি আমার 'দজ্জালের পা', 'বিয়ে নিয়ে ইয়ে', তালাক নামা', প্রজন্মের প্রহসন ও সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী শীর্ষক নারী সিরিজের বইগুলো পড়ার আবেদন জানাবো।-

কোরআনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

এই পাঠের দ্বিতীয় অংশ তথা ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতগুলো মুসলিম সমাজের আর্থিক লেনদেনের একটি দিকের সাথে জড়িত। এর উদ্দেশ্য, এই ক্ষেত্রে লেনদেনের নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করে এই ক্ষেত্রটিকে বিধিবদ্ধ করা। সাধারণভাবে সকল মুসলমানদের পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করা, মালিকানা ও উপার্জনে নারীর অধিকার কতখানি তা জানানো এবং পরিশেষে জাহেলী যুগ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত অভিভাবকত্বের চুক্তিতে লেনদেন ও আচরণকে বিধিবদ্ধ করা, এই ব্যবস্থাটির বিলোপ সাধন, উত্তরাধিকারকে শুধুমাত্র আপনজনের জন্যে নির্দিষ্ট করা এবং নতুন করে। আর কোনো অভিভাবকত্বের চুক্তি সম্পাদিত হতে না দেয়া। ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতের মূল পাঠ ও অনুবাদ লক্ষ্য করুন।

এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রশিক্ষণ ও আইন বর্ণনা উভয় কাজই সম্পন্ন করা হয়েছে। ইসলামী বিধানে প্রশিক্ষণ দান ও আইন বর্ণনা এই দুটো কাজ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত, এগুলো একটা আরেকটার পরিপূরক। আইন বর্ণনা যেমন প্রশিক্ষণ ও উপদেশ দানের সাথে সংযুক্ত, তেমনি তা সমাজ জীবনের কার্যকলাপকে বিধিবদ্ধ করার সাথেও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আইন বর্ণনার সাথে সাথে যেসব নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা বিবেক ও মনের লালন ও প্রশিক্ষণের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। এই আইনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সংক্রান্ত সচেতনতা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত্র হওয়া এবং আইনের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতার বাস্তবায়নের ওপরও তা নির্ভর করে। অনুরূপভাবে আইন ও আনুষাংগিক নির্দেশগুলো আল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্কের ওপর এবং নির্দেশ ও আইনের সমন্বয়ে গঠিত আল্লাহর সামগ্রিক বিধানের উৎস সম্পর্কে অন্তরকে সচেতন করার ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানব জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দেন, তার বৈশিষ্ট্যই এরূপ। আল্লাহর বিধানে পার্থিব জীবন এবং মানব বিবেক-এই উভয়টিই পরস্পরের পরিপূরক।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, মোমেনদের প্রতি অবৈধভাবে পরস্পরের সম্পদ ভোগ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অর্থের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে লোভ বা মুনাফা বৈধ হওয়ার একমাত্র পন্থা হলো বাণিজ্য। এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে, অবৈধ অর্থ আত্মসাত বা অবৈধ উপার্জনকে আত্মহনন ও ধ্বংসের আকারে চিত্রিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আখেরাতের আযাব ও দোযখের আগুন থেকে সতর্ক করতেও আমরা দেখি। একই সাথে ক্ষমা ও গুনাহের কাফফারা করে দেয়ার ওয়াদা রয়েছে। দুর্বলতায় সাহায্য ও ভুলত্রুটি মাফ করার আশ্বাসও রয়েছে। অনুরূপভাবে লক্ষ্য করি যে, আল্লাহর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে যে বিশেষ বিশেষ বাড়তি অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, তার প্রতি ঈর্ষাকাতর না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন সম্পদের মালিক ও মহান দাতা। তাঁর কাছেই চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে আর এ আদেশ দেয়া হয়েছে নারী ও পুরুষের উপার্জনের অধিকার বর্ণনা করার অব্যবহিত পর। সবকিছুর সাথেই এই মহাসত্যকে যুক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে জ্ঞানী। অনুরূপভাবে দেখতে পাই যে, অভিভাবকত্বের চুক্তি ও সেই চুক্তি পালনের আদেশ দানের সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সাক্ষী। আল্লাহর আইন বর্ণনার সাথে এই সকল উক্তির অত্যন্ত কার্যকর ও মর্মস্পর্শী আবেদন ও প্রভাব রয়েছে। এই শিক্ষামূলক নির্দেশাবলী মানুষের মানসিক গঠন ও তার বিচিত্র মনস্তত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আল্লাহরই কীর্তি। এটাই এ আয়াতের শেষাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়।

২৯ ও ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা তোমরা পরস্পরে নিজেদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।'

এখানে সম্বোধন মোমেনদের প্রতি, আর নিষেধাজ্ঞা অবৈধ সম্পদ ভোগ ও ভক্ষণের বিরুদ্ধে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি মুসলিম সমাজকে জাহেলী জীবনের অবশিষ্ট কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র ও মুক্ত করার উদ্যোগ। 'হে মোমেনরা' সম্বোধন দ্বারা মোমেনদের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করা হয়েছে। তাদের ঈমানের দাবী সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা হয়েছে।

'অবৈধভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ'

এই কথাটি দ্বারা সম্পদ বা অর্থ লেনদেনের জন্যে গৃহীত আল্লাহর অননুমোদিত ও নিষিদ্ধ সকল পন্থাই বুঝায়। প্রতারণা, ঘুষ, জুয়া, মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় পণ্য গোলাজাত করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ও কালোবাজারী এবং সুদসহ যাবতীয় নিষিদ্ধ বেচাকেনা এর আওতাভুক্ত। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, এ আয়াত সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে না পরে নাযিল হয়েছে। যদি আগে নাযিল হয়ে থাকে, তবে নিসন্দেহে এ দ্বারা সুদ নিষিদ্ধ করার পটভূমি তৈরী করা হয়েছে। কেননা সুদ হচ্ছে অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ করার সবচেয়ে জঘন্য পন্থা। আর যদি পরে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে পরের সম্পদ আত্মসাৎ করার অন্যান্য পন্থার ন্যায় সুদও এর আওতাভুক্ত।

অতপর ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে যে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন হয়, তাকে এর আওতাবহির্ভূত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বাণিজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।'

আরবী ব্যাকরণে একে 'এসতেছনা মুনকাতে' বলা হয়। এর প্রতিপাদ্য এই যে, তোমাদের সম্মতিক্রমে যদি কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন হয়ে থাকে, তবে সেটা এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। কোরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ব্যবসায়িক লেনদেন ও অবৈধ আত্মসাতজনিত লেনদেনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকে। সূরা বাকারার সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এই সাদৃশ্যের ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সেখানে সুদ নিষিদ্ধকরণের বিপক্ষে সুদখোরদের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'বেচাকেনা তো সুদেরই মতো'। একই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের এই উক্তির জবাব দেন, 'অথচ আল্লাহ তায়ালা বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' সুদখোররা তাদের অভিশপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। তারা বলে যে, বেচাকেনা একটা লাভজনক ব্যবসা। তাই সেটা সুদেরই মতো। সুতরাং বেচাকেনাকে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করার কোনো অর্থ হয় না।

ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও সুদভিত্তিক কর্মকান্ডে দুস্তর ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যবসা জনগণ ও শিল্প কারখানার যে উপকার সাধন করে এবং সুদ জনগণ ও ব্যবসায়ের যে ক্ষতি সাধন করে, তাতে এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

ব্যবসা হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের মধ্যে একটা লাভজনক ও উপকারী মাধ্যম। ব্যবসা উৎপাদিত পণ্যের বিস্তার ও বাজারজাতকরণের সহায়তা করে, আর এ জন্যে সে তার শ্রীবৃদ্ধি করে ও তাকে সহজলভ্য করে। এ কাজটি উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্যে সেবাস্বরূপ এবং এই সেবা দ্বারা কিভাবে লাভবান হওয়া যায় তার পথ নির্দেশক। এই লাভ বা মুনাফা অর্জন দক্ষতা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল এবং তাতে একই সাথে লাভ ও ক্ষতি দুটোরই সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু সুদ এই সকল দিক দিয়েই ব্যবসায়ের বিপরীত। আসল ব্যয়ের ওপর আরোপিত সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে শিল্প কারখানার ব্যয়ভার বেড়ে যায়। আর এই বাড়তি ব্যয়ভার মেটাতে গিয়ে শিল্প কারখানা ব্যবসায়ী ও ভোক্তার ওপর বাড়তি মূল্য ধার্য করে এবং তা দিতে গিয়ে ব্যবসায়ী ও ভোক্তার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে, আর একই সাথে সুদ শিল্প বাণিজ্যকে এমন পথে পরিচালিত করে, যেখানে শিল্প কিংবা ভোক্তা জনসাধারণ কারোই স্বার্থ রক্ষিত হয় না। বরং এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো মুনাফার অংক বৃদ্ধি করা, যাতে শিল্প ঋণের সুদ পরিশোধ করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে জনগণ যদি শুধু বিলাসদ্রব্যই ভোগ করতে থাকে এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়, তথাপি তাতে সুদখোরদের কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, পুঁজির এই অব্যাহত ও তথাকথিত স্থায়ী মুনাফা (অর্থাৎ সুদ এবং লোকসান উৎপন্নকারী দুর্ঘটনাসমূহে তার অংশ গ্রহণ না করা যেমনটি ব্যবসা অংশগ্রহণ করে থাকে) এবং ব্যবসা বাণিজ্যে যে মানবীয় চেষ্টা সাধনা করা হয়ে থাকে, সেই চেষ্টা সাধনার ওপর এর নির্ভরশীলতা কম থাকা সুদী লেনদেন ও বাণিজ্যিক লেনদেনের পার্থক্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দেয়। এসব বৈশিষ্ট্য ও এর অন্যান্য খারাপ বৈশিষ্ট্য একত্রিত করলে সুদী অর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে কালো তালিকা তৈরী হয়, তা তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার দাবী জানায়। ইসলাম তার বিরুদ্ধে এই দন্ডই ঘোষণা করেছে।(৮)

সুদ ও বাণিজ্যের পার্থক্যের পাশাপাশি এই আপাত দৃশ্যমান সাদৃশ্যের কারণেই সুদের অকাট্য নিষেধাজ্ঞার অব্যবহিত পর 'পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বাণিজ্যিকে লেনদেন'কে বৈধ বলে উল্লেখিত ব্যতিক্রমী নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ব্যাকরণবিদদের ভাষায় 'এসতেছনা মুনকাতে' অর্থাৎ আগে বর্ণিত বিষয়টির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত। অতপর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি অনুকম্পাশীল।'

অন্যায়ভাবে পরস্পরের অর্থ সম্পদ আত্মসাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। পরস্পরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে সমাজ জীবনে তার কিরূপ ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, সেই কথাই এই মন্তব্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বস্তুত, এটি একটি হত্যাকান্ডই বটে! মোমেনদেরকে যখন আল্লাহ তায়ালা এ কাজ করতে নিষেধ করেন, তখন তিনি আসলে তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এই হত্যাকান্ড থেকে বিরত রাখতে চান।

বস্তুত এটি যথার্থই একটি হত্যাকান্ড। যখনই কোনো সমাজে অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ আত্মসাৎ ও ভক্ষণের প্রবণতা বিস্তার লাভ করে, যথা সুদ, প্রতারণা, জুয়া, কালোবাজারী ও মওজুদদারী, জালিয়াতি, পরস্ব অপহরণ, ধোঁকাবাজী, ঘুষখুরী, চুরি এবং সম্ভ্রম, নিরাপত্তা, বিবেক, চরিত্র ও ধর্ম প্রভৃতি অবিক্রয়যোগ্য জিনিস বিক্রয় করা হয় তখন সেই সমাজের মাধ্যমে ধ্বংস ও আত্মহননের পথই বেছে নেয় এবং সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তার কপালের লিখন।

আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হয়ে বান্দাদের এই ধ্বংসাত্মক হত্যাকান্ড থেকে নিবৃত্ত রাখতে চান। এটা হলো মোমেনদের ভার লাঘব করা ও তাদের মানবীয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন তার একটি অংশ। মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া যাদের কাম্য তাদের আনুগত্য করে, তখন সে এই দুর্বলতারই শিকার হয় এবং তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

---

(৮) ইতিপূর্বে এই তাফসীরের সূরা বাকারায় সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

এর অব্যবহিত পর এসেছে আখেরাতের আযাবের হুমকি। যারা অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করে, সেইসব আগ্রাসী যালেম শোষকদেরকে আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। এ হুমকি দেয়ার আগে তাদেরকে পার্থিব জীবনে হত্যাকান্ড ও ধ্বংসলীলা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে আত্মসাৎকারী যালেমদেরকেও এবং যাদের সম্পদ আত্মসাত করা হয় সেই মযলুমদেরকেও। কেননা গোটা সমাজই এ অপকর্মের কুফল ভোগ করে থাকে। যুলুম, শোষণ ও আগ্রাসনকে যখন অবাধে চলতে দেয়া হয় এবং পরস্ব অপহরণ ও আত্মসাতের প্রথা সমাজে চালু হয়ে যায়, তখন সেই সমাজের ওপর দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর আযাবের সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়ে যায়। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে এসব কাজ করবে, তাকে আমি আগুনে পোড়াবো। এটা আল্লাহর কাছে সহজ ব্যাপার।' (আয়াত ৩০)

এভাবে ইসলামী বিধান দুনিয়ায় ও আখেরাতে মানুষের প্রবৃত্তির চারপাশে সীমারেখা স্থাপন করে। তার জন্যে আইন ও বিধি নিষেধ রচনা করে। আর তার মনের ভেতর থেকেই এক সদাজাগ্রত প্রহরী নিয়োগ করে, যার কাজ হলো নির্দেশ গ্রহণ ও পালন করা এবং আইন বাস্তবায়ন করা। শুধু তাই নয়, ইসলামী বিধান সমাজের লোকদেরকেও পরস্পরের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। কেননা গোটা সমাজের ওপরই এর দায় দায়িত্ব বর্তে এবং অন্যায় ও অত্যাচারমূলক পরিবেশকে প্রতিরোধ না করলে ও অবহেলা করলে পৃথিবীতে ধ্বংস ও খুন খারাবী এবং আখেরাতে জবাবদিহীর দায় গোটা সমাজকেই বহন করতে হবে। 'এটা আল্লাহর কাছে সহজ ব্যাপার।' অর্থাৎ এই অবধারিত শাস্তি দিতে তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এই শাস্তির কারণ যখন সংঘটিত হয়, তখন শাস্তি সংঘটিত হওয়া কেউ ঠেকাতে পারে না।

বড়ো গুনাহ পরিহার করলে ছোটো গুনাহ ক্ষমার আশ্বাস

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে একটি আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। সেটি এই যে, অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করাসহ যাবতীয় 'কবীরা গুনাহ' থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রহমত করা, ক্ষমা করা এবং কবীরা গুনাহ ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাদের দুর্বলতার কথা জানেন বলেই তাদের প্রতিদান এবং বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে সংযত থাকার বিনিময়ে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দিতে চান। ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা বড়ো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করো, তাহলে আমি তোমাদের বাদবাকী গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।'

কতো উদার এই দ্বীন। কতো সহজ এর বিধি ব্যবস্থা! এতে উচ্চতা, মহত্ত্ব, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও আনুগত্যের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, যেটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য, আদেশ ও নিষেধ জারী করা হয়েছে, তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তি গঠন ও অপরাধমূলক ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন।

এই সমস্ত আহ্বান ও আদেশ নিষেধ জারি করার সাথে সাথে মানুষের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতনতার ক্ষমতা ও সামর্থের সীমা সম্পর্কে সে অজ্ঞ নয়। তাই তার অসাধ্য কোনো দায়িত্ব সে তার ওপর চাপায় না।

এ জন্যেই ইসলামে ক্ষমতা ও দায়িত্ব, প্রয়োজন ও কামনা বাসনা, দমন ও উৎসাহ দান, আদেশ ও ধমক, উদ্দীপনা ও সতর্কীকরণ, পাপ কাজের বিরুদ্ধে আযাবের কঠোর শাসানি ও ক্ষমার উদাস আশ্বাস প্রদানের মধ্যে এমন ভারসাম্য নিহিত।

ইসলাম মানুষের কাছ থেকে শুধু এতোটুকুই প্রত্যাশা করে যে, সে আল্লাহর দিকে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করুক, এটা মনোনিবেশকরণে সে পুরোপুরি নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হোক এবং আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করুক। এরপর তার জন্যে রয়েছে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহ বান্দার দুর্বলতা ও অক্ষমতায় অনুকম্পার প্রদর্শন করে, তাওবা কবুল করে, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে সযত্নে ও সসম্মানে ক্ষমা প্রদর্শন করে।

বান্দা যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হবে যদি সে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ বড়ো বড়ো কাজ থেকে সংযত থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি কবীরা গুনায় লিপ্ত হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, পাপের প্রতিরোধে তার কাছ থেকে যতোটুকু কষ্ট সাধনা প্রত্যাশা করা হয়েছিলো তা সে করেনি এবং তাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেনি। কেননা, কবীরা গুনাহগুলো এতোবড়ো স্পষ্ট যে, না জানা ও না বুঝার ওজুহাতে তাতে লিপ্ত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এতদসত্তেও আন্তরিকতা সহকারে তাওবা করলে তা সব সময় আল্লাহর দয়া ও করুণার দৌলতে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কেননা দয়াকে আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোনো অন্যায় কাজ করলে অথবা নিজেদের ওপর যুলুম করলে আল্লাহ তায়ালাকে যারা স্মরণ করে, নিজেদের গুনাহের জন্যে ক্ষমা চায়– বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে গুনাহ মাফ করবে? এবং নিজেদের কৃতকর্মকে জেনেশুনে যারা অব্যাহত রাখে না।' (আলে ইমরান ১৩৫) এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা 'মোত্তাকী' বা সংযমী বলে অভিহিত করেছেন।

এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কবীরা গুনাহ পরিহার করা হলে অন্য সকল গুনাহ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এখানে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে সেই ব্যাপারেই প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, কবীরা গুনাহ কি কি? এ ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কবীরা গুনাহের কিছু প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, পুরো সংখ্যা জানানো হয়নি। এ ধরনের প্রতিটি হাদীসে কিছুসংখ্যক কবীরা গুনাহ বর্ণনা করা হয়েছে, কোনোটাতে কিছু কম, কোনোটাতে কিছু বেশী। এ থেকে মনে হয় যে, এসব হাদীস কতকগুলো বাস্তব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে এবং প্রত্যেক হাদীসে সংঘটিত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কবীরা গুনাহ তার প্রকার, সংখ্যা, পরিবেশ ও যুগ হিসাবে যতোই বিভিন্ন হোক না কেন, তাকে চেনা ও জানা কোনো মুসলমানের পক্ষে কঠিন কিছু নয়।

এখানে আমি গুনাহ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের অধিকারী হিসেবে সুপরিচিতি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এই ঘটনা থেকে জানা যাবে ইসলাম কিভাবে তার অনুভূতিকে এতো শাণিত ও সতেজ করেছিলো, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানদন্ড কিভাবে তার হাতে ভারসাম্যপূর্ণ ও নিখুঁত হয়েছিলো এবং তা সমাজের সমস্যাবলীর সঠিক প্রতিকারে তাকে সক্ষম করেছিলো।

একবার হযরত ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহকে মিসরের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো যে, আল্লাহর কেতাবে এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই, যার অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তা অনুসরণ করা হয় না। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে আমরা আমীরুল মোমেনীনের সাথে সাক্ষাৎ করবো মনস্থ করেছি। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর প্রশ্নকারীদের সাথে নিয়ে হযরত ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, তুমি কবে এসেছো? তিনি বললেন, অমুক দিন। হযরত ওমর আবার বললেন, তুমি কি অনুমতি নিয়ে এসেছো? বর্ণনাকারী বললেন, আব্দুল্লাহ এ প্রশ্নের কি জবাব দিলেন, তা আমি জানি না। এরপর আব্দুল্লাহ বললেন, আমীরুল মোমেনীন! কিছু লোক মিসরে আমার সাথে দেখা করে বলেছে যে, আমরা আল্লাহর কেতাবে এমন অনেক বিষয় দেখতে পাই, যার অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা অনুসরণ করা হয় না। এই বিষয়ে তারা আপনার সাথে দেখা করে এ কথা বলতে চায়। আমীরুল মোমেনীন বললেন, আচ্ছা, ওদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি তাদেরকে তার কাছে নিয়ে এলাম।'- বর্ণনাকারী আবু দাউদ বলেন, আমার প্রবল ধারণা এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর সমবেত করার স্থানের নাম 'বাহু' বলেছিলেন- এরপর হযরত ওমর তার নিকটতম ব্যক্তিকে দিয়ে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের দোহাই দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি সমগ্র কোরআন অধ্যয়ন করেছো? সে বললো, জী হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তা নিজের ওপর বাস্তবায়িত করেছো? সে বললো, না। সে যদি হাঁ বলতো, তাহলে তিনি তাকে জেরা করতেন। এরপর বললেন, তুমি কি কোরআনকে নিজের চোখে, নিজের কথাবার্তায় ও নিজের চাল চলনে বাস্তবায়িত করেছো? এভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত এসে বললেন, ওমরের মায়ের দোহাই, বলো, তোমরা কি ওমরকে এই দায়িত্ব দিচ্ছো যে, সে জনগণকে আল্লাহর কেতাবের অনুসারী বানাক? আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানতেন যে, আমাদের দ্বারা বহু গুনাহ সংঘটিত হবে। অতপর আলোচ্য আয়াত 'যদি তোমরা নিষিদ্ধ বড়ো বড়ো গুনাহ পরিহার করো, তাহলে আমি তোমাদের অন্যান্য গুনাহ মাফ করে দেবো...।' পাঠ করলেন। অতপর বললেন, মদীনাবাসী কি তোমাদের আগমনের বিষয়টি জেনে গেছে? তারা বললো, না। তিনি বললেন, তারা যদি জানতো, তবে তোমাদের সাথে তাদেরকেও আমি এ উপদেশ দিতাম।

এভাবেই অসাধারণ ও তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও সংবেদনশীল মানুষ হযরত ওমর সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ের ওপর কর্তৃত্ব চালাতেন। কোরআন তার অনুভূতিকে পরিশীলিত সুষম করে দিয়েছিলো। তাকে দিয়েছিলো সূক্ষ্ম ও নিখুঁত মানদন্ড। তিনি বলেছিলেন, 'কিছু না কিছু গুনাহ যে আমাদের দ্বারা সংঘটিত হবে, তা আমাদের রব জানতেন।' বস্তুত আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্পর্কে আগে থেকে যা জানতেন, তা থেকে ভিন্নতর কিছু হতে পারি না এবং কখনো হতে পারবোও না। বিবেচ্য বিষয় হবে এটাই যে, আমরা কেমন দৃঢ় ও অবিচল ইচ্ছাশক্তি পোষণকরি, সঠিক পথ আঁকড়ে ধরতে কতোটা যত্নবান, কেমন চেষ্টা সাধনা করি। আনুগত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে কতোটা আগ্রহী এবং সে জন্যে কেমন সচেষ্ট। বিবেচ্য বিষয় হলো আমাদের ভারসাম্য, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, সরলতা ও মধ্যম আচরণ।

ইসলামে নারী পুরুষের অবস্থান

পরবর্তী আয়াতে অর্থ সম্পদ এবং সমাজে তার সুষ্ঠু বন্টন ও বিতরণ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসংগে পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের মধ্যকর লেনদেন ও সম্পর্কের বিষয়ে উপসংহার টানা হয়েছে। এতে অভিভাবকত্বের চুক্তিসহ ও সাধারণ উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা সূরার শুরুতেই করা হয়েছে। নীচের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনকে অপরজনের ওপর যে প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার প্রতি লালায়িত হয়ো না ... আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে সাক্ষী।' (আয়াত ৩২-৩৩)

আয়াতে মোমেনদের একজনকে অপরজনের ওপর প্রদত্ত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঈর্ষা পোষণ করতে যে নিষেধ করা হয়েছে, সেই নিষেধাজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠত্ব কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব যে কোনো ধরনের হতে পারে। দায়িত্ব, পদমর্যাদা, যোগ্যতা ও প্রতিভা, ধন সম্পদ ও বিত্তবৈভবের যে কোনোটিতে একজন অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারে। পার্থিব জীবনের যেসব বিষয়ে মানুষের পরিমাণে তারতম্য ঘটতে পারে, তার সবই এর আওতাভুক্ত। এসব তারতম্য ও ব্যবধানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বঞ্চনাবোধ, হীনমন্যতাবোধ মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ন্যায্য বন্টনের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করার পরিবর্তে কাংখিত সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাওয়ার মনোভাব গড়ে তোলা, তাঁর কাছে চেয়ে যাওয়া। তাঁর কাছে সরাসরি সর্বপ্রকারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে এখানে তাকীদ দেয়া হয়েছে। বস্তুত অন্যের যে কোনো ধরনের সৌভাগ্য মনোক্ষুণ্ন হওয়া ও নিজের বঞ্চনায় হা-হুতাশ, বিষণ্নতা ও বিমর্ষতায় জর্জরিত করে। খারাপ মনোবৃত্তি ও কুচিন্তায় মানুষ খামোখাই শক্তি ক্ষয় করে। পক্ষান্তরে সরাসরি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনায় মনোনিবেশ করা ও উদ্যোগী হওয়ার অর্থই হলো সকল সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির মূল উৎসের কাছে হাত পাতা। তার কাছেই সকল বিষয়ে ধর্ণা দেয়া কর্তব্য।'

এতো গেলো সাধারণ হেদায়েতমূলক বক্তব্য। কিন্তু এখানে এই নির্দেশ দান ও তার নাযিলের মাঝে আরো একটি বিশেষ বিষয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে নারী-পুরুষের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়। যা আয়াত দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই নারী পুরুষের সম্পর্ক, পারস্পরিক সৌহার্দতা, একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নির্ভরশীল। তাতে বংশধারা এবং পুরো মুসলিম সমাজে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এর সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের ওপর আলাদা আলাদা কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। সেই জন্যে কারো প্রতি বিশেষ দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে।

এ প্রসংগে হাদীস শরীফে একটি বর্ণনা অনুধাবনযোগ্য–

ইবনে আবী হাতেমে রয়েছে, উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যুদ্ধ করার সুযোগ পাই না, যে শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ করতো এবং আমাদের উত্তরাধিকার অর্ধেক হবে না। এর জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়– "তোমাদের একজনকে অপরজনের ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ো না।"

এর জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়। অতপর সূরা আলে ইমরানের শেষ ভাগের এ আয়াতও নাযিল হয়, 'পুরুষ বা স্ত্রী যেই হও না কেন, আমি তোমাদের কোনো কর্ম সম্পাদনকারীর কর্ম বিনষ্ট করি না।'

সুদ্দী এ আয়াত প্রসংগে বলেন, 'কিছুসংখ্যক পুরুষ বলেছিলো যে, আমরা মহিলাদের তুলনায় যেমন সম্পত্তির দ্বিগুণ পাই, তেমনি সৎকর্মের পুরস্কারও আমরা দ্বিগুণ পেতে চাই। কেননা আমরা যুদ্ধ করতে পারি নারীরা যুদ্ধ করতে পারে না। একথার জবাবে নারীরা বললো, আমাদের ওপর যদি যুদ্ধ ফরয করা হতো, তবে আমরাও যুদ্ধ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের কারোই দাবী পুরা করলেন না। তবে তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা সুদ্দী এ আয়াত প্রসংগে বলেন, 'কিছুসংখ্যক পুরুষ বলেছিলো যে, আমরা মহিলাদের তুলনায় যেমন সম্পত্তির দ্বিগুণ পাই, তেমনি সৎকর্মের পুরস্কারও আমরা দ্বিগুণ পেতে চাই। কেননা আমরা যুদ্ধ করতে পারি নারীরা যুদ্ধ

করতে পারে না। একথার জবাবে নারীরা বললো, আমাদের ওপর যদি যুদ্ধ ফরয করা হতো, তবে আমরাও যুদ্ধ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের কারোই দাবী পুরা করলেন না। তবে তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। সুদ্দী, বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার সহায় সম্পদ নয়। কাতাদাও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আমার কিছুসংখ্যক বর্ণনায় এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, এ আয়াতে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা এই যে, 'পুরুষের এরূপ আক্ষেপ করা চাই না যে, আহা, আমার যদি অমুকের মতো ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন থাকতো।' তবে প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। হাসান, মোহাম্মদ ইবনে সিরিন, আতা ও যাহহাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাগুলোতে আমরা নারী পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে জাহেলী ধ্যান-ধারণার কিছু রেশ এবং উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবের কিছু লক্ষণ দেখতে পাই। ইসলাম মানুষের উভয় লিংগ, প্রতিটি শ্রেণী, ব্যক্তি এমনকি তার মন ও প্রবৃত্তির জন্যে সাধারণভাবে যে সম্মান, মর্যাদা ও সুবিচার নিশ্চিত করেছে, আর বিশেষভাবে নারীকে যে স্বাধীনতা ও অভূতপূর্ব অধিকার প্রদান করেছে, সম্ভবত তার কারণেই নারীরা এরূপ দাবী দাওয়া উত্থাপনের সাহস পেয়েছে।

তবে ইসলামের এসব অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য শুধু পুরুষদেরকেও সুবিধা দেয়া নয়। শুধু নারীদের স্বার্থ রক্ষা করাও নয়। বরং আল্লাহর গোটা বিধানকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ও সর্বাত্মকভাবে বাস্তবায়িত করা। ইসলামের উদ্দেশ্য 'মানুষের' ও 'মুসলিম সমাজের' অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা, নৈতিকতা, সততা ও কল্যাণকে সার্বিকভাবে নিশ্চিত করা এবং সর্বতোভাবে সুষম ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব, কাজ ও সম্পদ বন্টনে ইসলাম প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। প্রকৃতি প্রাথমিকভাবে পুরুষকে পুরুষ ও নারীকে নারী হিসেবে তৈরী করেছে। তাদের উভয়কে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যাতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট কাজ দেয়া যায়। এটা সে নিজের অথবা নারী বা পুরুষের সুবিধা বা কল্যাণের জন্যে করেনি-করেছে গোটা মানব জীবনের সার্বিক ও সামগ্রিক মংগলের লক্ষ্যে। প্রকৃতি মানুষকে নারী ও পুরুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং বৈশিষ্ট্যে ও দায়িত্বে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিকে সুষম করে, সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহকে পূর্ণতা দান করে এবং পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর এবাদাত ও দাসত্বের লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করে। আর বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের বিভিন্নতার ভিত্তিতে জীবন নামক বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ ও মংগলের লক্ষ্যে কাজ করে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সম্পদ ও কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হয়ে যায়। প্রথমে গোটা ইসলামী বিধানকে এবং তারপর এর নারী পুরুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত অংশকে অধ্যয়ন করলে এ বিষয়ে প্রচলিত প্রাচীন ও আধুনিক সকল বিতর্কের অবসান ঘটে। এ সংক্রান্ত প্রাচীন বিতর্ক তো নিছক জনশ্রুতির ফসল। আর আধুনিক বিতর্ক অবসরভোগী নারী-পুরুষের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে এবং তা সমাজে এতো ব্যাপক হৈ চৈ সৃষ্টি করেছে যে, কখনো কখনো কর্মব্যস্ত নর নারীকেও বিব্রত করে থাকে।

নারী ও পুরুষের ব্যবধানকে এই উভয় লিংগের মধ্যকার এক ঘোরতর তর্কযুদ্ধের আকারে ফুটিয়ে তোলা এবং এর হারজিত চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিছুসংখ্যক লেখক যেভাবে নারীকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং সকল দোষ তার ওপরে আরোপ

করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সেটা তারা ইসলামের নামেই করুন আর গবেষণা ও বিশ্লেষণের নামেই করুন, তা একেবারেই অর্থহীন ও বৃথা চেষ্টা মাত্র। কেননা, বিষয়টা আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের বিষয় নয়। এটা শুধু বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা কর্ম ও দায়িত্ব বন্টন, পরস্পরের পরিপূরক হওয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিধানে পূর্ণাংগ সুবিচার প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

নারীকে নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত যদি কোথাও হয়, তবে হতে পারে কেবল জাহেলী তথা অমুসলিম সমাজে। কেননা, এ সমাজ নিজের যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা কেবল নিজের খেয়াল খুশী, সংকীর্ণ স্বার্থ ও আপাতদৃশ্যমান কল্যাণ ও সুবিধার খাতিরে কিংবা সমাজের কেবল পরাক্রান্ত ও আধিপত্যশালী শ্রেণীসমূহের অথবা বিশেষ বিশেষ পরিবার বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থেই রচনা করে থাকে। সার্বিক মানব সত্ত্বা সম্পর্কে এবং মানব জীবনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত অথবা একই ধরনের পেশায় পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরী নারী শ্রমিককে না দেয়া কিংবা উত্তরাধিকার থেকে কিংবা সম্পদের ব্যবহারের অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার আশ্রয় নেয়ার কারণে আধুনিক জাহেলী সমাজ নারীর অধিকার হরণকারী বিধি ব্যবস্থা রচনা করে থাকে।

কিন্তু ইসলামী সমাজে এ ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার কোনো অবকাশ নেই, সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকে না। পার্থিব সম্পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকে না। নারী কিংবা পুরুষের ওপর আক্রমণ চলে না। উভয়ের কারো ক্ষতিসাধন করা হয় না। কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সুযোগ থাকে না এবং কারো দোষ অন্বেষণে লেগে থাকারও অবকাশ থাকে না। ইসলামী সমাজে এরূপ ধারণা করারও অবকাশ থাকে না যে, নারী পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে যে সৃষ্টিগত ও জন্মগত পার্থক্য রয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উভয়ের কাজে, দায়িত্বে ও ভূমিকায় কোনো ব্যবধান রাখা হয়নি কিংবা এই ব্যবধানের ফলে উভয়ের কর্মক্ষেত্রে ও পেশায় কোনো বিভিন্নতা সৃষ্টি করা হয়নি। এ ধরনের যাবতীয় ধারণা একদিকে যেমন নিরর্থক, তেমনি তা ইসলামী বিধানকে ও নারী পুরুষের ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে না বুঝার অনিবার্য কুফল। এরপর জেহাদ করা, তাতে শহীদ হওয়া এবং এ দুটি মহৎ ও পুন্যকর্মে স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ ও প্রতিদান লাভের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। এ বিষয়টি প্রাথমিক যুগের মহীয়সী মহিলাদের মনকে তোলপাড় করতো। এটি সর্বতোভাবে আখেরাতকেন্দ্রিক চিন্তার ফসল, যদিও তা ইহকালীন কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত। উত্তরাধিকারে নারী ও পুরুষের প্রাপ্য অংশের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া যাক। এটিও অতীতে ও বর্তমানে কিছু নারী ও পুরুষের মনে ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা নারীর ওপর জেহাদ ফরযও করেননি, নিষিদ্ধও করেননি। যখন জেহাদের প্রয়োজন পড়ে এবং পুরুষদের দ্বারা সে প্রয়োজন পূর্ণ হয় না, তখন এ কাজে নারীকে অংশগ্রহণে ইসলাম বাধা দেয় না। বহু নারী ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ বিগ্রহে যোগ দিয়েছেন। শুধু উৎসাহ বা সান্ত্বনা দানকারিণী হিসাবে নয়, কিংবা রসদ সরবরাহকারিণী হিসাবেও নয়- বরং সরাসরি যোদ্ধা হিসাবেই তারা যোগ দিয়েছেন। তবে সেটা কোনো সাধারণ রীতি ছিলো না। প্রয়োজন অনুসারে কদাচিত কোনো নারী জেহাদে অংশ নিয়েছেন। মোটকথা, পুরুষের মতো নারীর ওপর আল্লাহ তায়ালা জেহাদ ফরয করেননি।

নারীর ওপর জেহাদ ফরয না করার কারণ এই যে, তার পেটেই যোদ্ধা পুরুষের জন্ম হয়ে থাকে। নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠনের প্রতিটি দিক বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, সে সন্তানের প্রজনন থেকে শুরু করে সন্তানকে যুদ্ধ করা ও জীবিকা উপার্জন করা এই উভয় কাজের জন্যেই

সমভাবে প্রস্তুত করার সহজাত যোগ্যতার অধিকারী। বরঞ্চ এ কাজে নারীই সবচেয়ে বেশী সক্ষম ও বেশী কার্যকর। বেশী সক্ষম এ জন্যে যে, তার দেহের প্রতিটি কোষ দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে এই কাজের জন্যে প্রস্তুত। এখানে বাহ্যিক দৈহিক গঠনের বিষয়টিই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, ডিম্বাণু যুক্তকরণের পর এবং উক্ত ডিম্বাণু পুরুষ হবে, না স্ত্রী হবে সে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্থিরীকৃত হওয়ার পর প্রতিটি কোষই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর উক্ত কোষের সাথে উল্লেখিত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত হয়ে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, একজন নারী একটি মানুষ তৈরীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরও বটে। যুদ্ধে যখন পুরুষরা ব্যাপকভাবে মারা যায় এবং নারীরা বেঁচে থাকে, তখন শূন্যতা পূরণের উপায় থাকে না। মুসলিম সমাজেই হোক বা অন্য কোনো সমাজে যখন পুরুষের সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন একজন পুরুষ চারজন নারীকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করাতে পারে। এভাবে হত্যাকান্ডজনিত শূন্যতা কিছুদিনের মধ্যেই পূরণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একজন নারীকে দিয়ে একজন পুরুষ যে কয়জন সন্তান দিতে পারে, এক হাজার পুরুষ তাকে দিয়ে তার চেয়ে বেশী সন্তান প্রজনন করতে ও শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। জেহাদ ফরয করা থেকে নারীকে অব্যাহতি দেয়ার পেছনে আল্লাহর যে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে, তা শুধু এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের নৈতিকতা ও তার স্বভাবগত সৃষ্টিশীলতাকে এবং উভয় লিংগের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংরক্ষণসহ এমন বহু বিষয় এতে রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেননা, এ জন্যে একটা স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন। বাকী রইলো প্রতিদান ও পুরস্কারের বিষয়টি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারীদেরকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সবাইকেই জেহাদের সওয়াবের অংশীদার করা হবে। প্রত্যেক মানুষকে যে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই তার জন্যে যথেষ্ট। এতেই সে আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল বলে পরিগণিত হবে।

উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও একই কথা। আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, পুরুষের জন্যে দু'জন নারীর অংশের সমান নির্ধারণ করে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্থুলদৃষ্টি অচিরেই উদঘাটন করে যে, স্ত্রী ও পুরুষের সামগ্রিক অবস্থা ও দায় দায়িত্বের সমন্বয়ে একটি পরিপূরক একক সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটে। ইসলামী বিধানে এই স্থায়ী পরিপূরক বিধি স্বীকৃত যে, 'যার যতো দায় তার ততো আয়' (আল গুনমু বিল গুনমি)। পুরুষ স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে থাকে, স্ত্রী কোনো মোহরানা দেয় না। আর স্ত্রী ও তার সন্তানদের খোরপোশ পুরুষই বহন করে থাকে, স্ত্রী এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এমনকি তার যদি ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি থেকেও থাকে তবুও সে এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পুরুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করলে তার সর্বনিম্ন শাস্তি হয়ে থাকে কারাদন্ড। পরিবারের কোনো সদস্য কাউকে খুন যখম করলে পুরুষই তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। নারীর ওপর এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব বর্তে না। পরিবারের যেসব সদস্য উপার্জনে অক্ষম, তাদের খরচ স্ত্রীকে নয়, বরং পর্যায়ক্রমে পুরুষকেই বহন করতে হয়। এমনকি সন্তানের দুধ পানের ব্যবস্থা এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান পালনের সমস্ত দায়িত্ব, এমনকি স্ত্রীরও খোরপোশ পুরুষকেই বহন করতে হয়। এভাবে ইসলামের ব্যবস্থা একটা পরিপূরক ব্যবস্থা। দায় দায়িত্ব কার কত সে অনুপাতেই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ উত্তরাধিকারের যতোটুকু অংশ পায়, সে তুলনায় তার ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা বেশী। এখানে প্রধান

বিবেচ্য বিষয় হলো, পুরুষের স্বভাবগত উপার্জন ক্ষমতা এবং মূল্যবান মানব সম্পদ পালন ও সংরক্ষণের জন্যে নারীকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দান। বস্তুত নারীর এই দায়িত্বকে কোনো অর্থমূল্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয় এবং অন্য কোনো সমাজ সেবা, জনসেবা বা উৎপাদনমূলক কাজ এই কাজের সমকক্ষ নয়।

নারীর উপার্জন ও মালিকানা

এভাবেই আমরা বুঝতে পারি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা রচিত প্রজ্ঞাময় ইসলামী বিধানে কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভারসাম্য ও কত সূক্ষ্ম পরমিতিবোধ নিহিত রয়েছে।(৯)

ইসলাম নারীকে মালিকানার কিরূপ অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছে এ আয়াতের শেষাংশে সেটিও লক্ষণীয়,

'পুরুষরা যা উপার্জন করেছে, তাতে তাদের অধিকার রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে, তাতে তাদের অধিকার রয়েছে।'

নারীর এ অধিকারকে আরব জাহেলিয়াতের ধ্বজাবাহীরা অন্যান্য প্রাচীন জাহেলিয়াতের মতোই হরণ করতো এবং কদাচিত তাকে স্বীকার করতো। ছলে বলে ও কৌশলে এ অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হতো। কেননা স্বয়ং নারীই অন্যান্য সহায় সম্পদের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হতো।

যে সমস্ত আধুনিক জাহেলী ব্যবস্থা গলাবাজি করে যে, নারীকে তারা যতো অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, ততোটা আর কেউ দেয়নি, সেইসব ব্যবস্থাও নারীর উত্তরাধিকার হরণ করে থাকে। কোনো কোনো সমাজে জ্যেষ্ঠ পুরুষ উত্তরাধিকারীকেই সমস্ত উত্তরাধিকার দেয়া হয়। কোনো সমাজ আবার নারীর সাথে যে কোনো আর্থিক চুক্তি সম্পাদন করতে অভিভাবকের অনুমতি জরুরী গণ্য করে। কোথাও বা স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহার করতে তাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হয়। অথচ নারীর অধিকার নিয়ে এতোদিনে কতো আন্দোলন ও কতো বিপ্লব হয়ে গেলো এবং তার ফলে নারীদের সামগ্রিক জীবনে, পরিবার ব্যবস্থায় ও সাধারণ নৈতিক পরিবেশ কতো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলো। অথচ ইসলাম প্রথম থেকেই নারীকে এ অধিকার দিয়েছে। এ অধিকার আদায় করতে তার কোনো আন্দোলন, বিপ্লব বা পার্লামেন্টের সদস্যগিরি তো দূরের কথা, অধিকার চাওয়ারও প্রয়োজন হয়নি। সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতি, নারী ও পুরুষের প্রতি, স্বীয় পরিবারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এবং পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে সমভাবে স্নেহ, মমতা ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ দিয়ে যে রক্ষাব্যূহ রচনা করা হয়েছে, তার প্রতি ইসলামের যে মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভংগি রয়েছে, তার ভিত্তিতেই সে তাকে এ অধিকার দিয়েছে।

এ কারণেই ইসলামী সমাজে নীতিগতভাবে উপার্জন ও মালিকানায় নারী ও পুরুষের পূর্ণ সমানাধিকার রয়েছে।

ডক্টর আব্দুল ওয়াহেদ ওয়াফী স্বীয় 'মানবাধিকার' নামক গ্রন্থে ইসলামে ও পাশ্চাত্য দেশে নারীর অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেছেন,

ইসলাম নারী ও পুরুষকে আইনের চোখে ও সকল নাগরিক অধিকারে সমান মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি এ ক্ষেত্রে বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীতেও কোনো বৈষম্য রাখেনি। ইসলামের বিয়ে

(৯) উত্তরাধীকার আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের ইনসাফ সম্পর্কে অধিক জানার জন্যে উসাহী ব্যক্তিদের আমার লেখা 'প্রজন্মের প্রহসন' বইটি দেখার অনুরোধ জানাবো।–সম্পাদক

অধিকাংশ পশ্চিম খৃষ্টান দেশের বিয়ের চাইতে ভিন্নরকমের। ইসলামে বিয়ের পর নারীর নিজের নাম, নাগরিক ব্যক্তিত্ব, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা ও মালিকানা অধিকার কোনোটাই হারায় না। বরং মুসলিম নারীর বিয়ের পরও নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নাম, যাবতীয় নাগরিক অধিকার, সামাজিক ও আইনগত দায় দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা, ক্রয় বিক্রয়, বন্ধক, দান ও উইল ইত্যাদির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে, তার ব্যক্তিগত সহায় সম্পদও স্বামীর সহায় সম্পদ থেকে পৃথকভাবে থাকে। স্বামীর জন্যে তা থেকে এক কপর্দকও নেয়ার অনুমতি নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে বিপুল সম্পদ দিয়ে থাকে তবে তা থেকে একবিন্দুও নিও না।' সুস্পষ্ট অন্যায় ও অবৈধভাবেই কি তা তোমরা নিতে চাও? তোমরা যখন একজন অপরজনের সাথে মিলিত হয়েছো এবং স্ত্রীরা তোমাদের কাছ থেকে কঠোর অংগীকার নিয়েছে, তখন কিভাবে তা নেবে?'

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছো তা থেকে কিছু নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।'

স্ত্রীকে দেয়া জিনিস থেকেও যখন কেনো কিছু ফেরত নেয়া বৈধ নয়, তখন স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ থেকে কিছু নেয়া তো তার সানন্দ সম্মতি ছাড়া বৈধ হতেই পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশী মনে দিয়ে দাও। অতপর তারা যদি তা থেকে কিছু খুশি মনে দেয়, তবে তোমরা তা সানন্দে খাও।'

স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করাও বৈধ নয়। কেবল স্ত্রীর প্রদত্ত অধিকার বা অনুমতিকে সে বাতিলও করতে পারে।

আধুনিক যুগের সর্বাধিক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের আইন কানুনও এতো উচ্চস্তরের সমানাধিকার আজও নিশ্চিত করতে পারেনি। ফ্রান্সে নারীর অবস্থা বর্তমানেও নাগরিক দাসত্বের কাছাকাছি। বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে ফরাসী আইন নারীর মালিকানা অধিকার হরণ করেছে। ফরাসী নাগরিক বিধির ২১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো স্ত্রীর বিয়ে যদি তার ও তার স্বামীর পৃথক মালিকানা অধিকারের ভিত্তিতেও সম্পন্ন হয়ে থাকে, তথাপি সেই বিবাহিত নারীর স্বীয় সম্পত্তি দান করা, হস্তান্তর করা, বন্ধক রাখা, বিনিময় সহকারে বা বিনিময় ছাড়া মালিক হওয়া বৈধ নয়, যদি স্বামী সেই চুক্তিতে অংশীদার না থাকে বা লিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করে। (লেখক এখানে মূল ফরাসী পাঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন)।

এই ধারাটিতে পরবর্তীতে যেসব শর্ত ও সংশোধনী যুক্ত হয়েছে, সেসব সত্তেও ফরাসী নারীরা এখনো পূর্ববর্তী আইনের প্রভাবাধীন। পাশ্চাত্যের নারীর ওপর আরোপিত এই দাসত্বকে দৃঢ়তর করার জন্যে পশ্চিমা জাতিগুলোর আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, স্ত্রী লোকের বিয়ে হওয়া মাত্রই নিজের ও নিজের পরিবারের নাম তারা হারিয়ে ফেলবে। তাকে আর অমুকের মেয়ে অমুক বলা হবে না, বরং সে এখন থেকে স্বামী ও তার পরিবারের নাম বহন করবে। তাকে বলা হবে, 'মিসেস অমুক' অথবা তার নাম তার পিতা ও পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর ও স্বামীর পরিবারের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। স্ত্রীর নিজের নাম হারানো এবং স্বামীর নাম বহন করা দ্বারা তার নাগরিক ব্যক্তিত্ব হারানো ও স্বামীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া বুঝায়।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমাদের অনেক মহিলা এই নিপীড়ণমূলক রীতিতে ও পাশ্চাত্য নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চেষ্টা করছে এবং নিজেদের জন্যে এই হীন অবস্থাটাকেই পছন্দ করছে। তাই তাদের অনেকে নিজেকে স্বামীর নামে নামকরণ করছে, অথবা নিজের নামকে স্বামী ও তার পরিবারের নামের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করছে। নিজের পিতা ও পরিবারের সাথে যুক্ত করছে না, অথচ ইসলামের এটাই মনোনীত রীতি। এর চেয়ে অন্ধ অনুকরণ আর কিছু হতে পারে না। মজার ব্যাপার এই যে, এমন অন্ধ অনুকরণ করেও তারা নারী অধিকার ও নর নারীর সমানাধিকারে বুলি কপচায়। অথচ তারা জানে না যে, এই কাজটি করে তারা ইসলামের দেয়া সবচেয়ে মূল্যবান অধিকারকে অবজ্ঞা করছে। এ অধিকার দিয়ে ইসলাম তাদের মর্যাদা সমুন্নত ও পুরুষদের সমান করে দিয়েছিলো। (মূল গ্রন্থের ৬৫১, ৬৫২ পৃষ্ঠা)

শরীয়তের অনুমোদিত চুক্তিসমূহ

এবার আমরা এই রুকুর শেষ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করছি। উত্তরাধিকার আইনের আগে যে অভিভাবকত্বের চুক্তিগুলো চালু ছিলো, এ আয়াত সেই চুক্তিগুলোর বাস্তবায়নে একটি সীমারেখা দিয়ে একে শৃংখলাবদ্ধ করেছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ উত্তরাধিকারকে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমিত করেছে। আর অভিভাবকত্বের চুক্তি অনাত্মীয়দের ক্ষেত্রেই কার্যকর থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'পিতামাতা ও আত্মীয় যে সম্পত্তি রেখে গেছে, তার অংশ আমি সকলের জন্যে নির্ধারণ করেছি। আর যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি রয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দাও। আল্লাহ তায়ালা সকল ব্যাপারে সাক্ষী।'

নারী ও পুরুষের নিজ নিজ উপার্জিত সম্পদে তাদের অধিকার থাকা এবং স্ত্রী ও পুরুষদের উত্তরাধিকারের কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার থাকার বিষয় উল্লেখ করছেন। সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারীরা পৈতৃক সম্পত্তির সাথে নিজেদের উপার্জনকেও যুক্ত করে, অতপর তা আবার পরবর্তী উত্তরাধিকার সূত্রে বন্টিত হয়। ইসলামী বিধানে এভাবে সম্পদের আবর্তন চলে, কোনো প্রজন্মেই তা থেমে থাকে না এবং কোনো ব্যক্তি বা পরিবারে তা কেন্দ্রীভূতও থাকে না। চিরন্তন নিয়মে তা আবর্তিত হতে থাকে, বন্টন হতে থাকে এবং সম্পত্তির মালিক ও মালিকানার পরিমাণ সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামী শরীয়তের অনুমোদিত চুক্তিসমূহের কথা। এগুলো কখনো কখনো আত্মীয়কেও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ দেয়। একে বলা হয়, 'অভিভাবকের চুক্তি। ইসলামী সমাজে এ জাতীয় চুক্তি কয়েক প্রকারের ছিলো,

প্রথমত, মুক্ত গোলামদের অভিভাবকত্ব চুক্তি। এই চুক্তির বলে দাস দাসীরা মুক্ত হওয়ার পর মনিবের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতো। ফলে কোনো দিয়াত বা রক্তপণ তার ওপর আরোপিত হলে মনিব তা দিয়ে দিতো, যেমন বংশের আপনজনেরা করে থাকে। মনিব মারা গেলে সে তার উত্তরাধিকারী হতো।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকত্বের চুক্তি বা 'আকদুল মোয়ালাত'। এ চুক্তির বলে কোনো আত্মীয় উত্তরাধিকারী না থাকলে একজন অনারব কোনো আরবের অভিভাবকত্বের অধীন বা তার পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারতো। এ ক্ষেত্রেও মনিব তার দিয়াত ইত্যাদি পরিশোধ করতো এবং মারা গেলে সে তার উত্তরাধিকারী হতো।

তৃতীয়ত, যে চুক্তি রসূল (স.) মদীনায় যাওয়ার অব্যবহিত পর মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে সম্পাদন করেন, এই চুক্তির বলে মোহাজেররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হতো এবং তারা এই পরিবারের সদস্যের মতোই হতো। আর মোশরেক হলে পরিবার থেকে পৃথক থাকতো। আকীদা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো।

চতুর্থত, জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো যে, তারা উভয়ে পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে।

ইসলাম এই সকল চুক্তি বিশেষত তৃতীয় ও চতুর্থ চুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে। কেননা আত্মীয়তাই হলো উত্তরাধিকারের একমাত্র ভিত্তি। তবে পূর্বে সম্পাদিত কোনো চুক্তি কিন্তু ইসলাম বাতিল করেনি। নতুন কোনো চুক্তি করা হবে না এই শর্তে সেগুলোকে বহাল রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছো, তাদেরকে অংশ দাও।'

এই চুক্তিটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছেন এবং এর ওপর ও এর বাস্তবায়নের ওপর নিজে সাক্ষী থেকেছেন। বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর সাক্ষী।'

রসূল (স.) বলেছেন, ইসলামে কোনো মৈত্রী চুক্তির বিধান নেই। তবে জাহেলী যুগে কোনো মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে ইসলাম তাকে আরো কঠোর করেছে।' (আহমদ ও মুসলিম)

ইসলাম যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের চুক্তিতে যে নীতি অবলম্বন করেছেন সুদ সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও তাই অবলম্বন করেছে। যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাকে পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর করেনি। যেমন সুদকে যখন বাতিল করেছে, তখন তাকে সুদ গ্রহীতাদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তা ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়নি। তবে ওহী নাযিল হওয়ার আগেকার চুক্তিসমূহ সেই সুদকে বৈধ করেনি, যা এখনো তাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু এখানে ওই চুক্তিগুলোকে এই শর্তে বহাল রাখা হয়েছে যে, তার ভিত্তিতে আর নতুন কোনো লেনদেন করা হবে নিষিদ্ধ। এর কারণ এই যে, আর্থিক বিষয় ছাড়াও এসব চুক্তির সাথে এমন কিছু সম্পর্ক জড়িত হয়ে গেছে, যা পারিবারিক সম্পর্কের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তার মধ্যে অনেক জটিলতা ও ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই এই চুক্তিগুলোকে বহাল রাখা হয়েছে, এগুলোকে পূরণ করার ওপর প্রবল জোর দেয়া হয়েছে তবে তা থেকে নতুন কোনো চুক্তি উদ্ভূত হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সময় থাকতেই এই পথ বন্ধ করা হয়েছে, যাতে এ থেকে এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব যেন না হয়, যার প্রতিকার করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

এই রেয়াত দেয়ার পদক্ষেপটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের জীবন যাপন বিধিকে সহজ ও উদার করতে চায় এবং সে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে অত্যন্ত প্রশস্ত, ব্যাপক, প্রজ্ঞাময় ও গভীর দৃষ্টিভংগি অবলম্বন করে। কেননা ইসলাম মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিটি আইন ও বিধির মাধ্যমে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করে।(১০)

---

(১০) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ, আর যাদের সাথে অভিভাবকত্বের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাদের জন্যে সাহায্য, শুভাকাংখা ও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

সমাজে পুরুষের বিশেষ মর্যাদা

এ ভাষণের শেষ বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবারকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরী করা এবং পারিবারিক সকল বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা রচনা করা। সেখানে যার যে মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন তাকে সে মর্যাদা দান করা এবং প্রত্যেকের কর্তব্য নির্ধারণ করা। পারিবারিক এই সংগঠনের সকল কাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্যে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মন মেযাজ ও চিন্তা ভাবনার পার্থক্য হেতু অনেক বিষয়েই তাদের মধ্যে ভাংগন বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয়। তাই সেগুলোর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা বড়ো কঠিন কাজ, এ জন্যে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ের ওপর কোরআনে করীমের দৃষ্টিভংগি লক্ষণীয়,

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।' কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাউকে কারো ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন, আর এ জন্যেও বটে যেহেতু ....।'

এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি। আসলে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাইলে এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন।

যে মহান সত্ত্বা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে স্বামী স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করার একটি প্রবল আকাংখা রেখে দিয়েছেন। এ আকাংখা শুধু মানুষের নয়- সৃষ্টিকূলের প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী,

'আর সকল জিনিসের মধ্যেই আমি (জোড়া জোড়া পয়দা করেছি। যাতে করে তোমরা শিক্ষা নিতে পারো।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা একটি প্রাণী (বাবা আদম) থেকে চাইলেন মানুষের জোড়া জোড়া পয়দা হওয়ার ধারা চালু করতে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানবমন্ডলী ভয় করো তোমাদের রবকে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকেই তার জোড়া (স্ত্রীকে) সৃষ্টি করেছেন।'

তারপর তিনি সে একজন ব্যক্তি থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের দুইটি অংশকে স্বামী স্ত্রীরূপে সম্মেলন ঘটিয়ে তাদের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করলেন। তাদের শরীরের শিরা উপশিরার মধ্যে ছুটিয়ে দিলেন পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে এক অনাবিল আনন্দ প্রবাহ, তাদের তিনি আত্মিক প্রশান্তি ও শরীরের আরাম দান করলেন এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্যে পর্দা ও প্রতিরক্ষা দানকারী বিষয়ে পরিণত করলেন। এরপর তাদের 'মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের ধারা চললো, সর্বক্ষণ উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের মনে আকাংখা জাগলো। এ সবকিছু সংঘটিত হতে থাকলো অদৃশ্য সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর সাদর পরিচর্যায়, যিনি প্রতিকূল সকল জিনিস থেকে তাদের হেফাযতের ব্যবস্থা করে তাদেরকে অনাবিল আনন্দ দান করলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটি একটি যে তিনি তোমাদের জন্যে সবকিছু দান করলেন।'

'তোমাদের মধ্যে থেকে স্ত্রীদেরকে (তোমাদের জোড়া হিসেবে) পয়দা করেছেন যাতে করে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, তোমাদের মধ্যে মহব্বত ও পরস্পরের প্রতি দরদ সহানুভূতি পয়দা করে দিয়েছেন।'

আরো জানাচ্ছেন,

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসলের ক্ষেত, অতএব সেসব ক্ষেতে তোমরা যে দিক থেকে খুশি সেই দিক থেকে তোমাদের ক্ষেত্রে আগমন করো। তবে তোমাদের নিজেদের জন্যে তোমরা সামনে থেকেই আসো এবং আল্লাহকে ভয় করো।'

'হে ঈমানদাররা! তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে পূজারী মানুষ এবং (পূজার দেব দেবী) পাথর।'

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের বংশধররা তাদেরকে ঈমানের সাথে অনুসরণ করেছে তাদের সাথে আমি তাদের বংশধরকে একত্রিত করে দেবো কিন্তু তাদের করা যাবতীয় সৎ কাজ থেকে আমি কিছুমাত্র কম করবো না।'

একজন ব্যক্তি থেকে দুই শ্রেণীর মানুষ তৈরী হলো, তৈরী হলো আল্লাহর ইচ্ছাতে সমান সমান দায়িত্ব বহনকারী হিসেবে, যাতে করে গোটা মানবমন্ডলীই সার্বিকভাবে এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নারীর মর্যাদাও সমভাবে স্বীকৃত হলো। তাদের এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো প্রতিদান ও পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে এবং উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রেও বটে। ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক একজন নারী একজন স্বাধীন স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে পুরুষের সমমর্যাদা পেলো। এর বিস্তারিত আলোচনা এই ভাষণের প্রথম দিকে এসে গেছে।

একটি জীবন থেকে সৃষ্ট এই মানবগোষ্ঠীর দু'টি অংগের সম্মিলনের প্রথম অবদান হলো পরিবার গঠন ও এর নির্মাণ এবং এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহ অবস্থান। পারস্পরিক আস্থা, দয়া-সহানুভূতি ও নিশ্চিন্ততার প্রশান্তি ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা ও সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পারস্পরিক নিরাপত্তা তারা লাভ করলো। দ্বিতীয় অবদান হিসেবে, সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিধান ও পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শনের এবং মানুষের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা কারো থেকে যে কারো কম নয়– এই অনুভূতি তারা পেলো। মানব জীবনের সকল ছোটো বড়ো কাজে পারিবারিক জীবনের এই দুই সদস্য সমানভাবে সক্রিয়। পেছনের পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখিত সূরার প্রথম দিকে আলোচনায় এসব সংগঠনের কথা কিছু কিছু এসে গেছে, বাকি সম্পূরক কথাগুলো ইনশাআল্লাহ সূরাটির চতুর্থ ভাগে পেশ করা হবে। সূরায়ে বাকারাতেও এই বিষয়ের একাংশ আলোচিত হয়েছে, এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে আবার এর দ্বিতীয় পারাতে। এইভাবে কোরআনে করীমে আরো বহু সূরার মধ্যে এই পরিবার সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, বিশেষ করে আঠারো পারার সূরায়ে 'নূর'-এ, একুশ ও বাইশ পারার সূরায়ে 'আহযাব-এ এবং আটাশ পারার সূরায়ে 'তাহরীম'-এ। এছাড়া আরো অনেক সূরার মধ্যে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা পাওয়া যাবে। এসব আলোচনাগুলোকে একত্রিত করলে মানুষের এই প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের ওপর একটি পূর্ণাংগ ও সূক্ষ্ম সংবিধান তৈরী হয়ে যাবে, যা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগি পেশ করবে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের পারস্পরিক সমঝোতার ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমরা আশা করবো আমাদের পাঠক এই অধ্যায়ের পাশাপাশি এই পারার শুরুতে বর্ণিত কথাগুলোর দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করবেন, দৃষ্টিপাত করবেন কোরআনের উপস্থাপিত সে দৃশ্যের দিকে যেখানে অবোধ অসহায় শিশু বৎসল্যের চপলতায় ঘরের পরিবেষ্টনীতে মুখরিত হয়ে আছে। নানাপ্রকার রোগ ব্যাধির দুঃসহ যাতনায় গোটা পরিবেশকে দুর্বিষহ করে তুলছে, এ সময়

চরম ও পরম সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি মাতৃ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে নিজ রোগ শোক যাতনা ভুলে গিয়ে পরম মমতায় বাচ্চাকে তার বুকের মাঝে টেনে নিচ্ছে- দুগ্ধদানে তার সকল জ্বালা প্রশমিত করছে। এইভাবে গড়ে ওঠা বাচ্চাটিই এক সময় ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে আয় রোযগার করার যোগ্যতা লাভ করছে, সমাজ সেবায় অর্থদান করছে এবং গোটা মানব সমাজের খেদমতে আত্মনিয়োগ করছে। তারপর এই ব্যক্তি অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে অবশেষে তা এক সময় মানব কল্যাণের জন্যে রেখে যাচ্ছে।

পরিবার সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে এই কথাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। দায়িত্ব ও অবদান সম্পর্কে এবং পরিবারের সকল সদস্যের যত্ন যে নারী নেয় সেই নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি তা জানা, বুঝা এবং তাদের প্রতি কি যত্ন নেয়া প্রয়োজন এবং তাদের জান-মাল ও ইযযতের জন্যে কি কর্তব্য পালন করতে হবে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার বলেও আমরা মনে করি। এই পরিবারকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কাছের ও দূরের দেশগুলোতে যে মারাত্মক চক্রান্ত চলছে তার দিকে খেয়াল করা প্রয়োজন। প্রকারান্তরে এ চক্রান্তকারীদের অজান্তে এবং অধিকাংশ সময়ে না বুঝার কারণে গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে এ চক্রান্ত চলছে।

পরিবার ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগী কি, তার কিছু সংক্ষিপ্ত ইংগীত এখানে পেশ করা হলো। দুনিয়ায় বেঁচে থাকাকালীন সময়ে সুখ-শান্তি এবং নিশ্চিন্ততা লাভের যে স্বাভাবিক আকাংখা রয়েছে পরিবারই হচ্ছে তার রক্ষাকবচ। এ রক্ষাকবচকে নিশ্চিত করা যাবে তখন, যখন আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পন্থায় মহিলাদেরকে মর্যাদা দেয়া হবে, দেয়া হবে তাদেরকে তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ এবং যথাযথ সম্মান এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যেসব অধিকার দান করেছেন তার মধ্যে কোনো কাটছাঁট না করে যখন তা পুরোপুরি আদায় করা হবে। এটা শুধু স্ত্রীর স্বার্থে মহব্বতের বিনিময়ের জন্যেই নয়, বরং গোটা বিশ্বের মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্যেও দরকার। এই বিষয়ের ওপর ভাষণ প্রসংগে কোরআনের শেষ যে পথনির্দেশটি পাওয়া গেছে এবং যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা এসেও গেছে সে বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা আসছে,

দাম্পত্য জীবনকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং এই গঠন প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল দেয়া প্রয়োজন, যাতে এ পরিবারের মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং ভাংগন বিচ্ছিন্নতাকে প্রতিরোধ করা যায় তার জন্যে কোরআনের এ আয়াতগুলো আমাদেরকে যথাযথ হেদায়াত দিয়েছে। আয়াতগুলো আমাদের সবাইকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং নিবৃত্ত করার ইচ্ছা, আবেগ বা কোনো ব্যক্তির মতকে প্রতিষ্ঠা করা থেকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে কোরআন জানিয়েছে যে পরিবার সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে পুরুষের হাতে।

কর্তৃত্ব কেন পুরুষকে দেয়া হয়েছে তার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। নেতৃত্ব কর্তৃত্বের প্রয়োজনে যেসব গুণাবলী ও বিশেষ যোগ্যতা দরকার তা আল্লাহ তায়ালা নিজেই পুরুষকে দান করেছেন। তাকেই এই পারিবারিক সংগঠনের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার কারণেই তার মধ্যে পরিবারকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা এবং যে কোনো কঠোরতা ও সংকট সমস্যা মোকাবেলা করার যোগ্যতা দিয়েছেন, এর পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং

এজন্য তার শরীর ও মনকে সেইভাবেই গড়ে তুলেছেন। সর্বশেষে বাইরের কোনো শত্রুর আক্রমণে যখন গোটা পারিবারিক মন্ডলে ভয়ভীতি ছেয়ে যায় তখন সবদিক সামাল দিয়ে দৃঢ়চিত্তে ভেতর ও বাইরের সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ও মেজাযের ভারসাম্য ঠিকে রেখে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টিকর্তা নিজেই পুরুষকে দিয়েছেন। বিশেষ করে বাচ্চা ধারণকালে এবং বাচ্চা যখন কোলে থাকে তখন মা ও শিশুর পরিচর্যা ও ঘরের সবকিছুর পরিচালনা পুরুষের পক্ষে বহন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। এইভাবে পরিবারকে নানাপ্রকার বিপদ আপদ ও ভাংগন বিপর্যয় থেকে রক্ষার ব্যাপারে পুরুষদেরকে অন্যান্য যেসব ভূমিকা রাখতে হয় সে বিষয়ে আসুন আমরা সাধ্যানুযায়ী আরো চিন্তা করি। আল্লাহর বাণী,

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল যেহেতু তাদের কাউকে কারো ওপর আল্লাহ তায়ালা মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেহেতু তারা (পুরুষেরা) তাদের মাল সামানা থেকে খরচ করেছে।'

আগেই বলেছি, পরিবারই মানব জীবনের প্রথম সংগঠন। একে প্রথম সংগঠন এই কারণেই বলা হয়েছে যে, জীবনে সকল পর্যায়ে যে কোনো কাজ করা হোক না কেনো পরিবারই সেই কাজের উপর প্রথম প্রভাব ফেলে। গুরুত্বের দিক দিয়েও পরিবারই প্রথম সংগঠন, যেহেতু এই সংগঠনের মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলে এবং সামগ্রিকভাবে মানব জাতির উন্নয়নই লোকের দৃষ্টিতে আসল উন্নয়ন যার দ্বারা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

পরিবার সংগঠনের তুলনায় অন্য যতো সংগঠন আছে সেগুলোর গুরুত্ব শান্তি বিধানের প্রশ্নে অনেক কম। সুতরাং যে সকল প্রক্রিয়া পারিবারিক জীবনে শান্তি-আনতে পারে সেগুলোকেই যদি অন্যান্য সকল সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োগ করা হয় তাহলেই মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে তার বাঞ্ছিত ফল আশা করা যায়।

এ কারণেই আল্লাহ প্রদত্ত আইন এই পারিবারিক জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্যে বিস্তারিত হেদায়াত দিয়েছে। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী অনুসারে তাকে পরিচালনা করেছে এবং তাকে প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে দিয়েছে। পরিবারের প্রধান দুই সদস্যকে এমন শিক্ষা দিয়েছে যার কারণে তাদের আকর্ষণীয় প্রভাব অন্যান্যদেরকে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। স্বামী স্ত্রীর বিবাদ মীমাংসায়ও ইসলামী আদালত এই কোরআন প্রদত্ত আইন অনুসারেই ফয়সালা দান করে যাতে করে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পুরুষ ও নারী উভয়ে আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা কিছুতেই চান না যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কারো প্রতি যুলুম হোক। আর এই জন্যেই তিনি তাদের প্রত্যেককেই বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রস্তুত করেছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের গড়েও তুলেছেন। তাদের প্রত্যেকের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন যেনো নিজ নিজ স্থানে থেকে তারা প্রত্যেকে তাদের যোগ্যতার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটাতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবমন্ডলীকে পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে পয়দা করেছেন। মানব জাতির প্রসারের জন্যে স্বামী স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং নারীকে দায়িত্ব দিয়েছেন সন্তান ধারণ করার, সন্তান পালন করার, দুধ পান করানোর এবং তার ও তার স্বামীর মিলনকে মধুময় করে তোলার। প্রথমত এ দায়িত্ব অত্যন্ত বড়ো। দ্বিতীয়ত, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব যেমনি তেমনি কোনো তুচ্ছ দায়িত্ব নয়, তেমনি কোনো সহজসাধ্য জিনিসও

নয় যে, বিনা প্রশিক্ষণে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হবে। এর জন্যে প্রয়োজন শারীরিক, মানবিক ও বুদ্ধিগত গভীর ও ব্যাপক প্রশিক্ষণের। বিশেষ করে নারীদের জন্যে এর প্রয়োজন বেশী। অবশ্য ইনসাফের দাবী মোতাবেক পরিবারের দ্বিতীয় সদস্য স্বামীরও জরুরী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে দয়া-মায়া-মমতা দিয়ে সে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং দয়া সহানুভূতি সহকারে স্ত্রীর প্রতি যত্ন ও পরিচর্যা দিয়ে তাকেও তার গুরুদায়িত্ব পালনে সহায়তা করতে পারে। তাকে সন্তান ধারণ, প্রজনন, দুগ্ধ দান ও সন্তান পালনের বোঝা যেনো তার একারই বহন করতে না হয় তার জন্যে যথাসম্ভব সহযোগিতা করতে হবে এবং এর ওপর খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রসূতির নিজের যত্ন নিতে না হয়। রাত জাগা, বাচ্চার দেখাশুনা এবং অন্যান্য কাজের দায়িত্ব যেনো তার একার ঘাড়ে এসে না পড়ে। এ বিষয়ে স্বামীকে আরো খেয়াল রাখতে হবে যেনো স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক শিরা উপশিরার যোগ্যতা সবকিছু তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে উপযোগী হয়। এটি মূলত একটি অতি বড়ো কাজ এবং তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।

এরপর খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীলোককে তার দায়িত্ব পালন করার জন্যে কি চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন, তাকে দান করেছেন স্নেহ মমতা, দিয়েছেন বিনয়, দ্রুতগতি সম্পন্ন আবেগ, মুগ্ধ হওয়ার গুণ এবং বাচ্চার দাবী অনুসারে অবিলম্বে ছুটে আসার মতো মনোবৃত্তি। এতে সে কখনো ক্লান্ত হয় না বা তার কোনো উদ্বেগও এতে নেই। এগুলোই হচ্ছে মানুষ গড়ার অংগনে প্রথম প্রয়োজন যা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক মানুষকেই এগুলো প্রভাবিত করে। নারীদের মধ্যে প্রদত্ত এসব গুণ এমনই মধুর ও নিস্বার্থ যে অবিলম্বে মমতা প্রদর্শনে তারা ক্লান্ত হয় না। কোনো কাজের কথা বলা হলে সংগে সংগে সাড়া দেয়া তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ হাযির হয়ে যাওয়া, এটার জন্যে কোনো জবরদস্তির প্রয়োজন হয় না। বরং বলতে হবে, সেই মুহূর্তেই সাড়া দেয়ার জন্যে তারা যেনো নিজের অন্তরের মধ্যে একটি প্রবল চাপ অনুভব করে। এর ফলে গোটা পরিবেশকে তারা নিমিষে মধুময় করতে পারে, যেখানেই থাকুক, তাদের এই যে মহাগুণ, যে শত কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমনই কায়দায় পয়দা করেছেন যে সংগে সংগে ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে প্রাণের আনন্দের বন্যা বয়ে যায় এবং আর অনেক জটিলতার জট এমনিই খুলে যায়।

নারীদের এসব গুণ কোনো কৃত্রিম বা বাহ্যিক গুণ নয়, বরং এগুলো হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তাদের অস্থিমজ্জার সাথে জড়িত, তাদের মন মেযাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে এগুলো সম্পৃক্ত এবং তাদের মন মানসিকতার সাথে গভীরভাবে এগুলো মিশ্রিত। বহু গবেষক তাদের এইসব অত্যাশ্চর্য ও পরিশীলিত গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এসব গুণ তাদের প্রতিটি রক্ত কোষের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে, এ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। আর এসব মৌলিক গুণের কারণেই তারা বাচ্চাদের অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং সন্তান সম্ভবা থাকাকালে অস্বাভাবিক কষ্ট ক্লেষ অবলীলাক্রমে বরদাশত করে।

পুরুষদেরকেও একইভাবে কিছু বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। তার শরীরকে করা হয়েছে শক্ত ও মযবুত এবং তার আবেগ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে সে সহজে ক্লান্ত হয় না এবং যে কোনো বড়ো কাজ সামনে আসুক না কেনো চিন্তা ভাবনা করে এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক সে কাজ সম্পাদন করে, কারণ জীবনের শুরু থেকেই তার জন্যে উপযোগী পেশা অনুযায়ী সে প্রশিক্ষণ নেয় ও কাজ করতে থাকে, তার মনমগযে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, তাকে বিয়ে করতে হবে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিজনের ভরণ পোষণজনিত ক্লেশ

তাকেই গ্রহণ করতে হবে। তাদের দেখা শুনা থেকে নিয়ে সর্বপ্রকার ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে, এই চেতনা নিয়েই সে সকল পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে। এইভাবে মেয়ের উপযোগী কাজের জন্যে তাদের মানসিক প্রস্তুতি ও তাদের অস্থি-মজ্জার সাথে জড়িত।

পরিচালনার দায়িত্ব বহন করার জন্যে এই গুণাবলী পুরুষকে নিজ পেশার উপযোগী ও সক্ষম বানায়। পরিবারের খরচ বহন করার দায়িত্ব অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে একটি বড়ো দায়িত্ব। এই অনুভূতি তার মধ্যে বাড়তি যোগ্যতা সৃষ্টি করে, যার ফলে সে কর্তৃত্বশীল হওয়ার হক আদায় করতে পারে। সৃষ্টি মল্লিকার দু'টি ফুল পুরুষ ও নারী এই উভয় শ্রেণীকে নিজ নিজ পেশার দাবী অনুসারে গড়ে তোলার জন্যে কোরআন পাকে তাদের প্রত্যেকের জন্যে প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

কোরআনে কারীম ইসলামী সমাজে পুরুষকে নারীদের উপর দায়িত্বশীল বানিয়েছে এবং সেইভাবে তাদের যোগ্যতাও গড়ে দিয়েছে। আর এই কারণেই প্রত্যেকের জন্যে উপযোগী পেশাও সে নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই জীবনের সকল কাজ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। যে ভাগ যার উপযোগী এবং সহজ তাকে সেই ভাগই দেয়া হয়েছে, প্রকৃতিও তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ সামাল দিতে সহায়তা করেছে। এসব কাজের যে ভাগ যার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে সেই ভাগের জন্যে সেই যোগ্যতার সাথে যেন সে খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে।

কর্তৃত্বশীল বা পরিচালক হওয়া অবশ্যই এক কষ্টের কাজ। নিজেকে চালানো এক অবস্থা, কিন্তু অন্যকে চালানোর জন্য বাড়তি কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন এবং এর জন্যে অবশ্যই কিছু অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়। এ কষ্ট না করেও কোনো উপায় নেই, যেহেতু পরিচালক ছাড়া ছোটো হোক বড়ো হোক কোনো মংগলই চলতে পারে না আর দায়িত্ব দুইজনের কোনো একজনকে পালন করতেই হয়। অতএব, প্রত্যেকে যদি তার ওপর অর্পিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে উদ্যত হয় তা সেখানেই তাকে সহায়তা করা হয়। নিজ দায়িত্ব-সীমার বাইরে অন্য কোনো দায়িত্ব কেউ যদি নিজের ঘাড়ে তুলে নেয় সেখানে তাকে প্রকৃতি কোনো সাহায্য করবে না-এটাই স্বাভাবিক। কারণ নিজ দায়িত্বের বাইরেই জোর করে অন্য কোনো দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেয়াটা হচ্ছে যুলুম। প্রকৃতির পরিচালক আল্লাহ তায়ালা এ যুলুমের কাজে কাউকে সাহায্য করেন না, করতে পারেন না। এটা তাঁর মর্যাদা বিরোধী, আল্লাহ তায়ালা ইনসাফের দাবী অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব পালনে অতি সংগোপনে সাহায্য করতে থাকেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা দান করেন। কর্তৃত্ব করার এ কাজে তিনি নারীদেরকে সাহায্য করেন না যেহেতু তাদের জন্যে তার পক্ষ থেকে বরাদ্দ রয়েছে ভিন্ন কাজ, আর তা হচ্ছে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। এ কাজের জন্যে প্রয়োজন অন্য আর এক প্রকারের যোগ্যতা। এ কাজ করার জন্যে প্রয়োজন গভীর ও দ্রুত আবেগ এবং কোনো কাজে দ্রুত সাড়া দেয়ার যোগ্যতা। এসব যোগ্যতার ওপরে তাদেরকে দেয়া হয়েছে ভিন্ন প্রকারের অংগ প্রত্যংগ ও শিরা-উপশিরার বিশেষ যোগ্যতা, যার প্রভাব তার ব্যবহার ও কোনো কাজে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে ফুটে ওঠে!

এসব হচ্ছে মানব জীবনের পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান মানুষের বুদ্ধি বলে হওয়া সম্ভব নয়। এসব বিষয়ে সমাধান বের করার জন্যে মানুষকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে কিছুতেই তারা এর সমাধান বের করতে পারবে না বরং অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে।

যখন মানুষকে তার ইচ্ছানুযায়ী চলার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সে তার জীবনের কাজ ও ব্যবহারগুলোকে প্রাচীন জাহেলিয়াত ও আধুনিক দৃষ্টিভংগি অনুসারে পরিচালনা করেছে তখন গোটা মানব জীবনের অস্তিত্বটিই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং মানবতার সেই বৈশিষ্ট্যগুলো খতম হয়ে গেছে যার ওপর তার অস্তিত্ব টিকে আছে এবং যা তাকে জীব-জন্তু থেকে আলাদা সৃষ্টি হিসেবে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

মানুষের জীবনের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্যে তাদের মনগড়া ব্যবস্থা যে ধ্বংসাত্মক তা বুঝার জন্যে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে কিছু প্রমাণ বর্তমান রয়েছে এবং যেসব বিচার-ফয়সালা তারা করে তা নির্ভুল নয়, তার সাক্ষী তারা নিজেরাও। মানুষের কল্যাণের জন্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে যে আইন কানুন তৈরী করেছে তাও কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেগুলোকে অপছন্দ করেছে, বর্জন করেছে এবং অবশেষে তারা সেগুলোকে উৎখাৎ করেছে।

এ সকল প্রমাণের মধ্যে এ বিষয়টিও খেয়াল করার মতো যে, অনেক অনেক বিষয়ে সমাধান দিতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি জবাব দিয়ে দিয়েছে, ফলে সমাজে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। যতোবারই মানুষের শান্তি বিপর্যস্ত হয়েছে ততোবারই দেখা গেছে, তার পেছনে রয়েছে তাদের আন্দায অনুমানভিত্তিক বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আল্লাহর আইনের প্রতি তাদের অবজ্ঞা, মানুষের এই মনগড়া আইনের কারণেই পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্বের নিয়মকে পরিবর্তন করা হয়েছে অথবা পরিচালনার দায়িত্ববোধ বিঘ্নিত করা হয়েছে অথবা দেখা গেছে যে, এ দায়িত্ব বহনের স্বভাবগত নিয়ম পালন করা হয়নি!

আল্লাহর আইনের মাধ্যমেই শান্তি আসতে পারে একথার একটি উল্লেখযোগ্য নযির হচ্ছে মহিলার প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পুরুষের কর্তৃত্বের প্রতি এমনিই শ্রদ্ধাশীল থাকে, এর ব্যতিক্রম হলে ক্ষতি হবে, অশান্তি আসবে এবং স্বামীর সাথে জীবন যাপনকালে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে, এটা যেনো স্বাভাবিকভাবেই তারা অনুভব করে। সাধারণভাবে কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্যে তারা চেষ্টাও করে না এবং এ গুরু দায়িত্ব বহন করা যে খুবই কঠিন কাজ তাও তারা অস্বীকার করে না, এরপরও কি পুরুষদের পক্ষে নারীদের হাতে কর্তৃত্বের দায়িত্ব দান করা শোভা পায়! এটা যে অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিকর তা সবাই দেখতে পেয়েছে। এমনকি ক্ষতিকর বলে তারাও মেনে নিচ্ছে যারা দ্বীন-ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সরে গেছে এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকারে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আল্লাহর আইন লংঘন করে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, পরিবারে সমাজে অথবা রাষ্ট্রে অবশ্য অবশ্যই বিপর্যয় আনয়নকারী, এর একটি বড়ো প্রমাণ হচ্ছে, যে পরিবারে পিতার পরিবর্তে মায়ের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সন্তানের ব্যক্তিসত্ত্বা প্রদমিত থাকে এবং তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়, কারণ তার মধ্যে মায়ের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং মাতৃসুলভ কোমলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কন্যা সন্তানের জন্যে এ অবস্থাটা খুব বেশী ক্ষতিকর না হলেও পুত্র ও সন্তানের জন্যে এটা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। পরিবারের দিকে তাকালে যেখানে মৃত্যুর কারণে পিতা বর্তমান নেই, অথবা শরয়ী দৃষ্টিতে না থাকায় পরিবারের দায়িত্ব মাকেই বহন করতে হয়, তাদের দিকে তাকালে এটা বুঝা খুবই সহজ, কদাচিত যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের পরিবারে ছেলেরা সাধারণভাবে উচ্ছৃংখল হয়ে যায় এবং তাদের মানসিক বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় আর এসব তাদের ব্যবহার ও চরিত্রে কিছু প্রকাশ পায়।

এখানে কয়েকটি কথার প্রমাণ দেয়া শেষ হলো, যেগুলো দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত চললে যতো বড়ো রকমের ক্ষতি হতে পারে তা জানা যায়, এর ফলে পরিবারের মধ্যে নারী নেতৃত্বে কোনো এক সময়ে অপ্রিয় অসহনীয় ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এ পুরুষের কর্তৃত্ব, তার পরিচালনার স্থায়িত্ব এবং তার উপকার ও প্রয়োজন স্বাভাবিকতা সম্পর্কে এর থেকে অধিক আর কিছু আমরা বলতে চাই না। হাঁ আর একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি, আর তা হচ্ছে পরিবারের মধ্যে পুরুষের হাতে নেতৃত্ব দানের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে বাড়ীতে অথবা সামাজিক জীবনে বসবাস কখনো এমন হবে না যে কিছু করার সময়ে নারীদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করা হবে, অথবা তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেয়া হবে, অথবা তার নাগরিক জীবনের মর্যাদার কোনো হানি করা হবে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আসলে নারীদের কাজটি হচ্ছে একটি মহান পেশা। এ পেশাটি তাদেরকে পরিবার রাজ্যের বেষ্টনীতে নিয়োজিত রাখে, যাতে করে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশকে তারা সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখতে পারে, তার হেফাযত করতে পারে, তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে এবং অন্যান্য যে কোনো সংগঠনের জন্যে একটি উত্তম আদর্শ স্থাপন করতে পারে। সেখানে যাতে কারো ব্যক্তিত্বই ক্ষুণ্ন না হয়। কোনো অংশীদারের অংশ নষ্ট না হয় এবং কোনো কর্মচারীর পাওনা অপরিশোধিত না থাকে সে বিষয়ে গৃহকর্ত্রীকেই খেয়াল রাখতে হবে। জীবনের যেখানে যেখানে পুরুষকে পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক কাজ দেয়া হয়েছে। যেমন হেফাযত করা, সাহায্য সহযোগিতা করা ইত্যাদি এজন্যে কোনো সময় তাকে তার জানমালের ওপরে কিছু ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজনও হয়। প্রয়োজন হয় স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার।(১১)

নেককার স্ত্রীর গুনাবলী

পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে এবং যেসব বিষয়ে সে সময় ও শ্রম দিতে বাধ্য সে সকল বিষয়ে আলোচনার পর নেক বখত মোমেন স্ত্রীলোকের স্বভাব তাদের ব্যবহার এবং পারিবারিক জীবনে তাদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায় সেইসব বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হচ্ছে। বিশেষ করে যাদের পরিবারে জীবন বিচ্ছিন্ন তাদের ঈমানী দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু কথা এখানে পেশ করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং নেককার, আনুগত এবং নিবেদিত প্রাণ স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করার কারণে আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিস হেফাযত করেছেন এবং হেফাযতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারা সেসব জিনিসের হেফাযত করে।'

অতএব, মোমেন স্ত্রীলোকদের প্রকৃতি, গুণাবলী, ঈমানী দায়িত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শনে সর্বাগ্রে কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর প্রতি তাদেরকে আনুগত্য থাকতে হবে। স্বামীর অনুগত থাকাকে বাধ্যতামূলক মনে করতে হবে এবং এইভাবে স্বামীর অনুরক্ত হওয়াকে তারা কর্তব্য জ্ঞান করবে। এ আনুগত্য হবে স্বতস্ফূর্ত, সন্তুষ্ট চিত্তে, আগ্রহের ও মহব্বতের সাথে, এটা 'কুন্নত' শব্দের অর্থ। কোনো চাপে

(১১) এ বাক্যটিতে যে বিষয়ে বলতে চাওয়া হয়েছে তার ওপর আরো বিস্তারিত জানার জন্যে পড়ুন ১. 'আল' ইসলামী ওয়া মোশকেলাতিন হাদ্বারাত' অধ্যায় ' আল মাআতু ওয়া ইলাকআবতুল জিনসায়াতাইন ২. আল উসতাদ মওদূদী রচিত আল হেজাব এবং সূরায় নূর; এর তাফসীর ৩. ডঃ আবদুল ওহায়েব রচিত 'হুকুকুল ইনসান' এবং মুহাম্মদ কুতুব রচিতঃ 'আল্ ইনসান বাইনাল মাদ্দিয়াহ্ অল-ইসলাম' প্রকাশনা দারুল শরুক বৈরুত।

পড়ে নয়, বিনা তর্কে ও নির্বিবাদে এ আনুগত্য দিতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে, 'কানেতাতুন' অর্থাৎ ভক্ত অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে স্বামীর কথা মতো চলবে। তিনি 'তায়েআতুন' অনুগত শব্দটি ব্যবহার করেননি, কারণ প্রথম কথাটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক একটি বিশেষ অবস্থা বুঝা যায় যা দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে নেই। সে শব্দটিতে যে মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে প্রভাতকালীন মৃদু মন্দ সমীরণের সাথে তুলনা করা যায়। নারীর এই আচরণই প্রয়োজন প্রতিটি দাম্পত্য জীবনে ও প্রতিষ্ঠিত সংসারে শান্তি, মহব্বত ও পারস্পরিক ক্রটিমুক্তি ও নিরাপত্তা আনয়নের যে বুকে প্রেম প্রতি দানা বেঁধে উঠবে এবং যার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তার কথা ও ব্যবহারে এবং বাস্তব জীবনে সেই বক্ষাস্থিত হৃদয় যেন বিগলিত হবে স্ত্রীর স্বতস্ফূর্ত আনুগত্যে।

একজন নেককার মোমেনা স্ত্রীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এবং অবশ্যম্ভাবী গুণ হচ্ছে সে ঈমানের দাবী পূরণ করবে এবং সেই ঈমানের কারণে যে কোনো সংশোধনকে মেনে নেবে এবং তার ও স্বামীর মধ্যকার পবিত্র বন্ধনকে স্বামীর দৃষ্টির অগোচরেও অটুট রাখার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে, অর্থাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতেও তার আমানতকে হেফাযত করা তার প্রথম কাজ। এক মুহূর্তের জন্যেও যেনো এমন না হয় যে কোনো পক্ষের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে এতোটা বেওকুফী করা হয়ে যায় যার ফলে প্রতিপক্ষের মান সম্ভ্রম দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে অথবা এমন কিছু করা হয় যাতে স্বামীর আমানত হেফাযত হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যে কথা বা কাজ জায়েয নয় তার ওপর যেদ ধরা স্ত্রীর পক্ষেও যেমন ঠিক নয়, তেমনি স্বামীর পক্ষেও ঠিক নয়। যেদ করার মাধ্যমে কারো সম্মান বাড়ে না, বরং মনে রাখতে হবে সম্মান দান করা ও সম্মানকে অটুট রাখার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। স্বামীও যেমন আল্লাহর নিষিদ্ধ ও খারাপ কাজ করা বর্জন করবে, স্ত্রীও তেমনি যা কিছু অবৈধ ও খারাপ কাজ বলে বুঝবে তা ত্যাগ করবে এবং রক্ষা করবে সেই বস্তুকে যা 'বেমা হাফেযাল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা যা তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সুতরাং, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন কাজ করা জায়েয হওয়ার জন্যে শুধু স্বামীর পছন্দ অপছন্দটাই আসল কথা নয়, বরং আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যেসব বিষয় হেফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোকে অবশ্যই হেফাযত করতে হবে, 'বেমা হাফেযাল্লাহ' দ্বারা এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে। বাতিল সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী যদি আল্লাহর হুকুমের পরওয়া না করে কোনো অবৈধ কাজ বা ব্যবহারকে স্ত্রীর জন্যে অসন্তোষজনক মনে না করে তাহলেই সেটা জায়েয হয়ে যাবে– আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয়। স্বামীর উপস্থিতিতেই হোক বা অনুপস্থিতিতে আল্লাহর আইন বিরোধী কোনো কাজ বা ব্যবহার যেহেতু স্বামী বা সমাজের কাছে খারাপ নয়, এজন্যে কিছুতেই কিন্তু তা তার স্ত্রী জন্যে বৈধ হবে না।

এই 'হেফাযত' বা সংস্করণের সীমার একমাত্র একটিই অর্থ রয়েছে আর তা হচ্ছে স্ত্রী নিজেকে সেসব কাজ বা ব্যবহার থেকে রক্ষা করবে যার থেকে আল্লাহ তায়ালা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাকে হেফাযত করেছেন। এ কথাটি বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশসূচক বাক্য ব্যবহার করে মোমেন স্ত্রীলোকদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটাই হবে নেককার স্ত্রীলোকদের প্রকৃতি এবং তাদের নেককার হওয়ার দাবীও এইটিই।

এই সময় মুসলিম পুরুষ ও নারী যারা পারিবারিক জীবনের সংকট ও সমস্যার কাছে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে তারা নমনীয় সমাজের চাপের মুখে নানাপ্রকার ওযর অজুহাত পেশ করে এবং পরস্পরকে দোষারোপ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, যদিও নেককার মহিলারা স্বামীর

অনুপস্থিতিতে যেসব জিনিস হেফাযত করেছে স্বামীরা তার কোনো স্বীকৃতি না দিয়ে অনেক সময় সীমা অতিক্রম করে। অনেক সময় আনুগত্য সহকারে সন্তুষ্টচিত্তে এবং ভালোবাসা ভরা হৃদয় নিয়ে নিজেদেরকে সেই স্ত্রীরা যখন বিলিয়ে দিতে চায় তখনও তাদেরকে ক্ষমা করতে চাওয়া হয় না।

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার পদ্ধতি

যেসব মহিলা নেককার নয়, তারা অবাধ্য হয়ে যায়। তাদের মেজায এতোটা গরম থাকে যেনো যমীনে তাদের পা পড়তে চায় না। এসময় তাদের এমন একটি মানসিক অবস্থা ক্রিয়াশীল হয়ে যায় যে, যে কোনো অন্যায় কাজ করতে তারা আর দ্বিধাবোধ করে না এবং অনেকটা বিদ্রোহীর ভূমিকায় নেমে আসে। ইসলামী আইন ততোক্ষণ কাউকে ধরপাকড় করে না যতোক্ষণ না বাস্তবে কেউ বিদ্রোহাত্মক কাজ করে নাফরমানীর পতাকা উত্তোলন করে। এমন অবস্থায় পরিবারের মধ্যে কর্তৃত্বের প্রতি ভয়ভীতি দূর হয়ে যায় এবং গোটা পরিবার হয়ে যায় যেনো একটি কুরুক্ষেত্র। এ ধরনের গুরুতর অবস্থা এসে গেলে তার চিকিৎসা মুশকিল হয়ে যায়। সুতরাং এই কঠিন অবস্থা আসার আগেই যথাশীঘ্র এর সঠিক চিকিৎসা হওয়া দরকার। কারণ অবস্থা এতোদূর গড়ালে পারিবারিক সংগঠনটি ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যাবে। সে ঘরে কোনো সুখ-শান্তি থাকা সম্ভব হবে না, না সেখানে বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা যাবে, সেখানে নেমে আসবে চরম ভাংগন। ছেলে-মেয়েরা ছন্নছাড়া হয়ে যাবে এবং শান্তির নীড়টি শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির আখড়ায় পরিণত হয়ে যাবে, এইভাবে সমগ্র পরিবারটিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

অবস্থা এই পর্যায়ে আসার আশংকা যখন দেখা দেবে অর্থাৎ কোনো স্ত্রীর মধ্যে যখন আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দেখা দেবে এবং বুঝা যাবে কোনো অবস্থাতেই সে আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় একমাত্র তখনই পরিবারকে চরম ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে পর্যায়ক্রমে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এসব ব্যবস্থা একমাত্র সংশোধনী প্রচেষ্টা হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে, বিদ্রোহাত্মক ব্যবহার ও কার্যকলাপের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নয়। দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থার স্বরূপ—

'আর যাদের সম্পর্কে তোমাদের অবাধ্যতার আশংকা দেখা দেবে তাদেরকে (প্রথমত) সদুপদেশ দেবে; (উপদেশে কাজ না হলে) তাদেরকে বিছানার মধ্যে আলাদা করে রাখো এবং (এতেও যদি কাজ না হয়) তাহলে তাদেরকে মারধর করো, এতে যদি তারা তোমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে (শাস্তিমূলক) কোনো পথ গ্রহণ করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সুমহান, তিনিই বড়ো।'

এবার আমরা দেখতে পাবো, আল্লাহ তায়ালা মানুষের এই দুই শ্রেণী, বিশেষ করে নারীদের সম্মানের প্রতি কতো বেশী খেয়াল দিয়েছেন। এর কিছু কিছু বিবরণ ইতিপূর্বেই এসে গেছে। এখানে সে বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দান করে তাদের মাতৃত্বের সম্মানে তিনি মহীয়ান করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পুরুষের সাথে সমান সমান নাগরিক অধিকার রাখে। পরিবারকে পরিচালনার ভার পুরুষের হাতে দিয়েও মহিলাদের মতকে টিকিয়ে রাখার জন্যে স্বামী গ্রহণ ও সংসার করার প্রশ্নে তাদের নিজেদের ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করার অধিকার তাদের রয়েছে, রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা ও তার ভোগ ব্যবহারের অধিকার। আনুগত্য স্বীকার করণে ও ইসলাম গ্রহণে তাদেরকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি।

এখানে যে কথাগুলো পেশ করা হচ্ছে তা পূর্বেও বলা হয়েছে, তবুও আরো খোলাসা করার জন্যে এখানে কথাগুলোর পুনরুক্তি করা হচ্ছে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, মুসলমানদের অন্তর ভাবের আবেগে যখন পরিচালিত হয় না এবং অহংকারের কারণে যখন তারা মাথাকে খাড়া করে চলে না তখন প্রথমত পারিবারিক জীবনে কেনই বা এসব উচ্ছৃংখলতা আসবে এবং কেনোইবা প্রথম মেয়েদেরকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে এতোসব বিধান দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কিভাবে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে- তার এতো বিস্তারিত বিবরণই বা কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, পারিবারিক জীবনে অবাধ্যতা ও চূড়ান্তভাবে বিপর্যয় আসার পূর্বেই সতর্কতামূলকভাবে আল্লাহ তায়ালা এসব কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তাড়াতাড়ি ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নেয়া যায় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। মনজগতকে আরো বিগড়ে দেয়ার জন্যে এ কথাগুলো বলা হয়নি, বলা হয়নি তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে, পারস্পরিক ঘৃণা জন্মানোর জন্যে বা কারো নযরে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে অথবা মনের মধ্যে রাগ চেপে রেখে স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করায় সংকীর্ণতা দেখাবে- সেজন্যে।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চান না যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো রকম কোনো অসৌজন্যতামূলক কিছু ঘটুক। তিনি চান শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে যেসব স্ত্রীর মধ্যে অহংকার এসে গেছে অথবা অবাধ্যতা করার প্রবণতা জেগে গেছে, অহংকারের সে মাথাগুলো যেন চূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে শৃংখলায় আনা যায়।

তবে মনে রাখতে হবে নির্যাতনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করাকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। যারা মানব সভ্যতার কোনো কোনো পর্যায়ে নারীকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্যে এসব হীনপন্থা গ্রহণ করেছে তারা মোটেই খেয়াল করেনি যে, তাদেরকে হেয় মনে করা, অপমান করা বা ছোটো মনে করার অর্থ হচ্ছে নিজেরই অস্তিত্বের একটি অংশকে ছোটো মনে করা। এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগি উপায় ও পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের প্রতি সংশোধনী তৎপরতার উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যাদের সম্পর্কে তোমাদের ভয় হয় যে তারা অবাধ্য হয়ে যাবে, তাদেরকে সদুপদেশ দাও।'

এটাই হচ্ছে প্রথম সংশোধনী প্রচেষ্টা অর্থাৎ সদুপদেশ দান। পরিবারের কর্তা বা পরিচালকের প্রথম কাজ এইটিই। পরিবারের নেতা হিসেবে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শেখানোর এই প্রচেষ্টা তার মধ্যে সকল অবস্থাতেই থাকতে হবে, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।'

এই কারণেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ হবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কোনো উদ্ধত স্ত্রীকে সংশোধনের প্রথম চিকিৎসা। কোনো প্রকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা মারাত্মক কোনো ব্যবহার করার পূর্বে এই সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানোই হচ্ছে প্রথম জরুরী কাজ। কিন্তু অনেক সময় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ কুপ্রবৃত্তি যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন শুধু ভালো কথায় আর কাজ হয় না, যেহেতু সে অবাধ্য স্ত্রী, তাই কোনো কথাই সে শুনতে রাযী থাকে না। কারণ তার রূপের গর্ব তাকে উগ্র বানায়, আর কখনো তার পিতা-মাতা ধনাঢ্য হলে, সেই অহংকার তাকে অনমনীয় করে রাখে, যার ফলে পরিবারের মধ্যে থেকেও অন্যান্য সবার মতো

নিজেকে সে পরিবারের এবং নিজেকে স্বামীর থেকে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতে থাকে। নিজেকে তাদেরই একজন মনে করতে পারে না। এ ধরনের অবস্থার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আর তা হচ্ছে,

'তাদেরকে বিছানার মধ্যে পৃথক করে রাখো'

বিছানা হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে স্বামী স্ত্রী একত্রিত হলে শারীরিক স্নায়ুগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরস্পরকে একান্ত সান্নিধ্যে পাওয়ার জন্যে সমস্ত অনুভূতি কোষগুলো উন্মুখ হয়ে যায় এবং এ অবস্থান পুরুষের তুলনায় নারীকে মিলনের জন্যে বেশী পাগলপারা করে তা সে যতোই অহংকারী হোক না কেন বা যতোই নিজ সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিতা হোক না কোন। এ চরম সময়ে যদি স্বামী আত্মনিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং প্রতিপক্ষের আকাংখায় সাড়া না দেয়ার মাধ্যমে তার স্নায়ুমন্ডলীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সে অহংকারী স্ত্রীর হাত থেকে সেই হাতিয়ার অবশ্যই খসে পড়বে যার বলে বলীয়ান হয়ে সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। তখন আশা করা যায় যে, সে তার উগ্র ব্যবহার পরিহার করবে এবং নরম হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। তার স্বামীর এই ঔদাসিন্য ও বেপরোয়া মনোভাবের আত্ম নিয়ন্ত্রণে তার দৃঢ়তার, ইচ্ছা শক্তির ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সামনে কঠিন নারীও নুয়ে পড়তে বাধ্য হবে। বিশেষ করে এটা এই কারণে যে, সে মুহূর্তে স্ত্রী তার দেহরাজ্যের যে সকল এলাকায় স্বামী গমনাগমনের প্রত্যাশী, তা না হওয়ায় সে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে যাবে। সুতরাং বিছানার মধ্যে পৃথক করে রাখাকে সুনির্দিষ্ট এক পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বরং সত্যিকারে বলতে কি পরোক্ষভাবে এ হচ্ছে একটি মহাশাস্তি। তবে মনে রাখতে হবে যে, প্রকাশ্যভাবে ও সবার সামনে এই ধরনের আচরণ অনুমোদিত নয়, শুধুমাত্র নিরিবিলি ও নির্জনে থাকার সময়েই এই বিচ্ছিন্নতা বা পৃথক হয়ে থাকা। এই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা যেন সন্তানের সামনে প্রকাশ না পায়। কারণ তাদের সামনে এই সম্পর্কহীনতা তাদের মনের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং সংসারে বিশৃংখলা নেমে আসবে। কোনো আগন্তুকের সামনেও এই বিচ্ছিন্নতা যেনো প্রকাশ না পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে, তাতে স্ত্রীর মান সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয় আছে এবং সে অপমানিত বোধ করবে এবং এর ফলে তার ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ত্রীর অবাধ্যতা-রূপী এ ব্যাধির চিকিৎসা করতে চেয়েছেন, তাকে অপমানিত করতে চাননি, চাননি বাচ্চাদের মধ্যে কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে। আর এদুটি কাজই হবে সংশোধনী প্রচেষ্টার লক্ষ্যে। কিন্তু এসব প্রক্রিয়াতে অনেক সময় সফল হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় কি পারিবারিক এই সংগঠনকে ভাংগনের মুখে ছেড়ে দিতে হবে? না, সেখানে আরো কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। সে পদ্ধতি একটু শক্ত হলেও এবং এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় তাকে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে গোটা পরিবার ভেংগে যাওয়ার তুলনায় সেটা সহজ ও তুচ্ছ,

'তাদেরকে প্রহার করো।'

বাক্যের এ শেষ কথাটির অর্থ ভালো করে বুঝতে হলে পূর্ববর্তী দুটি প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়েই তাকে বুঝতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য শাস্তি দান বা ব্যক্তিগত কারো তৃপ্তি লাভ করার জন্যে নয়, এ প্রক্রিয়া অবলম্বন স্ত্রীকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে লাঞ্ছিত করা ও অবমাননার জন্যেও নয়। এ পদক্ষেপ দ্বারা এটাও চাওয়া হয়নি যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে থেকে সন্তুষ্ট নয়, তবু জবরদস্তি করে সেই স্বামীর সাথে জীবন যাপন করতে তাকে বাধ্য করা হবে। এ মারধর করার উদ্দেশ্য হবে আদব শেখানো, যেমন কোনো মুরুব্বি ব্যক্তি আদব

শেখানোর উদ্দেশ্যে মারেন বা কোনো বাপ সন্তানদেরকে আবদ-কায়দা শেখানোর জন্যে মারধর করেন অথবা আদব-কায়দা শেখানোর জন্যে কোনো শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে মারধর করেন।

আর অবশ্যই এটা সুবিদিত যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ থাকা অবস্থায় এসব প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রশ্নই আসে না, কেননা জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনে তারা পরস্পরের জীবন সাথী এবং তারা এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে শুধুমাত্র অশান্তি বিশৃংখলা ও সংসার ভাংগনের কারণগুলো দূর করার উদ্দেশ্যেই।

এখন বুঝতে হবে, যেখানে সদুপোদেশ দানে কাজ হচ্ছে না, বিছানার মধ্যে পৃথক করে রাখাতেও কাজ হচ্ছে না, সেখানে অবশ্যই এই অবাধ্যতা হবে অন্য কোনো ধরনের এবং অন্য এমন কোনো পর্যায়ে যে, তার চিকিৎসা এই দু'ধরনের ঔষধ দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্যে এই শেষের প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তাতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর বাস্তবে কিছু কিছু অবাধ্যতার ঘটনা এমনও দেখা যায় এবং এমন কিছু বিশেষ মানসিকতার কথাও জানা যায় যেগুলো এই সংশোধনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুফল লাভ করেছে এবং তার স্বামীর সাথে সাময়িকভাবে হলেও সমঝোতায় উপনীত হতে পেরেছে।

তবে স্বামী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করাটাই যদি কারো মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে যায় তবে সেখানে নামকা ওয়াস্তে মিলমিশ করাতে আসলে কোনো অবস্থায় ফায়দা হবে বলে আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় আমরা কারো মুখের কথাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে না করে বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন মনে করি, যেমন ডক্টর আলফ্রেড নোবেল বলেন, নারীদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা পুরুষের পেশীশক্তি ও কড়া ব্যবহার ছাড়া বশীভূত হয় না এবং তাদের শক্তি সাহস আছে বলেও মনে করে না, সেইসবস্ত্রীলোকদেরকে কিঞ্চিৎ মারধর করে তাদের সুস্থ বিবেককে জাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে এই ব্যবস্থা সকল মেয়েদের জন্যে সমানভাবে প্রজোয্য নয়। কিন্তু একথা সত্য যে নারীদের মধ্যে অল্প কিছুসংখ্যক হলেও এমন অনেক আছে যারা শারীরিক মারকে ভয় করে এবং কিছুটা মারলেই সংশোধন হয়ে যায়। এই জন্যে সেসব ক্ষেত্রে পারিবারিক সংহতি ও শান্তি বজায় রাখার খাতিরে এই শেষ চিকিৎসাটি নেয়া যেতে পারে।

পরিবারিক জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে যেসব ব্যবহারে কথা বলা হয়েছে তার প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করা বা প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই, যেহেতু তিনিই এই বিধান দিয়েছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন, যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছু সম্পর্কে তিনিই ভালো করে জানেন। অতএব, সর্বজ্ঞ সেই মহান পরওয়ারদেগারের কথার ওপর কোনো যুক্তি তালাশ করা অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা অথবা অস্বীকার করা ঈমানের সীমালংঘন করারই শামিল।

পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার যোগ্য করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, স্ত্রীর মন মেযাজকে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে এবং তার সাথে সমঝোতা করে বসবাস করার নিয়তে সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবেই এটার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান অনুযায়ী রসূল (স.)-এর দ্বারা মুসলিম সমাজকে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কেননা জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা এ সমাজকে একটি আদর্শ সমাজ হিসাবে মানুষের সামনে পেশ করার প্রয়োজনে এ প্রশিক্ষণ ছিলো অনিবার্য। তখন মানুষ ধর্মের নামে জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করতো এবং ধর্মের দোহাই দিয়েই নারীদেরকে তারা দাসী-বাঁদিতে পরিণত করে রেখেছিলো। সে সময়ে পুরুষদেরকে

নারীরূপে সাজানো হতো এবং সাজানো হতো নারীদেরকে পুরুষরূপে অথবা কখনো তাদের উভয় শ্রেণীকেই সাজানো হতো 'হিজড়া'-রূপে। ধর্মের প্রতি প্রগতির নামেই চালানো হতো এসব। আঁধার যুগে প্রচলিত এসব প্রথা ও রীতিনীতি থেকে ইসলাম কতো স্বতন্ত্র ও উর্ধে তা মুসলমানদের বোঝা মোটেই কঠিন নয়! স্ত্রীর অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই তার অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে জায়েয করা হয়েছে এবং তার ব্যবহারকে সংশোধন করার জন্যে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে, তার মেযাজকে সংযত করতে বলা হয়েছে এবং যথাসম্ভব তাকে বিনয়ী হওয়ার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তার সামনে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনী ও পারিবারিক জীবনের কর্মধারাকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানেও বিতর্ক করলে এবং সীমালংঘন করে কথা বললে কিভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে তার বহু নযীর দেখানো হয়েছে।

ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থ ও মোসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, মোয়াবিয়া কুশাইরী (রা.) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের কোনো এক ব্যক্তির ওপর তার স্ত্রীর কী কী অধিকার আছে? তিনি বললেন, 'তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন কোনো কাপড় খরিদ করে তুমি পরবে তখন তার জন্যেও খরিদ করে তাকে পরাবে। তার মুখের ওপর মারবে না, তার কোনো কিছুকে মন্দ বলবে না এবং বাড়ীতে ছাড়া অন্যত্র তাকে পৃথক রাখবে না।'

আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা রেওয়ায়াতে বলেছেন, নবী (স.)-এর এরশাদ করেছেন, আল্লাহর বান্দীদেরকে মেরো না, এর পর এক সময়ে ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে এসে বলেছেন, মহিলারা তো তাদের স্বামীদের ওপর বেশী সাহসী হয়ে গেছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) তাদের মারার অনুমতি দিলেন। এরপর বহু স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রীদের ঘরে এসে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে শুরু করলো। তখন রসূলুল্লাহ (স.)- বললেন, 'হাঁ দেখা যাচ্ছে বহু স্ত্রীলোক মোহাম্মদ-এর পরিবারকে ঘিরে ধরে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে শুরু করেছে, না ওরা মোটেই তোমাদের মধ্যকার ভালো লোক নয়।'

অন্যত্র রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমাদের কেউ যেনো তার স্ত্রীকে উটের মতো মারধর না করে। এটা কেমন কথা, প্রথম রাতে তাকে চাবুক মারবে এবং রাতের শেষ ভাগে আবার তাকে নিয়েই এক বিছানায় একত্রিত হবে! তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর বিবেচনায় উত্তম এবং জেনে রেখো আমি আমার পরিবারের বিবেচনায় উত্তম ব্যক্তি।

কোরআন হাদীসের এসব উদ্ধৃতি এবং এ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় যেসব ঘটনা ধরা পড়েছে সেগুলো থেকে জাহেলী যুগে স্ত্রীদের সাথে যেসব কদর্য ব্যবহার করা হতো এবং তখনকার বিধি বিধান ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের মধ্যে যে কি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তার কিছু প্রমাণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রদর্শিত ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। নবাগত এই জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ের গভীরে শেকড় গাড়ার পূর্বেই এর শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন জাহেলী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো।

আসলে ওপরে এ তিনটি পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারকে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষা করা। এ পদক্ষেপসমূহের মধ্যে থেকে যেটা দিয়ে লক্ষ্য অর্জিত হবে সেখানেই থেমে যেতে হবে। যদি প্রথম কার্যক্রম অর্থাৎ উপদেশ দানেই ফল হয় তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই, আর যদি ফল না হয় তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাতেও ফল না হলে তৃতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সমস্যা কোনো ক্রমেই অতিক্রম করা যাবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে শুরু করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো পন্থা অবলম্বন করো না।'

উদ্দেশ্য সফল হলেই যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো তার অবসান ঘটাতে হবে, আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে আনুগত্য প্রাপ্তি। এই আনুগত্য স্বতস্ফূর্ত হতে হবে, জোর করে এই আনুগত্য আদায় করা যাবে না, কেননা জবরদস্তিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে শান্তি ও কল্যাণের ধারা বয়ে যেতে পারে না। যে কোনো জামায়াতের সংহতি রক্ষায় নিয়ম এই একটিই।

কোরআনের এ আয়াতটি ইংগিতে একথা জানাচ্ছে যে, আনুগত্য প্রদর্শনের পর স্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তবে তার দ্বারা শুধু আল্লাহর হুকুমকে লংঘন করা হবে না, বরং তা হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্রোহের শামিল। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহাত্মক পথ অবলম্বন করো না।'

এই নিষেধাজ্ঞার পর মহান আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে এর জোর তাগিদ আসছে যাতে করে মানুষের অন্তরগুলো নিশ্চিত হয়, ভক্তিভরে মাথাগুলো নুয়ে পড়ে এবং বাষ্পের মতো বিদ্রোহের চেতনা উড়ে যায়। আল্লাহকে স্মরণ করে যদি কোরআনের এই পন্থায় কিছু অন্তর উৎসাহ আর কোমল কুসুমের ন্যায় মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে নুয়ে পড়ে তাহলে তার মন ধন্য হবে, তার জীবন ধন্য হবে, তাই এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই রাব্বুল আলামীন সুমহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

সংশোধনের জন্যে শালিশ ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ

সংশোধনী প্রচেষ্টা সম্পর্কে যা কিছু ওপরে পেশ করা হলো তা হচ্ছে সে অবস্থার জন্যে যখন স্ত্রী সরাসরি তার অবাধ্যতার ঘোষণা দেবে না, অথচ স্বামী তাড়াহুড়া করে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে এই ভয় করতে থাকবে। কিন্তু যখন সে বেপরোয়া হয়ে যাবে এবং অবাধ্যতার ঘোষণা দিয়ে ফেলবে তখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করা কিছুতেই শোভা পাবে না, বিশেষ করে সেই ব্যক্তির পক্ষে যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজে সংসারের পরিচালক বানিয়েছেন। তখন দু'জন হবে পরস্পর দুশমন এবং একজন আর একজনের সার্বিক ধ্বংস সাধনে ব্রতী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে স্ত্রীকে সংশোধন করা সর্বপ্রকার চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যাবে যদিও এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটা কোনো কাম্য বস্তু নয় এবং এটা প্রীতিকর হতে পারে না। এমনিভাবে যখন দেখা যাবে যে, সব প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেছে, বরং দূরত্ব এবং ভাংগন অপরিহার্য হয়ে গেছে, যে ভালোবাসার বন্ধনে তারা এতোদিন নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ছিলো তা ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেছে, ছিন্ন ছিন্ন হয়ে গেছে তার শেষ সূতাগুলো, অথবা ছিন্ন প্রায় সম্পর্কে পুনরায় জোড়া লাগানোর সব উপায় ও পদ্ধতি বিফল হয়ে গেছে, এ ধরনের পর্যায়ে এসে ইসলামের বিজ্ঞ আইন এ পরিবারকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দুয়ার থেকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে চীৎকার দিয়ে বলেছে,

'আর যদি তোমরা তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ভাংগনের ভয় করো সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকে একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ পাঠাও, যদি তারা আপোষ করতে চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমঝোতা সৃষ্টি করার তৌফিক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহাবিজ্ঞ সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল।'

এইভাবে আল্লাহর আইন, স্ত্রীর বিভিন্ন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ ও অপ্রিয় ব্যবহারের কাছে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহবান জানায়নি, বিয়ে বন্ধনকে ছিন্ন করার জন্যে ব্যস্ত হতে বলেনি এবং সেই পারিবারিক সংগঠনটিকে সংগে সংগে আবার ভেংগে দিতেও বলেনি যার মধ্যে অনেক নিষ্পাপ, অসহায়, নিরুপায় বায়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও শিশু রয়েছে। কারণ ইসলামের কাছে পারিবারিক

এই সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিয়। যেহেতু এইটিই সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি এবং এর ওপর সমাজ জীবনের প্রাসাদ গড়ে তোলার জন্যে যতো ইটই ব্যবহার করা হোক না কেনো, প্রত্যেকটি ইটকে এই মূল সংগঠন প্রতিনিয়ত শক্তি যোগাতে থাকে এবং তাকে মযবুত বানায়।

পরিবারের মধ্যে যখন ভাংগন বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয় তখন মানুষ শেষ উপায়ের কাছে আশ্রয় খুঁজতে থাকে এবং বাস্তব ভাংগন আসার পূর্বেই (আল্লাহর ইচ্ছামতে) যে উভয়পক্ষের দরদী মুরুব্বীদের কাছে সালিশ করে দেয়ার জন্যে ছুটে আসে। তখন তারা পছন্দমতো কাউকে নিয়ে সালিশী বোর্ড বসায়। তারা ধীর স্থিরভাবে বসে, কোনো প্রকার মানসিক অস্থিরতা না রেখে এবং কারো প্রতি দুর্বলতা পোষণ না করে, যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ ধৈর্যের সাথে শোনে এবং খোলামেলা আলোচনা করার পর তাদের পারস্পরিক সকল বিবাদ বিসম্বাদ মেটানোর জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। উভয়পক্ষের পরিবার থেকে আগত এই দুই মুরুব্বী বাচ্চা-কাচ্চা ও অসহায় শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং কারো প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে যেনো এই ভাংগনপ্রায় সংগঠনটি পুনরায় সুসংহত হয়। উভয়পক্ষের সালিশ (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই) যেন ভাংগনের কবলে পতিত পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ চায়। 'কেউ কারো ওপর বিজয়ী হয়েছে' এই অনুভূতি কারো মধ্যে যেন পয়দা না হয়, কারণ এই পর্যায়ে উভয়ের ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত টনটনে থাকে। কাজেই কারো ব্যক্তিত্বে কোনোপ্রকার আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সালিশরা অত্যন্ত গভীরভাবে খেয়াল রাখে এবং তাদের ও তাদের সন্তানদের কল্যাণার্থেই তারা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায়। এসময়ে উভয়পক্ষের সালিশরা স্বামী স্ত্রীর গোপনীয়তাকে যত্নের সাথে রক্ষা করবে, কারণ তারা তো ওদের উভয়েরই মুরুব্বী। অবশ্যই তাদের কাছ থেকে এসব গোপনীয়তা প্রকাশ করা হয় না। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে এসব গোপনীয়তা প্রকাশ হওয়ার মধ্যে দু'জনের কারো কোনো কল্যাণ বা উপকার নেই, বরং তাদের সার্বিক চেষ্টা থাকে উভয়পক্ষের ত্রুটি ও গোপণীয়তাকে ঢেকে দেয়া এবং মুছে দেয়া।

উভয়পক্ষ থেকে আগত সালিশদের কাজই হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপোস করার জন্যে চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো। এমতাবস্থায় যদি তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সমঝোতার আগ্রহ থাকে এবং একমাত্র ক্রোধই এই সমঝোতার পথকে আটকে রেখে থাকে, তাহলে সালিশদের কর্তব্য হবে সে ক্রোধকে ঠান্ডা করার জন্যে সাধানুযায়ী চেষ্টা চালানো এবং এ ব্যাপারে তারা তাদের যোগ্যতা ও হেকমতকে যদি কাজে লাগায় তাহলেই আল্লাহ তায়ালা সে দম্পতির মধ্যে আপোস রক্ষার প্রচেষ্টাকে সফল করে দেবেন এবং তাদের অন্তরগুলোকে এই আপোষ-চেষ্টাকে গ্রহণ করার তাওফীক দান করবেন। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'যদি ওরা দুজন সংশোধনী (বা আপোস) চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই আপোস প্রক্রিয়া গ্রহণ করার তাওফীক দান করবেন।'

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সমঝোতায় আসার জন্যে ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকতে হবে। তবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সে ইচ্ছাকে কবুল করবেন এবং তাদের মধ্যে আপোস ফর্মূলা গ্রহণ করার তৌফিক দান করবেন।

এই কথাটিই হচ্ছে এখানে আসল সত্য। মানুষের অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা হওয়া এবং এর জন্যে চেষ্টা করার মূলে প্রথম কথাটিই হচ্ছে 'ইচ্ছা', একমাত্র আল্লাহর 'কুদরতই' মানুষের জীবনের জন্যে কোনো কিছু সংঘটিত করতে পারে, তবে মানুষের হাতেও রয়েছে ইচ্ছা ও

প্রচেষ্টা, যখন কোনো কাজের জন্যে নিয়ত করে ও সেই কাজকে সম্পন্ন করে দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসে এবং তখন যা সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে থাকে এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকেন। তাই তিনি এরশাদ করেছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

আলোচ্য এই ভাষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যতোপ্রকার কল্যাণ আছে তার মূলে রয়েছে, স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক এবং পারিবারিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা। একথাটিকে এখানে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিভংগি। এরই ওপর নির্ভর করে সমাজের সকল সম্পর্ক ও মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা। অতএব ইসলামের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিধান আমাদের স্পষ্টভাবে জানা দরকার এবং সর্বাধিক শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে তা পালন করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার। জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা মুসলিম সমাজ এই বিধানের গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝেছিলো এবং এই বিধান অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালনা করে পৃথিবীতে চূড়ান্ত শান্তি ও সচ্ছলতার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। সক্ষম হয়েছিলো আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অনুসারে অপর জাতিসমূহের কাছে ইসলামের সুন্দরতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে, আর এটাও তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলো যে, আল্লাহর পথ প্রদর্শন ছাড়া হেদায়াত বা সঠিক পথ পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا
مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ
لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا

৩৬. তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, (আরো) যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এতীম, মেসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, (তোমার) পথচারী সংগী ও তোমার অধিকারভুক্ত (দাস দাসী, তাদের সবার সাথেও ভালো ব্যাবহার করো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক। ৩৭. (আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে; আমি কাফেরদের জন্যে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। ৩৮. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না; (আর) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়োই খারাপ সাথী (পেলো)! ৩৯. কি (দুর্যোগ) তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনতো এবং ঈমান আনতো পরকাল দিবসের ওপর, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তারা খরচ করতো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৪০. আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না, (বরং তিনি তো এতো দয়ালু যে,) নেকীর কাজ যদি একটি হয় তবে তিনি তার

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٤٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝٤١ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا
الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝٤٢ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝٤٣

পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন এবং (এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও বড়ো কিছু পুরস্কার যোগ করেন। ৪১. সেদিন (তাদের অবস্থাটা) কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের (কাজে) সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে) এনে হাযির করবো এবং (হে মোহাম্মদ,) এদের সবার কাছে সাক্ষী হিসেবে আমি (সেদিন) তোমাকে নিয়ে আসবো। ৪২. সেদিন যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং (তাঁর) রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা কামনা করবে, মাটি যদি তাদের নিজেদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতো! (কারণ সেদিন) কোনো মানুষ কোনো কথাই (মহাবিচারক) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

রুকু ৭

৪৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা এতোটুকু নিশ্চিত না হবে যে,) তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা (ঠিক ঠিক) জানতে (ও বুঝতে) পারছো, (আবার) অপবিত্র অবস্থায়ও (নামাযের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা (পুরোপুরিভাবে) গোসল সেরে নেবে, তবে পথচারী অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা, (আর) যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে (ফিরে) আসো অথবা তোমরা যদি (দৈহিক মিলনের সাথে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে), তবে যদি (এসব অবস্থায়) পানি না-ই পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে (এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে), তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

তাফসীর

আয়াত-৩৬-৪৩

আলোচ্য এ ভাষণের সাথে এবং সূরার সমগ্র আলোচ্য বিষয়সমূহের সাথে অনেক দিক দিয়েই সামঞ্জস্য রয়েছে। যে বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলোর সাথে ইতিপূর্বেকার আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আলোচ্য দারসটি শুরু হয়েছিলো মুসলিম সমাজের সংগঠন পদ্ধতির আলোচনা দিয়ে। কেমন করে মুসলিম সমাজ জাহেলী যামানার প্রচলিত রীতিনীতির নাগপাশ থেকে রেহাই পেলো এবং নতুন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানে তা বর্ণনা করা হয়েছিলো। সেখানে আহলে কেতাবদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আহলে কেতাব বলতে এখানে মদীনার ইহুদীদের কথাই বলা হয়েছে। যারা নানা প্রকার কদর্যব্যবহার ও অসৎ তৎপরতায় লিপ্ত ছিলো। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে তারা নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও হীন চক্রান্তে মেতেছিলো। বিশেষ করে তারা চেষ্টা করেছিলো মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রে ভাংগন ধরাতে। মূলত এই নবগঠিত মুসলমান জামায়াতের শক্তির চাবিকাঠি ছিলো তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতার মনোভাব এবং পরস্পর যিম্মাদারী গ্রহণের ওপর। এই শক্তিকে দুর্বল করার জন্যে বিভিন্নভাবে ইহুদীরা ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলো।

যেহেতু এই নতুন ভাষণটি এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। এ জন্যে এখানে প্রথম সেই মূলনীতি দিয়ে শুরু করা হয়েছে যা মুসলিম সমাজের প্রথম কথা। সে মূলনীতি হচ্ছে খাঁটি একত্ববাদ যার ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের সমগ্র জীবন আবর্তিত হয়, আসলে এই তাওহীদের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে ইসলামের সমস্ত আইন-কানুন। মুসলমানদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ আবর্তিত হয় এই আইনের ভিত্তিতেই।

পারিবারিক সংগঠন সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে ভাষণ এসেছে তাতে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে এবং যেসব মহান উদ্দেশ্যে পরিবারের নানাপ্রকার ঝামেলা মানুষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয় সেসব বিষয়েরও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। বিবরণ এসেছে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কেরও। পূর্বের ভাষণে পরিবার এবং এর সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এ সংগঠনকে কিভাবে ভাংগন-বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যায়, সেসব বিষয়ের বিবরণ এবং যেসব ব্যবহারের মাধ্যমে এর বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করা আরো মযবুত বানানো যায় সে সকল বিষয়ের ওপরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিবার সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারেও যথেষ্ট আলোচনা এসে গেছে এবং দেখানো হয়েছে যে, সামাজিক সম্পর্কগুলো আসে এই পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের পরে। তার পর আসে পিতামাতার সাথে সম্পর্কের প্রশ্ন এবং তারপর আসে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ব্যাপার। পরিবারের সদস্যের মধ্যে গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্ক পরিবারের ভেতর ও বাইরের অন্যান্য লোকদের ওপরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে এবং এইভাবে সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের অন্যান্যদেরকেও সেই মহব্বতের পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়। যা তারা পরিবারের মধ্যে গড়ে তুলতে পেরেছে। ইসলামী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে দয়া সহানুভূতি, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার পরিবেশ বিরাজ করে এ ব্যক্তিরা যখন বাইরের পরিবেশে যায় তখনো সর্বত্র তারা এই ভালোবাসার বীজ বহন করে নিয়ে যায় এবং সবখানে তারা এই বীজ ছড়িয়ে দেয়।

বর্তমান এই ভাষণে নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পরে বৃহত্তর মানব সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিবারে মধ্যে যে অর্থ খরচ করে এবং যে না করে কৃপণতা করে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় এবং এই মূল্যায়নের ওপরই তাদের বাইরের আচরণ গড়ে ওঠে। সুতরাং মানুষের যাবতীয় আচরণের সুতিকাগৃহ হচ্ছে এই পরিবারটি। এখানেই তাদের ভালো বা মন্দ হওয়ার ট্রেনিং হয়। এখানেই ইসলামী জীবন বিধানের প্রশিক্ষণ চলে এবং এই প্রশিক্ষণ নিয়েই মানুষ সমাজের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে, আর অন্যান্যদেরকেও তারা এই সন্মোহনী ব্যবহার পদ্ধতি গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। যে শিক্ষার ভিত্তিতে পরিবারের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে তাও হচ্ছে তাওহীদি শিক্ষা। এক আল্লাহকেই জীবনের ভালো মন্দের সর্বময় কর্তা বলে জানা ও মানা। এই তাওহীদ বিশ্বাসই মানুষকে যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধে তুলে ধরে। তাকে উদার মহৎ বানায় এবং তখন সে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথানত করে না। মানুষের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা এবং এই অনুভূতিই যখন মুসলমানদের বিবেচনার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন তার বহিপ্রকাশ ঘটে তার কাজে, কথায় ও ব্যবহারে। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ ভাষণে দ্বিতীয় যে কথাটি এসেছে তা হচ্ছে নামায ও পবিত্রতা অর্জনের প্রক্রিয়া। এরপর মদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিধান দেয়া শুরু হয়েছে। ইসলামী জীবন-বিধানের প্রথম কাজ 'তাওহীদ' ও 'নামায'-কে ইসলামী সমাজে নিয়মিতভাবে চালু রাখার প্রয়োজনেই মদের নিয়ন্ত্রণ শুরু করা হয়। এসব বিধান একটির সাথে অপরটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ বিধানগুলো পূর্বের ভাষণের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং সূরার মূল সূরের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

কর্মজীবনে তাওহীদের প্রভাব

এ আয়াতগুলো শুরু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর চূড়ান্ত আনুগত্য করার নির্দেশ এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ দিয়ে।এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবতীর্ণ পূর্বেকার ভাষণের শেষ কথাটির সাথে এই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাও ভাষণের শেষের দিকে বর্ণিত পরিবার সংগঠন সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে একথাটি বলতে চাচ্ছে যে, দুটি ভাষণের মধ্যে বর্ণিত বিষয়গুলো হচ্ছে পূর্ণাংগ দ্বীন। এর একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অভিন্ন এমন কোনো বিশ্বাসকে এখানে বুঝায় না, যা বিবেকের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকবে। অথবা 'দ্বীন' কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের নামও নয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে পর পর পালন করা হয়। আবার বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক মুক্ত এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাত মুক্ত নিছক পার্থিব কোনো সংগঠনের নামও 'দ্বীন' নয়, বরং 'দ্বীন' বলতে মানুষের উভয় জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সেসব কিছুকেই পূর্ণাংগ 'দ্বীন' বলে। যার মধ্যে ইহকাল ও পরকালীন জীবনের বিশ্বাসগত ও কর্মগত সকল দিকই সামঞ্জস্য রয়েছে, অর্থাৎ ইহকালের সর্বাধিক কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালের মুক্তির ব্যবস্থার নামই হচ্ছে 'দ্বীন'। এর আকীদাগত দিক হচ্ছে, ক্ষমতার মালিক এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং এ জীবন শেষে চিরস্থায়ী (পরকালীন) জীবনে পদার্পণ করতে হবে এবং সেখানে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে একথার ওপর আস্থা রেখে এ জীবনে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

এসব বাস্তব কাজকে বাদ দিয়ে শুধু কিছু বিশ্বাসের সমষ্টির নাম 'দ্বীন' নয়। তাওহীদের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই বাস্তব জীবনে একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সকল কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়।

আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে ও শেরেক থেকে দূরে থাকতে গিয়ে একমাত্র তাওহীদ বিশ্বাসই প্রেরণা যোগায়। পারিবারিক জীবনে এবং সাধারণভাবে সামাজিক পরিবেশে এহসান (তথা সুন্দর ব্যবহার ও পরোপকার) করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, এই বিশ্বাসই কৃপণতা অহংকার, বাহাদূরী প্রদর্শন এবং মানুষকে কৃপণতার কাজে উৎসাহ দান করার কাজকে আমাদের কাছে ঘৃণিত করে তোলে, আল্লাহর মেহেরবানীর দানগুলোকে গোপন করতে, তা ধন সম্পদ হোক, জ্ঞানগত নেয়ামত হোক বা দ্বীনদারীর নেয়ামত– যাই হোক না কেনো। এই তাওহীদ বিশ্বাসই শয়তানের অনুসরণ করার ব্যাপারে তাকে সতর্ক করে, সতর্ক করে পরকালে আযাবের কথা উপেক্ষা করাকে। তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে এবং অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করে না তাদের জীবন বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তারা একই নীতির মধ্যে জীবন যাপন করে এবং কোনো সময়েই আল্লাহর বিধানের মধ্যে মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার দুঃসাহস করে না, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে অন্য কারো সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয় না, না তারা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো কাজে কোনো মানুষের আনুগত্য করে। আল্লাহর ঘোষণা,

'নিরংকুশভাবে তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, আর পিতামাতার সাথে এহসান করো। এই এহসান (সুন্দর ব্যবহার) করবে নিকটাত্মীয়দের সাথে, এতীমদের সাথে, মেসকীনদের সাথে, মোসাফেরদের সাথে এবং যাদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে তাদের সাথেও।'

আল্লাহর বিধান চালু করা মানুষকে সেই বিধান মানার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা ও পরিচালনা করার কাজ সব একই বিশ্বাসের ফল, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসের কারণে এ কাজ সম্ভব হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তাই কোনো ব্যক্তির মধ্যে আকীদা অনুযায়ী তার কাজগুলো করতে মনোযোগী করে এবং এই কারণেই মোমেনের বিশ্বাস ও কাজ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায়। বিশ্বাসের দৃঢ়তা যেমন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তেমনি বলিষ্ঠ কাজ দৃঢ় ঈমানের পরিচয় বহন করে। এর ফলে বান্দার কাজগুলোর এক অংশ থেকে অন্য কোনো অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়াটাও কঠিন হয়ে যায় এবং মূল তাওহীদের শিক্ষা না দেয়া পর্যন্ত যে কোনো কাজ সম্পর্কে তার শিক্ষাদানও হয়ে যায় ক্রটিপূর্ণ। কারণ গভীর বিশ্বাসই মানুষের চালিকাশক্তি এক আল্লাহর প্রতি ঈমানই মানুষকে তাঁর সকল হুকুম পালন করার ব্যাপারে যত্নবান করে। এই বিশ্বাসের মধ্যে যখন দুর্বলতা আসে তখন সে আল্লাহর কোনো নির্দেশ পালন করে, আর কোনোটা করে না, ফলে এসব কাজের কোনো সুফল আশা করা যায় না, যেহেতু কাজগুলো সবই একটির সাথে অপরটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং সকল কাজই জীবনকেন্দ্রিক বিধায় সবগুলো সমভাবে জরুরী। সুষ্ঠুভাবে এসব কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজন ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে আল্লাহর সৃষ্টিজগত জীবজন্তু ও মানবজাতি সম্পর্কে তার মনে চিন্তা জন্মায়। সে চিন্তাধারার উপরই গড়ে ওঠে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন। আর পৃথিবীর সকল এলাকার মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এই বিশ্বাসেরই প্রভাব পড়ে। ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের বিবেক এই বিশ্বাস অনুযায়ীই কাজ করে। মানুষের আদান প্রদান এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলোও এই বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে আল্লাহর বিধান মেনে চলা ও তাঁর তদারকীর অনুভূতি যতোটা গভীর হবে ততোটাই তাঁর হুকুম মানার ব্যাপারে তৎপরতা বেশী দেখা যাবে। এটা স্থির সত্য কথা যে, আল্লাহর প্রতি

আনুগত্যবোধই লেনদেনের মূলনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেহেতু সেক্ষেত্রে মানুষের বিবেক ও ব্যবহারের মধ্যে এক পবিত্র ভাবধারা বিরাজ করতে থাকে। এই আনুগত্যপূর্ণ মনই জীবনের শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথে তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। একমাত্র তাঁর কাছেই সে তখন সাহায্য প্রার্থী হয়, অন্য কারো কাছে নয় এবং একমাত্র তাঁর কাছেই দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে আকুতি জানায়।

ইসলামী আকীদা ও ইসলামী বিধানের এইটিই হচ্ছে মূল দিক এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সঠিক ও সার্বিক বিধানের কার্যকারিতার ব্যাপারেও এ বিশ্বাসই হচ্ছে চূড়ান্ত ও শেষ কথা। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি এহসান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস প্রধান ভূমিকা রাখে। অন্যান্য মানুষের প্রতি এহসান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস এবং এই আনুগত্যবোধ কাজ করে, একথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এখানেও আল্লাহর এবাদাত এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবী হিসেবে পিতামাতা ও অন্যান্য দলের মানুষদের প্রতি এহসানের কথা বলা হয়েছে, আর একইভাবে দেখা যায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্যবোধ এবং তাঁর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের মধ্যে এবং বিশ্ব-মানব সম্পর্কিত বর্তমান বিধানের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে কারণে সম্প্রীতি, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে, সেই একই কারণে বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সে দরদ মহব্বত গড়ে উঠতে পারে। সবার মধ্যেই সেই একই ভাবধারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও বাস্তব আনুগত্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন, আর সেই জন্যে এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদাত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।'

এখানে এই দুটি নির্দেশের মধ্যে বিশেষভাবে খেয়াল করার প্রথম কথাটি হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার সাথে অন্য কারো এবাদাত সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত। এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, মানুষ যতোপ্রকার জিনিসের পূজা অর্চনা, অন্ধ আনুগত্য, অন্ধ ভক্তি প্রদর্শন করে তা সবই নিষেধ। তাই বলা হয়েছে, 'আর তাঁর সাথে কোনো জিনিসকেই শরীক করো না।' 'শাইয়ান' শব্দ দ্বারা নিষ্প্রাণ জীবন জানোয়ার মানুষ রাজা-বাদশাহ বা শয়তান সকলকেই বুঝানো হয়েছে এরা সবই 'শাইয়্যান' শব্দটির আওতাভুক্ত।

এহসানের পরিধি

তারপর আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে বিশেষভাবে পিতামাতার প্রতি এবং সাধারণভাবে আত্মীয়স্বজনের প্রতি এহসান সম্পর্কে। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সন্তানদের জন্যে পিতামাতার পক্ষ থেকে ওসীয়ত করার কথা বলা হয়েছে। পিতামাতা সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে ভুল করেন না, তবুও আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে স্মরণ করাচ্ছেন, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায় পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন করার কথা স্মরণ করান। যদিও সন্তানরা জন্মগতভাবে পিতামাতার প্রতি যত্নবান হওয়ার তীব্র অনুভূতি রাখে। সন্তানদের জন্যে পিতামাতা সকল সময়েই চিন্তা ভাবনা করেন এবং বরাবরই অভিভাবক থাকেন। তাদের প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও মহব্বত সকল সন্তানের অন্তরে ও চেতনার মধ্যে সাধারণভাবেই রয়েছে। তবে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে পিতামাতার দরদের থেকে নিজ সন্তানের প্রতি মানুষ দরদী হয় বেশী, এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ পেছনের কথা ভুলে গিয়ে সামনের দিকেই দেখে বেশী, এটাই তার স্বভাব। এজন্যে পরম করুণাময়

মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা, যিনি পিতা বা সন্তান কাউকে পরিত্যাগ করেন না। পরিত্যাগ করেন না কোনো সন্তানকে বা তার পিতামাতাকে, আর তিনি তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত, সে সন্তান হোক বা পিতামাতা হোক সবার খবরই তিনি রাখেন। উভয়পক্ষকেই তিনি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করছেন। এ আয়াতে এবং অনেক স্থানের আলোচনায় দেখা যায় যে, যতো নেকীর কাজ আছে তন্মধ্যে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারকে অনেক উচুঁতে স্থান দেয়া হয়েছে। বরং আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই সমস্ত 'ভালো' বা নেকীর কাজ শুরু হয়। বিশেষ করে, নিকক আত্মীয়তা বা সাধারণ আত্মীয়তা যেটাই হোক না কেনো, তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে যে পুণ্য বা নেক কাজের সূচনা হয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারই প্রসার ঘটে। বিশ্ব মানব পরিবারের সদস্যরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা যদি সাহায্য প্রার্থী হয় তাহলে সেখানেই তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করা যায়। এটাই প্রকৃতির ধর্ম, মানব প্রকৃতি এই ধর্মেই বিশ্বাসী। ইসলামে সকল সওয়াবের বড়ো সওয়াব হচ্ছে এই মানব সেবা, মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং মানুষের দুঃখ বেদনা দূর করার কাজে সহযোগিতা করার কাজ। সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রথম শুরু হয় নিজ গৃহের পরিবেষ্টনীতে ছোটো পরিবারের মধ্যে, তারপর জীবনের বৃহত্তর পরিসরে। যখন যেখানেই সে থাকুক না কেন, মানুষের এ দরদী মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যদের সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে। পারিবারিক পরিবেশে মানুষের যে দয়া মহব্বতপূর্ণ হৃদয় গড়ে ওঠে, তার সেই হৃদয়াবেগের ছোঁয়া প্রথম তার আত্মীয়স্বজনেরা যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই তাদের প্রতি সে দরদী হয়।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী সংগঠনের সদস্যদের প্রতি তার মন দরদী হয় এবং সেখানে সে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। রক্তের সম্পর্কের পর আদর্শের কারণে গড়ে ওঠা এ সম্পর্ককে তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যেমন পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতি থাকে, তেমনি ইসলামী সংগঠনের দুস্থ ভাইদেরকে দাঁড় করানোর জন্যে তার উদ্বেলিত হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে কর্মসংস্থানের এই বিরাট দায়িত্ব রাষ্ট্র সংস্থাকে একা বহন করতে না হয়। যখন সমাজের ব্যক্তিরা বেকার লোকদের স্থায়ীভাবে কোনো সরাসরি কর্মসংস্থানে অপরাগ হয়ে যায় তখন সংগঠনকে এ দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসতে হয়। অবশ্যই একথা সত্য যে, ব্যক্তির প্রচেষ্টা থেকে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অনেক বেশী কার্যকরী হয়। এইভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে রূপরেখা এখানে টানা হয়েছে তাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কর্মসংস্থান থেকে নিয়ে অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এইভাবে বিশ্বমানবতার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ হয়ে যায়।

কোরআনের আলোকে সামাজিক এ দায়িত্ব বহনের কাজ শুরু হতে হবে পিতামাতার প্রতি এহসান দিয়ে। পিতামাতার প্রতি এহসানের এই কাজ শুধুমাত্র মাতা-পিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আত্মীয়দের পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তাদের থেকে নিয়ে এটা ছড়িয়ে পড়বে এতীম ও মেসকীনদের প্রতি। এমনকি সে এতিমরা যদি প্রতিবেশী থেকে দূরেও অবস্থান করে তবুও তারা প্রতিবেশীদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে, যেহেতু তাদের প্রয়োজন ও অভাব প্রতিবেশীদের থেকে অনেক বেশী এবং আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা ও সুন্দর ব্যবহার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার তাদের বেশী। এরপর আসছে কাছের প্রতিবেশীর কথা। তারপর বলা হয়েছে 'আজনবী' প্রতিবেশী। (আজনবী বলতে বুঝায় আগন্তুক বা অচেনা দূরের প্রতিবেশী, সাময়িক প্রতিবেশীও এ

শব্দের আওতাভুক্ত) এরাও ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার পাওয়ার দরকার। এই দুই ধরনের প্রতিবেশীর হক সাধারণ সংগী বা বন্ধু-বান্ধব থেকে বেশী, কারণ প্রতিবেশী তো তার সার্বক্ষণিক কাছের লোক। বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত হয় কালে-ভদ্রে। এরপর আসছে অন্যদের অধিকার। তাফসীরে 'রফীক' সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাময়িক সংগী, যে সফরের সময় সাময়িকভাবে পাশে থাকে। তারপরে আসছে মোসাফেরের অধিকার সম্পর্কে। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে মোসাফের এমন এক ব্যক্তি যে, তার নিজের পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলে বেকায়দায় পড়ে গেছে। আবার আসছে 'রফীক'-এর কথা, যার সাথে কখনো কখনো মেলামেশা হয়। এরা বাড়ীর কর্মচারীও হতে পারে, কিন্তু এই শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ার কারণেই এই শব্দের অর্থে বনী আদমের মধ্যে থেকে দুনিয়ার যে কোনো এলাকার মানুষই হতে পারে।

একথা বলার পর অহংকার ও বাহাদুরী প্রদর্শন, কৃপণতা করা, অন্যকে কৃপণ হতে বলা, আল্লাহর রহমত ও দয়া প্রাপ্তির কথা গোপন করা, লোক-দেখানো খরচ এবং আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের উপর ঈমান না থাকা এবং শয়তানের অনুসরণ ও শয়তানী কাজে জড়িত থাকার পরিণাম হিসেবে এসব কিছুর প্রতিক্রিয়া সহজেই দেখা যায়।

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অহংকারী ও বাহাদূরী প্রদর্শনকারীকে ভালোবাসেন না। যারা নিজেরা তো কৃপণতা করেই, অপরকেও কৃপণতা করার জন্যে উস্কানি দেয়, আর যা কিছু নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানী দ্বারা তাদের দিয়েছেন তা গোপন করে। এসব নেমক হারাম কাফেরদের জন্যে আমি বেদনাদায়ক আযাব নির্ধারণ করে রেখেছি। অন্য আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা তাদের সম্পদ লোক দেখানোর জন্যেই খরচ করে এবং শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না। আর এইভাবে শয়তান যার বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, সে তার নিকৃষ্ট সংগী হিসেবেই কাজ করবে।'

এমনিভাবে এখানে ইসলামী জীবন বিধানের একটি মৌলিক দিকও ফুটে উঠেছে, আর তা হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর ইচ্ছাবিরোধী যাবতীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, এক আল্লাহর ওপর ঈমান ও তার পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করার কাজ করতে হবে। এই ঈমান ও আনুগত্যপূর্ণ কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার কথাটি সর্বদা মনে থাকতে হবে, তাহলেই তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের ওপর এহসান করাটা সহজ হয়ে যাবে। এর বিনিময় সে আশা করবে একমাত্র পরকালীন জীবনে। অত্যন্ত বিনয় নম্রতা দয়ার্দ্র চিত্তে এবং জ্ঞান বুদ্ধি সহকারে, একথা অবশ্যই তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোনো বান্দাহ যা কিছু খরচ করে সেগুলোও আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। এগুলো তার নিজস্ব পয়দা করা কোনো জিনিস নয়। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়ার ভান্ডার থেকে না দিলে এগুলো পাওয়ার কোনো যোগ্যতাই তার ছিলো না। অপরদিকে একথাও তাকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা ও রোজ হাশরকে অস্বীকার করার কারণেই মানুষের মধ্যে অহংকার ও নিজের বাহাদুরী প্রদর্শনের মানসিকতা গড়ে ওঠে। কৃপণতা করা ও অপরকে কৃপণতা করার জন্যে উস্কানি দানের প্রবণতা, তাঁর মেহেরবানী ও নেয়ামতকে গোপন করার কু-প্রবৃত্তি এই কারণেই দেখা যায়। যখন সে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার না করে, কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে অথবা দিলেও লোক দেখানো মনোভাবটি সেখানে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বেশী এবং এ দান-দক্ষিণার মধ্যে নিজের বড়োত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছাটাই ফুটে ওঠে এবং

লোকদের জন্যে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর আকাংখা প্রকাশ পায় তখনই এসব সমস্যা দেখে দেয়। এ অবস্থা দেখা দিলে বুঝা যায় আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে সে গোপন করছে।

লোক দেখানো কাজের মূল্যায়ন

নৈতিক চরিত্রকে সুদৃঢ় ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্যে এ প্রসংগে তাগিদ দেয়া হয়েছে। ঈমানী চরিত্র এবং কুফুরী চরিত্র কখনোই এক বস্তু নয়। পবিত্র কাজ ও পবিত্র চরিত্র গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা ও রোজ হাশরের প্রতি ঈমান, আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির একান্ত ইচ্ছা এবং আখেরাতে এর প্রতিদান লাভের বাসনা। এটা হচ্ছে এমন একটি মহান আকাংখা যা দুনিয়ার কোনো ফায়দা চায় না বা মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদানও আশা করে না, মানুষের কাছে কোনো প্রতিদানও আশা করে না, মানুষের কাছে কোনো স্বীকৃতি চায় না। ঈমান হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির আশা, আখেরাতের জীবনের আকাংখা এবং আল্লাহর কাছেই সমস্ত কাজের প্রতিদান পাওয়ার আশা যদি মোমেনের অন্তরে না থাকতো তাহলে সে অবশ্যই অন্য পাঁচজনের মতো দুনিয়ার জীবনের মূল্যায়ন করতো এবং মানুষের কাছে স্বীকৃতি আশা রাখতো। আসলে দুনিয়ার জীবন ও এ জীবনের লোভনীয় বস্তুগুলোর লোভ সংরক্ষণ করার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান। এছাড়া অন্য কোনো জিনিস এমন নেই যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাকে পার্থিব মোহের উর্ধে তুলতে পারে। দুনিয়ার জীবনকে সে যখন অত্যন্ত সুন্দর করে দেখে এবং তার মোহে পড়ে যায় তখন সে কল্পনাই করতে পারে না যে, এক সময়ে এ জীবন শেষ হয়ে যাবে, আর এই জন্যেই এ জীবনকে সে আখেরাতের জীবনের ওপরে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। এই জন্যেই সে কৃপণতা করতে পারে, অপরকে কৃপণতা করতে উস্কাতে পারে এবং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ না করে মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করে।

এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নিন্দনীয় চরিত্র পছন্দ করেন না',

আর আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ও প্রয়োজনের উর্ধে। তাঁর মধ্যে ভালো লাগা বা মন্দ লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাঁর নিজস্ব কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ সেইসব আযাব থেকে বেঁচে যাক যা কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি কাফেরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি নির্ধারণ করেছি।'

এ অপমান হচ্ছে অহংকারের ফলে নিজেকে বড়ো করে দেখার শাস্তি। কোরআনের ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে, মানুষ এই কদর্য খাসলাৎ ত্যাগ করুক, তাদের অন্তরের মধ্যে এসব ঘৃণ্য ও মন্দ প্রবণতার প্রতি যথাযথ ঘৃণা সৃষ্টি হোক এবং সে অনুভব করুক যে এসব মন্দ প্রবণতার পেছনে শয়তান কাজ করছে। শয়তান তার বন্ধু সেজে এই মিথ্যা ও ভুল জিনিসকে তার সামনে রংগীন ফানুস হিসেবে তুলে ধরছে। সে যে চির শত্রু তা জানতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন,

'শয়তান যখন কারো বন্ধু ও সাথী হয়ে যায়। তখন সে নিকৃষ্ট বন্ধু হিসেবেই কাজ করে।'

জানা যায় যে, এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো মদীনার ইহুদীদের সম্পর্কে। এখানে বর্ণিত কথাগুলো তাদের ব্যাপারেই খাপ খায়। মোনাফেকদের ওপরও কথাগুলো প্রজোয্য হতে পারে। অবশ্য এরা উভয় সম্প্রদায়ই মুসলমান সমাজের সাথে মিলেমিশে চলাফেরা করতো, আল্লাহ

তায়ালা ইহুদী সম্প্রদায়কে যেসব নেয়ামত অতীতে দিয়েছিলেন [যার মধ্যে রসূল (সা.)-এর আগমন সংবাদ ও লক্ষণসমূহ বর্ণিত ছিলো] তা তারা গোপন করে। কেতাব ও হেদায়াতে ছিলো তাদের জন্যে সঠিক পথের দিশা এবং তাদেরকে যে পৃথিবীর পরিচালক বানানো হয়েছিলো সেটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ প্রদত্ত তৎকালীন সমগ্র ইহুদী জাতির জন্যে এক মহান নেয়ামত। সেইদিকে ইংগিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) যে সত্য প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের এই একই সত্য যা তাদের কেতাবেও বর্ণিত রয়েছে, তাতে রয়েছে রসূল (স.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু কোরআনের কথাগুলোর মধ্যে নাম না নিয়ে নিকৃষ্ট এ চরিত্রের অধিকারীদের জন্যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, কথাগুলো একমাত্র তাদের জন্যে প্রজোয্য মনে না করে এই সকল লোকের জন্যে ধরে নিতে হবে যাদের মধ্যে এসব খাসলাত থাকবে। আর এটাই আয়াতের প্রাসংগিক এবং সঠিক ব্যাখ্যা। তাদের কু-প্রবৃত্তি ও দুর্ব্যবহারের মন্দ দিকগুলো তুলে ধরার পর এবং আল্লাহর নারায থাকা শয়তানের সাহচর্য ও অনুসরণ, এসব নিকৃষ্ট দোষে লিপ্ত যারা তাদের সম্পর্কে ভীষণ আযাব নির্ধারিত রয়েছে– এসব কিছুর বর্ণনা শেষে অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করছেন,

'কি অসুবিধা হতো তাদের যদি তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনতো এবং আল্লাহর রেযেক থেকে করচ করতো? অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। নিশ্চয়ই তিনি যুলুম করবেন না। কারো কাজ যদি ভালো হয় তা তিনি বহুগুণে বাড়িয়ে বড়ো করে দেবেন আরো দেবেন তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান।'

হাঁ তাদের কী অসুবিধা হতো, আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে কোন জিনিসকে তারা ভয় করছে? আল্লাহর প্রদত্ত জীবন সামগ্রী থেকে খরচ করার ব্যাপারেই বা কোন জিনিস তাদেরকে বাধা দিচ্ছে? আর আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে জানেন, কেন তারা খরচ করছে এবং কোন নির্দিষ্ট বস্তুটি তাদেরকে খরচ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। আল্লাহ তায়ালা যখন কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করবে না তখন তাদের ঈমান ও ইনসাফ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানবেন এটাই স্বাভাবিক। এই প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার যুলুম বা কাট-ছাঁট করা হবে না, বরং সেখানে তো দেয়া হবে আরো অতিরিক্ত, আরো কিছু বাড়িয়ে। নেকীগুলোকেও সংখ্যায় ও কলেবরে আরো বড়ো করে দেয়া হবে এটাতো অসীম অফুরন্ত ভান্ডারের মালিক আল্লাহর ওয়াদা আর আল্লাহর মেহেরবানীতে কতো যে বেশী দেয়া হবে তার তো কোনো হিসাব নিকাশ নেই।

অবশ্যই ঈমানের পথ হচ্ছে মানুষের জন্যে কল্যাণ নিশ্চয়তা দানকারী এবং সকল সময় ও সবদিক দিয়ে সর্বাধিক লাভজনক, এমনকি বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে লাভ লোকসানের বিচার করলেও দেখা যাবে এ পথই সব থেকে লাভজনক পথ। তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনায় তাদের কি কোনো ক্ষতি হতো? তারা এই জন্যে খরচ করে না যে তারা মনে করে তাদের উপার্জন শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি, অথচ তাদের চিন্তা করা দরকার যে, সেগুলো তো তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই সরবরাহ করেছেন। এর সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেন যে, তিনি তাদের নেকীর সমস্ত কাজগুলো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর তাদেরকে তিনি নিজ খাস মেহেরবানী বলেই বাড়িয়ে দেবেন এবং সেই রেযেক থেকেই তো তারা নিজেদের জন্যে খরচ করবে এবং অপরকে দান করবে। আহ, কী চমৎকার এ সম্মান, হাঁ কী মধুর আল্লাহর দান! আহা কী সুন্দর এ ব্যবস্থা ও লেনদেন! একমাত্র জাহেল, মূর্খ-নাদান যারা তারাই এর থেকে দূরে থাকতে পারে!

কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্র

এরপর আদেশ নিষেধ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদানের শেষে কেয়ামতের কিছু দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, সেখানে কিভাবে মানুষ থাকবে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে তখনকার মানুষের অবস্থা সম্পর্কে। সে দিন মানুষের নড়াচড়া স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং চেতনাশক্তি নিস্ক্রীয় হয়ে যাবে। কোরআনে বর্ণিত কেয়ামতের সে দৃশ্যগুলো একবার দেখুন,

'কেমন হবে তখন যখন প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো এবং (হে মোহাম্মদ) তোমাদের হাযির করবো সে সব লোকদের ব্যাপারে সাক্ষদানকারী হিসেবে! সেদিন কাফের ও নাফরমানরা চাইবে, হায় তারা যদি যমীনের মধ্যে মিশে বিলীন হয়ে যায়। সেদিন আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাকেই গোপন রাখবেন না।'

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত কেয়ামতের দৃশ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথম ভূমিকাস্বরূপ যে কথাটি বলেছেন, তা হচ্ছে

'(সেই দিন) আল্লাহ তায়ালা বিন্দু পরিমাণে যুলুম করবেন না।'

তাহলে সেদিনকার বিচার হবে পরিপূর্ণ ইনসাফপূর্ণ এবং সর্বোচ্চভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। বিচারের সে মানদন্ড চুল পরিমাণেও এদিক ওদিক যাবে না। সেদিন নেকীর কাজগুলোকে বহুগুণে বর্ধিত করা হবে এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান হিসেবে সেগুলোকে আরো অনেক বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহর রহমতের ছায়ায় সেদিন যারা আশ্রয় পাবে তাদের জন্যে হবে এটা একটা খাস রহমত, আর তারা সেদিন মর্যাদাবান হবে। যারা ঈমান ও সৎকর্ম করেছে তাদের মর্যাদা হবে সেদিন সীমাহীন।

পাশাপাশি আর একটি দলকে দেখা যাচ্ছে, তারা ঈমান বা ভালো কাজের কিছুই নিয়ে আসেনি। সেদিন কী অবস্থা হবে তাদের, আর অন্যান্য জাতিদের অবস্থাই বা কি হবে যখন তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এক একজন নবীকে সাক্ষ্য দান করার জন্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে।

'(হে মোহাম্মদ) তোমাকেও তোমার উম্মতের সেসব লোকদের বিরূদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে যারা নাফরমানী করেছিলো।'

সেই সময়কার ছবি আঁকা হচ্ছে, এতে দেখা যায়, বিশাল এ প্রান্তরে (পৃথিবীর প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যতো জাতি পয়দা হয়েছিলো) সেই সকল জাতি সবাই এখানে হাযির, সে দৃশ্য যেন চোখের সামনে স্থির হয়ে ভাসছে। হাঁ ওই দেখা যায় সেইসব কাফের, অহংকারী, আত্মম্ভরী, কৃপণ, কৃপণতার উস্কানিদাতা ও আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মর্যাদাকে গোপনকারী এবং লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে কর্মসম্পাদনকারীর সেই দল যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থী ছিলো না। এই ঘোষণার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে ওই বদ-লোকগুলো, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে নবীদেরও ডাকা হচ্ছে। ওরা সব প্রকাশ্য ও গোপন কাজ নিয়েই ওখানে হাযির রয়েছে। যা কিছু তোমরা অস্বীকার করেছিলে এবং যা কিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে সবই আজ সৃষ্টিকর্তার সামনে মওজুদ রয়েছে, হাযির হয়েছে সেই রেযেক দাতা আল্লাহর সামনে, যাঁর নেয়ামতকে তারা দুনিয়ায় গোপন করেছিলো, তাঁর দানকে তারা অস্বীকার করেছিলো, আজকের এই দিনের সামনে এবং রসূল (স.)-এর মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে সে কথাকেও তারা অস্বীকার করেছিলো, আজ তাদের কী উপায় হবে? আজকের দিনে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা, হীনতা ও অপমান। আজকে তাদের কোনো কিছু অস্বীকার করার উপায় নেই।

এসব কথা কোরআনে কারীমে বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি, কিন্তু বর্ণনাভংগীতে এই ছবিগুলো যেন মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে। সে গোটা পরিবেশ, হতভাগাদের হীনতা-দীনতা ও লজ্জাবনত চেহারাগুলো যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! এরশাদ হচ্ছে,

'সেদিন সে কাফের ও রসূলকে অবজ্ঞকারী হতভাগার দল চাইবে, হায় যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারতো, কিন্তু সেদিন আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাই গোপন রাখবেন না।'

আল্লাহর ঘোষণার সাথে সবকিছু যখন জীবন্ত ছবি হয়ে ভেসে উঠবে তখন সব দিকে দেখা দেবে চোখের সামনে হতাশা আর হতাশা। এ ভীষণ দৃশ্যের বিবরণ হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়, এ দৃশ্যের কথাগুলো জীবন্ত রূপ নিয়ে যখন সামনে ভেসে ওঠে তখন এমন গভীর হতাশায় হৃদয় ছেয়ে যায় যে, এর সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনাই করা যায় না। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে সে দৃশ্য। মূলত এই হচ্ছে কোরআনে করীমে উপস্থাপিত কেয়ামতের দৃশ্য। কোরআনের আরো কয়েকটি স্থানে এইভাবে কেয়ামতের ছবি আঁকা হয়েছে। কোরআনের বিশেষ বর্ণনাভংগীতে তা ধরা পড়েছে।

মদপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রথম পর্যায়

বর্তমান পাঠটি শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত আলোচনা নিয়ে। এই পর্যায়ে নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় তার মধ্যে নামায সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই নামাযের মাধ্যমেই আনুগত্যবোধের বহিপ্রকাশ ঘটে সব থেকে বেশী। নিচের এ আয়াতে নামাযের কিছু হুকুম আহকাম জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না-এমন অবস্থায় যে তোমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রয়েছো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মাফ করনেওয়ালা ও ক্ষমাশীল।'

মুসলিম জামায়াতকে আল্লাহ তায়ালা যে চমৎকার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সেই প্রশিক্ষণমালার মধ্য থেকে এ বর্ণনাটি অতি সুন্দর একটি নিদর্শন। এ আয়াতে জাহেলী যুগের পাতা থেকে মানুষের মনমগযকে ঘুরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অজ্ঞতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ সে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মদের ব্যবহার ছিলো এক অবিচ্ছেদ্য আনন্দের জিনিস এবং প্রত্যেক সমাবেশের জন্যেই ছিলো এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আজও আল্লাহবিমুখ সমাবেশসমূহের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই মদিরা।

পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মদের ছড়াছড়ি

অতীতে রোম ও পারস্য সমাজেও মদের প্রচলন ছিলো সাধারণ, যেমন করে আজকের ইউরোপ ও আমেরিকা এমনকি আফ্রিকাতেও জাহেলী যুগের মতো মদের ঢলাঢলি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি ঘরে ঘরে বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধেই নানা প্রকারের মদ ব্যবহার করা হতো। আধুনিক যুগের সোভিয়েত ইউনিয়ন মদের ব্যবহারে অনেককে ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে একজন মধ্যপন্থী নেশাখোরের মদপানের পরিমাণ দৈনিক ছিলো প্রায় বিশ লিটার। এ সাংঘাতিক অবস্থা এবং মাদকদ্রব্যের প্রসার অতীতের যে কোনো অবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ রাশিয়ার সরকারকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে, যার কারণে সরকার মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সমস্ত মাদকদ্রব্যকে বাজেয়াপ্ত করেছে। মদের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকার মদের রেশন প্রথা চালু করেছে, যাতে করে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী মদ্যপান করতে না পারে। সাধারণ সমাবেশেও মদপান নিষিদ্ধ করেছে, এতো কিছু করেও যখন দেখা গেছে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মদের প্রসার কম হওয়ার পরিবর্তে আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন বাধ্য হয়ে সরকারকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে এবং সম্প্রতি এই নিয়ন্ত্রণকে

এতো কঠোর করা হয়েছে যে শুধুমাত্র এই রেশন কার্ড গ্রহণের পরই মদ সরবরাহ করা যাবে। তবে কোনো ব্যবস্থাই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। এরপর আবার এক সময় পর্যায়ক্রমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদ ব্যবহার বৈধ করা হয়। প্রথমদিকে বলা হয় মদ বৈধ হবে, তবে দিনে নয় গভীর রাতে, কিন্তু তাতে যখন কোনো উন্নতি হলো না তখন সাধারণভাবে মদ বৈধ করে দেয়া হয় এবং ধীরে ধীরে ফলের রসজাত মদ ও শষ্যজাত মদ সবই বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং বয়স্কদের মদ্যপান বৃদ্ধি পেতে পেতে অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করে।(১৩)

আমেরিকাতে সরকার প্রথমবারের মতো ১৯১৯ সালে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের নাম দেয় 'শুষ্ককরণ' আইন। এ আইন তৈরী হওয়ায় অনেকেই ক্রোধে ফেটে পড়ে, প্রথম দিকে এই আইন অনুসারে শুধুমাত্র আংগুরের তৈরী মদের ওপরই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ আইন চৌদ্দ বছর বলবৎ থাকে; অবশেষে ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে (গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে) এ আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়, যদিও আংগুর ও ফলজাত মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার জন্যে সরকারী সর্বপ্রকার প্রচারযন্ত্র, রেডিও, সিনেমা, সমাবেশ অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে কাজে লাগানো হয়। মদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে সরকার ষাট মিলিয়ন ডলারেরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ প্রসংগে যে সকল বইপত্র প্রণীত হয় তার পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ বিলিয়নের বেশী এবং দীর্ঘ চৌদ্দ বছর এই মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে তিনশ' ব্যক্তির প্রাণদন্ড কার্যকর করা হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয় আরো ৫,৩২,৩৫৫ জন ব্যক্তিকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরকে যে জরিমানা করা হয় তারও পরিমাণ ছিলো ষোল মিলিয়ন পাউন্ড। এ কারণে যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় তার মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে চার বিলিয়ন পাউন্ড। এতদসত্ত্বেও সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এ আইনকে বাতিল করে দিয়ে পুনরায় মাদকদ্রব্য বৈধ ঘোষণা করতে সরকার বাধ্য হয়।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের অবস্থা

অপরদিকে জাহেলী যামানায় প্রচলিত এই ভীষণ মানবতা বিধ্বংসী মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে ও মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ইসলাম কোরআনে কারীমের সামান্য কয়েকটি আয়াতমাত্র ব্যবহার করছে, যার সম্মোহনী প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে অলিতে গলিতে, প্রায় সমাজ দেহের প্রতি রন্ধ্রে।

এখানে জাহেলী যুগ ও আধুনিককালে মানব প্রচেষ্টা ও মানবরচিত পন্থাসমূহ এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। বিশেষভাবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানব রচিত ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টার প্রকৃতি অতীতকালে ও বর্তমানে একই ধাতুতে গড়া। তাই তার ফলও বরাবর একই প্রকার প্রমাণিত হয়েছে। জাহেলিয়াতের পরিবেশে গড়ে ওঠা সমাজ দেহের ধমনিতে যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হতো তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্যে প্রয়োজন পার্থিব জীবনকেন্দ্রিক তার ধ্যান-ধারণার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা। সে ধ্যান ধারণার বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাই তাদের সাহিত্য ও কৃষ্টিতে। তাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে মদ আজ একটি অবিচ্ছেদ্য বস্তু বলে বিবেচিত এবং এই কথাই তাদের সকল সাহিত্য ভান্ডারে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সুখী সমাজে বিলাসিতার জন্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অপরিহার্য। এর প্রতিক্রিয়া যতো ভয়াবহ হোক না কেন তা বুঝা ও খেয়াল করার মতো অবসর তাদের নেই।

(১৩) এ অবস্থা কমিউনিযমের যমানার কথা, এখন রাশিয়া এসব ব্যাপারে আমেরিকানদের চেয়ে মোটেই পেছনে নয়।—সম্পাদক

অতীতের সেই অন্ধকার যুগে এই মদের প্রচার কতোভাবে এবং কতো অভিনব উপায়ে যে করা হতো তার দু'একটি নযির এখানে পেশ করা হচ্ছে, প্রতিটি ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে সেখানে প্রথমেই মদ বেচাকেনার কথা বলা হয়েছে; যেমন কবি-লাবীদ বলছেন, 'অনেক রহস্যময় গল্প শোনার মধ্য দিয়ে আমি তার সাথে রাত্রি যাপন করলাম, তারপর সে যখন পানপাত্র আমার সামনে তুলে ধরলো তখন আমি তার মিনতি রক্ষা করলাম।'

কবি আমর ইবনে কামিয়াত বলছেন,

'যেন শীত ও গ্রীষ্ম প্রবাহিত মেঘমালা আনন্দের নির্ঝরিনী সুধা বয়ে নিসে আসে।' এমনি করে জাহেলী যামানায় বিরাজমান তথাকথিত সভ্যতায় দেখা যায় সর্বত্র মদিরার প্রচন্ড ছড়াছড়ি এবং এর গৌরবাত্মক গাঁথায় পরিপূর্ণ তৎকালীন কাব্য ভান্ডার।

জাহেলী যুগের মহাকবি ইমরাউল কায়েস বলছেন,

'আর রাত্রি শেষে যখন জেগে উঠলাম তখনো সে প্রেম-মদিরা আমাকে ডাকছিলো, আর তখনো আমি চার চারটি ভোগ বিলাসের লোনা স্বাদের অপেক্ষায় বিভোর। বলে দাও মোর সে সুরা সাথীদের প্রিয়সী, এসো, মোর সাথে, মধুর সে শরাবের নেশায় বিভোর মোর হৃদয়ের মণিকোঠায় এসো। রাখবো তোমায় একান্ত আপন করে, তাদের সঞ্চরণশীল চপল চঞ্চল একটা বেগবান অশ্বসম যেন তা নিরাপদ, সকল ভয়-ভীতির উর্ধে।'

কবি তারফা ইবনুল আবদ বলছেন,

'কেন হয় না এমন যে তাদের ত্রিগুণের সমাহার যৌবনের উদ্দাম আবেগ আনে,
ঢেউ তুলে দেয় প্রেমের সাগরে,
হেরিনু আমি যতোকাল ধরে মধু-মদিরার মাহফিলে এই রূপরাশি, যার ছাপ রেখে যায়,
মম মুগ্ধ হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে।
মনে পড়ে গোলাপী সুরার পাত্র-হাতে তিরস্কারের সেই মৃদু মধুর বাণী,
কখনো তার ওপর যোগ হয়েছে কোমল হাতের দেয়া স্বচ্ছ পানি,
আবর্তিত হয়েছে কানায় কানায় ভরা পান-পাত্র ও তার মন মাতানো স্বাদ
যার মুগ্ধ আবেশে বৃদ্ধি পেয়েছে মুক্ত হস্ত ভেংগেছে
মোর হৃদয়ের সংকীর্ণতার বাঁধ।
প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে ভুলেছি আমি মুক্ত মাঠে
বিরচণশীল দশম মাসের গর্ভিনী উটনিটিরে,
তারে হারিয়ে তুষ্ট হতে আমি বাধ্য হয়েছি আমি সবেধন এবাদতখানার উটটি নিয়ে।'

কবি আশা বলেন,

'মদ পান করা হলে পর তুমি জেনে নিয়েছো
ঘর ও সফরের দিনগুলোকে
তারপর সেচ দেয়া হয়েছে ফসলের সে জমিতে ততোক্ষণ
যতোক্ষণ না বশীভূত হয়ে সে জমি দীর্ঘায়িত হয়েছে।'

কবি মিনখাল আল অ্যাশকারি বলেন,

'অবশ্যই আমি পান করেছি ছোটো ও বড়ো মোর পান সাথীদের সাথে

তারপর মদমত্ত হয়েছিলো যখন তখন হয়েছি আমি মালিক সংকীর্ণ সে সাগরের ও বৃহদাকার সে বরই গাছের,

তারপর উন্মত্ত হয়েছি উল্লাসে যখন

তখন শুধু আমি মালিক যৌনাবেগ ও আমার বাহনের।'

এমনি করে জাহেলী যুগের বহু কবিতায় মদ ও তার আনুষাংগিক বস্তু বিষয়ের উলংগ বিবরণ পাওয়া যায়। এই ছিলো জাহেলী সমাজ ও তার সমাজপতিদের চেহারা।

এমনি করে মুসলিম সমাজের শুরুর দিকে আমরা দেখতে পাই মদ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণ পর্যায়ের বিভিন্ন অবস্থা, দেখি তাদের অবস্থা যারা এসব ঘটনার নায়কের ভূমিকায় ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন- ওমর, আলী, হামযা, আব্দুর রহমান ও আরো কিছু মহান এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এসব ঘটনাবলীর মাধ্যমে গভীর জাহেলিয়াতের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র এই,

ওমর (রা.) তার নিজের ইসলাম গ্রহণ করার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি জাহেলী যুগে মাদকাসক্ত ছিলাম, প্রায়ই বলতাম, অমুক মদ বিক্রেতার দোকানে যেতে পারলে আমি প্রাণভরে পান করতাম।

ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি মদ পান করতে থাকলেন, তারপর এই আয়াত নাযিল হলো,

মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে মাদকদ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে ওদের বলে দাও, এ দুটির মধ্যে মহা অপরাধ বিরাজমান, কিন্তু মানুষের জন্যে এগুলোর মধ্যে কিছু উপকারও আছে; তবে এগুলো ক্ষতিকর দিক উপকার থেকে অনেক বড়ো।'

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর ওমর (রা.) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা! মাদক দ্রব্য সম্পর্কে আমাদেরকে তৃপ্তিজনক কিছু জানিয়ে দাও।' এইভাবে তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকলেন, অবশেষে নাযিল হলো,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা মদ পান করে মাতাল (জ্ঞানহারা) অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জ্ঞান ফিরে না আসে এবং যা বলছো তা বুঝতে না পারো।'

কিন্তু এরপরও হযরত ওমর (রা.) তৃপ্ত হতে পারেননি এবং অনবরত বলতে থেকেছেন, 'হে আল্লাহ মালিক, তৃপ্তিজনকভাবে আমাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দাও আমরা প্রকৃতপক্ষে মদ পান একেবারেই পরিত্যাগ করবো কিনা।' পরিশেষে সিদ্ধান্তকর সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা নাযিল হলো,

মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা

'অবশ্যই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াতে, আরো চায় তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। সুতরাং তোমরা কি এ সব (মদ-পান) থেকে বিরত হবে?'

হযরত ওমর (রা.) এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে বলে উঠলেন, হাঁ, 'আমরা থেমে গেলাম, আমরা থেমে গেলাম। তারপর সত্যই তিনি থেমে গেলেন।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে দুটি বিবরণ পাওয়া যায়, যার একটি আর একটির সম্পূরক ও সহায়ক। এ রেওয়ায়াত দুটিতে মোহাজেরদের দু'জন আলী ও আব্দুর রহমান বিন আওফ এবং আনসারদের মধ্যকার সা'দ বিন মায়াযের ঘটনা পাওয়া যায়। রেওয়ায়াতকারী হযরত সা'দ বিন মায়াযের বরাত দিয়ে বলেন, 'চারটি আয়াতে এই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নাযিল হয়েছে। আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তি একদিন কিছু খাবার তৈরী করে মোহাজের ও

আনসারদের কিছু ব্যক্তিদের দাওয়াত দিলেন। তখন আমরা দাওয়াতে শরীক হয়ে খানাপিনা করলাম ও সুরা পান করে মাতাল অবস্থায় একে অপরের ওপর বড়াই দেখাতে শুরু করলাম। (যেহেতু তখনো মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়নি)। এ সময় এক ব্যক্তি উটের পাঁজরের হাড় দিয়ে সা'দের নাকে আঘাত করলো। অবশ্য এর পূর্বেই সা'দের নাকি একটি কাটা দাগ ছিলো। এতে যে দন্দ্বসৃষ্টি হলো তাকে কেন্দ্র করে নাযিল হলো,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, সুরাপান করা অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।'

এ হাদীসটি হযরত শু'বা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর একটি হাদীস হযরত আলী (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী বলেন, আমাদের জন্যে আব্দুর রহমান বিন আওফ কিছু খাবার তৈরী করে আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং মদও পরিবেশন করলেন। আমাদের মধ্য থেকে আমি পানপাত্র হাতে নিয়ে পান করতে শুরু করেছি এমন সময় নামাযের সময় সমাগত হলে ওরা এক ব্যক্তির দিকে এগিয়ে গেলো যে সূরায়ে 'কাফেরুন' পড়ছিলো। এরপরই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'হে ঈমানদাররা মদমত্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না যতোক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা কী বলছো।'

আরব জাহেলিয়াতের যামানায় মদ ও নেশার প্রশংসায় আরববাসীরা কতো পঞ্চমুখ ছিলো তা আশা করা যায় উপরোক্ত কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অতিরিক্ত উদাহরণ দেয়া নিষ্প্রয়োজন। এই নেশার বস্তু আর তার সাথে ছিলো জুয়ার আসর। যে কোনো সমাবেশের জন্যে এ দুটি ছিলো প্রধান আকর্ষণ।

এর পাশাপাশি দেখুন, মহান আল্লাহর ব্যবস্থা কতো সুন্দরভাবে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে পারস্পরিক মহব্বতের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেছে এবং সমাজদেহের পচন রোধ করার জন্যে সুষ্ঠু সুন্দর এমন নির্মল আনন্দদায়ক ব্যবস্থা দান করেছে যার তুলনা অন্য কিছুতেই হতে পারে না। ইসলাম প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় ভালোবাসার বিনিময়ের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণকর লেন-দেন ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অবতীর্ণ কোরআনে করীমের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে সমাজের উঁচু ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতি ও দরদ-সহানুভূতি গড়ে তোলার যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, কোনো ঝগড়াঝাটি, বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, খুনখারাবী ও কারো কোনো ক্ষতি লোকসান ছাড়াই সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং সমাজদেহ থেকে শরাব পানের বদ অভ্যাসটি বিদূরিত হয়েছে। হারাম ঘোষণার এই কয়েকটি আয়াতের সম্মোহনী শক্তি ছিলো এমন মযবুত যে, সেগুলো নাযিল হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি অলিগলির মধ্যে এতো বিপুল পরিমাণে মদের পিপা ঢেলে দেয়া হয় যে মদীনার রাস্তাগুলোতে যেনো ঢল নেমে আসে। যারা পানপাত্র মুখে ধরেছে, এ আয়াতগুলোর শব্দ কানে যাওয়ার সাথে সাথে তারা থেমে গেছে, আর একটি ঢোকও গিলতে পারেনি। এ অবস্থার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ সামনে আসছে।

মক্কা নগরী তখনো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা মুসলমানদের কোনো ক্ষমতাও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, তবে মুসলমানদের হৃদয়রাজ্যে ইসলামী আইনের কর্তৃত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, সে অবস্থায় অবতীর্ণ সূরা আন নাহল-এ মদ সম্পর্কিত ইংগীতের কার্যকারিতাও চমকারিত্ব প্রতিধানযোগ্য।

সূরায়ে 'নাহল'-এর মধ্যে এসেছে,

'খেজুর ও আংগুর ফলগুলো থেকে মাদকদ্রব্য যেমন তৈরী করা যায় তেমনি তার মধ্যে রয়েছে উত্তম ও উপকারী খাদ্য সামগ্রী।'

'সাক্‌র' শব্দটি দ্বারা মাদকদ্রব্য (যা মাদকতা আনে) বুঝায়। এ ফল দুটি দ্বারা এ সকল জনপদের অধিবাসীরা সুন্দর সুমিষ্ট রস হাসিল না করে তা দ্বারা মাদক দ্রব্য তৈরী করতো। এ দু'টি ফলের কথা পাশাপাশি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা জানাতে চেয়েছেন যে, এ দুটি' বস্তু একই প্রকার ফল থেকে তৈরী হওয়া সত্তেও এ দু'টির বাস্তব প্রয়োগ ছিলো ভিন্ন, এদের কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়াও ছিলো বিভিন্নমুখী। আল্লাহর আয়াতের বক্তব্য একমাত্র মুসলিম জন মানুষরাই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। এর পার্থক্য যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির বিবেকের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু মদের অভ্যাস বা নেশা সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এর ক্রিয়া ব্যক্তি পর্যায়ে যতোটা, সমষ্টি পর্যায়ে তার থেকে অনেক গভীর। এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের গভীরে। অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিংবা তরবারির শক্তি দ্বারা মদ নিষিদ্ধ করতে হয়নি। আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা তরবারির শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মদীনায় কোরআনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো।

ইসলামী আইন প্রয়োগ করা শুরু হয় মহব্বতের সাথে এবং সহজ সুন্দরভাবে। মানুষের সঠিক বুঝ-শক্তির কাছে ইসলামী আইনের কল্যাণকর আবেদন পেশ করা হয় এবং সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ ও কল্যাণকে সামনে তুলে ধরেই তা করা হয়।

মুসলমানদের বিবেকের কাছে মদ ও জুয়ার অনিষ্টতা তুলে ধরার জন্যে তাদের প্রশ্নের জবাবে মদীনার প্রথম যুগে সূরা 'বাকারা'তে কিছু আয়াত নাযিল হয়, 'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, এ দুটির মধ্যে মহা-অপরাধ নিহিত রয়েছে, অবশ্য মানুষের জন্যে এর মধ্যে কিছু উপকারও রয়েছে, তবে উপকার থেকে অপকারই বেশী।'

ইসলামী আইন প্রয়োগ পদ্ধতির এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ যা মনোযোগ দিয়ে মানুষরা শুনেছে এবং ইসলামী আবেগ উচ্ছ্বাসের কাছে তা সাথে সাথে গৃহীত হয়েছে। এটাই ছিলো ইসলামের যুক্তি-বিজ্ঞান। এরই ওপর নির্ভরশীল হালাল হারামের বিধান। অথবা বলা যায় যে যুক্তি-বুদ্ধির ভিত্তিতে ইসলামী আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তার মূলে রয়েছে মানুষের বিবেকের কাছে স্বতস্ফূর্তভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা বা তা প্রতিহত করার জন্যে মানুষের স্বভাবজাত প্রতিরোধের অভিব্যক্তি। জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই এই একই নীতি ক্রিয়াশীল। যখন মানুষের বিবেকের কাছে এটা প্রতীয়মান হলো যে, এ মদ ও জুয়া নামক বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উপকারিতা থেকে অপকারিতা বেশী তখনই সে এ দুটির নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত ইংগীত পেয়ে গেলো কারণ একজন জাগ্রত বিবেক অপেক্ষাকৃত উপকারিতা হাসিলের পথই খোঁজে।

কিন্তু এখানে আরো গভীরভাবে বুঝার বিষয় রয়েছে, যার জন্যে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, হে আল্লাহ তায়ালা আরো তৃপ্তিজনকভাবে মদ-এর বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দাও। একজন আরববাসী হিসেবে জাগ্রত হৃদয়ে এই কৌতুহল বা জানার আগ্রহ যে কারণে পয়দা হলো, সেই বিষয়টি আরো গভীরভাবে আলোকপাত করার দাবী রাখে।

অনাচার নির্মূল করণে কোরআনের নীতি

প্রিয় পাঠক, এ বিষয়ের ওপর আমি সংগত কারণেই কিছু নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছি, এর কিছু অংশ ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। আবারো দেখুন আল্লাহর প্রেরিত এই আয়াতটির দিকে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না 'এমন অবস্থায় যে তোমরা মদ পান করে মাতাল হয়ে রয়েছো, (যার কারণে) কী বলছো তোমরা বুঝতে পারছো না।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, এই আয়াতে কারো কোনো দোষ ধরা হয়নি, কোনো তিরস্কারও করা হয়নি, কতো আদর মহব্বতের সাথে প্রচলিত অভ্যাস থেকে মুক্ত করার জন্যে মানুষের জাগ্রত বিবেককে আকর্ষণ করা হয়েছে।

মানুষের মনমগযকে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করার ও সে অপকারিতা থেকে বাঁচানোর জন্যে এ ছিলো এক মধুর ও সুবিস্তীর্ণ পর্যায়ের আবেদন। এ আবেদনকে আরো জোরদার করার জন্যে বলা হয়েছে, 'এটি খারাপ জিনিস'। দেহ মনের জন্যে এটা লজ্জাকর ও অপবিত্র অনুভূতি দানকারী, মানুষের মান-ইযযত ধ্বংসকারী এবং মানুষকে প্রদত্ত মর্যাদার প্রতীক যে জ্ঞান এটি তা বিনষ্ট করে দেয়। অতএব, এর ব্যবহার হচ্ছে অন্যতম একটি শয়তানী কাজ। এই বিস্তীর্ণ আলোকপাতের মধ্যে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরোক্ষ আহবান অথবা এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার আবেদন রয়েছে আর এটা এইভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব যে, নামাযের সময় যখন সমাগত হবে তখন শরাব পান করা যাবে না। আর যেহেতু প্রতি কয়েক ঘন্টা পরপরই নামাযের সময় হাযির হয়, সুতরাং বাধ্য হয়েই আস্তে আস্তে শরাব পান বন্ধ হয়ে যাবে। নামাযের হুকুম পালনের খেয়াল ও নামাযের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক মোমেনের হৃদয় মনে মদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করেছে।

বহু বছর ধরে লালিত একটি অভ্যাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্যে কী চমৎকার ধারাবাহিকতা এবং হৃদয়াবেগের কাছে গ্রহণযোগ্য তার কি সুন্দর এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! এক ওয়াক্ত থেকে আর এক ওয়াক্তের মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য তা তো শরাব পান করার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়; সুতরাং কি করে তা পান করা যাবে, তাছাড়া আগেও একবার বলে দেয়া হয়েছে যে, 'জিনিসটা তো খারাপ', অপেক্ষাকৃত ক্ষতিকরও বটে, এমন বাজে জিনিস না পান করলেই কি নয়? মন তো চায়, কিন্তু নামাযের ক্ষতি, শরীর ও মনের ক্ষতি, এতোসব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে মাত্র সামান্য একটু আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কেন তা পারা যাবে না। এতে আল্লাহ তায়ালা তো অবশ্যই খুশী হবেন। হাঁ এই যে রেযায়ে ইলাহীর আকাংখা, এই তো হচ্ছে মোমেনের প্রধান আকর্ষণ। নামাযের জন্যে সময় রেখেই তবে শরাব পান করা যাবে, কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নামায আগে না শরাব আগে, নামাযের সময় ঠিক রাখতে গেলে তো শরাব ছাড়তে হয়, কারণ শরাব পান করার পর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত নামাযের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না, আর নামাযের কথা তো কোনো অবস্থাতেই গৌণ মনে করা যেতে পারে না, কেননা নামাযই তো মোমেন জীবনের প্রধান স্তম্ভ। আয়াতটি নাযিল হবার পর মোমেনদের দিলে এই কথাগুলোর আনাগোনা শুরু হয় এবং তা তাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করছিলো।

এসব চিন্তা ভাবনা জাগিয়ে দেয়ার পর তাদের আরো অনেক কিছু বলার ও করার ছিলো। এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর কথা লক্ষণীয়, (তিনি তো সেই ওমর যিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ আমাদের জন্যে আরো স্পষ্ট করে কিছু বলুন।'

এরপর এক দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলো, তবুও কোনো নতুন নির্দেশ এলো না, বরং আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেলো (এইভাবে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর মদের প্রতি বিতৃষ্ণ এবং মদ পরিত্যাগের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে থাকলো এবং তারপরই মুসলমানদের অব্যক্ত চাহিদা [যা হযরত ওমর (রা.)-এর কথার মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো] পূরণের জন্যে সূরায়ে মায়েদায় দুটি আয়াত নাযিল হলো,

'অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তিস্থাপন এবং তীর ধনুক দ্বারা ভাগ্য গণনা করা অপবিত্র ও শয়তানী কাজ, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো....'

এ আয়াতের আহবানে মুসলমানরা বাস্তবিক পক্ষেই পুরাপুরিভাবে এসব নিষিদ্ধ কাজ থেকে থেমে গেলো এবং মদের পিপাগুলো উপুড় করে ঢেলে দেয়া হলো, যার ফলে মদীনার অলিগলি সব ভেসে গেলো, ভেংগে ফেলা হলো সব মদের বোতল। শুধুমাত্র হারাম হওয়ার এ ঘোষণা শোনামাত্রই সবাই এভাবে তা আমল করলো। যারা মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ঢোক গিলতে যাচ্ছিলো, এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ মদের শেষ অংশটুকু মুখ থেকে কুলি ফেলার মতো ছুঁড়ে ফেললো, একটি ঢোকও আর কেউ গিলতে পারলো না। মহান কোরআন শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলো, তার আইন সফল হলো। আইন প্রয়োগকারীদের কোনো আইন প্রয়োগ করা দরকার হলো না। বরং এমনিই আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো।

এই মহা বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে সম্ভব হলো এ মহাবিপ্লব? কিভাবেই বা সম্পন্ন হলো এ মহান ও অত্যাশ্চার্যজনক ব্যাপারটি, যার নযীর মানবেতিহাসে দ্বিতীয়টি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ভীষণ আকর্ষণীয় জিনিসটি কোনো শক্তিধর ব্যক্তি ও রাষ্ট্র আইন করে, শাস্তি দিয়ে, জরিমানা করে, কোনোভাবেই বন্ধ করতে পারেনি, তা দুটি মাত্র আয়াতের সম্মোহনী শক্তিতে এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেলো যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো শক্তিমান আইন প্রণেতা আজ পর্যন্ত স্থাপন করতে পারেনি, পারেনি কোনো রাষ্ট্রকর্তা এমনভাবে তার আইনকে কার্যকর করতে।

এ মোজেযা পরিপূর্ণ হলো, কারণ বিশ্বপালকের আইন, মানুষ বিশেষ এক পদ্ধতিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একে গ্রহণ করেছিলো, গ্রহণ করেছিলো আল্লাহর ক্ষমতা বলে তাঁর ভয়ে তাঁরই পর্যবেক্ষণের মুখে এবং তাঁর উপস্থিতির অনুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে। মুসলিম সমাজে আল্লাহর অবস্থান ও উপস্থিতির এই তীব্র অনুভূতি এতো গভীর এবং এতোই জোরদার যে, একজন সজাগ মুসলমান কিছুতেই এটা ভুলতে পারে না, পারে না চোখ বুঁজে কোনো কাজ করে যেতে, পারে না আল্লাহর চোখকে কোনোভাবে এক মুহূর্তের জন্যে ফাঁকি দিতে, পারে না ফাঁকি দেয়ার কোনো সাহস করতে। এই কারণেই এ মুসলিম সমাজ পরিপূর্ণভাবে এ নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও ঘটেনি, প্রকৃতির যিনি মালিক তাঁরই ইচ্ছা প্রকৃতি আপন শক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

মদ পরিহার করার কাজটি এভাবেই অতি যত্নে সম্পন্ন হয়ে গেলো, মন মাতানো সে নেশার আকর্ষণে কোনো নেশাখোরের তীব্র নেশা তাকে ধরে রাখতে পারলো না। মদের নেশায় মানুষ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে, সে হয়ে যায় সপ্ত রাজ্যের সম্রাট যে হাওয়ায় কল্পনার পাখায় ভর করে উড়তে থাকে, সে সব স্বপ্নসাধ মুহূর্তে খান খান হয়ে ভেংগে গেলো। মদ-পরিত্যাগ করার কাজটি এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো যা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। দিশেহারা ও ভ্রান্ত মানুষগুলো একদিনে একেবারেই বদলে গেলো, জাহেলিয়াতের সকল বন্ধনকে সে এক লমহায়

ছিন্ন করে ফেললো, মানুষগুলো যন্ত্রণাদায়ক সামাজিক এ ভীষণ ব্যধি থেকে বেঁচে গেলো। সে শুভ্র সমুজ্জ্বল মুক্ত আলোর বাতায়ন খুলে ঘুটঘুটে অন্ধকারের অমানিশা ছিন্ন করে বেরিয়ে এলো। দীন-হীন দাসত্বের নিগড় থেকে নিষ্কৃতি পেলো, শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতার পরিবেষ্টনী উন্মোচন করে সে ইসলামের সুন্দর সুশীতল ও সুরভিত বাগানের ছায়াতলে বেরিয়ে এলো, কানায় কানায় তার দিল ভরে গেলো। তার ইচ্ছা মহান আযাদীর স্বাদ পেয়ে মহীয়ান হলে উঠলো মুক্ত বাধনমুক্ত। সকল সংকীর্ণতার উর্ধে পৌঁছে গিয়ে সে দুনিয়া ও আখেরাতের সুবিস্তীর্ণ প্রশস্ততা লাভ করলো।

সকল বন্ধন ছিন্ন করে সে আজ মুক্ত হলো এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হলো। সব পাওয়ার বড়ো পাওয়া এই তো তার সারাজীবনের কামনার বস্তু, সাধনার ধন। ঈমানের এই সজীব ও সুমধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা মদের নেশার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত হয়ে গেলো। আল্লাহর ভয় তাঁর হুকুম পালনের অনুভূতি তাদেরকে মিথ্যা আমোদ প্রমোদ ও মিথ্যা আবেগ চরিতার্থ করা থেকে রক্ষা করলো। ঈমানের এই অনভূতি হচ্ছে এমন এক স্বাদ যা মুসলমানকে বেহেশতের সুষমা দান করে এবং তার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের চেতনা জাগায়, তাঁর মহান নূরের মহিমাময় আলোকে সে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে গভীরভাবে আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ পেতে থাকে বলে সহজেই সে মদের মজা ও তার নেশা ভুলে যেতে সক্ষম হয়। কখনো মদ পান করার দরুন, আবার কখনো বা দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করার কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়ে এক সময়ে সে প্রশান্ত হয়ে যায়।

এই ঈমানের শক্তিই তাকে জাহেলিয়াতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে এবং সকল প্রকার জটিলতার জট খুলে দেয়, যা ঈমানী শক্তি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা খোলা সম্ভব নয়। তার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত সুপ্ত মানবতা জেগে ওঠার ফলে সে সুঁড়িখানা ও নেশাখোরদের আড্ডার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে থাকলেও কোনো উন্মাদনা আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

ঈমান গ্রহণ করার কারণে তার মধ্যে সত্যের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে এবং সে সব দিক দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করে সাহসের সাথে সত্যকে ধারণ করে ও সকল প্রকার মহান কাজ করে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হওয়ার সেই দায়িত্ব পালন করে, যার জন্যে সব বিষয়ে খবর রাখনেওয়ালা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সৃষ্টি করেছেন।

নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরাই তো আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করতে পারে এবং তাঁর খলিফা হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে হেদায়াতের আলোকময় পথে চলতে পারে।

ফলের রস বিশেষ করে আংগুর ও খেজুর থেকে প্রস্তুত মদ আকর্ষণীয় হওয়ার দিক দিয়ে প্রচলিত জুয়ার মতোই। এগুলো অন্যান্য বে-ফায়দা খেলাধূলার শামিল। আজ মানুষ শরীর চর্চার নামেও বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলায় মেতে উঠেছে। এসব খেলাধূলা পরিচালনা ও প্রদর্শনের জন্যে সব দেশে ও সকল সমাজে অজস্র পয়সা ব্যয় করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে ও দ্রুতগতিতে আবেগ সৃষ্টিকারী সিনেমা থিয়েটার ও অন্যান্য গান-বাজনার মাহফিলে মানুষকে মজিয়ে ফেলা হচ্ছে। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞানবিবর্জিত করে দেয়া হচ্ছে এবং অতীতের মতো আজকের নব্য জাহেলিয়াতে আরো অসংখ্য প্রকারের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলীয় জীবনে নৈতিক উচ্ছৃংখলতা নেমে এসেছে।

এ সকল বাজে কাজে মানুষ তখনই লিপ্ত হয়ে যায় যখন তার বিবেককে সে কাজে লাগায় না, বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে যখন দুর্বলতা এসে যায়। দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে যখন ঈমানের দুর্বলতা থাকে তখন সে সজাগ বিবেক নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা

ভাবনা করার মতো ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে, সে তখন অনেক বে-ফায়দা কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আসলে এসব কিছুর পেছনে ঈমানের দুর্বলতাই প্রধাণত দায়ী, যার কারণে মানুষ তার প্রবৃত্তির কাছে পরাজয় বরণ করে, ঈমানের কমযোরী ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল যে নৈতিক দুর্বলতা, তাই তাকে অবসর কাটানোর জন্যে মদ ও জুয়ার দিকে শনৈ শনৈ এগিয়ে দেয়, যেমন করে ওপরে বর্ণিত আরো বহুতর বাজে খেলাধূলা তাকে নিশিদিন ব্যস্ত রাখে। এটা অতি সত্য কথা যে, এ দুটি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাকে একবারে পাগল বানিয়ে ছাড়ে, যার কারণে তার বাহ্যিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে থাকে এবং বহুবিধ না-ফরমানী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মদাসক্ত হওয়ার পর সামান্য কিছু ব্যক্তিই এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

এসব পাগল করা উন্মাদনা থেকে অত্যাশ্চর্যজনকভাবে তাদের রক্ষা করার কাজটি শুধুমাত্র কিছু বড়ো বড়ো বুলি দ্বারাই সাধিত হয়নি, বরং এর পেছনে রয়েছে মানুষের মালিক মহান আল্লাহর দেয়া পূর্ণাংগ জীবন বিধান। এটা মানুষের তৈরী করা কোনো ব্যবস্থাপনার কেরামতি নয়। আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য এখানে পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। অবশ্য আল্লাহর এ ব্যবস্থা অনুধাবন করার মতো মানুষ দুনিয়ায় খুব বেশী পাওয়া যায় না।

এসব সামাজিক ব্যাধি দূর করা কোনো বাগাড়ম্বর কথা, কোনো দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা, কোনো কবির কাব্য, কোনো চিন্তাশীলের গবেষণা অথবা কোনো রাজা বাদশা বা রাষ্ট্রের কর্ণধারের কাজ নয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক যুক্তি পেশ করা যেতে পারে। কোনো ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বয়ান করে অনেক চটকদার ও সুন্দর সুন্দর কথা বলা যেতে পারে, অথবা কোনো মূল্যবান দর্শনও পেশ করা হতে পারে, কিন্তু মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার কাজ মানুষের তৈরী করা ব্যবস্থা বা ক্ষমতাবলে কখনো সম্ভব হয় না। এটা সম্ভব হয় সেই মহান ও শক্তিধর বাণীর শক্তি দ্বারা যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। এটা সম্ভব হয় সেই মহান সত্ত্বার পক্ষে যার হাতে রয়েছে সমস্ত ক্ষমতার চাবিকাঠি। সে পবিত্র ও শক্তিমান মালিকের ব্যবস্থাপনা মানুষের তৈরী যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে বহু উর্ধে। মানুষের চিন্তা চেতনা, জ্ঞান গবেষণা ভুলে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যে ভরা থাকে, অথচ তার যে অস্তিত্ব, তার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম মহাপবিত্র সে মহান সত্ত্বা। মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে যারা ব্যবস্থা দিতে চায় তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা ছাড়া কোত্থেকে সেই চিরন্তর ব্যবস্থা দান করবে? কি করেই বা তারা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে মহা বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর নিয়ম নীতির সাহায্য ছাড়া নিজেদের বুদ্ধি বলে পূর্ণাংগ কোনো ব্যবস্থা রচনা করবে? আর যেসব বিষয়ে মহাস্রষ্টা ও মহা শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ রেখা দান করেননি সে বিষয়ে মানুষ কিভাবে কোনো নির্দিষ্ট স্মারক স্থাপন করবে? হায় কখন এবং কিভাবে এই অসম্ভব কাজ করার প্রয়াসজনিত এই ধোঁকাবাজি থেকে যে মানুষ রেহাই পাবে!

এসব বিষয় থেকে নযর ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আমরা একবার আল্লাহর আয়াতের দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করি। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা মদমত্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না যতোক্ষণ.....।'

কিছু অপবিত্র অবস্থা ও তার থেকে পবিত্রতা অর্জন

এ আয়াতে জানা গেলো, মদমত্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। একইভাবে অপবিত্র থাকাকালেও গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের নিকটবর্তি হতে মানা করা হয়েছে; তবে সফরে থাকাবস্থায় পানির অভাবে গোসল না করতে পারলে তার জন্যে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

মোসাফেরী হালাতে থাকা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় সে বিষয় বিভিন্ন কথা জানা যায়। একইভাবে নিকটবর্তী হতে মানা করা কথাটির ব্যাখ্যায়ও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

এ প্রসংগে একটি মত হচ্ছে, মসজিদের কাছে না যাওয়া অথবা অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করা পর্যন্ত মসজিদের মধ্যে না থাকা। তবে শুধু মসজিদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করায় দোষ নেই। একদল সাহাবার বাড়ীর দরজা মসজিদে নববী (স.)-এর দিকে ছিলো এবং তারা সেগুলো খুলে রাখতেন তারা সেই মসজিদের মধ্য দিয়েই আসা-যাওয়া করতেন। জুনুব (অপবিত্র) অবস্থায় তাদেরকে মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। গোসল না করা পর্যন্ত সে অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা বা নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা হিসেবে এ আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি কথা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মোসাফেরের জন্যে গোসল না করে মসজিদে আসা এবং নামায আদায় জায়েয করা হয়েছিলো। তবুও তাদের জন্যে ওযু ও গোসলের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে। আমাদের মতে, প্রথম কথাটি বেশী স্পষ্ট এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ দ্বিতীয় কথার মধ্যে সফরের উল্লেখ রয়েছে অথচ মোসাফেরদের সম্পর্কিত আইন জানাতে গিয়ে পরবর্তীতে পৃথক একটি আয়াত নাযিল হয়েছে। সুতরাং 'আবেরে সাবীলিন'-এর ব্যাখ্যায় মোসাফের বুঝানোর অর্থ হচ্ছে, একই আয়াতে একাধিক নির্দেশ দান যে নিষ্প্রয়োজন তা বোঝানো। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা যদি কেউ অসুস্থ থাকো অথবা সফরে থাকো... আল্লাহ তায়ালা মার্জনাকারী সহৃদয়তার সাথে ক্ষমাশীল।'

আলোচ্য এই আয়াতে মোসাফেরের কথা বলা হয়েছে, বড়ো রকমের অপবিত্র অর্থাৎ 'জুনুব' থাকলে গোসলের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করতে হবে এবং ছোটো অপবিত্রতা বা ওযুর প্রয়োজনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবেও নামাযের জন্যে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে।

কোরআনের এই আয়াত অনুসারে অসুস্থদের জন্যে উভয় অবস্থায় (অর্থাৎ পায়খানা পেশাবজনিত কারণে এবং বড়ো অপবিত্রতা বলতে যে 'জুনুব' অবস্থা বুঝায় সে সব কারণে) তায়াম্মুম করার সমান সুবিধা দেয়া হয়েছে। 'গায়েত' বলতে সে সকল নীচু জায়গাকে বুঝানো হয়েছে যেখানে গিয়ে লোকেরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতো। সে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ দ্বারা আসলে ইংগিত নীচু স্থান থেকে আগত অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আবার 'জুনুব' বলতে বুঝানো হয়েছে স্ত্রী সহবাস।

'নারী স্পর্শ' শব্দটির অর্থেও কয়েকটি মত আছে প্রথম মত হচ্ছে 'স্পর্শ' দ্বারা ইংগীতে স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন বুঝায় যার কারণে গোসল ফরয হয়। দ্বিতীয় মত হচ্ছে পুরুষের শরীরের কোনো অংগ স্ত্রীর শরীরের কোনো অংগে স্পর্শ করা এতে কোনো কোনো ফেকাহবিদদের মতে ওযুর প্রয়োজন হয়, আবার কারো কারো মতে ওযুর প্রয়োজন নেই।

বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, সংক্ষেপে কিছু কথা বলছি.

ক. স্পর্শকারীর মধ্যে যদি উত্তেজনার উদ্রেক করে তাতে ওযুর প্রয়োজন হয় অথবা যে নারীকে স্পর্শ করা হয়েছে তার মধ্যেও যদি উত্তেজনা আসে তাতেও ওযুর দরকার হবে। খ. ওযুর প্রয়োজন হয় যদি এ স্পর্শে মনের মধ্যে কিছু অনুভূতি আসে, তাতে তার মন নড়াচড়া করুক আর নাই করুক। গ. আর একটি স্পর্শ হচ্ছে, স্ত্রীকে চুমু খাওয়া বা তাকে আলিংগন করা, এতে ওযুর কোনো প্রয়োজন নেই।

এসব প্রত্যেকটি মতের পেছনে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কোনো না কোনো কাজ বা কথাকে দলীল হিসেবে নেয়া হয়েছে এবং তা বিভিন্ন ফেকাহবিদরা বিভিন্ন রকম বুঝেছেন। তবে আমরা এই আয়াতটি দ্বারা পাওয়া সেই অর্থকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, যার কারণে গোসল ফরয হয়, কেননা ওযুর প্রশ্নে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

তায়াম্মুমঃ পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি

এখানে বর্ণিত সর্বপ্রকার অবস্থায় কিন্তু পানি না থাকায় তায়াম্মুম করা চলবে– তা ওযুর বিকল্প হিসেবে হোক কিংবা গোসলের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হোক। একইভাবে পানি থাকলেও তা যদি ক্ষতিকর বা নাগালের বাইরে থাকে সে ক্ষেত্রেও উভয় প্রয়োজনে তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হবে এবং একথা কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। আয়াতের ভাষার দিকে লক্ষ্য করুন,

'অতপর তায়াম্মুম করো পবিত্র (শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত) মাটি দ্বারা'

অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করার মানসে পবিত্র মাটির ব্যবহার। পৃথিবীর সকল মাটি, পাথর, দেয়াল এমনকি কোনো পশুর পিঠের ওপরে অবস্থিত ধুলাবালির আস্তর বা বিছানার ওপরে উড়ে পড়া সামান্য কিছু ধুলা যেখানে হাত মারলে ধুলা আছে বলে টের পাওয়া যায়– এসব কিছুই পবিত্র মাটির অন্তর্ভুক্ত।

এবারে দেখা যাক তায়াম্মুমের পদ্ধতি কি; দু'হাত দ্বারা পবিত্র মাটির ওপর একবার থাকা মারতে হবে, এরপর হাত ঝেড়ে ফেলে মুখমন্ডলের ওপর বুলিয়ে নিতে হবে এবং কনুই পর্যন্ত দুটি হাত মসেহ করতে হবে, নতুবা পুনরায় মাটিতে হাত মেরে তবে হাত দুটির ওপর মসেহ করতে হবে। এ বিষয়ে চুলচেরা হিসাব নিকাশ করা ও মতভেদ করার জন্যে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি আল্লাহর ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিসই সহজ, আর তায়াম্মুম করার অনুমতি দান করেও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সহজ অবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু শুধু দ্বীনকে আমরা কঠিন করতে যাবো কেন?

'অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা মার্জনাকারী দরদী ক্ষমাশীল।'

এই আয়াতাংশ আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, তিনি মানুষের দুর্বলতাসমূহ জেনে-বুঝেই তার জন্যে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। তার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে নযর সরিয়ে নিয়েছেন এবং তার অপরাধগুলোকে দরদের সাথে ক্ষমা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ আয়াতের ওপর আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে এবং এ পাঠটি শেষ করার পূর্বে এই ছোট্ট আয়াতটির ওপর আমি আরো কিছু আলোকপাত করতে চাই। তায়াম্মুমের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তালাশ করতে গিয়ে আমরা ছাফ ছাফ দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন।

শরীয়তের বিধান ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহের ব্যাপারে যারা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অনেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ইসলামের হুকুম আহকাম পালন করাকে আমাদের সামনে কঠিন হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন নয় এবং ইসলামের বিধি বিধান পালন করার এটা কোনোক্রমেই কোনো সঠিক উপায়ও হতে পারে না। কোরআনের আয়াতসমূহ এবং রসূল (স.)-এর উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা এর সব কড়াকড়ির খেলাফ। এই কারণেই আমরা মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন করছি, যেন কোনো কম বেশী না করে প্রত্যেক জিনিসকে তার সঠিক অবস্থানের ওপর স্থাপন করা হয়। এর পূর্বেকার আয়াতেও আমরা শরীয়তের বিধানের সীমারেখাগুলোর দিকে এভাবে ইংগীত করেছি।

নামাযের পূর্বে ওযু করার তাৎপর্য তো হচ্ছে প্রধানত পরিচ্ছন্নতা অর্জন। এটাই ওযুর উদ্দেশ্য, এছাড়া অন্য যা কিছু বলা হবে তা হবে এই মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং তা মানুষের জন্যে মোটেই উপযোগী বা নিরাপদ নয়।

আজকে আমরা এমন এক সময়ে উপনীত হয়েছি যখন কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক ও উগ্রমস্তিষ্ক গবেষক এতোটা ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করেছে যে, তাদের মতে আজকের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যুগে ওযু করার মতো এই আনুষ্ঠানিক কাজের আর কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ যখন তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ রচনার ব্যবস্থা নিজেরাই তৈরী করে নিচ্ছে, তখন ওযুর প্রয়োজন আর থাকে না, বরং তাদের মতে নামাযের শর্ত হিসেবেও আজ ওযুর আর কোনো প্রয়োজন নেই।

আবার নামাযের তাৎপর্য বলতে গিয়ে এর স্বাস্থ্যগত দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে যে মুখ্য কথাটা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, নামায একটি ব্যায়ামের কাজ যা শরীরের সকল অংগ-প্রত্যংগকে সঞ্চালিত করে। কখনো বলা হয়েছে নামায বিভিন্নভাবে মানুষকে নিয়মতান্ত্রিক বানায়, তাকে সময়ানুবর্তী বানায়। সুসামঞ্জস্যভাবে তার অংগ প্রত্যংগের ব্যায়াম করতে সাহায্য করে, সারিবদ্ধভাবে ও এক মনে, একজন নেতার অনুসরণে আল্লাহর হুকুম পালন করা শেখায় ইত্যাদি। আবার কখনো বলা হয়েছে, নামায দোয়া ও কোরআন পাঠের মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। এর উদ্দেশ্য হিসেবে এটা ওটা যাই বলা হোক না কেন, নামাযের তাৎপর্যের মধ্যে সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে নামায মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সাহায্য করে এবং তাদের পারস্পরিক বন্ধনকে মযবুত করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা দান করে।

আজ এমন একটি সময় এসে হাযির হয়েছে, যখন শরীয়ত ও এর বিধি বিধান সম্পর্কে নানাপ্রকার মন্তব্য পেশ করা হচ্ছে। কেউ বলছে, আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের জন্যে নামাযের আর কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণ দ্বারা অর্জিত শারীরিক প্রয়োজনোপযোগী বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে যথেষ্ট। কেউ বলেন শৃংখলা শেখানোর জন্যেও নামাযের কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমাদের কাছে এখন নিয়মিত সেনাবাহিনী বর্তমান রয়েছে, তারা এ কাজের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

আবার কেউ বলেন, নামাযের মধ্যে যে বিভিন্ন অংগ সঞ্চালন রয়েছে এসবের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ একাকী অবস্থায়ও করা সম্ভব এবং অধিক উপযোগী, আর প্রার্থনা করার কাজ তো অংগ সংঞ্চালন দ্বারা সম্ভব নয় যেহেতু এতে আত্মিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়।

এমনি করে আমরা মানবীয় যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা এসব কিছু বুঝার প্রয়াস পাই এবং প্রত্যেকটি এবাদাত-এর মধ্যে তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করি ও তাকে তর্কবিদ্যার আলোকে বুঝতে চাই, তারপর মনে করি এইভাবে বুদ্ধির নিরীখে যাচাই করে নেয়াটাই বুঝি সঠিক, তখন কালামে পাকে বর্ণিত কথা ও নির্দেশাবলী গ্রহণ করা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাই; আর এইভাবে আমরা নিরাপত্তার সীমানা থেকেও অনেক দূরে চলে যাই, যার ফলে পারস্পরিক ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির দুয়ার নিজেরাই উন্মুক্ত করে দেই। আর এটাই হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত ধ্যান ধারণার সবথেকে বড়ো ত্রুটি। এ ত্রুটি আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তখন যখন আমরা আমাদের অর্জিত জ্ঞানকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দেই। কারণ দুনিয়ার এই জ্ঞান স্থির বা অপরিবর্তনীয় কোনো সত্য নয়, প্রতিনিয়তই এর সংশোধন ও পরিবর্ধন চলছে।

যাই হোক বর্তমানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তায়াম্মুম। এর দ্বারা ওযু ও গোসলের উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়, অবশ্য এর দ্বারা পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হয় না, কারণ ওযু গোসলের দ্বারা যে স্নিগ্ধতা অর্জিত হতো এর থেকে পাওয়া না গেলেও মানসিক দিক থেকে আমরা এর দ্বারা পবিত্রতা অনুভব করি এবং সেইটিই তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য।

আমরা কিছুতেই আল্লাহর কোনো বক্তব্যের কোনো ভুল অর্থ বা সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত নই, শুধুমাত্র এই কথাটাই বলতে চাই যে, তায়াম্মুম দ্বারা আমরা সেই যোগ্যতা লাভ করতে চাই যার দ্বারা যে কোনোভাবে (নামাযের মধ্যে শামিল হয়ে) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি এবং নামাযে শামিল হওয়া এমনই একটি কাজ যা আমাদেরকে দুনিয়ার দৈনন্দিন অন্য সমস্ত কাজ বা ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও অন্যান্য সকল কাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয় আর এই উদ্দেশ্যেই তায়াম্মুম ওযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত হয়।

আসলে আল্লাহ তায়ালাই সঠিক জানেন তায়াম্মুমের গূঢ় রহস্যটা কি। এ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কি কি নেয়ামত দান করতে চান বা কোন কোন কঠিন পথ পরিক্রমা করাতে চান তা তিনিই সঠিকভাবে অবহিত আছেন। যেহেতু তিনিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। এখানে আরেকটি শেষ কথা বাকি থেকে যায়, তা হচ্ছে মহামহিম, করুণাময় ও মহান আল্লাহর সাথে এই তায়াম্মুমের মাধ্যমেই আমরা সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাই এবং তাঁর প্রতি আদব প্রদর্শনেরও একটি উপায় লাভ করি।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে টিকে থাকার বাসনা নিয়ে আমরা শত বাধা-বিঘ্ন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নানা ওজুহাত উপেক্ষা করে পুনরায় নামাযের কাতারে এসে দাঁড়াতে এবং সমাজের বুকে নামাযের যিন্দেগী কায়েম করতে চাই, অতিক্রম করতে চাই সব বাধা ও অসুবিধাকে, যার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সুযোগ হাসিল করি। আর এ জন্যে ঘরের বাইরে মোসাফেরী হালতে ওযুর পরিবর্তে পানির অভাবে তায়াম্মুম করার সুযোগ গ্রহণ করি। আবার কখনো পানি না থাকলেও নানা সংকট বা অসুবিধার কারণে যখন পানি যা আছে তা পান করা বা অন্যান্য অপরিহার্য প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ওযুর জন্যে তা ব্যবহার করতে পারি না বলেও তায়াম্মুম করি। কখনো সফরে থাকাকালে পানি ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, সেখানেও তায়াম্মুম করার সুযোগ আমরা গ্রহণ করি এবং এই সব দান করে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আমদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছেন।

পরবর্তীতে যুদ্ধের ময়দানে, ভয়-ভীতির সময়ে তায়াম্মুম করার অনুমতি দান সম্পর্কিত যে আলোচনা আসছে তার সাথে বর্তমানের আলোচনা একান্তভাবে জড়িত বলে বুঝা যাচ্ছে। কারণ এসব কিছুর পেছনে মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে নামাযের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় খুঁজে বের করার তীব্র বাসনা। যেহেতু একজন মুসলমান কোনো অবস্থাতেই চায় না যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার যে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তা ছিন্ন হয়ে যাক। মোমেনের এই মানসিক অবস্থা তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন অসুস্থ থাকার কারণে সে বসে, শুয়ে এবং চরম অসুস্থতার কারণে যখন অংগ প্রত্যংগ সঞ্চালন করতে অক্ষম হয়ে যায়, তখনো চোখের ইশারায় নামায আদায় করে, তবুও নামায ছুটে যাক-এটা চায় না।

প্রকৃতপক্ষে এইটিই হচ্ছে মনিবের সাথে গোলামের সম্পর্ক। এ এমন এক সম্পর্ক যা কোনো সময়ে ছিন্ন হয়ে যাক মেহেরবান মনিব কিছুতেই তা চান না। যেহেতু পাক পরওয়ারদেগার বেহতর জানেন যে বান্দাহর জন্যে এ সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা কতো বেশী প্রয়োজন। আসলে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার নিজের তো দুনিয়া জাহানের কোনো কিছু থেকে কিছুই পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বান্দারা তাঁর আনুগত্য করায় তাদের নিজেদের উপকার ছাড়া তাঁর তো কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

নামাযের মধ্যে বান্দাহ যা পায় এবং যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার দ্বারা তার অনেক দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়, তার অন্তর প্রশান্ত হয়, তার অন্তরাত্মা তৃপ্তি লাভ করে, তার নিজ সত্তার মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোর রেখা ফুটে ওঠে, সে অনুভব করতে থাকে যে, সে সদা-সর্বদা আল্লাহর হেফাযতে রয়েছে, তাঁর নৈকট্য লাভ করছে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী (বা তার চাহিদা মোতাবেক) তাকে তিনি নিজেই পরিচালনা করছেন। আর এটা তো অবশ্যই সত্য কথা, তার যে কি প্রয়োজন তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো করে জানেন। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো ভালো করে জানেন যে, কিসে তার ভালো এবং কোন জিনিসে তার উপকার হবে। আর তিনিই তার যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এবারে আসুন, পরবর্তী ছোট্ট আয়াতে যে কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা বুঝার জন্যে একটু চেষ্টা করি; আর তা হচ্ছে মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পর্কিত; এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পায়খানা থেকে আসে।'

এখানে খেয়াল করার বিষয়, 'এই কাজটি করে আসে', এর বদলে বলা হয়েছে, 'অমুক জায়গা' থেকে আসে। এর দ্বারা ইংগীতে বলা হয়েছে, এই কাজ সেরে আসো। এখানে এটাও লক্ষ্যনীয় যে, কোনো ব্যক্তি সমষ্টিকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে না, 'তোমরা যদি পায়খানা থেকে আসো,' বরং বলা হচ্ছে, 'যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পায়খানা থেকে আসে।' সম্বোধনের এই ভংগীতে কী চমৎকার শালীনতা রক্ষা করা হয়েছে এবং আদব রক্ষা করতে গিয়ে ইংগীতে কথা বলারই কি সুন্দর ভংগী। এইভাবে আল্লাহ মানুষকে কথা বলার ও আদব শিক্ষা দিচ্ছেন।

আবার দেখুন, মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারীদের মধ্যকার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো,' এই স্পর্শ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, বিনম্র, লজ্জাবনতভাব ও মধুময় কোমল স্পর্শ, এ কথা দ্বারা হয়তো ইংগীতে বলতে চাওয়া হয়েছে বাস্তব কাজে উপনীত হওয়ার পূর্বে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ককে মধুময় করে তোলার আনুষাংগিক আচরণসমূহ অথবা মূল কাজটিও বোঝানো হতে পারে। ব্যাখ্যা যাই হোক না কেনো; এখানে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে রব্বুল আলামীন শালীনতাপূর্ণ ভাষা ও বর্ণনাভংগী ব্যবহার করে, পরোক্ষভাবে মানুষকে তিনি আদব-কায়দা, শালীনতা ও লজ্জা শরমের শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা এসবের প্রতিফলন ঘটাতে পারে এবং তাদের মধ্যে লজ্জানুভূতি ও শালীন আচরণ গড়ে ওঠে।

আল্লাহ তায়ালা নিজে শালীন ও পবিত্র বর্ণনা দান করে জানাচ্ছেন যে, তিনি পবিত্র এবং পবিত্র ব্যক্তিরাই উত্তম ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং প্রিয়, অপরদিকে সৃষ্টিকর্তা মানব প্রকৃতিকে যে স্বভাবজাত লজ্জাশরম দান করেছেন তাতে অশালীন কথা, কাজ ও ব্যবহার সর্বদাই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য।

এসব কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা চান মানুষের মধ্যে পবিত্র অনুভূতি জাগ্রত হোক ও পবিত্র সেইসব কাজ গড়ে উঠুক যা সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে প্রিয় এবং সকল সাধারণ মানুষের জন্যে উপকারী।

পাক পবিত্র আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মানুষের মধ্য সব অনুভূতি বিরাজ করে তা তারই সৃষ্টি। তিনি তা সবই জানেন। তিনি চান, তাঁর দেয়া এ অনুভূতিকে তাঁরই দেয়া বিধান অনুযায়ী মানুষ ব্যবহার করুক। আর তারই মধ্যে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা নিহিত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن
مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا
بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ
نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আসমানী) গ্রন্থের (সামান্য) একটা অংশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা গোমরাহীর পথই কিনে নিচ্ছে, তারা তো চায় তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। ৪৫. তোমাদের দুশমনদের আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন; অভিভাবক হিসেবে (যেমন) আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট, তেমনি সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। ৪৬. ইহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা (রসূলের) কথাগুলো মূল (অর্থের) স্থান থেকে সরিয়ে (বিকৃত করে) দেয় এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং (সাথে সাথে) অমান্যও করলাম, (আবার বলে) আমাদের কথা শুনুন, (আসলে ইসলামী) জীবন বিধানে অপবাদদানের উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে এরা বলে (হে নবী), আপনি শুনুন (সাথে সাথেই বলে), আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক, (অথচ এসব কথা না বলে) তারা যদি বলতো (হে নবী), আমরা (আপনার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম এবং আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে এ বিষয়টা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো, তাই হতো (বরং) তাদের জন্যে সংগত, কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর (তাদের) সামান্য কিছু লোকই মাত্র ঈমান এনে থাকে। ৪৭. হে মানুষেরা, যাদের কেতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো, যা আমি (মোহাম্মদের ওপর) নাযিল করেছি (এ হচ্ছে এমন এক কেতাব), যা তোমাদের কাছে মজুদ (পূর্ববর্তী) কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (ঈমান আনো) সে সময় আসার আগে, যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারাসমূহ বিকৃত করে তাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, অথবা (ইহুদীদের পবিত্র দিন) শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি আমি যেভাবে অভিশাপ নাযিল করেছি (তেমনি কোনো বড়ো বিপর্যয় আসার আগেই ঈমান আনো), আর আল্লাহ তায়ালার হুকুম, সে তো অবধারিত!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انْظُرْ كَيْفَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ
لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

৪৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানালো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো এবং একটা মহাপাপে (নিজেকে) জড়ালো! ৪৯. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি যারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে, অথচ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন এবং (সেদিন) তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। ৫০. (এদের প্রতি) তাকিয়ে দেখো কিভাবে এরা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই তো (এদের জন্যে) যথেষ্ট!

রুকু ৮

৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কেতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (তারা আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমূলক যাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা মাবুদের ওপর ঈমান আনতে শুরু করলো এবং এ কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো সঠিক পথের ওপর রয়েছে! ৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) মানুষগুলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে যে), তাদের ভাগে রাজত্ব (ও প্রাচুর্য সংক্রান্ত কিছু বরাদ্দ করা) আছে? (যদি সত্যি সত্যিই তেমন কিছু এদের দেয়া হতো) তাহলে এরা তো খেজুর পাতার একটি ঝিল্লিও কাউকে দিতে চাইতো না।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ
وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৪. অথবা এরা কি অন্যান্য মানব সন্তানদের ব্যাপারে হিংসা (বিদ্বেষ) পোষণ করে, যাদের আল্লাহ্ তায়ালা নিজস্ব ভান্ডার থেকে (জ্ঞান, কৌশল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা) দান করেছেন, (অথচ) আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (ও সেই গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, (এর সাথে) আমি তাদের (এক বিশাল পরিমাণ) রাজত্বও দান করেছিলাম। ৫৫. অতপর তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোকই তার ওপর ঈমান এনেছে, আবার কেউ কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এদের (পুড়িয়ে দেয়ার) জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট! ৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের আমি অচিরেই জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, অতপর (পুড়ে যখন) তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন আমি তার বদলে নতুন চামড়া বানিয়ে দেবো, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী। ৫৭. যারা (আমার) আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা (থাকবে) চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পূতপবিত্র (সংগী) ও সংগিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

তাফসীর

আয়াত ৪৪-৫৭

আলোচ্য এই পাঠে প্রথম দেখা যাবে জাহেলিয়াতের ধারক বাহক, বিশেষ করে আহলে কেতাবদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষের বিবরণ এবং তার মোকাবেলায় কোরআনে করীমের দিকনির্দেশনা। ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত এই সংঘর্ষের বিবরণ আমরা পেয়েছি। সেই একই প্রকারের বিরোধিতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা বারবার ঘটেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে বাকারার শুরুতে, আলে ইমরানের শুরুতে এবং আলোচ্য সূরার বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই।

এ দারসের সূচনা হচ্ছে বহিশত্রুর সাথে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়ে। এ সময়ে মুসলিম জামায়াতের সাথে মদীনার আশেপাশের গোত্রসমূহ বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু এগুলো

তখনো কোনো অস্ত্র যুদ্ধের পর্যায়ে পৌছেনি। ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরার মধ্যে আসা বিবরণে জানা যায়, অমুসলিমদের সাথে মুসলিম সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও নৈতিক কার্যক্রমের পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় সেখানে এক তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির লক্ষ্য ছিলো জাহেলী যুগের বিভিন্ন বদভ্যাস ও রীতিনীতিকে উৎখাত করে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পুরাতন সভ্যতার মূলোৎপাটন করে নতুন ইসলামী সমাজের পত্তন ঘটানো। এ কাজটি মোটেই কোনো সহজ ব্যাপার ছিলো না। বিশেষ করে মদীনায় দীর্ঘকাল ধরে যে সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিলো তার শেকড় ছিলো অনেক গভীরে। সে শেকড় উৎপাটন করার লক্ষ্যে ইসলাম যখন কাজ শুরু করে তখন মুসলিম সমাজের দুশমনদের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ মতপার্থক্য, তর্ক বিতর্ক, সংঘাত এগুলো ছিলো বাস্তব অস্ত্র সংগ্রামের সূচনা। অবশ্য তার সাথে সাথেই শত্রুর আক্রমণের মোকাবেলায় যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ শুরু। এইভাবে ইসলামী ইমারতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং নতুন ইসলামী ব্যবস্থার প্রাসাদ গড়ে উঠতে শুরু করে। তারপর চারপাশের বিরোধী সকল সমাজ ব্যবস্থার ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে এ কাজ নিরন্তর গতিতে এগুতে থাকে।

সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলে ইমরানে বর্ণিত আলোচনায় অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে হলেও ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন প্রক্রিয়ার চমৎকার দৃশ্য আমরা দেখেছি। সমাজের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, পারস্পরিক ব্যবহার ও আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও নিয়ম কানুন, লেনদেন ও সমাজ সামাজিকতা এসব কিছু পার্শ্বস্থিত বিরোধীদেরকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, প্রভাবিত করে সেই সকল গোত্রকেও যারা সে বিরোধীদের সাথে সহযোগিতা করতো, তাদেরকে ষড়যন্ত্র করা ও মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া থেকে নিরস্ত করে রাখতো। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে সকল বিরোধী মহলের মোকাবেলায় নিশ্চিন্ত মনে ও জাগ্রত চোখে মযবুত হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে উৎসাহিত করে, তাদের সংকল্পকে সুসংহত করে, যাতে করে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও শত্রুকূলের ভয়াল মূর্তি জেনে-বুঝেই তার মোকাবেলায় তারা অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এই একই ধরনের অবস্থা ও তার মোকাবেলায় প্রেরণা দেয়ার কথা এ সূরাতেও আমরা দেখতে পাই।

এ সময় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কাজ করার জন্যে এবং সকল অবস্থার মোকাবেলায় মুসলমানদের মনমগয ও চিন্তা চেতনাকে প্রস্তুত করার জন্যে কোরআনে কারীম কাজ করেছে। বিশ্বাপালকের ওপর মযবুত চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজ নবতর বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দুনিয়ায় নিজেদের মূল্যবোধ পরিমাপ করতে সক্ষম হয়, নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা দৃঢ়তার সাথে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায়, তারা তাদের প্রকৃতি থেকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় আবর্জনার স্তূপ ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেয়, তাদের অন্তর ও গোটা সমাজ দেহ থেকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় কলুষ কালিমা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে এবং সেথায় ঈমানী আলোর নূরাণী মশাল জ্বালিয়ে দেয়, সেখানে ইসলামী সমাজের স্নিগ্ধ গুলশানকে প্রতিষ্ঠিত করে– যার সুবাসে জাহেলী আরব ও তার আশপাশের সব মেকী রংমহল সুরভিত হয়; কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকা বাতিল ব্যবস্থা ও তার ধারক বাহকদের পক্ষে, তাদের কায়েমী স্বার্থজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা এতো সহজ ব্যাপার ছিলো না, কিছুতেই তারা তাদের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের আসন ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলো না। তাই তারা ইসলামী সভ্যতার এই অনিরুদ্ধ জোয়ারকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে রুখে দাঁড়ালো, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দামামা ভেতরে ও

বাইরে বেজে উঠলো। এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে একে একে মদীনার ভেতরে ও বাইরের ইহুদী মোনাফেক ও মোশরেকরা জড়িয়ে পড়লো। এ ছিলো মোমেনদের অস্তিত্বের সংগ্রাম, প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম, মদীনার বুকে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে সংহত করার সংগ্রাম, এ সংগ্রাম ধীরে ধীরে আকীদা বিশ্বাস, নীতি নৈতিকতা, সমাজ সামাজিকতা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত করার ব্যাপকতার ক্ষেত্রে সমানভাবে পরিব্যপ্ত হলো।

আল্লাহর যমীনে তাঁরই প্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ইসলামী সমাজ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কিছুতেই অন্য কারো প্রাধান্য মেনে নিতে পারে না, তাই জাহেলিয়াতের কাছে ও দূর পরিবেশের সবখানে ইসলাম সমাজ সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো সকল সংগ্রামের বড়ো সংগ্রাম। কারণ মদীনার মূল ভূমিতে আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক সর্ব পর্যায়ে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিলো। সকলের ওপর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এমতাবস্থায়, সামগ্রিকভাবে তাদের ওপর সামরিক, অর্থনৈতিক অথবা বস্তুগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোরআনের শিক্ষার আলোকে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থার সঠিক প্রাধান্য গড়ে তোলাই ছিলো প্রথম কাজ।

বরং প্রকৃত সত্য হচ্ছে সামরিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুশক্তির দিক দিয়ে ইসলামী শক্তি কোনো কালে এবং কোনো দেশে গুরুত্বপূর্ণ থাকেনি। বরাবর এটাই দেখা গেছে যে, ইসলামী বাহিনীর তুলনায় বিরোধীদের সামরিক বাহিনী সংখ্যায় ও সরঞ্জামে সব সময়েই ছিলো বেশী। তাদের প্রস্তুতি, সাজ সরঞ্জাম ও সম্পদ এবং বস্তুগত প্রস্তুতিও সদা সর্বদা বেশীই দেখা গেছে। আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরেও ইসলামের বড়ো বড়ো বিজয় যখন হয়েছে তখনো এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আসলে যে বিষয়ে ইসলাম কর্তৃত্ব করেছে তা হচ্ছে আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ। এরপর ইসলাম কর্তৃত্ব করেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কারো কোনো মনগড়া নীতির ভিত্তিতে ইসলাম প্রাধান্য প্রদর্শন করেনি, বরং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থাতেই ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী সবার ওপর ইসলামের আইন-কানুন চালু করা হয়েছে।

এই প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলাম যুক্তিপূর্ণ একটি নীতির ভিত্তিতে সকল জাহেলী রীতি-নীতিকে উৎখাত করার সংগ্রাম করেছে এবং জাহেলী যুগে প্রচলিত সবকিছুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিপ্লব এনেছে। তাদের আত্মিক সত্ত্বাকে পরিবর্তন করে ঢেলে সাজিয়েছে, তাদের নৈতিক মানদন্ডকে ও চেতনাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে- তবেই গিয়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বস্তরে তাদের পরিচালনার যোগ্যতা গৃহীত হয়েছে, আর এইভাবে ইসলাম জাহেলিয়াতের অমানিশাকে অপসারিত করেছে। জাহেলিয়াতের মধ্যে গড়ে ওঠা যাবতীয় অপশক্তির পতন হয়েছে। প্রথম আরবভূমিতে, এরপর পতন এসেছে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন বিশাল দুটি সাম্রাজ্য কায়সার এর রোম এবং কেসরার পারস্যে, তারপর অবশিষ্ট অন্যান্য স্থানে। কখনো সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র প্রয়োগে, আর কখনো বা আল্লাহর কেতাব ও কেতাবধারীদের উদাত্ত আহবানে।

এই প্রাধান্য বিস্তারকল্পে কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহর রাজ্যে তাঁর বান্দাদেরকে কায়েমী স্বার্থবিরোধীদের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতে দেয়া যেতে পারে না। তাই এ শক্তি প্রয়োগ মাঝে মাঝে জরুরী হয়ে পড়ে, আর এটা যদি না করা হতো তাহলে সেই অসাধারণ ও অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত করা যেতো না যার কোনো নযির পৃথিবী আজও দেখাতে পারেনি। প্রাচীন ইতিহাসের তাতারীদের বিখ্যাত ধ্বংসাভিযান ও আধুনিককালে হিটলারের দিগ্বিজয়ের অভিযানের মতো আরো বহু অভিযান দুনিয়ায় এসেছে, কিন্তু ইসলামী

বিপ্লবের মতো এমন সুমহান বিপ্লব আর কেউ কোনো দিন আনতে পারেনি। এটা শুধু রক্তক্ষয়ী, ধ্বংসকর ও নিষ্ঠুর সামরিক অভিযানই ছিলো না, বরং এ ছিলো মানুষের মনমগযে বিপ্লব সৃষ্টিকারী, নৈতিক, সৃষ্টিগত এবং প্রেম ও কল্যাণকারিতার আবেগ আপ্লুতকারী অভিযান। এতে কোনো জবরদস্তী ছিলো না, কারো অনুভূতির ওপর অযৌক্তিক কোনো চাপ বা বল প্রয়োগ ছিলো না, এতে কারো আকীদা বিশ্বাসকে নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিতও করা হয়নি, কারো ভাষাকে অবমূল্যায়ন করা হয়নি, কারো অভ্যাস ও রীতিনীতিকে দলিত মথিত করা হয়নি; বরং মহব্বতের সাথে ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাই করে সুন্দরতম জিনিসগুলোকে গ্রহণ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষের ঘুমন্ত বিবেক জেগে উঠতে পারে এবং সহজ ও স্বাভাবিক এই পথকে মানুষ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। এটা এমন এক বিপ্লব যা কোনো সামরিক অভিযান দ্বারা অতীতের কোনো কালে সংঘটিত করা সম্ভব হয়নি, আর ভবিষ্যতেও কোনোদিন করা হবে না।

এটা ছিলো মানবতার পরিপূর্ণ প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব- উচ্চাভিলাষী কোনো ব্যক্তির কল্পনা নয়। এটা ছিলো মহামূল্যবান মানবীয় বৈশিষ্ট্যেরই বিজয়, মানবতা প্রতিষ্ঠার বিজয়। এটা ছিলো মানবতার জন্যে নতুনভাবে জন্ম লাভ, যার সন্ধান ইতিপূর্বে মানুষ কখনো পায়নি। এরপর দিকে দিকে ইসলামের এই দিগ্বিজয়ী আলো এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, সব কিছুর রং-ই বদলে গেলো এবং এ আলো জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত সব কিছুকেই বদলে দিলো। এক বিশেষ (স্বার্থপর) জনগোষ্ঠী এই প্রশান্ত আলোতে অবগাহন করা থেকে দূরে সরে রইলো। এরা পেছনে পড়ে থাকা সেইসব জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের সাথে থাকা পছন্দ করলো যারা যুগ যুগ ধরে সে অঞ্চলে বাস করে আসছিলো, যেমন মিসরে অবস্থিত ফেরাউনের বংশধর, ব্যবিলনের অধিবাসী ও ইরাকে বসবাসরত আমীরীয় জনগোষ্ঠী। আরো ছিলো সিরিয়ায় অবস্থিত ফিনিকী এবং সুরীয়ানীরা। মানব সমাজে একেবারে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জাহেলিয়াতের শেকড় গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো। সকল যুগেই মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমনি মনোভাব বদ্ধমূল ছিলো।

ইসলামের বিজয়াভিযান পর্যায়ে একটি আশ্চর্য বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করার মতো। ইসলামী ভাষা ও তার প্রতিষ্ঠান সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব দেশে, যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিলো। অর্থাৎ যখনই কোনো এলাকার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তারা অন্তর দিয়ে আরবী ভাষাকেই ইসলামী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের যুক্তি তর্ক, পাঠ্য ও গবেষণার ভাষা হিসেবে। এর কারণ আমার মনে হয়, আরবী ভাষার এই চমক ও গ্রহণযোগ্যতা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস এবং তার প্রতিষ্ঠা থেকেও বিজিত এলাকাসমূহের জনগণের অন্তরে অনেক বেশী রেখাপাত করেছে। আরবীর প্রতি এই আকর্ষণকে অত্যাশ্চার্য একটি ঘটনাও বলা যায়। অবশ্য এটাও সত্য যে, এ আকর্ষণ আরবী ভাষার নিজস্ব কোনো শক্তি বা কৃতিত্বের কারণে পয়দা হয়নি, কারণ আরবী ভাষা তো পূর্বেও ছিলো, তখন তো দুনিয়ার কোনো অংশ এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। আকৃষ্ট হয়েছে তখন, যখন ইসলামের আগমন ঘটেছে। আর সেই সময় থেকেই ইসলামের বাহন হওয়ার কারণে এ ভাষা ইসলামী ভাষা হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। সুতরাং নিসন্দেহে এটা বলা যায়, এ ভাষার জনপ্রিয়তা শুধু ইসলামের কারণেই।

এখানে একটি রহস্য বা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় প্রণিধানযোগ্য; আর তা হচ্ছে ইসলামের আগমনের পর বিজিত সকল দেশে মানুষ যে ভাষার মাধ্যমে ইসলামের অপূর্ব মহিমা পেয়েছে তা মূল আরবী ভাষার লালিত্যের কারণে নয়, বরং আরবীর নতুন সংস্করণের কারণে যা সমৃদ্ধ হয়েছে-ইসলামের ভাষা হিসেবে। ইসলামী ভাষা হিসেবে তাই তা সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।

এই ভাষা দিয়েই বিজিত সকল দেশে শিক্ষা বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ কল্যাণকারিতা পাওয়া গেছে এবং শিক্ষা ও কৃষ্টি বিষয়ক কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বিজিত দেশসমূহ ও অঞ্চলে মাতৃভাষার বাইরের এ ভাষাকে নবাগত বা অক্ষম বলে প্রতিভাত হয়নি; বরং বাস্তবে এই ভাষাটিই আসল মাতৃভাষা হিসেবে সবখানে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে প্রথমত এ ভাষা সকল মত ও পথ ব্যক্ত করার ব্যাপারে এমন ব্যাপক ও সুন্দর ভূমিকা রেখেছে যা ইতিপূর্ব অন্য কোনো ভাষা দ্বারাই তা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, এ ভাষা ও তার অবদান মানুষের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যশীল, যেহেতু এ ভাষা বরাবর মানব প্রকৃতি নিয়েই চর্চা করে এসেছে এবং এর মধ্যে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি ও তার সকল তৎপরতার মধ্যে পরস্পর গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আরবী ভাষা যেমন প্রাচীন তেমনি এর কৃষ্টিও বহু পুরাতন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আরবী ভাষার এ গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রাণ মাতানো মাধুর্য ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও মনমুগ্ধকর ধ্যান ধারণার কারণেই গড়ে উঠেছে এবং যেহেতু ইসলামের ভিত্তিমূলে আত্মার অনিবার্য খোরাক রয়েছে, যুক্তিসংগত ব্যবহার ও কাজ, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক বিধি বিধানও রয়েছে যা ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে সংক্ষেপে অথচ আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের ভাষা হিসেবে এ ভাষার শব্দকোষ যেমন ব্যাপক, তেমনি তা গভীর অর্থবহ ও প্রাণবন্ত।

এ ভাষা যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী, তেমনি এ ভাষা একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী বাহিনীও। এর মোকাবেলায় দুনিয়ার কোনো শক্তিই বেশীদিন দাঁড়াতে পারেনি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে ইসলামী ভাষা হিসেবে আরবীকে এইভাবে মূল্যায়ন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।

আসলে ইসলামী ভাষা হিসেবে আরবীর ওপর আলোচনা করতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। 'ফী যিলালির কোরআন'-এর আলোচনা প্রসংগে আমরা এতোটুকুই ইংগিত করাই এখানে যথেষ্ট মনে করছি।

আলোচ্য সূরার এই পাঠ থেকেই শুরু হচ্ছে (সশস্ত্র) যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা। এটা মাদানী যিন্দেগীতে ইসলামী জামায়াতের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। এ দারসে বর্ণিত বিষয় হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা। নবাগত এ দ্বীনের বিরোধিতায় তাদের ভূমিকার কথা আগেই এসেছে। এর পরবর্তী দারসে আলোচনা এসেছে মুসলিম জামায়াতের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে, তাদের জীবন পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে, ইসলামের সীমারেখা এবং ঈমানের সেইসব শর্ত সম্পর্কে যা তাদেরকে অন্য জাতির জীবন পদ্ধতি, রীতিনীতি ও জীবন যাপন প্রণালী থেকে ভিন্ন এক জাতিতে পরিণত করেছে। এর পরবর্তী দারসে এই মুসলিম দলের পক্ষ থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার জন্যে দাওয়াত দান করার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। তারপরই মোনাফেকদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো বর্ণনা করে তাদের সামনে তাদের অতি কদর্য একটি চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যায়, জীবন মৃত্যু এবং যে তাক্বদীরের দ্বারা এসব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় সে সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ভাগ্য সম্পর্কিত এ আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম জামায়াতকে সজ্ঞানে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে শেখানো এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে শত্রুর মোকাবেলায় বীরত্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। অবশ্য পরবর্তী দারসে মোনাফেকদের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করে সেগুলো থেকে পরহেয করার জন্যে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। শত্রুদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্যে মুসলমানদের সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

এ অংশে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা কোনো কাজের ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হয়ে যায়, অথবা কারো কথা প্রতিহত করতে গিয়ে যেন তারা দ্বিধাবিভক্ত না হয়ে পড়ে। এরপর ইসলামের অগ্রযাত্রা দমন করার জন্যে মদীনার আশেপাশের কবিলাগুলোর পক্ষ থেকে যেসব ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। অর্থাৎ যখনই নবগঠিত এই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে আইন কানুন নাযিল হতে শুরু করেছে তখনই মদীনা ও আশপাশের কবিলাগুলো যেসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, এ অধ্যায়ে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সামনের দারসে আমরা দেখতে পাবো, প্রতিটি ইহুদীর সাথে লেনদেন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম চমৎকার নযীর স্থাপন করেছে! এ দারসে আমরা শেরেক ও মোশরেকদের সাথে ব্যবহারের বিভিন্ন দিকও দেখতে পাবো। দেখতে পাবো কেমন করে আরবের বুকে অবস্থিত মোশরেকদের শেরেকের সেই সকল বুনিয়াদকে আঘাত করা হয়েছে এবং তাদের সেই ভ্রান্ত মতবাদকে দাবিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ওপর মোশরেকদের সমাজ দাঁড়িয়ে ছিলো। তবে এ কথাও জানা যায় যে, ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগঠন মযবুত হওয়ার কারণে মদীনার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সূরাটির শুরুতে ইতিমধ্যে যে আলোচনা এসেছে তাতে দেখা যায় সমাজ সংগঠনে ইসলামের ভূমিকা অনবদ্য। এরপর আলোচ্য অধ্যায়ের শেষ দারসে যেসব আলোচনা এসেছে তাতে মোনাফেক ও নেফাক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মোনাফেকদেরকে আগুনের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা হবে যেখানে আগুনের গভীরতা ও তীব্রতা হবে সব থেকে বেশী।

এ পর্যন্ত বলে আসা সকল ইশারা ইংগীত থেকে আমরা তৎকালীন মুসলিম দলের মধ্যকার সাংঘর্ষিক বিভিন্ন অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ কিছুটা আঁচ করতে পারি। এতে জানা যায়, প্রথম দিকে গড়ে ওঠা ইসলামী সমাজের ভেতর ও বাইরের জীবনে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের মধ্যেও তাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে পরস্পরের মধ্যে যেমন মিল মহব্বত একাত্ম হয়ে কাজ করার প্রেরণা বিরাজ করছে তেমনি ছিলো তাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদও। আসলে অনুরূপ সংঘর্ষ আজো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ইহুদীদের তাওরাত বিকৃতকরণ

আলোচ্য অধ্যায়ের এ অংশে আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সম্পর্কে যেসব বিষয় জানা যায় তার মধ্যে সব থেকে যে জিনিসটি বিস্ময় আনে তা হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কখনো রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, আর কখনো বা করা হয়েছে তাদেরকে যারা ইহুদীদের সেসব অপ্রিয় ব্যবহারগুলো দেখে বা জানে।

'তুমি কি দেখোনি সে সকল ব্যক্তিকে যাদেরকে কেতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে, (সে অংশ থেকে সঠিক শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে) তারা গোমরাহীকে খরীদ করে নেয় এবং তারা চায় যেন তোমরা সঠিক পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

পরিণামে এ পথ পরিত্যাগ করে তোমরা দূরে সরে চলে যাও।

'কেতাবের কিছু অংশ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে হেদায়াতের পথে চালানোর জন্যে মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা 'তাওরাত' দিয়েছিলেন, যাতে করে পূর্বে যে গোমরাহীতে তারা পড়েছিলো তা পরিত্যাগ করে হেদায়াতের পথে চলতে পারে, কিন্তু তারা সে কেতাব পরিত্যাগ করে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেলো এবং এখনো দূরে সরেই থাকলো এবং তার পরিবর্তে গোমরাহীর পথ খরীদ করে নিলো। এই খরীদ করার কথা বলে বুঝানো হচ্ছে যে, তারা

জেনে বুঝে ও ইচ্ছা করেই সঠিক পথের বদলে মন্দ ও ভুল পথ গ্রহণ করেছে। হেদায়াতের আলো তাদের হাতে থাকা সত্তেও তারা তা পরিত্যাগ করে গোমরাহীর অন্ধকারকে গ্রহণ করছে, যেন তারা জেনে-বুঝে ও ইচ্ছা করেই মন্দের বেসাতি করছে; না জানার কারণে, অথবা না বুঝে অথবা ভুল করে মন্দ ও অকল্যাণকর পথ গ্রহণ করছে– তা নয়; আর এটাই হচ্ছে বড়ো অদ্ভুত ও মূর্খতার কাজ। এ ধরনের পদক্ষেপে রয়েছে যেমন বিস্ময়, তেমনি রয়েছে তাদের অনাকাংখিত ক্ষতি।

তারা এই অদ্ভুত ও মূর্খতাপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে শুধু যে নিজেরাই টিকে থাকতে চায় তা নয়, এ পথ গ্রহণ করে নিজেরা তো বটেই বরং সঠিক পথের যাত্রীদেরকেও তারা ভুল পথে চালাতে চায়, চায় বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এসব পথ উপায়ের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলে ইমরানের মধ্যে বিশদ আলোচনা এসেছে। একইভাবে আলোচ্য সূরাতেও এ বিষয়ের ওপর একটি অংশের আলোচনা আসবে। ভালো ও কল্যাণকর পথের বিনিময়ে তারা যে মন্দ পথ খরীদ করে নিচ্ছে তা শুধু নিজেদের জন্যে গ্রহণ করেই তারা খুশী নয়, বরং তাদের আশপাশ থেকে সঠিক পথের নাম নিশানা পর্যন্তও তারা মুছে ফেলতে চায়, যাতে করে সেখানে কোনো সঠিক পথ বা সেই পথের পথিকও না থাকে!

এ প্রসংগে পূর্বেকার আলোচনার মাধ্যমে ইহুদীদের এসব অপরাধ, ত্রুটি এবং ষড়যন্ত্রপূর্ণ পদক্ষেপের বর্ণনা এই জন্যে দেয়া হচ্ছে যাতে মোমেনরা ওদের ধোঁকাবাজি থেকে সতর্ক হয়ে যায়। উহ, কী ভীষণ ষড়যন্ত্র! একাধিকবার ইহুদীদের এসব চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলতে চাইছেন যেন মোমেনরা তাদের ধোঁকাবাজির ধূম্রজালে পা না রাখে। যারা হেদায়াত লাভ করেছে, তাদেরকেই ওরা গোমরাহ করতে চায়। মোমেনরা এই হেদায়াত লাভ করায় নিজেরা সম্মানিত বোধ করতো এবং তারা জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয় অবস্থাকে জানতো বলে এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটাও তারা বুঝতো, আর সেই কারণেই যারা তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করেছিলো তাদেরকে ওরা শত্রু জ্ঞান করতো। তারা ফেলে আসা জীবনের অবস্থাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে মহব্বতের সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। যেহেতু তাদেরকে ওরা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলো এজন্যে কমবেশী সবাই ইসলাম বিরোধীদেরকে অপছন্দ করতো। এই অবস্থাকে সামনে রেখেই কোরআনে পাক তাদের সম্পর্কে বলছে, 'এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের বুকের মধ্যে যে অনুভূতি বিরাজ করছে তার জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলছেন।'

আর তখন থেকেই ইহুদীদের এই হীন প্রচেষ্টা চলে আসছে এবং তা প্রতিহত করার জন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে, ইহুদীরা মুসলমানদের চিরশত্রু। আল্লাহর পরিচালনায় এবং সাহায্যে গড়ে ওঠা মুসলিম উম্মাহকে তারা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না, তাদের সকল প্রচেষ্টার মূল কথা এটাই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের দুশমনদেরকে ভালো করেই জানেন এবং তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

এইভাবে মদীনায় অবস্থিত মুসলিম জামায়াত ও ইহুদীদের মধ্যকার শত্রুতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হচ্ছে এবং ছাফ ছাফ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মুসলমানদের চির শত্রু। তাদের জীবন যাপন প্রণালী ও চলার পথগুলোকেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা বা অতর্কিত হামলা করার কাজ সাধারণভাবে আহলে কেতাবদের পক্ষ থেকে হলেও উভয় অর্থে মদীনার ইহুদীদেরকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এতোটুকু অর্থ

নেয়াই এ প্রসংগে যথেষ্ট নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে ইহুদীদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের থেকে চরম সাবধানতা অবলম্বন করতে

বলা হয়েছে, পরিষ্কারভাবে তাদের অবস্থা ও বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাদের চরম বেয়াদবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারছি যে, ইহুদীদের এইসব চক্রান্তের সূচনা ও বাড়াবাড়ি হিজরতের পর পরবর্তী কয়েক বছর ধরে সমানে চলতে থাকে, যতক্ষণ না তাদের শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাদের তৎপরতা উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'যারা ইহুদী হয়ে গেছে, (নিজেদেরকে ইহুদী বলে দাবী করেছে) (১৪) তারা (তাওরাতের শব্দগুলোকে নিজ নিজ জায়গা থেকে অন্যত্র স্থাপন করে এবং বলে, হাঁ আমরা শুনলাম এবং অমান্যও করলাম। আসলে তারা (পরস্পর) বলে, না শুনার মতোই শোনো এবং তারা (রসূল (স.) সম্পর্কে) বলতো 'রায়েনা', জিহবাকে একটু উল্টিয়ে বলতো'

যাতে শব্দ বেরুতে 'রাঈনা' (আমাদের রাখাল এবং এইভাবে বলে তারা বুঝাতে চাইতো সে তা 'আমাদের রাখাল', সে আবার কী জীবন ব্যবস্থা পেশ করবে?' এইভাবে বলে তারা মোহাম্মদ (স.)-কে দোষারোপ করতো।

তাদের এই জিহবা উল্টিয়ে উচ্চারণ করা এবং আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে আল্লাহর সাথে চরম বেয়াদবী করা ছিলো উদ্দেশ্যমূলক। আরো কার্যকর কথা হচ্ছে, রসূল (স.) সম্পর্কে তাওরাতে উল্লেখিত কথাগুলো প্রকাশ পেলে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না বলে ইহুদী আলেমরা তাওরাতের শব্দগুলোকে এধার ওধার করে লিখে তাদের সাধারণ মানুষের কাছে পেশ করতো। তারা আরো মনে করতো তাদের এই আচরণ তাওরাত সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখিত কথাগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে দেবে। কোরআন ও তাওরাতের উৎপত্তি যে একই মহান সত্ত্বা থেকে সে কথাকেও তারা এইভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করতো, এমনকি তারা ভাবতো যে, এই পন্থায় মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়তকেও ভুল প্রমাণ করা যাবে। নিজেদের কেতাব তাওরাতকে পরিবর্তন করার দুঃসাহস করার পেছনে একটিমাত্র কারণ ছিলো, আর তা হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে নিজেদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ। যে উদ্দেশ্যে তাওরাত প্রেরিত হয়েছিলো সেই কেতাবের শব্দগুলোকে হেরফের করে তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার এই অপপ্রয়াস ছিলো জনগণকে তাদের সঠিক 'দ্বীন' থেকে ফিরিয়ে দেয়ার নামান্তর এবং প্রত্যেক যামানার ক্ষমতাধরদের অসৎ ইচ্ছা চরিতার্থ করার মানসে জনগণকে বিভ্রান্ত করাই ছিলো এ ধরনের আচরণের মূল উদ্দেশ্য। এটাকে তারা একটা কৌশল এবং চমৎকার শিল্পকর্ম মনে করতো। যে ইহুদী ব্যক্তি এ কাজ করতো তাকে বড়োই নিপুণ ও দক্ষ মনে করা হতো। যদিও আজ আমাদের এই যামানায় কোনো ব্যক্তি এ কাজ করলে তাকে তাহরীফকারী বা কেতাব পরিবর্তনকারী বলে অভিহিত হবে, সাধারণভাবে ধিক্কার দেয়া হবে। কী জঘন্য ইহুদী চরিত্র! সরাসরি আল্লাহর সাথেই বেয়াদবী!

---

(১৪) য়াহুদাহ নামে এক গোত্র ছিলো যারা দাবী করতো তারাই তাওরাতের আসল ধারক ও বাহক। সেই গোত্রের বংশধর হওয়ার দাবীদাররা নিজেদেরকে ইহুদী বলে দাবী করতো।—সম্পাদক

রসূল (স.)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ

এরপর রসূল (স.)-এর থেকে মুখ ফেরানো ও তাঁর সাথে সরাসরি বেয়াদবী করার খবরও জানা যায়। ইহুদীরা তাঁকে সরাসরি বলতো, মোহাম্মদ, শোনো, তুমি যা বলছো আমরা তা শুনলাম, তবে আমরা তা মানলাম না! আমরা তা বিশ্বাসও করবো না, তোমার অনুসরণও করবো না এবং তোমার আনুগত্যও করবো না। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে আয়াতগুলো মাদানী যেন্দেগীর একেবারে গোড়ার দিকে নাযিল হয়েছিলো, যখন ইসলামী শক্তি সংহত হতে পারেনি এবং ইহুদীদের এতোটা সাহস করা সম্ভব হয়েছিলো যে তারা নবী (স.)-কে মুখের ওপর দর্পভরে, বেয়াদবীর সাথে ও কদর্যভাবে বলতো, 'হাঁ, ওর কথা না শোনার মতো শোনো। আর ওতো আমাদের রাখাল (যখন একটু ঘুরিয়ে 'রায়েনা'র স্থলে 'রাঈনা' বলা হয় তখন) এ অর্থ হয় অবশ্য, বাহ্যিক শব্দে তারা বলতো, শোনো, কিন্তু যা শুনবে তা না শোনার মতোই শুনবে, কথার ভাবে একটু আদবের ছাঁট আছে যেহেতু 'রায়েনা'র শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আমাদের দিকে একটু দেখো, আমাদের অবস্থা বিবেচনায় আমাদের প্রতি একটু রেয়ায়েত করো, অথবা আমরা যে কি অবস্থায় জীবন যাপন করছি তার দিকেও একটু খেয়াল করো; কারণ আমরাও আহলে কেতাব। সাধারণ মোশরেকদের মতো তো আমরা নই, যার জন্যে মোশরেকদের মতো আমাদেরকেও একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দিতে হবে।

মাথা নেড়ে নেড়ে নিষেধ করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে; মুখে তারা বলতো, 'শোনো কিন্তু মাথার ইশারায় বলতো শুনো না বা না শোনার মতোই শোনো। ভাবখানা এই যে, আরে এতো একটা পাগল মানুষ, ওর কথা কী শুন্‌বে? ঠিক আছে, বলছে যখন তখন না শোনার মতোই একটু শোনো, ততো খেয়াল করার দরকার কি, তার কথা তো আর পালন করতে যাচ্ছো না (লাঞ্ছিত করুন আল্লাহ তায়ালা সে হতভাগাদেরকে)। আর 'রায়িনা' শব্দ দ্বারা বুঝাতে চাইতো, আনমনাভাবে শোনো, যেহেতু 'রাউনাতুন'-এর অর্থ আনমনাভাব।

এমনিভাবে তাদের সে কথায় অহংকার ও চরম বেয়াদবী প্রকাশ পেতো, আর মাথা নেড়ে মানা করায় উন্নাসিকতা প্রকাশ পেতো। এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ খাসলাৎ তাদের মধ্যে ছিলো বলেই তো তারা তাদের কেতাবের শব্দ ও অর্থসমূহ হেরফের করার দুঃসাহস করতে পারতো!

এই হচ্ছে সেই ইহুদী জাতি ও তাদের চরিত্র!

এদের বিষয় আলোচনা করার পর অন্য আহলে কেতাবদের সম্পর্কে কোরআন স্পষ্টভাবে তাদের উপযোগী ব্যবহারের কথা জানাচ্ছে, যাদেরকে হেদায়াতের আলো কিছু দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও তাদের যথাযোগ্য প্রতিদান হিসেবে কল্যাণ, মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান দানের ওয়াদা করা হয়েছে। যারা হেদায়াতপ্রাপ্তির আশা পোষণ করে তাদের প্রতিও রয়েছে এসব নেক আশ্বাস। যদি সে সকল ভ্রান্ত আহলে কেতাব সঠিক ও মযবুত পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে সকল সাফল্যের পথ এবং এটাই তাদের পদমর্যাদার সঠিক মূল্যায়ন। এইসব সত্যাশ্রয়ী আহলে কেতাবদের সম্পর্কে মর্যাদার অনেক কথাই কোরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অতীতেও তারা যেমন মর্যাদাবান ছিলো, ভবিষ্যতেও তেমনি মর্যাদাবান থাকবে। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'যদি ওরা বলতো আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি, আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের দিকে একটু খেয়াল.... তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর সত্যপথ গ্রহণকারী কেউ হবে না।' (আয়াত ৪৬)

এমন পরিষ্কার, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং দৃঢ়তার সাথে তাদের কথা জানানোর পর এটাই স্বাভাবিক যে, সাধারণভাবে তারা আর ইসলাম গ্রহণ করবে না, আর বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে তাদের ভেতরকার কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া তারা ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছে না। আর প্রকৃতপক্ষে তারা যদি এইভাবে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে মনস্থির করতো এবং এগিয়ে আসতো, তাহলে এটা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হচ্ছে, সে সত্যিকার অর্থে তাদের জন্যে কোনো জটিলতাই ছিলো না, এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোরআনে কারীমে জানানো হয়েছে,

'আমরা শুনেছি, মেনে নিয়েছি, একটু শুনুন এবং আমাদের দিকে একটু খেয়াল দিন।'

এই পদক্ষেপ নিলেই তাদের জন্যে কল্যাণ হতো তাদের স্বভাব প্রকৃতি, মেযাজ, তাদের ব্যক্তি মর্যাদা ও তাদের অবস্থা মযবুত হতো। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে হলো এই যে, তাদের কুফরীর কারণে হেদায়াত থেকে তারা বহু দূরে সরে গেলো। সুতরাং এখন অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই ঈমান আনবে না (এটা সে অভিশপ্ত জাতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের ফল এবং আল্লাহর তরফ থেকে অমোঘ ফয়সালা)।

আর আল্লাহর বাণী আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বহুকাল ধরে অতি সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া ইহুদীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ নেই। শুধু তারাই এগিয়ে এসেছে যাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ মঞ্জুর করেছেন এবং যাদের জন্যে হেদায়াতের পথ সুগম করে দিয়েছেন, যেহেতু তারা হেদায়াত পাওয়ার জন্যে চেষ্টা ইচ্ছা ও সাধনা করেছে।

এদের অপর বৃহত্তর অংশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বেশ কয়টি শতাব্দী ধরে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও তাদের অনেককে মদীনায় থাকার অনুমতি ও নিরাপত্তা দান করা হচ্ছে। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের স্থায়ী দুশমনী ছিলো ও আছে, যার কোনো বিরতি কোনো দিন হয়নি, কোনো সময়ের জন্যেও থেমে যায়নি। তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বর্ণবৈষম্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার অস্বীকৃতি, বরাবরের মতো আজও অব্যাহত রয়েছে। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ইসলামের বিরুদ্ধে এতো শত্রুতা দুনিয়ার অন্য কোনো জাতি আজ পর্যন্ত করেনি। বিশ্বব্যাপী যে ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো এবং যেসব নানাপ্রকার আগ্রাসন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে, একটু চোখ মেলে তাকালে দেখা যাবে যে, সব কিছুর সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনো একজন অংশীদার হিসেবে আবার কখনো এককভাবে এই ইহুদীরা লড়াই করে এসেছে।

আহলে কেতাবদের প্রতি আল্লাহর ধমক

এরপর সম্বোধন করা হচ্ছে সরাসরি সকল আহলে কেতাবদের বিশেষভাবে ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তাদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে সেই কেতাবকে মেনে নেয়ার জন্যে, যা তাদের কাছে আছে। তাদের কাছে রক্ষিত কেতাবের সত্যায়নকারী এই কেতাবের মাধ্যমে তাদের ইসলামী বিদ্বেষ ও অন্যান্য মন্দ কাজের কারণে, তাদেরকে পশুতে রূপান্তরিত করার ভয় দেখানো হয়েছে এবং কখনো তাদের প্রতি লা'নত পাঠানো হয়েছে। আবার কখনো কোরআন তাদেরকে এই জন্যে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তারা শেরেকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং সেই নিরংকুশ তাওহীদ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে, যার ওপর তাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত। আল্লাহ তায়ালা অপর সকল গুনাহ মাফ করলেও তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার মনে করা হবে– এ অপরাধ মাফ করেন

না। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর বিশাল ক্ষমাশীলতার সীমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, আলোচনা এসেছে শেরেকের কদর্যতা সম্পর্কে এবং জানানো হয়েছে যে শেরেকের গুনাহ মহাদয়াময় আল্লাহর ক্ষমাশীলতার আওতা বহির্ভূত। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আহলে কেতাব (তোমরা) বিশ্বাস করো যা কিছু আমি নাযিল করেছি ..... আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক মহামিথ্যা তৈরী করে নিয়েছে।

উপরের আয়াতে আহলে কেতাবদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানিয়েছেন যেন তারাই সর্বপ্রথম আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারী হয়ে যায় এবং এভাবেই তারা প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাই আবারও এরশাদ হচ্ছে,

'হে কেতাবধারী ব্যক্তিরা, যা কিছু আমি নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান আনো। বর্তমানেরও এ কেতাব তো তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী।'

একথা দ্বারা বুঝা গেলো যে, 'আল কেতাব' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে রক্ষিত মূল কেতাব তাদেরকেও দেয়া হয়েছে, যার নতুন সংস্করণ এসেছে ভিন্ন ভাষায়। সুতরাং হেদায়াত লাভ করার পথে এ কেতাব তো কোনো নতুন জিনিস নয়। আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা যিনি তাদেরকে এ একটি কেতাব (শিক্ষা) দিয়েছেন এবং তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তাদের কাছে উপস্থিত কেতাবের সত্যায়নকারী হিসেবে বর্তমান কেতাবের মাধ্যমে তাদের ঈমান আনার আহবান জানাচ্ছেন। সুতরাং এ কেতাব তাদের জন্যে কোনো নতুন জিনিস নয়। এ কেতাব তাদের কাছে যা কিছু আছে, তার সত্যায়নকারী। ঈমান আনার কাজ স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি এবং বাহ্যিক কোনো উপায় উপকরণ দ্বারা যদি প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে তারাই প্রথম ঈমান গ্রহণকারী দলে পরিণত হতো। আসলে ঈমান গ্রহণ করার জন্যে ভালো মনে এবং সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ভাবনা করে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়োজন ছিলো যা তারা করতে রাযি ছিলো না। যেহেতু তারা বিভিন্ন স্বার্থের কারণে নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকতেই চাইলো এবং তাদের নিয়তই ছিলো খারাপ ও বিদ্বেষপূর্ণ এবং স্বভাবগতভাবে তারা ছিলো সংকীর্ণমনা।

তৎকালীন এই ইহুদী জনগোষ্ঠী ছিলো হঠকারী এবং বাঁকা ঘাড়ওয়ালা। এই কারণেই তারা ঈমান আনেনি, আর এই একই কারণে তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে ভীষণ তিরস্কার ও কঠিন আযাবের ভয়। এরশাদ হচ্ছে,

'(ঈমান আনো) তোমাদের চেহারাগুলোকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পূর্বে এবং জেনে রেখো....... জেনে রেখো আল্লাহর ফয়সালা অমোঘ।'

এখানে 'তামসুল উজুহ' বলতে বুঝানো হয়েছে, মানুষের যেসব চিহ্ন তাকে বিশেষ মানুষ হিসেবে পরিচিত করে সেসব চিহ্নগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আর সেই চেহারাগুলোকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় পিঠের দিকে মুখ করে দেয়া, যাতে করে হাঁটতে শুরু করলে পেছন দিকে হাঁটতে থাকবে। আসলে এখানে, একটি বাস্তব ও বস্তুগত শাস্তির কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে করে তারা মানবতার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে পেছন দিকে চলতে থাকবে। আর এমনি করে তাদেরকে সে আয়াতের ভয়ও দেখানো হয়েছে যা নেমে এসেছিলো শনিবারওয়ালাদের ওপর (আর তারা ছিলো সেইসব বিদ্রোহী লোক যাদেরকে তাদের শরয়ী নির্দেশ হিসেবে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করা সত্তেও নানা হীলা-বাহানা করে তারা হুকুম অমান্য করেছিলো) আর বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরিণত করে দিয়েছিলেন বানর ও শুকরে। এইভাবে সেইসব স্পষ্ট নিদর্শন কেতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে ইহুদীরা

সেইসব স্পষ্ট নিদর্শন মুছে ফেলে দিয়েছিলো যা আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদের মধ্যে দান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ জেনে-বুঝেই তারা কুফুরী ও জাহেলিয়াতকে গ্রহণ করেছিলো।

কুফুরীর পথকে প্রাধান্য দান করা বলতে বুঝায়, যখন হেদায়াত ও গোমরাহীর পথগুলো পাশাপাশি থাকে তখন ঈমানের ওপর কুফুরীকে গুরুত্ব দানই হচ্ছে চরম গোমরাহী। এ হচ্ছে এমন অপরাধ যার কারণে মুখমন্ডলসমূহ বিলুপ্ত করা এবং দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করে দেয়ার ধমকি দেয়া হয়েছে, আর জেনে রাখা দরকার, সঠিক পথ পাওয়ার পর পেছনে দিকে ফিরে যাওয়া হবে সকল প্রত্যাবর্তন থেকে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন।

শনিবারে মাছ শিকারীদের প্রতি প্রদত্ত শাস্তি বা চেহারাগুলো মুছে ফেলার শাস্তি দান এই দুইয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেটাই দিতে চান না কেন, ধ্বংসকর আযাব হিসেবে দুটোই সমান, আর এই আযাব সত্য সত্য তিনি দান করেন বা না করেন, এটা নিশ্চিত যে, না-ফরমানদের জন্যে এটা সাংঘাতিক এক ধমকি এবং অত্যন্ত কঠিন আযাবের এক চরম ভীতি প্রদর্শন। এ দুইয়ের মধ্যে যেটাই ওই কঠিন হৃদয় ইহুদীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা উপযোগী মনে করবেন সেটাই তাদের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করবেন যেমন করে অতীতের বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

এই ধমকির কারণে যারা মন্দ আচরণ ও বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে বিরত হয়েছে তাদের অন্যতম ছিলেন কা'ব পাদ্রী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা নিম্নরূপ–

আহমদুল্লাহ আল খাওলানীর বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, খাওলানী বলেন, আবু মুসলিম আল খালীলী ছিলেন কা'ব-এর শিক্ষক। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যাওয়ার পথে বিলম্ব করার কারণে কা'বকে একদিন তিরস্কার করছিলেন। কা'ব বলেন, এরপর তার শিক্ষক তাকে রসূলুল্লাহর কাছে পাঠিয়ে জেনে আসতে বলেন যে, সত্যি তিনি নবী কিনা? কা'ব বলেন, আমি আমার বাহনে (ঘোড়া বা উটে) চড়ে মদীনায় পৌঁছুলাম তখন তিনি কোরআনের এই অংশ পড়ছিলেন, 'হে কেতাবধারীরা আমি যা কিছু নাযিল করেছি তার ওপর ঈমান আনো। আমার নাযিল করা সে কেতাব তোমাদের কাছে যে কেতাব রয়েছে, তার সত্যায়নকারী। জলদী করে তোমরা ঈমান আনো সে অবস্থা আসার পূর্বে যখন আমি শাস্তিস্বরূপ হঠকারী অস্বীকারকারী ইহুদীদের চেহারাগুলোকে মুছে সমান করে দেবো এবং তারপর তাদের চেহারাগুলোকে আমি পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবো...।' এ আয়াত শুনার পর আমি পানির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলাম এবং গোসল করলাম। আর আমি তখন আমার চেহারার ওপর ভয়ে ভয়ে বারবার হাত বুলিয়ে দেখছিলাম। তারপর (অবিলম্বে) আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

এই ধমকির পরপরই আবার বলা হচ্ছে 'এবং আল্লাহর হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়।'

এ কথার মধ্যে তিরস্কারকে আরো জোরদার করা হয়েছে, বলা হয়েছে, ইহুদীদের প্রকৃতি এমনই কঠিন যে তাদের ওপর সে আযাব আসাটাই স্বাভাবিক।

যে গুনাহর কোনো ক্ষমা নেই

একথার পরপরই অন্য একটি ধমকি আসছে এবং তা হচ্ছে আখেরাতে শেরকের গুনাহ মাফ না হওয়ার ধমকি, যেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমতের দরজা, এই (শেরেকের) অপরাধ ছাড়া অন্য সকল অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে খুলে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শেরেক করার .... আর যে, আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে আসলে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে।'(আয়াত ৪৮)

আয়াতের বর্ণনাভংগীতে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইহুদীরা আল্লাহর সাথে শেরেক করে নির্জলা মিথ্যা বলছে, অথচ তাদেরকে নির্ভেজাল ঈমান আনার জন্যে এবং একমাত্র আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে মানার জন্যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। অবশ্য এখানে কথা বা কাজের মাধ্যমে তারা এমন কোনো কিছু করছে না যার কারণে শেরেক করছে বলে নির্দিষ্ট করে বলা যায়। এ ব্যাপারে অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে কোরআনে করীম অন্যত্র তাদের শেরেকের কথা উদ্ধৃত করেছে, 'তারা বলেছে ওযায়র আল্লাহর ছেলে, যেমন নাসারা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।' আর এ কথা নিসন্দেহে শেরেক! এমনি করে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে যে তারা ('ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে') তাদের পাদ্রী ও সন্নাসী ধর্ম যাজকদেরকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

অবশ্য তারা পাদ্রী ধর্ম জাযকদের নিরংকুশ আনুগত্য করতো না, তাদের পূজাও করতো না। তবে আইন প্রণেতা হিসেবে তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে বলে তারা মনে করতো। কোনো কিছুকে বৈধ বা নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা দান আল্লাহরই বিশেষ অধিকার এবং সৃষ্টিকর্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। এটা জানা ও বুঝা সত্তেও এ ইহুদী ও খৃষ্টানটা ধর্ম যাজকদের এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী বলে মানতো। আর এই কারণেই কোরআনে কারীমে তাদেরকে মোশরেক রূপে গণ্য করা হয়েছে। এই বিবেচনায় ও সঠিক ইসলামী ধ্যান ধারণা অনুসারে হারাম হালাল বিধান মানাকে ইসলামের সীমা ও শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এ সূরার নির্ধারিত অংশে আসবে।

যাই হোক, রেসালাতে মোহাম্মদীর যামানায় গোটা আরব দেশ মূর্তিপূজার আখড়া ছিলো। তারা (সাধারণভাবে) তাওহীদ থেকে দূরে ছিলো। তাদেরকে তিরষ্কার করে, এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা শেরেক ব্যতীত যার জন্যে খুশী অন্য সব গুনাহ মাফ করবেন, কিন্তু শেরেকরূপী মহা অপরাধ যে করবে এবং শেরেক করা অবস্থায় যে মারা যাবে বা মৃত্যু দম পর্যন্ত যে শেরেক করা থেকে বিরত হবে না তার জন্যে আল্লাহর কাছে কোনো ক্ষমা নেই।

আসলে শেরেক অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। এরপর কোনো ক্ষমার আশাই আর থাকে না। এ দুনিয়া থেকে যখন তারা মোশরেক থাকা অবস্থায় বেরিয়ে যাবে তখন সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী অবস্থায় বেরুবে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে কোন অবস্থায় মানুষ আল্লাহর সাথে শেরেক করছে এবং কি ধরনের মানসিকতা নিয়ে সে দুনিয়া ছাড়া পর্যন্ত শেরেকের অবস্থায় টিকে থাকছে! বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান অসংখ্য জিনিস তার সামনে থেকে আল্লাহর একাত্ববাদের ঘোষণা দিচ্ছে, সব কিছু তাকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, একটি ক্ষমতাই সবখানে বিরাজমান এবং সকল রসূল (স.)-এর শিক্ষার মধ্যে সে শুনেছে এই একই সূরের প্রতিধ্বনি, এতদসত্তেও সে এই জঘন্য অপরাধ করে চলেছে। তার মধ্যে ভালো ও কল্যাণকর কাজের প্রবণতা বর্তমান থাকা সত্তেও এই কাজটি সে করে চলেছে এটা কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? এই আচরণ যখন সে করে তখন সে এমনই ধ্বংসাত্মক কাজ করে যার থেকে ফিরে আসার আর কোনো পথ থাকে না! এ আচরণের দ্বারা সে তার নির্মল সত্তাকে ধূলামলিন ও কদর্য করে ফেলেছে যাকে আল্লাহ তায়ালা কলুষতা বিমুক্ত করেছিলেন এবং এইভাবে নিজেকে নীচুতার সর্বনিম্নে নামিয়ে দিয়েছে এবং নিজেকে জাহান্নামের অধিবাসী বানিয়ে ফেলেছে।

অপরদিকে এই প্রকাশ্য ও স্পষ্ট গুনাহের পাশাপাশি এবং এই মহা নির্লজ্জ ও খোলাখুলি যুলুমের বাইরে অন্যান্য ছোট বড়ো যতো গুনাহ আছে, সবই আল্লাহ তায়ালা, যার জন্যে চাইবেন– মাফ করে দেবেন। কারণ সকল অপরাধই আল্লাহর ক্ষমার আওতায় রয়েছে, তা সে তাওবা করুক বা নাই করুক বা তাওবা করার সুযোগ নাও যদি সে পেয়ে থাকে তবুও যেমন হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়াতে জানা যায়; যতোদিন বান্দার চেতনার মধ্যে আল্লাহর অনুভূতি বিরাজ করে ততোদিন সে তাঁর ক্ষমার আশা রাখে, বিশ্বাস করে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ খাতা ক্ষমা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং একথাও জানে যে, আল্লাহর ক্ষমা করার ক্ষমতা বান্দার গুনাহ করার ক্ষমতা থেকে অনেক বেশী। আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমতের যে সব চিত্র আঁকা হয়েছে এইটিই হচ্ছে তার চূড়ান্ত রূপ। অর্থাৎ তাঁর মেহেরবানীর কোনো সীমা বা শেষ নেই, তাঁর ক্ষমার দরজা কখনোও বন্ধ হবার নয় এবং সে ক্ষমা ভান্ডারের দ্বারে কোনো দ্বাররক্ষীও নেই।

বোখারী ও মুসলিম উভয়ে হযরত আবু যার এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস এনেছেন। আবু যার বলেন, এক রাতে আমি বাইরে বের হলাম, দেখি যে, রসূলুল্লাহ (স.) একাই হেঁটে চলেছেন, তাঁর সাথে অন্য কোনো মানুষ নেই। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম, তাঁর সাথে কারো হাঁটা তিনি হয়তো পছন্দ করবেন না। এরপর তিনি বলেছেন, আমি তখন দূরে থেকে চাঁদের আলোতে তাঁর পেছনে পেছনে থাকলাম। তারপর এক সময় পেছনে ফিরে তাকাতেই আমাকে তিনি দেখে ফেললেন এবং বললেন, কে ওখানে? বললাম, আবু যার, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যে আমার জীবন কবুল করুন। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার, এসো। আবু যার বলছেন, আমি তাঁর সাথে ঘন্টা খানেক হাঁটতে থাকলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, দেখো, যারা আধিক্যের প্রত্যাশী (সব সময় সব কিছু বেশী বেশী পেতে চায়), কেয়ামতের দিন তারাই হবে সব থেকে কম পাওয়া মানুষ, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ধনদৌলত দান করেন তার কথা ভিন্ন, এমন ব্যক্তি ডাইনে বামে, সামনে পেছনে হাত প্রশস্ত করে অকাতরে খরচ করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে সব সময় ভালো কাজ করে। এরপর আবু যর বললেন, তাঁর সাথে আমি আরো কিছুক্ষণ চললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, এখানে বসো (একথা বলে) তিনি আমাকে এক সমতল জায়গায় বসিয়ে দিলেন, যার আশে পাশে অনেকগুলো পাথর খন্ড ছড়িয়ে ছিলো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাকবে। রেওয়ায়াতকারী আবু যার বলছেন, তিনি আমার বেশ কিছু দূরে চলে গেলেন এবং ফিরতে অনেক বিলম্ব করলেন। এরপর হঠাৎ করে আমি তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, দেখি তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলছেন, 'যদি কেউ ব্যভিচার করে কিংবা চুরি করে।' রেওয়ায়াতকারী বলেন, 'যখন তিনি কাছে এলেন তখন আমি জিজ্ঞাসা না করে আর স্থির থাকতে পারলাম না, বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনার ওপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোরবান করুন, মেহেরবানী করে আমাকে বলুন, এই মরুভূমির মধ্য থেকে আপনার সাথে কে কথা বলেছিলো? আমি যেনো কাউকে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে শুনলাম। তিনি বললেন, তিনি জিবরাঈল। মরুভূমির দিক থেকে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, তোমার উম্মতকে সুসংবাদ দাও, কোনো ব্যক্তি যদি শেরেক না করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে দাখেল হবে। আমি বলেছিলাম, যদি সে যেনা করে থাকে অথবা চুরি করে থাকে তবুও (জান্নাতে যাবে)? তিনি বললেন, হাঁ। আবারো বললাম, চুরি ও যেনা করে থাকলেও? বললেন, হাঁ হাঁ, এমনকি মদ পান করে থাকলেও।'

ইবনে আবু হাতেম তার মোসনাদে জাবের (রা.)-এর একটি হাদীস এনেছেন, জাবের বলছেন, 'রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি শেরেক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ক্ষমা পাওয়া তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাকে আযাব দেবেন, আর চাইলে তাকে মাফ করে দেবেন, তবে তাঁর সাথে শেরেক করা হলে সে গুনাহ মাফ করবেন না, তাছাড়া অন্য সব গুনাহ, যার জন্যে ইচ্ছা, তার জন্যে তিনি মাফ করে দেবেন।

ইবনে আবু হাতেম, তার মোসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি হাদীস এনেছেন। ইবনে ওমর বলেন, আমরা, (নবী (স.)-এর সাহাবারা) কোনো ব্যক্তিকে হত্যাকারী, এতীমের মাল ভক্ষণকারী, কোনো সতী নারীর প্রতি দোষারোপকারী এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর দোযখী হওয়ার ব্যাপারে মোটেই সন্দিহান ছিলাম না। অবশেষে নাযিল হলো,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি শেরেক করার অপরাধ মাফ করবেন না। বাকী অন্যান্য সকল অপরাধ যার জন্যে ইচ্ছা, তিনি মাফ করে দেবেন।'

রেওয়ায়াতকারী বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবীর সাহাবারা (উপরে বর্ণিত অপরাধগুলো ক্ষমার অযোগ্য) এ কথা বলা থেকে থেমে গেলেন!

তিবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস তাঁর মোসনাদে পেশ করেছেন, ইবনে আব্বাস নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন– বলে উল্লেখ করেন, নবী (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এ কথা জানে যে, আমি সকল গুনাহ খাতা মাফ করতে সক্ষম, আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি, এতে আমার কিছু পরওয়া নেই (অর্থাৎ তাকে মাফ যখন করে দিয়েছি, তখন তার আর কোনো কিছুকে ক্ষমা করা থেকে বাদ রাখিনি, সবই মাফ করে দিয়েছি। তা সে যতো বড়ো গুনাহই করে থাকুক না কোনো, এতে আমার কোনোই ক্ষতি নেই। এই মাফ করার ব্যাপারে আমার কোনো সংকটও নেই)। এই শেষের হাদীসটিতে চোখ খুলে দেয়ার মতো একটি বিষয় আছে, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর অসীম ক্ষমাশীলতা বা ক্ষমা করার ক্ষমতার প্রতি বান্দার প্রগাঢ় আস্থা ও হৃদয়ানুভূতি। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে বসে চেতনার মধ্যে তার কল্যাণকামিতা, প্রবল আশা, ভয় ও লজ্জানুভূতি সবই সেই মুহূর্তে বিদ্যমান থাকে। আর এই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় যে, বান্দার এই ভয় এবং ক্ষমা পাওয়ার আশা তাকে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য করে তোলে।

অভিশপ্ত ইহুদী জাতি ও আজকের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কী?

এরপর কোরআনের বাণী সামনে অগ্রসর হচ্ছে, মদীনার মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘটিত নানাপ্রকার সংঘর্ষের কথা কোরআন বলে বিস্ময় প্রকাশ করছে। এ সৃষ্ট জীবগুলো সম্পর্কে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় জনগোষ্ঠী মনে করে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়; অথচ একই সময় তারা তাদের কাছে রক্ষিত কেতাবের শব্দগুলো হেরফের করার কদর্য কাজটি করে চলেছে, এরপর পূর্বে বর্ণিত কথাগুলোতে দেখা যায়, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চক্রান্ত করে চলেছে। এর মধ্যে আরো দেখা যায়, তারা নানা জড় পদার্থ ও দুনিয়ার অহংকারী ও যুলুমবাজ নেতাদের শক্তি ক্ষমতায়ও বিশ্বাসী, যার বর্ণনাও পরে আসছে। এসব কিছু বিবেচনায় এ কথায় আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, নিজেদের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে আল্লাহকে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে, আর সর্বপ্রকার অন্যায় করার পরও তারা যে মনে করে যে, তারা আল্লাহর নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি একথা চরম বেওকুফী ও হঠকারিতা। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখোনি সে সকল ব্যক্তিকে যারা নিজেদেরকে দোষমুক্ত বলে দাবী করে? বরং প্রকৃতপক্ষে দোষমুক্ত ও পবিত্র তো তারা.... প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে যথেষ্ট।' (আয়াত ৪৯)

ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ গোত্র ও আল্লাহর পছন্দনীয় গোত্র হওয়ার দাবী অনেক পুরাতন। আমানত বহন ও রেসালাতের দাবী পূরণ করার জন্যে কার্যত তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দনীয় বলে বাছাই করেছিলেন এবং সে সময়ে তাদেরকে পৃথিবীর সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বও দিয়েছিলেন। তাদের জন্যেই ফেরাউন ও তার সভাসদ, সর্দার ও দল বলকে ধ্বংস করেছিলেন এবং তাদেরকে বায়তুল মাকদেসের পুন্যভূমির ওয়ারিসও বানিয়েছিলেন। কিন্তু তারাই তো সেইসব ব্যক্তি যারা এরপর আল্লাহর পথ থেকে সরে দাঁড়ালো এবং পৃথিবীতে ভীষণভাবে অহংকার প্রদর্শন করলো। তারা এতো বেশী অন্যায় ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়লো যে তাদের দৌরাত্মে পৃথিবী আর্তনাদ করে উঠলো। তাদের ধর্মজাযকরা আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোকে হালাল করে ফেললো এবং যা তাদের জন্যে তিনি হালাল করেছিলেন সেগুলোকে তারা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিলো। সাধারণ মানুষ তাদের অন্ধভাবে আনুগত্য করতে শুরু করলো। তারা যে হালাল হারাম বিধানকে নষ্ট করে কার্যত আল্লাহর হকগুলো নষ্ট করলো তা কারো কাছে খারাপ লাগলো না। এইভাবে সে ধর্মগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শরীয়ত বা আইন কানুনকে ক্ষমতাসীন ও তথাকথিত ভদ্র বা অভিজাত শ্রেণীর জন্যে বদলে দিলো। জনগণের পছন্দ ও খাহেশের কাছে তারা যুক্তিহীনভাবে আত্মসমর্পণ করলো। আর এইভাবে তারা ধর্মগুরু ও ধর্মীয় আলেমদেরকে তাদের নিরংকুশ ভাগ্য নিয়ন্তা, মুরুব্বী ও পরিচালক মেনে নিয়ে তাদের কাছে নিঃশর্তভাবে নিজেদের ছেড়ে দিলো। তারা জঘন্যতম অপরাধের জিনিস সুদ খেতে শুরু করলো এবং আল্লাহর দ্বীনের সাথে সম্পর্ককে তারা নিকৃষ্টভাবে কলুষিত করলো। তাদের জন্যে যে কেতাব প্রেরিত হয়েছিলো তাকে তারা লাঞ্ছিত করলো। এসব আচরণ এবং আরো বহু কিছু না-ফরমানীর কাজ করা সত্তেও তারা নিজেদের আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়পাত্র মনে করতে থাকলো। আরো ভাবতে থাকলো যে, অল্প কয়েকদিনের জন্যে ছাড়া স্থায়ীভাবে কোনো আগুন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। আত্মপ্রবঞ্চনার এখানেই শেষ নয়, বরং তাদের ধারণা যে, তারা ব্যতীত হেদায়েতের পথে আর কেউই নেই এবং ইহুদী না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির আর কোনো পথই নেই। তারা বিশ্বাস করতে থাকলো, তাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ভালোবাসার সম্পর্ক, তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সুকোমল ও বিশেষ দরদের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এসব যাবতীয় প্রয়োজন বা দুর্বলতা থেকে বহু উর্ধে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোনো বান্দার আত্মীয়তা বা বংশীয় কোনো সম্পর্ক থাকার প্রশ্ন অবান্তর। বান্দারা তাঁর সাথে মযবুত আকীদা বিশ্বাস ও নেক কাজের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে এবং এই সম্পর্ক মযবুত হয় দৃঢ়তার সাথে তাঁর পথে টিকে থাকার কারণে। এই সম্পর্ককে যে শিথিল করে তার ওপরেই আল্লাহর ক্রোধ এসে পড়ে। আর এই ক্রোধ তখন আরো বেড়ে যায় যখন গোমরাহ লোকদের কাছে হেদায়াতের আলো আসার পর তার থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেসব ইহুদীদের অবস্থা আজকের মুসলমানদেরই মতো, যারা নিজেদেরকে মুসলমান এবং মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত বলে মনে করে, আরো মনে করে যে, মুসলমান যখন তারা আছে তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্যকারী এবং তাদের জন্যে অবশ্যই ইহুদীদেরকে তাদের এলাকা থেকে তিনি নিজেই বের করে দেবেন। অথচ আজ তাদের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দ্বীন বা পরিচালনা করার জন্যেই এই জীবন বিধান

দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সে জীবন বিধানকে তাদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাদের নিজেদের বিবাদ বিষম্বাদ বা অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দেয় তার মীমাংসার জন্যে তারা আল্লাহর কেতাবের দিকে ফিরেও যায় না। তাদের সমাজ সংগঠন, আদব-শৃংখলা ও আনুগত্য অনুসরণের নিয়ম পদ্ধতির ব্যাপারেও তারা আল্লাহর কেতাবের কাছে ফয়সালা চায় না। তাদের কাছে এখন শুধু মুসলমানদের নামটুকুই বাকি রয়ে গেছে। আর একটি গৌরব তাদের বুকের মধ্যে দানা বেঁধে রয়েছে, যে তারা এমন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছে যেখানে এককালে মুসলমানরা কর্তৃত্ব সহকারে বাস করতো, কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে সেখানে তাদের বাপ-দাদারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান চালু করেছিলো এবং তারা বিচার শাসন করতো আল্লাহরই আইন অনুসারে।

এসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) এসব ইহুদীদের সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছেন যারা নিজেরাই নিজেদেরকে যাবতীয় দোষ ক্রটির উর্ধে মনে করে অন্যদিকে এ যামানার মুসলমানদের অবস্থা আরো বেশী আশ্চর্যজনক। মুসলমানদের আজকের অবস্থা যেমন তাদের নিজেদের কাছে বিস্ময়কর, তেমনি অপরকেও তা বিস্মিত করছে।

কোনো মানবগোষ্ঠী নিজেদেরকে এইভাবে দোষ-ক্রটি মুক্ত বলতে পারে না, আর না তারা বলতে পারে যে, তারাই একমাত্র খাঁটি ও যোগ্য এবং আল্লাহর নৈকট্য সম্পন্ন ও পছন্দনীয় হওয়ার একমাত্র উপযোগী তারাই। এ কাজ একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র ও দোষমুক্ত বলে ঘোষণা দিতে পারেন। কারণ একমাত্র তিনিই মানুষের অন্তর ও কাজগুলোকে ভালোভাবে জানেন, আর কখনোই কোনো মানব গোষ্ঠীর ওপর তিনি যুলুম করেন না। যতোদিন তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্ধারিত এসব ব্যবস্থাকে তাঁর ওপরই ন্যস্ত রাখে, বাস্তব কাজে মন নিয়োগ করে এবং শুধু মৌখিক ভালো হওয়ার দাবী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, ততোদিন আল্লাহর মেহেরবানী তারা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয় না। তারপর প্রকৃত ভালো কাজ করাই যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা লজ্জা শরমপূর্ণ ব্যবস্থাকে বিনীতভাবে মেনে নেয়, চারিত্রিক পবিত্রতার নমুনা পেশ করে এবং শুধু মৌলিক দাবী করেই সন্তুষ্ট থাকে না, যে অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহর কাছে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, তাদের কোনো কাজকেই ভুলিয়ে দেয়া হবে না এবং কোনোক্রমেই তাদেরকে তাদের পাওনা থেকে কম দেয়া হবে না।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা ইহুদীদের অবাঞ্ছিত এসব দাবীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করতে গিয়ে বলেছেন, যখন তারা নিজেদেরকে সকল ক্রটির উর্ধে বলে মনে করে এবং দাবী করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন, তখনই তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ যেনো তারা আল্লাহর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন)। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের এই কাজকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন এবং সে নির্লজ্জ জাতির এই জঘন্য ব্যবহারের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'দেখো, কেমনভাবে তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আর এই যঘন্য ব্যবহারকে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট মহা অপরাধ বলে গণ্য করার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।'

আর এখন আমরা দেখছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করেছি, তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের নামটি মুসলমানী নাম, অর্থাৎ বাপ-মা ইসলামী কোনো নাম রেখে দেয়ার কারণেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা এই

মুসলমানিত্বের বোঝা বহন করে চলেছি। এর থেকে বেশী মুসলমান বলে পরিচিত হওয়ার জন্যে তেমন আর কোনো কারণ নেই। হাঁ, আর একটি কারণ, যে এলাকায় মুসলমানরা বাস করে আমরা সেই এলাকার অধিবাসী। অথচ আমাদের জীবনে ইসলামী জীবন পদ্ধতি অনুসরণের কোনো নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই। আমরা যে মুহূর্তে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছি, সেই মুহূর্তে হিসাব করলে আমরা দেখতে পাবো, আমরা আমাদের চেহারা ও মুসলমানী পরিচিতি নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছি, অথচ বাস্তবে আমাদের ব্যবহার দ্বারা আমরা যে ইসলাম থেকে বহু যোযনব্যাপী দূরে সরে রয়েছি, আমরা নিজেরাই তার সাক্ষ্য বহন করছি। এরপরও আমরা জোর গলায় দাবী করছি, আল্লাহর কাছে কাছে আমরা প্রিয়, কারণ আমরা উম্মতে মোহাম্মদী (স.)। আমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বীন রয়েছে, এটা আমাদের দাবী, কিন্তু বাস্তবে ইসলামী জীবন-বিধান চরমভাবে আমাদের কাছে পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

এই ধরনের অবস্থাকে সামনে রেখেই তো আমাদের নবী রসূল (স.)-এর কাছে ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, আর তাঁরই সংগী-সাথী ও উম্মতরা একইভাবে তাদের এই স্পষ্ট গুনাহের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আল্লাহর পানাহ! তিনি আমাদের রক্ষা না করলে গযব থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই আমাদের নেই, তাঁর কাছেই আমরা আশ্রয় ও সাহায্য চাই।

নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীন হচ্ছে পূর্ণাংগ একটি জীবন ব্যবস্থা; বরং তা হচ্ছে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। আর আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ হলো এই জীবন বিধানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং বিভাগে প্রয়োগ করা। তারপর আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, সে তো একমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এখন আমাদের দেখা দরকার, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন ও জীবন পদ্ধতি থেকে আমরা কতোটা ব্যবধানে আছি, এরপর আমাদের ভেবে দেখা দরকার, আমরা সেই ইহুদীদের অবস্থা থেকে কতোটা দূরত্বে অবস্থান করছি, যাদের অবস্থা আল্লাহকে বিস্মিত করেছিলো এবং তারা ত্রুটিমুক্তির দাবী দ্বারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করার নযির স্থাপন করেছিলো। তারপর নিয়ম বলতে সবখানে একই নিয়ম প্রযোজ্য, এক স্থানে এক নিয়ম, অন্য স্থানে ভিন্ন নিয়ম তো হতে পারে না। আর কোনো বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করলে সবখানে একভাবেই বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহর সাথে তো কারো বংশীয় বা রক্তের সম্পর্ক নেই, আর সেখানে কোনো বন্ধুত্বের আদান-প্রদান নেই!

তাগুতের সাথে কোনো আপোষ নেই

এ প্রসংগে আলোচনা আরো এগিয়ে চলেছে। যারা নিজেদেরকে সকল দোষক্রুটির উর্ধে মনে করে সেই হতোভাগা জাতির বিস্ময়কর বিষয় নিয়ে জরুরী আরো কথা আসছে। দেখা যাচ্ছে, ইহুদী জাতি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার বহির্ভূত মানব রচিত ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখে এবং পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলে এবং তারা সেই সকল হুকুম আহকাম মেনে চলে, যা আল্লাহর আইন থেকে উদ্ভূত নয় এবং ওদের মধ্যে সরকারী বেসরকারী এমন কোনো সংস্থা বা সংগঠন নেই যে, তাদেরকে বিদ্রোহাত্মক এসব আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারে এই কারণেই 'জেবত' দেব-দেবী, মনগড়া আইন কানুন ও কোনো খেয়ালী সত্ত্বা, তাগুত, উচ্চাভিলাষী, অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ও সীমালংঘনকারী ব্যক্তি বা সরকার এদেরকেই তারা বিশ্বাস করতো। এদের কথা তারা মেনে চলতো। সমাজপতিরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তি প্রয়োগ করে অতীতেও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতো এবং আজও করছে। সাধারণ মানুষ

কখনো না বুঝে, কখনো তাদের রঙীন কথায় ধোঁকা খেয়ে, আবার কখনো বা চাপে পড়ে এসব তাগুতী শক্তির আনুগত্য করে। মদীনার যে প্রেক্ষাপটে এ কথাগুলো বলা হচ্ছে সে সময় তারা শেরেক ও মোশরেকদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতো, বলতো মোশরেকরা এসব মোমেনদের থেকে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত যারা আল্লাহর কেতাব, তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন কানুন হিসেবে প্রদত্ত ইসলামী বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এসব আশ্চর্যজনক ব্যবস্থার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার নিন্দাবাদ প্রচারে মাধ্যমে নানাভাবে ইহুদীরা তাদেরকে অপমান করতো বলে আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছেন এবং চরমভাবে তাদেরকে অপমানিত করেছেন। এইভাবে এ ইহুদীদের প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা হিংসা, কৃপণতা এবং ইবরাহীম (আ.)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে অন্য যতো প্রকার বাহানা তারা তালাশ করেছিলো তা সবই প্রকাশ পেয়ে গেলো, অথচ এই মহান দাবী ইবরাহীম (আ.)-এর বংশোদ্ভূত হওয়ার কথা বলে তারা গৌরবান্বিত বোধ করতো। ইহুদীদের প্রতি হামলার ইতি টানা হচ্ছে তাদেরকে জাহান্নামী হওয়ার দুঃসংবাদ দানের মাধ্যমে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (তাদেরকে) জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।'

'তুমি কি দেখোনি এসব লোকের দিকে যাদেরকে কেতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো... আর তাদের জন্যে জাহান্নাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।' (আয়াত ৫১-৫৫)

যেসব লোককে আল কোরআনের একটি অংশ দেয়া হয়েছিলো তারাই সেই কেতাব এর অনুসরণ করার ব্যাপারে তাদের তুলনায় ছিলো যোগ্যতর-যাদের কাছে কেতাব আসেনি, সেই শেরেককে প্রত্যাখ্যান করার জন্যেও তারাই ছিলো সর্বোত্তম মানুষ, যা তারা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো। তাদের জীবনে অবতীর্ণ আল কেতাবের প্রাপ্ত অংশ থেকে ফয়সালা নেয়ার ব্যাপারেও যোগ্যতর ছিলো এবং তাগুত বা আল্লাহদ্রোহীদের অনুসরণ করবে না বলেও তারা বলেছিলো। কারণ এই তাগুতের অনুসরণের জন্যে তাদের এমন কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তাগুতকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বিধানে কোনো রকম কোনো ছাড় বা অনুমতি ছিলো। কিন্তু যেসব ইহুদী ছিলো আত্ম-প্রশান্তিতে মগ্ন এবং আল্লাহর বন্ধু হওয়ার গৌরবে ছিলো যারা অস্থির, তারাই সে আল্লাহদ্রোহী ও মিথ্যা শক্তি-ক্ষমতার অধিকারীদের অনুসরণ করতো এবং জ্যোতিষীদের কথা মতো চলে শেরেক করতো, কিন্তু অবশেষে সে সকল গণক ও পাদ্রী এমন সব আইন-কানুন দিতে শুরু করলো যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কখনো দেননি। এভাবে তারা নিজেরাও আল্লাহদ্রোহী শাসকদের নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে লাগলো। আর এইভাবে বিচার শাসন করার মূলনীতিগুলোও তারা শরীয়তের আইনের বাইরে থেকে নিয়ে নিলো। তাগুত তো সেই, যার মধ্যে রয়েছে অহংকার ও বিদ্রোহের মনোভাব। অর্থাৎ জেনে বুঝে যে ব্যক্তি স্বার্থের কারণে সঠিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এটা যারা করে তারা আল্লাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করে, আর সে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা। এই শাসন ক্ষমতার অনুভূতির মধ্যে আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যে থেকে সুবিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য না থাকলে তাই হবে 'তুগিয়ান' তথা সীমালংঘন। শরীয়তের সীমা থেকে বেপরোয়া হয়ে যে নিজ স্বার্থের জন্যে কাজ করবে সেই হবে তাগুত। আর যারা এই মোশরেক বা কাফের তাগুতের প্রতি আস্থা রাখে এবং তার অনুসরণ করে তাদের কাজে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই বিস্মিত হন, যেহেতু ওদেরকেই আল কেতাবের একটি অংশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা কেতাবের সেই অংশকে মযবুত করে ধরেনি, বরং পদে পদে তারাই সে কেতাবকে অপমান করে চলেছে।

তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে মিথ্যা কাজ, মনগড়া আইন ও তাগুতী শক্তি ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নিজেদের ওপর বাধ্য করে নিয়েছিলো। এর ফলে, তাদের স্থান নিরূপিত হয়েছে মোশকের ও কাফেরদের কাতারে এবং এরা আজ মোমেনদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে, অথচ তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা কেতাব দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ওদের আরো বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন,

'আর ওরা কাফেরদের সম্পর্কে বলে, 'মোমেনদের চাইতে ওরাই বেশী হেদায়াতের পথে রয়েছে।'

হাদীসে আসছে, ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে যোগদানকারী কাবীলাগুলো ছিলো কোরায়শ, গাতফান ও বনি কোরায়যার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল কাবীলা থেকে যারা যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এসেছিলো তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছে, হুওয়াই ইবনে আখতার, সালাম ইবনুল হাকীক, আবু রাফে, রবী ইবনে হাকীক, আবু আমের অহ্অহ্, ইবনে আমের এবং হাওদাহ ইবনে কায়েস। অহ্অহ্, আবূ আমের ও হাওদাহ ছিলো বনী ওয়ায়েল গোত্র থেকে, আর বাকি সবাই ছিলো ইহুদী কাবীলা বনু নাযীর থেকে। এরা মক্কার কোরায়শদের কাছে যখন এলো তখন তারা বললো, 'এরা ইহুদীদের বড়ো বড়ো আলেম এবং পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কেতাবের পন্ডিত, এদেরকেই জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের দ্বীন ভালো না মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বীন ভালো? তখন ওরা (কোরায়েশদরকে) বললো, 'তোমাদের দ্বীন তাঁর (মোহাম্মদের) দ্বীন থেকে ভালো এবং তোমরা তার ও তার অনুসারীদের থেকে বেশী সঠিক পথপ্রাপ্ত। এ ঘটনার পরপরই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, তুমি কি দেখোনি সেই সকল লোকের দিকে যাদেরকে আল কেতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো? কী জঘন্য মিথ্যা কথাই না তারা বললো? (আয়াতের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। এ জিজ্ঞাসাবোধক কথা নাযিল করে, প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালা তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং আখেরাতেও তাদের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকবে না, কারণ মোশরেকদের থেকে সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা তাদের পক্ষে কথা বলেছিলো। ওদের সাহায্যের আবেদনে কোরায়শদের লোকজন যথাযথভাবে সাড়া দিয়েছিলো এবং আহযাবের যুদ্ধে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো। সে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে মদীনার চতুর্দিকে নবী (সা.) ও তাঁর সাথীরা গভীর পরিখা খনন করেন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'রাগের কারণে যারা কুফুরী করেছিলো তাদের ক্রোধকে আল্লাহ তায়ালাই প্রতিহত করেছেন তারা কিছুতেই কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধের ব্যাপারে মোমেনদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা চির শক্তিশালী মহা-ক্ষমতাবান।'

সত্য মিথ্যার সংঘাত চিরন্তন

ইহুদীদের একথা বলা যে মোশরেকদের দ্বীন মোহাম্মদ ও তাঁর সংগী সাথীদের দ্বীন থেকে ভালো– এটা বড়োই আশ্চর্যের বিষয়, আরো আশ্চর্যের বিষয় তাদের একথা বলা যে, তারাই সঠিক পথের পথিক। অবশ্য এই আশ্চর্যের ব্যাপারটা শুধু ইহুদীদের পক্ষ থেকেই ঘটে, তারা সত্যের বিরুদ্ধে এবং মিথ্যার পক্ষে থেকেছে– এটাই তাদের স্বভাব। আবার অদম্য লালসার শিকার এক দল লোক বরাবরই আছে, যারা কু-প্রবৃত্তির তাড়নে চলে এবং বহু মন্দ কাজ করে, তারা হকপন্থীদের কাছে কোনোদিনই এবং কোনো ব্যাপারেই স্থান পায় না, সবাই মিলেই সত্যের

বিরোধিতা করে। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই সে মন্দ লোকেরা মন্দের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যারা দুর্নীতিতে মগ্ন সেই সকল অন্যায়কারী ও তাদের সংগী সাথীদের কাছ থেকে অবাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যারা লাগামছাড়া প্রবৃত্তির দাস তাদের পদলেহন করে এবং তাদের খুশি করার জন্যে সত্যের ধারক বাহকের বিরোধিতা করে।

সত্য-মিথ্যার প্রকৃতি ও সংঘাত চিরদিন এই একই রকম, এর কারণ সব সময় একই রকম থেকেছে এখনো একই রকম আছে, আর এই স্বাভাবিক কারণেই তাদের কথা ও যুক্তিতে এটা এসেছে যে ঈমানদারদের থেকে সে মোশরেকদের জীবন যাপন প্রণালী বেহতর।

যে কথা ওরা কাল বলেছে, আজকেও তাই বলছে এবং আগামীকালও তারা সে একই কথা বলবে, এটা বিচিত্র কিছু নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তাদের হাতে সত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর ও প্রচারের যে উপায় উপকরণ ও শিক্ষা এখনো বর্তমান রয়েছে তারা তার অপব্যবহার করছে, বরং আরো কঠিন সত্য হচ্ছে, সেগুলোকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের মংগল ও শান্তি বিধানের জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত ইসলামী ব্যবস্থা তাদের কাছে এসেছিলো, তাকে তারা নিজেরাই পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাকে ধ্বংস করার জন্যে পরিপূর্ণ বাতিলপন্থী মোশরেকদের সাহায্য কামনা করছে। অতীতেও তারা যেমন ইসলামের ধ্বংস সাধনে, কোরায়শ মোশরেকদের সহায়তা নিতে চেয়েছিলো আজও তারা মোশকেরদের সহায়তায় সেই জীবন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রয়াস পাচ্ছে।

কিন্তু তারা তাদের হীন ও সংকীর্ণ মনস্কামনা পূরণ করার জন্যে এবং সত্যকে নিশ্চিহ্ন করতে ও তাদের অসৎ ইচ্ছা পূরণ করতে সরাসরি সত্যের বিরোধিতা না করে আধুনিক কূটনীতি গ্রহণ করেছে। এজন্যে তারা জেনে বুঝে মন্দের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে কোনো কথা বলছে না, বরং সত্য ও সত্যপন্থীদের প্রতি দমননীতি চালিয়ে সত্যের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। উপরন্তু সত্যকে চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অন্যায় অপশক্তিকে তারা সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে, আর এ কারণে আজকের যুগে তারা তাদের খোলাখুলি প্রশংসা করতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

আজ তাদের মনে দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এই চিন্তায় তারা এখন অস্থির যে, মিত্ররা গোপনে অন্য কারো সাথে আঁতাত করছে না তো! যদিও সবখানে ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনামাফিক তারা কাজ করে যাচ্ছে।

অবশ্য এসব ধোঁকাবাজি এবং এ বিষয়ে যতো প্রকার চক্রান্ত যারা করেছে তারা অনেক সময়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বাড়ছে এবং একের বিরুদ্ধে অপর শক্তি জয়ী হওয়ার জন্যে তারা যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠছে, এ ব্যাপার পরস্পর শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তারা মারাত্মক অস্ত্রসজ্জা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে তাদের নিজেদের লোক ক্ষয় অথবা সত্যকে জলা লি দিতে হলেও তাতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু বাহ্যিক অন্তসার শূন্য কথা ও আচার-আচরণ দ্বারা তারা পরস্পর সন্দেহ নিরসনের জন্যে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে যাতে দূরবর্তী মুসলমানদের দমন করার যে লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলছে তা হাসিল করা যায়।

সকল বিধর্মীদেরই মঞ্চ অভিন্ন

পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের প্রশ্নে তারা সবাই একমত এবং ছলে-বলে, কলে-কৌশলে যেভাবেই হোক না কেন, পৃথিবীর কাছে ও দূরে সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমানদের মধ্যে

নানা প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি করার কাজ করে যাচ্ছে, যাতে করে তারা কখনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে এবং সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে পৃথিবীতে টিকে থাকতে না পারে।

ইসলামের দুশমনদের মন-মেযাজ, পদক্ষেপ ও উদ্দেশ্য সবই একই প্রকারের। আর এই কারণেই আল্লাহর লা'নত ও ঘৃণা সবার প্রতি একই প্রকার রয়েছে। এটা নিশ্চিত সত্য যে প্রয়োজনের সময় ও কঠিন বিপদের মুহূর্তে সেসব লোকদের মধ্য থেকে তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো সাহায্যকারী পাবে না যদি মুসলমানরা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত হিসেবে আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহরই প্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য একথাও সত্য যে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে দুনিয়ার সব মানুষও যদি তাদের সাহায্য করতে চায় তাতেও কোনো কাজ হবে না। সকল সমর্থন ও সহযোগীদের প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়ে যাবে।

'ওরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে, আর যার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয় তার জন্যে তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।'

আজকে এ বিষয়টা আমাদের অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত করে ফেলেছে যে, গোটা পাশ্চাত্য জগতকে আমরা ইহুদীদের সাহায্যকারী হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। এই কারণে আমরা প্রশ্ন করছি, ওদের প্রতি আল্লাহর লা'নতের সে ওয়াদা আজ কোথায়; আর যার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে তার জন্যে নাকি কোনো সাহায্যকারী পাবে না, সেটাই বা কি করে বুঝবো?'

কিন্তু এটা চির সত্য যে, প্রকৃত সাহায্যকারী মানুষ নয়, রাষ্ট্রবর্গও নয়, তা যতোই তারা হাইড্রোজেন বোমা এবং রকেটের অধিকারী হোক না কেনো। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন প্রকৃত সাহায্যকারী। তিনি তার বান্দাদের ওপর অবশ্যই শক্তিমান; আর তাদের ওপরও তার পুরোপুরি শক্তি রয়েছে যারা বহু হাইড্রোজেন বোমা ও রকেটের মালিক হয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে সাহায্য করবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্যকারী যে ঈমানের হক আদায় করে, সঠিকভাবে তাঁর বিধান মেনে চলে খুশীর সাথে ও বিনয়াবনত মস্তকে যারা তাঁর বিধান মোতাবেক বিচার ফায়সালা করে।

আল্লাহ তায়ালা একথা বলে তাদেরকে সম্বোধন করছেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, মযবুতভাবে তাঁর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে গেছে, দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরছে তাঁর আইন কানুনকে এবং তাদের সকলের দুশমন ইহুদী ও তাদের সংগী সাথীদেরকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করছে। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করার এই ওয়াদা করেছেন, যেহেতু তারা ইহুদী তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার ওয়াদা মোমেনদের কোনো একটি দলের হাত দিয়েই পূরণ করেন যখন তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুতরাং ইহুদীদের প্রতি কাফের মোশরেক ও খৃষ্টানদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে দেখে আমাদের বিব্রত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা তো প্রতি যুগেই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সাহায্য করে এসেছে, তবুও তো প্রকৃতপক্ষে তারা সাহায্য পায়নি, আজও তারা একইভাবে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, আসল যে ব্যাপার মুসলমানদের চিন্তা করা দরকার তা হচ্ছে, তাঁরা প্রকৃত মুসলমান হবে কবে।

আজকের মুসলমানরা সঠিকভাবে একবার মুসলমান হয়েই দেখুক না কেনো–ইহুদীদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী থাকে কিনা, বা তাদের সাহায্যকারীরা তাদের কোনো কাজে আসে কিনা!

ইহুদীদের জঘন্য চরিত্র

ইহুদীদের কাজ, দৃষ্টিভংগি ও কথার ওপর বিস্ময় প্রকাশ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত ও তাদেরকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করার পর জানানো হচ্ছে, কিভাবে রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং মুসলমানদেরকে দ্বীন ইসলামরূপী নেয়ামত, সাহায্য ও ক্ষমতা দান করে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা যে এহসান করেছিলেন তাতে তারা কিভাবে ক্রোধে ফেটে পড়ছিলো। আল্লাহ রব্বুল ইযযত মেহেরবানী করে মুসলমানদের ওপর যে রহমত বর্ষণ করেছিলেন তাতে ওরাও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিলো। এমন তো নয় যে, তারা মুসলমানদেরকে নিজেরা কিছু দেয়ার কারণে সফলতা পেয়েছে এবং ওরা নিজেরা বঞ্চিত হয়েছে? তাদের এসব কদর্য ব্যবহার দ্বারা তারা প্রকৃতিগত সংকীর্ণতার কথাই প্রকাশ করছিলো, কারণ তাদের ধারণায় তারা ছাড়া এসব নেয়ামত আর কেউ পেতে পারে না; অথচ এক সময় তাদেরকে ও তাদের বাপ দাদাদেরকেও অনুরূপ নেয়ামত দান করা হয়েছিলো। সুতরাং, আল্লাহ তায়ালা এখন পুনরায় তাদেরকে একথা জানাতে প্রস্তুত নন যে তাদের পূর্বপুরুষদের ওপর কি কি নেয়ামত বর্ষিত হয়েছিলো আর একথাও তিনি বলতে নারায যে 'তোমরা হিংসা ও না শোকরি করা থেকে বিরত থাকো।' তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বাদশাহী বা ক্ষমতার কোনো হিসসা কি তারা পেয়েছে? যদি তা পেতো তাহলে তো... আরো দিয়েছিলাম তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য।' (আয়াত ৫৩)

হায়, কি আশ্চর্য! ওরা কিছুতেই চায় না যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে কোনো নেয়ামত দান করুক, তাহলে ওরা কি আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো কিছুর অংশীদার হয়ে গেছে নাকি যে, তাদের বুঝ মতো আল্লাহকে চলতে হবে। মহা পবিত্র আল্লাহ তায়ালা, এসব কদর্য ধারণা থেকে বহু উর্ধে তিনি। আল্লাহর রাজত্বে তাদের কোনো অংশ আবদ্ধ নাকি যার থেকে তিনি যাকে যতোটা খুশী দিচ্ছেন বলেই তাদের আপত্তি? তারা অংশীদার থাকলে না হয় তারা কৃপণতা ও সংকীর্ণতা করে কাউকে কিছু দেয়া থেকে আল্লাহকে ধরে রাখতে পারতো এবং মানুষকে একটি কানা কড়ি দেয়া থেকেও তখন আল্লাহকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে পারতো। 'নাক্বীর' বলতে বুঝায় খেজুরের আটির (দানার) উপরস্থ পাতলা ঝিল্লি, অর্থাৎ এতোটুকু তুচ্ছ জিনিসও কপট ইহুদী ও তাদের বশংবদরা কাউকে দিতো না, যদি তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছু মাত্র অংশ থাকতো এমন কি সকল মানবগোষ্ঠী নিপাত গেলেও তারা মানুষকে 'নাক্বীর'-এর মতো তুচ্ছ কোনো জিনিস দিতেও রাজি হতো না।

ওদের এই সংকীর্ণতা ও হিংসা বিদ্বেষের পেছনে হয়তো রয়েছে রসূলুল্লাহ (স.) ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা, যেহেতু তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ মেহেরবানীর ভান্ডার থেকে প্রচুর দান করেছেন। আর সে মেহেরবানী হচ্ছে দ্বীন ইসলামের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা যা তাদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছিলো এবং দান করেছিলো নতুন জীবন, তাদেরকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক জাতি বানিয়েছিলো এবং হেদায়াতরূপী এক অত্যুজ্জ্বল আলো দান করেছিলো ঈমানের শক্তিতে গড়ে ওঠা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, প্রশান্তি ও সুদৃঢ় এবং অবিচল ঈমান। সাথে সাথে দিয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অনুভূতি, আরো দিয়েছে তাদেরকে আত্মসম্ভ্রমবোধ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। এই কারণেই তো জ্বলে পুড়ে মরছে সে যালেম নিষ্ঠুর নরপিশাচ-হায়েনার দল– তাই না?

হিংস্র এ নরাধম ইহুদী তাদের অপকীর্তির কারণে তাদের হাত থেকে বিশ্ব-নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার কারণেই তো আজ তারা এমন হিংসায় মেতে উঠেছে। আত্ম-কলহে লিপ্ত আরব

জাহেলিয়াতের যামানার বিচ্ছিন্ন বেদুইনের ওপর শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভের উগ্র বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেই তারা উন্মত্ত, যেহেতু তখন তারা দ্বীন থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিলো। কিন্তু এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানীতে যখন কোনো জনগোষ্ঠীতে নবুওত দান করেন এবং সে জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন তখন নিজেদের দোষের কারণেই তারা নেতৃত্ব হারা হলে আর কোন যুক্তিতে তারা হিংসা করবে? ওরাই তো ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে আল্লাহর সকল মেহেরবানী লাভ করে এসেছিলো।

তাদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে কেতাব এবং নবুওতরূপী বিজ্ঞানময় ভান্ডারের নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সর্বপর্যায়ের নেতৃত্ব, কিন্তু তারা সেই মর্যাদার হক আদায় করেনি এবং সে নেয়ামতকে হেফাযতও করেনি, আর অতীতে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তিও তারা রক্ষা করেনি। আরো সত্য কথা যে, তারা বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। আর এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সত্য যে আল্লাহর এই নেয়ামত যদি অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সোপর্দ করা হয় তাহলে সর্বাত্মক বিপর্যয় আসবেই, যেহেতু তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী কাফের।

'অবশ্যই আল্লাহ ইবরাহীমকে কেতাব এবং এক বিজ্ঞানময় বার্তা দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য দিয়েছিলাম। তখন ওদের মধ্যে কেউ তার ওপর ঈমান এনেছিলো, আর কেউ কেউ সে কেতাব থেকে ফিরে গিয়েছিলো।'

এই ফিরে যাওয়া ছিলো হিংসাভরা হৃদয়ের অসহ্য বেদনার বহিপ্রকাশ, নেয়ামতপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির হিংসা পোষণ এক ধরনের, আর সেই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত কোনো ব্যক্তি যখন এই হিংসার বহিপ্রকাশ ঘটায় তখন তা অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করে; কিন্তু অসংখ্য নেয়ামত ধন্য ব্যক্তি যখন হিংসা পোষণ করে তখন সেইটাই হলো আসল ও গভীর হিংসা! সর্বোপরি এটা ছিলো ইহুদীদের হিংসা! এটা স্বতন্ত্র এমন এক হিংসা যার কোনো তুলনা নেই।

আর এই কারণেই তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপের ভয় দেখানো হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে তাদের জন্যে উচিত প্রতিদান ও তাদের দুষ্কৃতির যথাযথ বদলা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর জাহান্নামই তাদের পোড়ানোর জন্যে যথেষ্ট।'

এবার শুরু হচ্ছে ঈমানের বিবরণ এবং ইবরাহীম(আ.)-এর বংশের মধ্য থেকে ঈমান বিরোধী ভূমিকার ইতিবৃত্ত। তারপর দেখানো হয়েছে ঈমানকে অস্বীকারকারীদের পরিণতি এবং যারা ঈমানের ডাকে যথাযথভাবে সাড়া দিয়েছে তাদের পুরস্কারের বিবরণ। এই উভয় শ্রেণীর সবাই যার যার ভূমিকা অনুসারে সুনির্দিষ্ট সময়ে তাদের উচিত প্রতিদান পাবে এবং এটি প্রতিদানের সে সময়ে এতো কঠিন হবে যে তা হবে এক দর্শনীয় বস্তু, সেই দৃশ্যের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

একটি ভয়াবহ শাস্তির চিত্র

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে খুব শীঘ্রই আমি আগুনে প্রবেশ করাবো.... আর যারা ঈমান এনেছে ....তাদের জন্যে সেখানে উপস্থিত থাকবে পবিত্র সংগী-সংগীনীরা এবং আমি প্রবেশ করাবো তাদেরকে স্নিগ্ধ ছায়া ঘেরা স্থানে।' (আয়াত ৫৬)

আল্লাহর বাণী এখানে লক্ষণীয়, যতোবারই (তীব্র আগুনের উত্তাপে সেদ্ধ হয়ে) তাদের চামড়া ঝলসে যাবে ততোবারই নতুন নতুন চামড়া এনে সেখানে লাগিয়ে দেবো যেন তারা আযাবের স্বাদটা ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারে।

এ এমন এক দৃশ্য যার পুরো বর্ণনা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ দৃশ্য চোখকে স্থির করে দেবে এবং পাথরের মতো স্থির দৃষ্টির সামনে বারবার দৃশ্যগুলো ঘটতে থাকবে, তখন সে দৃশ্য অবলোকনে সকল চিন্তা-চেতনা স্থবির হয়ে যাবে এবং কোনো দৃষ্টিকে সে দৃশ্য থেকে

সরিয়েও নেয়া যাবে না। এ এক বিভীষিকা, এ বিভীষিকা যেমন ভয়ানক তা তেমনি সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল! এ অবস্থা বুঝানোর জন্যে 'কুল্লামা' বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বারবার সংঘটিত হওয়ার অর্থ ব্যক্ত করে, সাথে সাথে সে ভীষণ বিভীষিকাময় অবস্থা ভয়ানকরূপে হৃদয়পটে ভেসে ওঠে,

'যতোবারই ঝলসে যাবে তাদের চামড়া।'

অদ্ভুত ও বর্ণনাভংগী, যার সাথে বাক্য শেষে বলা হচ্ছে,

'আমি সে পুড়ে যাওয়া চামড়াকে অন্য চামড়া দ্বারা বদলে দেবো।' এ বাক্যটির সংক্ষিপ্ত কথা কয়টির মধ্যে একসাথে ভয়ংকর দৃশ্যের বিভীষিকাসমূহকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে! এটিই হচ্ছে কুফরীর উচিত প্রতিদান। এখানে ঈমানের যুক্তিসমূহও উল্লেখিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই যুক্তিসংগত কাজ যারা করবে তাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর প্রতিদান। যুক্তির বাইরে হঠকারিতামূলক কার্যকলাপের জন্যেও রয়েছে উচিত প্রতিদান,

'যাতে করে তারা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।'

এসব কথার মাধ্যমে এ সংবাদও দান করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং এ শাস্তি বাস্তবায়নে তিনি পুরোপুরিই বিজ্ঞানময় (অর্থাৎ তিনি যুক্তি-বুদ্ধির বিচারে গ্রাহ্য পন্থাই অবলম্বন করেন)। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিমান চির বিজ্ঞানময়।'

এখানে যে আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে 'প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঝলসে যাওয়া চামড়ার বদলে নতুন নতুন চামড়া আসতে থাকা দ্বারা' বলা হয়েছে যে, আগুনের দাহন একই ব্যক্তির ওপর বারে বারে নবায়িত হবে যা শেষ হয়েও শেষ হবে না, যার যন্ত্রণার কোনো পরিসমাপ্তি ঘটবে না।'(১৫)

এবার আমরা দেখতে পাবো এই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্যের মোকাবেলায় আর একটি দল, যারা ঈমান এনেছে এবং সকল প্রকার ভালো কাজ করে চলেছে, তারা মনোরম জান্নাতসমূহে অবস্থান করবে,

'যার মধ্য দিয়ে ছোটো ছোটো নদী প্রবাহিত হতে থাকবে।'

আর এই দৃশ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো স্থায়িত্ব, চিরন্তনতা এবং প্রশান্তির ঝর্ণাধারা।

'চিরদিন তারা সেখানে থাকবে।'

আরো আমরা দেখতে পাবো সেই চির বসন্তে ভরা, ফুলে ফুলে সুশোভিত বাগ বাগিচার মধ্যে পবিত্র পরিচ্ছন্ন, যাবতীয় কলুষতামুক্ত জীবন সংগিনী হিসেবে মনোলোভা সাথীরা।

আরো পাবো সেই সবুজ শ্যামলিমায় পল্লবিত সুশীতল ছায়া, যেখানে হেলে দুলে নাচতে থাকবে এই নেয়ামত ভরা দৃশ্য।

'আর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো ছায়া ভরা সে বাগ-বাগিচায়।'

প্রতিদানের পূর্ণ মাত্রা আমরা সেখানে দেখতে পাবো। সে দৃশ্যাবলী ও তার বাস্তব চিত্র ও বস্তুগত বাস্তবতার নিরীখে সেই সকল জিনিস সেখানে আমরা পাবো, যার আশ্বাস আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দৃশ্য পেশ করতে গিয়ে এ বর্ণনাভংগী আমাদের শক্তি সাহসকে একান্তভাবে সঞ্জীবিত করে এবং আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে গভীরভাবে তা রেখাপাত করে।

---

(১৫) চামড়া বদলের সাথে শাস্তির সম্পর্ক

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰىٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ
تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ أٰمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ
أُمِرُوْٓا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۚ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا
قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ

৫৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। ৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

রুকু ৯

৬০. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি যারা মনে করে, তারা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সে (কেতাবের) ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু (ফয়সালার সময় আমার কেতাবের বদলে) এরা মিথ্যা মাবুদদের কাছ থেকেই ফয়সালা পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা এসব (মিথ্যা মাবুদদের) অস্বীকার করবে; (আসল কথা হচ্ছে) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ৬১. এদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার দিকে (ফিরে) এসো,

يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ

اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ

لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ

اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى

يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا

তখন তুমি এই মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছ থেকে (একে একে) মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়ে, তখন এদের অবস্থাটা কি হয়? তারা তখন সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে তোমাকে বলে, আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি। ৬৩. এদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি লুকিয়ে) আছে তা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, তাই তুমি এদের এড়িয়ে চলো, তুমি এদের ভালো উপদেশ দাও এমন সব কথায়, যা তাদের (অন্তর) ছুঁয়ে যায়। ৬৪. (তুমি আরো বলো,) আমি যখনই কোনো (জনপদে) কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার (শর্তহীন) আনুগত্য করা হবে; যখনি তারা নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তারা তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহর রসূলও (তাদের জন্যে) ক্ষমা চাইবে, এমতাবস্থায় তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পাবে! ৬৫. না, আমি তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। ৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারি করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা তোমরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে (অন্যত্র চলে) যাও, (তাহলে) তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই তা করতো, যেসব উপদেশ

يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতো এবং (তাদের) মানসিক স্থিরতাও (এতে করে) মযবুত হতো! ৬৭. তাহলে আমিও আমার পক্ষ থেকে (এ জন্যে) তাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দিতাম, ৬৮. (উপরন্তু) আমি তাদের সরল পথও দেখিয়ে দিতাম! ৬৯. যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা প্রচুর নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) নবী-রসূল, যারা (হেদায়াতের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম! ৭০. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে বিরাট এক অনুগ্রহ, (মূলত কোনো কিছু) জানার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

তাফসীর

আয়াত-৫৮-৭০

আলোচ্য দারসটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জীবনে এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। মৌলিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর বিষয়টি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ এবং উম্মাতে মুসলিমার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈমানের বন্ধনে কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে মানুষকে আবদ্ধ করা যায়, কিভাবে ঈমানের গন্ডির মধ্যে থেকে মুসলিম উম্মাহর জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করাই এ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। এ পথে যে কঠিন ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য এ অধ্যায়ের আলোচনায় বিবৃত হয়েছে।

কোরআনে কারীমই এই উম্মতকে মানবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদেরকে সবদিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। তারপর এই উম্মতকে গোটা মান্ডবমন্ডলীর পরিচালনার জন্যে বের করে এনেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআনের গভীর ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য পেশ করতে গিয়ে জানাচ্ছেন,

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে গোটা মান্ডবমন্ডলীর জন্যে বের করে আনা হয়েছে।'

কোরআনই সেই মহাগ্রন্থ যা মুসলিম উম্মতকে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে এবং সেই থেকে তুলে এনেছে যে অবস্থায় তাদের কোনো অস্তিত্ব বা পরিচয়ই ছিলো না। তারপর তাদেরকে বিশ্ব ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে, তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে বের করা হয়েছে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে। এখানে বর্ণিত কথাটির ওপর আমাদের গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমত আমাদের দেখতে হবে এই উম্মত কথাটি বলতে কি বুঝায় অর্থাৎ এই উম্মতকে বিশ্ব সভায় তুলে আনা এবং তাদেরকে একই সাথে গড়ে তোলার তাৎপর্য কি?

মানবমন্ডলীর জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে কথা দুটির ওপর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে যে তাৎপর্যটি উপলব্ধি করা গেছে তা হচ্ছে, গোটা মুসলিম জাতির জন্যে এই 'উত্থান' ছিলো এক নতুন জন্মলাভের শামিল এবং আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে মুসলিম জাতির অস্তিত্বে আসাটা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে ছিলো সময়েরই এক অপরিহার্য দাবী। এ উম্মতের অস্তিত্বে আসার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব মানবতা এই উত্থানের মধ্যে দিয়ে জীবনের এক নতুন মূল্যবোধের সন্ধান পেলো। মানবতার বিকাশে এই উম্মত যেভাবে গড়ে উঠলো এবং যেভাবে মানুষের সমৃদ্ধি সাধনে যে অবদান তারা পেশ করলো তা ইতিপূর্বে কখনো কেউ করেনি, আর না মানুষের উন্নতির জন্যে এর পূর্বে কোনোরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক অর্থে এটা ছিলো বিশ্বমানবতার জন্যে পুনর্জাগরণ ও পুনর্জন্ম, যেমন ছিলো গোটা আরব জাতির জন্যে তেমনি ছিলো গোটা বিশ্বের জন্যেও!

আর যখন আমরা আরবের সাধারণ জনগণের অনুভূতির দিকে তাকাই এবং তাকাই জাহেলী যুগের ভাবধারার দিকে, তখন তাদের শাসন ব্যবস্থার অবস্থা বুঝতে পারি, জানতে পারি তৎকালীন আরবের উচ্ছৃংখলতা সম্পর্কে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের স্থায়ী দৃষ্টিভংগী না থাকা অবস্থাটাও দেখতে পাই, আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, সেখানকার মানুষের চরিত্র ও ব্যবহার, তাদের জীবনের দৃষ্টিভংগী, তাদের অবচেতন মনের চিন্তা ভাবনা, তাদের সামষ্টিক জীবনের ধারণা বিশ্বাস, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও অন্য সব কিছুকে বুঝতে পারি, উপস্থাপনের ভংগী জানতে পারি। এক কথায় বলা যায়, এই ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের সকল পরিচয় জানা যায়। আজ যখন কোরআনের ছায়াতলে বসে আমরা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অধীন সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, মতবাদ ও মানব নির্মিত জীবনের মূল্যবোধের দিকেই তাকাই, তাকাই গোটা সৃষ্টিজগত, মানব সভ্যতা ও মানুষের জীবনের প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিকোণ থেকে, সৃষ্টিলোক ও মানবসত্ত্বা এবং মানব জীবনের নিয়ম-কানুনের দিকে, সমাজের নিয়ম-কানুনের দিকে মানব সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্য যদি জানতে চাই এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সঠিক পথ খুঁজি তাহলে আমাদের সামনে বিস্ময়কর জ্ঞানের এক দিগন্ত খুলে যায়।

তারপর ইসলাম আগমনের পূর্বে ও পরে জাহেলী যুগের শাসন ব্যবস্থার অধীনে গড়ে ওঠা আরবের বাস্তব অবস্থার দিকে যখন তাকাই এবং পাশাপাশি যখন কোরআনের ছায়াতলে গড়ে ওঠা ইসলামী মতবাদসমূহ ও আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধান সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি তখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই যে, এই দুই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে কতো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

কোরআনের ছায়াতলে বসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সামনে রেখে যখন অতীতকাল থেকে চলে আসা জীবনধারাগুলোর দিকে তাকাই তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দ্রুতবেগে, অথবা হঠাৎ করে একদিনে, অথবা আসমান থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়েনি। অন্ধকারের পর্দা চিরে একদল লোককে ঐশী জ্ঞানের শুভ্র-সমুজ্জ্বল আলো হাতে নিয়ে দিশেহারা মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে বের করে আনাই ছিলো আল্লাহর কাজ, এটাই কোরআনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য এবং সর্বাধিক আশ্চর্যজনক এক পুনর্জাগরণ। বড়ই চমৎকার ছিলো এ কাজটি। নিষ্ঠুর সমাজের মধ্যে থেকে উম্মতে মোহাম্মদীকে বের করে আনা! এমন অত্যাশ্চর্য উত্থান মানবেতিহাসে একবারই হয়েছে এবং পরবর্তীকালেও এর কোনো নযীর আর পাওয়া যায়নি। অতীতের কোনো যুগেও মানুষের এমন অগ্রগতি ও উন্নতি ইতিহাস রচিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই উত্থানের মধ্যে দিয়েই খাঁটি ও পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে, বরং

সত্যিকারে বলতে কি, এ কথাগুলো আল্লাহরই কাজ, কোরআনে কারীমের মোজেযা আল্লাহর নিজস্ব ক্ষমতারই বহিপ্রকাশ।এরপর যারা কোরআনের কথাকে বিশ্বাস করতে চায় না এবং এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহর কথা কি না সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করে বা এর সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি তালাশ করে- সে আমাদের বলে দিক, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বাণী বহনকারী হিসেবে মানবমন্ডলীর মধ্যে থেকে বের করার পূর্বে তথা তৎকালীন বিশ্ব কোন পর্যায়ে ছিলো? এ কোরআন তাদেরকে সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পূর্বে সমাজে তার মর্যাদাই বা কী ছিলো?

আরব উপদ্বীপের মধ্যে কি ছিলো না এই জাতির বাস! বরং আজ মনে প্রশ্ন জাগে, মানব জাতির মধ্যে এ মহান জাতি আগে কোন এলাকায় বাস করতো? মানবজাতির অস্তিত্বের সন্ধান যে সমস্ত এলাকায় পাওয়া গিয়েছিলো তার কোন কোন অংশে এ মহান জাতিটি গড়ে উঠেছিলো? এমন সুন্দর জাতির সন্ধান কোনো কালের কোনো ইতিহাস কি ইতিপূর্বে দিতে পেরেছে? বিশ্বের দেশে দেশে আজ অবধি কত সমৃদ্ধ জাতির উত্থান পতন হয়েছে, এসেছে কত সচ্ছলতা কিন্তু মুসলিম জাতির মতো দরদী, শান্তিপ্রিয় এবং যাবতীয় মানব গুণের অধিকারী আর কোনো জাতি কি দিতে পেরেছে, যাদের নাম নেয়া যেতে পারে এবং তাদের উত্তরসূরীদেরকেও পাওয়া যেতে পারে? না কখনো নয়।

সুতরাং এটা মানতেই হবে যে, এ জাতি গড়ে উঠেছে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের ভিত্তিতে, এই মযবুত ও অভংগুর জীবন পথই এ জাতিকে এমন মহীয়ান বানিয়েছে। এর ফলেই তারা নিজেরা যেমন সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি অপরকেও পরিচালিত করেছে সেই মহান কেতাবের আলোকে, যা আজও অম্লান রয়েছে এই মুসলিম জাতির হাতে। অন্য কোনো জিনিসের বদৌলতে এই সাফল্য অর্জিত হয়নি। আমাদের সামনে ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে, আরবদের কাছে আল্লাহ তায়ালা যে ওয়াদা করেছিলেন অবশ্যই, তিনি সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে একটি কেতাব পাঠিয়েছি। তার মধ্যে রয়েছে তোমাদের (জন্যে) উপদেশ, তোমরা কি বুদ্ধিকে কাজ লাগাবে না?'

এই কেতাবের কারণেই পৃথিবীতে এ জাতির উন্নতি অগ্রগতির কথা স্মরণ করা হয়েছে। মুসলিম জাতির সে স্বর্ণ যুগের কথায় আজও মানবজাতির গোটা ইতিহাস ভরপুর। মুসলিম জাতিই প্রথম সত্যিকারের মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তারপর নগরবাসী হিসেবে বিশ্বের কাছে সভ্য জাতি হিসেবে তাদের পরিচয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়। ইসলাম বিরোধীরা বলতে চেয়েছে, একদল ক্রোধোন্মত্ত ও যুদ্ধংদেহী ব্যক্তি আরব জাতিকে আল্লাহর নেয়ামত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং গোটা বিশ্বে আরব জাতি ও তাদের ভাষার গ্রহণযোগ্যতা রূপী আল্লাহর মেহেরবানী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে, আর এইভাবে শুধু মাত্র একটি স্মরণীয় জাতি হিসেবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তারা স্থান পেয়েছে। এইসব কথা দ্বারা মুসলমানদের সেই সম্মানের পোশাক তারা খুলে ফেলতে চেয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরিয়েছিলেন। তারা চেয়েছে তাদের সেই পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলতে যা তাদেরকে মান সম্ভ্রম দিয়েছিলো এবং পৃথিবীতে স্মরণীয় বানিয়েছিলো এবং এইভাবে আজও গোটা বিশ্বের দরবারে মুসলিম জাতি একটি বিশেষ জাতি হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে।

আমরা বলবো, কোরআনে কারীমই সেই মহাগ্রন্থ যা মুসলিম জাতিকে অতীতে শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গড়ে তুলেছিলো এবং আজও তার সাহায্যেই এ জাতির গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে

এগিয়ে চলেছে। আজও কোরআন নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানে তাকে পথনির্দেশ করে চলেছে এবং জাহেলী যুগ থেকে উঠে আসা এ মুসলিম জাতির সামনে জ্ঞানের সমুজ্জ্বল দ্বীপ শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে, যার কারণে এ জাতির জীবন ও মন মানসিকতায় এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মননশীলতায় জাহেলিয়াতের যে মরচে পড়েছিলো তা ধুয়ে মুছে সাফ করে গেছে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার সংগঠনগুলোকে আল্লাহর এ কেতাব আজ পুনর্গঠিত করছে, অথবা বলা যায়, তাদেরকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যেন আজই প্রথম বলিষ্ঠভাবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

আবার এও দেখা যায় আরবের সেই বিরোধী পরিবেশের মতো মুসলিম জাতির মান সম্ভ্রম ও জীবনকে আজ আবারও বিপদগ্রস্ত করে ফেলা হচ্ছে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে এবং মদীনার ইহুদী ও মোনাফেক এবং মক্কা ও তার আশপাশের মোশরেকদের মতো আল্লাহর বিধানকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইছে, আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি সময় ও স্থানের ব্যবধানে এ সংঘর্ষের প্রকৃতি একই প্রকারের আছে!

এক সময় ছিলো, যখন কোরআন নিজেই এসব সংঘর্ষের মোকাবেলায় সরাসরি পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামের প্রতি যখনই কোনো প্রশ্নবান নিক্ষিপ্ত হয়েছে তখনই তার সঠিক জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম জামায়াতের ব্যক্তিদের মধ্যে সঠিক চিন্তাধারাটি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। স্পষ্টভাবে তাদেরকে ঈমানের শর্ত ও ইসলামের সীমারেখা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধনকে ইসলামের যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা মযবুত করে দেয়া হয়েছে। একটি মাত্র মৌলিক বিন্দু আছে যা সব কিছুর মূল আর তা হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধান। সারা বিশ্বের সব জীবের জন্যে প্রেরিত এই বিধান অনুসরণ করেই মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিলো এবং এই বিধানই অমুসলিমদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য নির্ণয় করেছে। এই বিধানই মুসলমানদেরকে এককভাবে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছে যার কারণে সে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে পেরেছে, আর এই জন্যেই বলা হয়েছে,

'তাকে সমস্ত মানবজাতির জন্যে বের করা হয়েছে।'

যাতে করে সে মানব জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারে এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে এগিয়ে দিয়ে যেতে পারে- এই পথই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান।

আলোচ্য এই দারসটি সেই জীবন বিধান সম্পর্কে জানানোর জন্যে প্রদত্ত হয়েছে। এ দারসের মধ্যে সেই জীবন বিধানের মূলকথা ঈমান এর মূলতত্ত্ব ও ইসলামী জীবন যাপনের সীমারেখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহকে তার জীবনে যেসব দিক ও বিভাগের সম্মুখীন হতে হয়, সে বিষয়ে কোনো সীমারেখার মধ্যে সে অবস্থান করবে এ দারসে সেই জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা অনুসরণের পদ্ধতি জানানো হয়েছে এবং যেসব সমস্যার সম্মুখীন সে হবে তা সমাধান করবে এ পথে সঠিক জ্ঞানও তাকে দেয়া হয়েছে। এখানে সেসব বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে যেগুলো অত্যন্ত জটিল এবং এর সমাধান সরাসরি কোরআন হাদীস থেকে পাওয়া যায় না এবং যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক মতভেদের সৃষ্টি হয়। সর্বকালের শাসন কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ের সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ সে বিষয়ের সমাধান সবারই প্রয়োজন এবং সে সমস্যা সম্পর্কে তারা একটা স্বীকার করেছে যে, এটা ঈমানের শর্ত এবং ইসলামের সীমারেখাও বটে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে, এই উম্মতের আকীদা বিশ্বাসের সাথে গড়ে ওঠা তার জীবনের মৌলিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহর অবিভাজ্য একত্ব সম্পর্কে, যার কোনো অংশ তাঁর থেকে পৃথক নয় এবং সে আকীদার অংশগুলো একটা থেকে আর একটা কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়।

এই দারসের মধ্যে এই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে এ বিষয়ে পূর্ণাংগ একটা ধারণা দিতে। এ অধ্যায়টি পুরোপুরি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করলে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এবং একটি ঐশী চেতনাবোধ যা মানুষকে চমৎকৃত করে দেয়। সে আশ্চর্যের সাথে ভাবতে থাকে যে, এতো কঠিন অবস্থার সাথে মুসলমানরা কিভাবে সংগ্রাম করে।

মুসলিম উম্মার কাছে এ দারসটি এ কথা খেয়াল করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে যে, সব নবী রসূল (স.)-এর দাবী ছিলো আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষ যেন তাদের পুরো আনুগত্য করে। শুধুমাত্র অন্যের কাছে দাওয়াত পেশ করাকেই যদি তারা যথেষ্ট মনে করে তাহলে তাদের দায়িত্ব পালন হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি রসূলদের পাঠিয়েছি যেন তাদের পুরোপুরি আনুগত্য করা হয়।'

কোরআন আরও জানাচ্ছে যে, উম্মাতে মুসলিমার কাজ শুধু বিশ্বাস করাই নয় বরং তারা যেন তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ফয়সালার জন্যে কোরআনের দিকেই এগিয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সঠিক চেতনা পাওয়ার লক্ষ্যে রসূল (স.)-এর জীবনী ও বিচার ফয়সালা সম্পর্কিত তাঁর কার্যাবলীকে সামনে রাখে। এরপর কোরআনের দাবী হচ্ছে, তারা ঈমানদার থাকার জন্যে ব্যধ্য হয়ে রসূল (স.)-এর কর্মধারার অনুসরণ করবে- এমন যেন না হয়, বরং তারা যেন মহব্বতের সাথে রসূল (স.)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুসারে বিচার ফয়সালা করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর না, তোমার রব-এর কসম .... অন্তরের মধ্যে কোনো সংকট অনুভব না করে।' (আয়াত ৬৫)

ফয়সালা যাই-ই আসুক না কেন, তা অম্লান বদনে ও প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে ঈমানের শর্ত ও সীমা। কোরআন আরও জানাচ্ছে, যারা আল্লাহদ্রোহীদের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে যাবে অর্থাৎ শরীয়তের আইন ছাড়া মানব নির্মিত আইন দ্বারা যারা বিচার ফয়সালা পেতে চাইবে তাদের রসূল (স.) ও তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ কেতাবের প্রতি ঈমানের দাবীকে কিছুতেই কবুল করা হবে না, কারণ তারা আল্লাহদ্রোহী কোনো ব্যক্তি বা শক্তির কাছে তাদের বিচারের ভার দিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি সেসব ব্যক্তির দিকে দেখো না, যারা মনে করে যে .... আর এভাবে শয়তান চায় তাদেরকে ভুল পথে বহু দূরে নিয়ে যেতে।' (আয়াত ৬০)

কোরআন জানাচ্ছে, আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত কেতাব প্রদত্ত ফয়সালা ও রসূলের ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করা মোনাফেকীর স্পষ্ট লক্ষণ। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর সে বাণীর দিকে ... পুরোপুরিভাবে দূরে সরে চলে যাচ্ছে।' (আয়াত ৬০)

কোরআন মুসলিম উম্মাহকে আরও জানাচ্ছে, ঈমানের পথ ও তার মৌলিক ব্যবস্থা হচ্ছে, কোরআনে প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং

রসূল (স.)-এর প্রবর্তিত পথকে অনুসরণের মাধ্যমে রসূল (স.)-এর আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং ঈমান ও ইসলামের শর্ত ও সীমার মধ্যে থাকা মোমেন যারা তোমাদের সাথে আছে, সেই সব নেতৃবৃন্দের হুকুমও মেনে চলবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে থেকে যারা হুকুমদাতা হবে তাদেরও ...... ।' (আয়াত ৫৯)

উম্মতে মোহাম্মদীকে কোরআন আরও বলছে, মানুষের জীবনে যে সব সমস্যা মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়, যেসব বিষয়ে কোরআন বা হাদীস থেকে সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া যায় না সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে হুকুম দান করার যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার কথা মেনে চলতে হবে, উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে যাওয়া, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানও তাঁর রসূলের সুন্নতের অনুসরণই মূল লক্ষ্য। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তোমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে .... তাঁর রসূলের ওপর ছেড়ে দেবে।' (আয়াত ৫৯)

আয়াতের এই অংশে যে বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মোমেনদের প্রতিটি বিষয়ের ওপর সদা সর্বদা আল্লাহর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে এবং তারা কেনো বিষয়ে জটিলতা অনুভব করলে তাঁর দিকেই যেন ফয়সালার জন্যে রুজু করা হয়, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে তিনি তার সমাধান দিয়ে দেবেন। মোমেনদের যিন্দেগীতে এ ধরনের ঘটনা ও তার সমুচিত ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে যে আসবেই সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এটাও ইসলামের এক মৌলিক বিধান যার ওপর মোমেনদের বিশ্বাস থাকতে হবে, এটাকে সত্য না জানলে মুসলমানই থাকা যাবে না। এর দ্বারা বুঝা গেলো, নেতার আনুগত্য নিরংকুশ নয়, বরং তা শর্ত সাপেক্ষ। যেসব বিষয় তোমাদের কাছে একেবারে নতুন মনে হবে এবং তার সমাধানের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্ট হবে সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করাই ঈমানের শর্ত ও ঈমানের সীমানা অন্তর্ভুক্ত, এ কথাটি এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে এবং এর দলীলও এখানে পরিষ্কার। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচারের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো'

ইতিপূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আশ্বাস বাণী পেয়েছি তা আমরা ভুলবো না, ভুলতে পারি না।

'আল্লাহর সাথে যখন কাউকে শরীক করা না হয় তাহলে, সে গুনাহ তিনি কখনো মাফ করবেন না, এছাড়া অন্য যতো গুনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছা, তাকে মাফ করে দেবেন।'

এর দ্বারা বুঝা গেলো, ইহুদীরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে শেরেকের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিলো, তার অর্থ এই নয় যে, তারা ওদের পূজা করতো, বরং সেসব নেতারা যে হালাল হারাম বিধানকে পরিবর্তন করে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিলো, সাধারণ ইহুদীরা তা বিনাদ্বিধায় মেনে নিয়েছিলো। এমনকি সে নেতাদের শাসন ক্ষমতাসহ শরয়ী বিধি-বিধান তৈরী করার ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক বলেও তারা প্রথম প্রথম মেনে নিতে শুরু করেছিলো, তারপর এভাবে তারা ধর্মজাযকদেরকে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করতে থাকে। এ হচ্ছে এমন শেরেক যা আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করতে থাকে। এ হচ্ছে

এমন এক শেরেক যা আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই মাফ করবেন না, বাকী অন্য সব গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন, এমনকি গুনাহে কবীরাও। রসূল (স.)-এর ভাষায়, 'এমনকি সে যদি ব্যাভিচার করে থাকে, চুরি করে থাকে অথবা সে যদি মদও পান করে থাকে- তাও আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেবেন।' এভাবে সেসব হতভাগ্য ব্যক্তি মহান আল্লাহর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভাগ করে দিয়েছিলো, কখনো এমন হয়েছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিকে তারা শাসন ক্ষমতার পূর্ণ দায়িত্বভার দিয়ে দিয়েছিলো। বলা বাহুল্য, আল্লাহর সব ক্ষমতার মধ্যে এইটিই হচ্ছে সব থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা, বরং বলা যায় সর্ব প্রধান ক্ষমতা। আল্লাহর ক্ষমতার এই পরিধির মধ্যে থাকতে গিয়ে একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম, নিজেকে মোমেন বলে পরিচয় দিতে সক্ষম হয়, আর এভাবে সমস্ত গুনাহের ক্ষমা পাবে সে আশা করে। এসবের মধ্যে কবীরা গুনাহও শামিল রয়েছে। এসব বড় বড় গুনাহের বাইরে শুধু শেরেকের গুনাহই থেকে যায় যা আল্লাহ তায়ালা কখনো মাফ করবেন না। সুতরাং এই শেরেক থেকে দূরে থাকাই ঈমানের শর্ত ও ইসলামের শেষ সীমা এটাই। তাই এরশাদ হয়েছে!

'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রেখে থাকো।'

এই দারসের মধ্যে মহা গুরুত্বপূর্ণ কথাটিকে আনা হয়েছে, সাথে সাথে সাথে পৃথিবীতে উম্মতের মুসলিমার দায়িত্ব সম্পর্কেও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। এই কথার ভিত্তিতেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে সৃষ্টি জগতের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার। এরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা যোগ্য পাত্রে আমানতসমূহ দান করো, আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে কোনো বিচার ফয়সালা করবে তখন সুবিচারের সাথে ফয়সালা দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে অতি সুন্দরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন।

আসল আমানত হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের আমানত

এখানে এ নির্দেশটি গোটা মুসলিম জামায়াতের প্রতি এক দিক নির্দেশিকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। ইসলামী জামায়াতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এভাবে তারা নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে এবং লোকদের মধ্যে সালিশী করার সময়ে হক বিচারের দিকে দৃষ্টি রাখবে, যেন সে সালিশ আল্লাহর বিধান মোতাবেক এবং তাঁর শেখানো পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

যতো প্রকার আমানত বা বিশ্বাসের বিষয় আছে, তার মধ্যে সব থেকে বড় এই আমানতটিকে প্রথমেই রক্ষা করতে হবে, আর সেই আমানতের ওপর গোটা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব ও স্থিতি নির্ভর করছে। আসমানসমূহ ও যমীন এই আমানতের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করেছিলে, কেননা তারা এ আশংকা করেছিলো যে তারা এ বিরাট বোঝা বহন করতে পারবে না, অপরদিকে মানুষ এ বোঝা বহন করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। সে আমানত হচ্ছে হেদায়াত পথ প্রদর্শনের আমানত; স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন ইচ্ছানুসারে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে চেষ্টা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঠিক পথে চলা ও অপরকে সঠিক পথে চলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। এটাই মানব জাতির স্বভাবগত আমানত এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ ব্যতীত অন্য যতো জীব জন্তু, কীট পতংগ ও জড় পদার্থ আছে সবাই এই ঈমানের বলেই কাজ করে চলছে, যা তাদের রব তাদের অন্তরের মধ্যে মেহেরবানী করে দান করেছেন। এই ঈমানের দ্বারা তারা হেদায়াত পায়, সঠিক পথ নিতে পারে, দিবারাত্র আল্লাহর আনুগত্য করে এই ঈমানের বলেই তারা তাঁর দেয়া আইন কানুনগুলো সহজে মেনে চলতে পারে, যার জন্যে বিশেষ কোনো বড় ইচ্ছা, পরিকল্পনা বা পেরেশানী তাদেরকে

বরদাশত করতে হয় না। একমাত্র মানুষকেই তার স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার বিবেক বুদ্ধির ওপর, তার জ্ঞান ও ইচ্ছার ওপর লক্ষ্য স্থির করে চলার এবং তার চেষ্টা সাধনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যার কারণ সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয় ও তাঁর সাহায্যে নিজেকে সম্মানিত করতে পারে।

তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আমার পথে থাকার জন্যে চেষ্টা সাধনা করবে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথসমূহ দেখিয়ে দেবো।

আর এই হচ্ছে সেই আমানত যা আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রথম দিয়েছেন।

এই মহান আমানতকে কেন্দ্র করে অন্য সকল আমানত সম্পাদিত হয়, যা আদায় করার জন্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এসব আমানতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আমানত হচ্ছে এই দ্বীনের জন্যে সত্যের সাক্ষ্য দান করা। এই সত্যের সাক্ষ্য দান করার কাজ শুরু হয় প্রথমত ব্যক্তি জীবনের সংযম সাধনা ও চেষ্টা-তদ্বীরের মাধ্যমে, তারপর এই ব্যক্তি আদর্শ মানুষ হয়ে ফুটে ওঠে অন্য মানুষের কাছে, তাদের হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ এবং তার কার্যাবলী ও ব্যবহারের মধ্যে এই সাক্ষ্য দান করার কাজটি জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে এবং তখন তারা বলে ওঠে, আহা কি পবিত্র এই ঈমান ও ঈমানী ব্যবস্থা; কী সুন্দর এর বাস্তব কাজ, আর কতো চমৎকার এ সম্মোহনী প্রভাব যা অন্যকেও আবেগমুগ্ধ করে। তখন এই সাক্ষ্যদানের ব্যবহার ও কাজগুলো ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং তার রংয়ে রঙীন করে ফেলে আশপাশের জনপদকে; তার নীতি নৈতিকতা ও পূর্ণাংগ জীবনে উপস্থাপনা মুগ্ধ এই পরিচয় নিয়েই সে হাযির হয় মহা মানবের মহান দরবারে। এরই সাহায্যে সে জনগণের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করে। এরই দ্বারা দাওয়াতে দ্বীনের মর্যাদাকে সে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তারপর এই মহান দাওয়াতী কাজ দাওয়াত দানকারীর জীবনকে ধন্য করে, শিক্ষা সৌন্দর্যে বরেণ্য করে। কিন্তু এইভাবে যদি জনতার স্বতস্ফূর্ত সাড়া জাগাতে সে সক্ষম না হয় তাহলে বুঝতে হবে তার ব্যক্তির মধ্যে সে ইসলামী আদর্শকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়নি, সক্ষম হয়নি সে দাওয়াত তাবলীগ ও দ্বীনের সঠিক স্তরে পৌঁছতে, সক্ষম হয়নি সে দাওয়াত তাবলীগ ও দ্বীনের সঠিক কথাগুলোকে কার্যকরভাবে ফুটিয়ে তুলতে, অন্যান্য সকল আমানতের মধ্যে দাওয়াত দান করার এ আমানত যে অন্যতম তা সে সঠিকভাবে পেশ করতে পারেনি।

এরপর আসছে এ মহান দ্বীনের সাক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এ দ্বীনকে কায়েম করার আপ্রাণ চেষ্টা করার কাজ। একামাতে দ্বীনের এ কাজ যে মোমেনদের কাজ- তাই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যে একামতে দ্বীনের এ কাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে ও দলীয়ভাবে যেসব উপায় উপকরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা সবই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বুঝা গেলো, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ঈমান আনার পর ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গোটা মানব জাতির জীবনে চালু করার চেষ্টা সকল দায়িত্ব (আমানত) থেকে বড় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে কোনো ব্যক্তি বা দল কেউই ক্ষমা পাবে না। এই কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর যমীনে তাঁরই আইন-কানুন চালু করার জেহাদ (একামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা) অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। তাহলেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আমানতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমানতের হক আদায় হবে।

এসব আমানতের যে বিবরণ ইতিমধ্যে এসে গেছে তার সাথে আরও যেসব আমানত আছে সেগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে যেতে হবে, যেমন মানুষের সাথে কাজ কারবার চালানোর আমানত, অবশ্য এই পর্যায়ে বহু আমানতের কথাই বলা যায়, যেমন লেনদেনের আমানত বস্তুগত লেনদেন ও পরিচালক ও পরিচালিত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত আমানত, উঠতি বয়সের বাচ্চারে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত আমানত, দলীয় গোপনীয়তা, অর্থ ও মাল সামানা এবং সব খরচ করা সম্পর্কিত আমানত সর্বোপরি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্দরভাবে সকল দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার আমানত। এসব বিষয়ের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত আমানতসমূহের হক আদায় করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং কোরআনে কারীমে এসব বিষয়ে অতি সুন্দরভাবে জানানো হয়েছে।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

এখানে দেখা যাক এখানে মানুষের মধ্যে 'আদল' বা সুবিচার কায়েম সম্পর্কিত কি কি কথা আছে। এ বিষয়ে কোরআনে করীম ঘোষণা দিচ্ছে গোটা মানব জাতির প্রতি সুবিচার করতে হবে, শুধু মুসলমানদের পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে বা আহলে কেতাবদের প্রতি সুবিচার করাকেও যথেষ্ট বলা হয়নি; বরং এ হচ্ছে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের একের ওপর অপরের অধিকার। এ অধিকার আদায় করা একটি মানবীয় গুণ। এ বিষয়ে আল্লাহর বিধান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আইন সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য, মোমেন, কাফের, বন্ধু, শত্রু, কালো সাদা, আরব আজম সবার জন্যে এই হুকুম, কারো জন্যে কোনো তারতম্য নেই। মুসলিম উম্মাহ সকল মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে এই আইন প্রয়োগ করার জন্যে দায়িত্বশীল। তারা যখন শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো তখন তারা এমন নিপুণভাবে ইনসাফপূর্ণ আইন চালু করেছিলো যার নযীর পৃথিবীতে আর নেই। একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এবং মুসলমানদের হাতেই এই ভারসাম্যপূর্ণ আইন চালু হয়েছিলো। মুসলমানদের নেতৃত্বে গোটা বিশ্বের মানুষ যে শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা লাভ করেছিলো তার স্বাদ মানুষ পূর্বে বা পরে আর কখনো পায়নি। গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে এইভাবে সম্মানজনক বিচার ব্যবস্থা চালু করা একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাতেই সম্ভব। যেহেতু এ ব্যবস্থায় মানুষকে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এর অতিরিক্ত অন্য কোনো স্থান না দিয়ে সবাইকে সমান অংশীদারিত্ব দান করারই সুফল এটা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ এটাই। আমানতের হক যেমন আদায় করার প্রয়োজন, একইভাবে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী ব্যবস্থা এই ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাও অপরিহার্য।

এর পরবর্তী নির্দেশ হচ্ছে, এই আমানত সঠিক ও যোগ্য পাত্রে দান করতে হবে এবং সকল মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে বিচার ফয়সালা করতে হবে। এইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই উপদেশ এক চিরন্তন স্মরণিকা এবং আল্লাহর হুকুমের বাস্তব এক ব্যাখ্যা, আর কী সুন্দরভাবেই না আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে উপদেশ দান করে তাঁর দিকে ওদের গতি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অতি সুন্দরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন।'

আমরা উপরে বর্ণিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে এর বর্ণনা ভংগির দিকে একটু খেয়াল করি। বাক্যের মূল কথা হচ্ছে 'নেয়েম্মা' এর অর্থ 'বড় সুন্দরভাবে'। এ প্রকাশ ভংগীর মধ্যে 'ইন্না' (অবশ্যই) শব্দটি সূচনাতে ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর মধুর একটি ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই তিনি হুকুম করার কথা না বলে ওয়ায করার বা আদবের সাথে

নসীহত করার কথা বলেছেন। হুকুমের মধ্যে কড়া সুর ধ্বনিত হয়, আর 'ওয়ায নসীহত' শব্দের মধ্যে পরম করুণাময় পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সস্নেহ আদবের আমেজ ঝরে পড়ে এবং মনিবের সাথে বান্দার অত্যন্ত গভীর একটা সম্পর্ক বুঝা যায়। মনিব যখন বান্দার জন্যে আদবের ভাষা ব্যবহার করেন তখন বান্দা সে কথাকে নির্দেশ হিসেবে বুঝে এবং সাগ্রহে ও খুশী মনে সে নির্দেশ পালন করে এবং সে নির্দেশ অমান্য করতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করে। আয়াত শেষ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার সাথে কিভাবে এবং কতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দার সব কিছু) শোনেনও দেখেন।'

আবার যেসব বিষয়ে কাজ করার জন্যে নির্দেশ এসেছে তা হচ্ছে, আমানত এর হক আদায় করা এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা, এটা ঠিকমতো করা হয় কি না তা শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা সঠিকভাবে অবগত।

শোনা ও দেখার মধ্যে যে স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম তদারকির কাজ হয় তা সহজেই অনুমেয়; কাজেই যেমন তিনি সবকিছু শুনতে পান তেমনি তাঁর দৃষ্টির আড়ালেও কিছু নেই। যেসব বিষয় ইনসাফ খেয়াল দেয়ার দাবী করে এবং যেসব জিনিসের আমানত রক্ষা করা প্রয়োজন তার কোনোটা শোনার মতো আর কোনোটা দেখার মতো, যেহেতু কিছু কাজ প্রকাশ্যে হয় এবং কিছু কাজ গোপনে সংঘটিত হয়, আর কিছু এমন বিষয় আছে যেগুলো ধরা ছোঁয়া ও প্রকাশ্য জিনিসের অন্তরালে সংঘটিত হয়; অতএব একথায় সবকিছুই শোনা ও দেখার পরিধির মধ্যে বিদ্যমান।

ন্যায় বিচারের মানদন্ড

এরপর আলোচনা করা হয়েছে আমানত ও আদল (সুবিচার) এর মাপকাঠি সম্পর্কে। কোন সে মাপকাঠি বা কোন সে পদ্ধতি যার দ্বারা জীবনের সব দিক ও বিভাগের এ দুটি জিনিস সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা বুঝা যায়!

প্রশ্ন হলো আমানত ও আদল-এর বিষয়গুলো, তার প্রয়োগ পদ্ধতিকে এবং সেগুলা পরখ করার উপায় উপকরণকে কি আমরা মানুষের বুঝ ও ব্যবহার পদ্ধতির ওপর ছেড়ে দেবো? ছেড়ে দেবো কি এসব কিছুকে তাদের বুদ্ধির ফয়সালা ও খোশখেয়ালের ওপর? না তা কিছুতেই হতে পারে না।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি এবং সঠিক পথপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান সাধনা অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এটা সত্য বলে স্বীকার করা সত্তেও মানতে হবে যে ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয়ভাবে মানুষ যখন কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করে স্থির করতে চায় তখন সে বিশেষ কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই তা করে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার পরিবেশের প্রভাবমুক্ত সে কখনো থাকতে পারে না বলে সকল দিক চিন্তা ভাবনা করে পরিপূর্ণ ভারসাম্য আনা এবং সুসামঞ্জস্যভাবে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে কোনো পথ বের করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে আমার-আপনার, অমুক-তমুকের এবং বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর বুদ্ধি অবশ্যই কাজ করে। যে কোনো এলাকা বা যে কোনো সময়ের কথা চিন্তা করা হোক না কেন- সবখানেই এই একই ধারায় মানুষ কাজ করে এবং সবখানেই মানুষ বিশেষ কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবাধীন থাকে আর এই কারণেই কখনো সে এদিকে ঝুঁকে পড়ে আবার কখনো অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে সে অনেক দূরে চলে যায়।

সর্বকালের, সব দেশের, সব পরিবেশের মানুষের জন্যে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী-অপকারী জানার জন্যে এমন একটি স্থায়ী মানদন্ড প্রয়োজন যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যেন এই মানদন্ডের মাধ্যমে তারা তাদের কার্যাবলী যাচাই করতে পারে। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ভালো মন্দ, তাদের চিন্তাধারা, ব্যবহারের মধ্যে সীমাতিরিক্ত পদক্ষেপ অথবা কাজের ক্রটি বিচ্যুতি এবং অবহেলা পূর্ণ চিন্তা ও চেষ্টাকে যেন তারা পরিমাপ করতে পারে। মানব কল্যাণ সম্পর্কিত তাদের পরিকল্পনা ও পদ্ধতিকে যেন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, সর্বশেষে এই মানদন্ড দ্বারা তাদের হুকুম আহকামকেও যেন বাছাই করতে পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে। এ হবে এমন একটি স্থায়ী মানদন্ড যা কারো কোনো অভিরুচি ও প্রবৃত্তির তাড়নে পরিচালিত হবে না, টলবে না কোনো অবস্থায় নিজ বলিষ্ঠ স্থান থেকে অথবা কোনোক্রমেই কারো কোনো প্রভাব সে গ্রহণ করবে না।

মন বুদ্ধি উদ্ভূত কোনো মানদন্ডে সর্বকালের, সকল পরিবেশের সব মানুষের জন্যে কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না। মানব নির্মিত এসব মানদন্ডে কিছু না কিছু ক্রটি থাকবেই এবং এই মানব নির্মিত মানদন্ড দ্বারা যা কিছু যাচাই বাছাই করা হবে তা সবই হবে ক্রটিপূর্ণ, আর এ ক্রটি বিচ্যুতি থেকে ততোধিক মানুষ রেহাই পাবে না। যতোদিন এ স্থায়ী মানদন্ডের দিকে সে ফিরে না আসবে।

গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে এই মানদন্ড একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই তৈরী করে দিয়েছেন, যেন মানুষ এর দ্বারা আমানত, সুবিচার ব্যবস্থা আদল, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের উপায় উপকরণকে পরখ করে নিতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

‘হে ঈমানদাররা নিরংকুশভাবে আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা হুকুমদাতা আছে তাদেরও ...... তোমাদের জন্যে সুন্দরতম পদক্ষেপ ও আচরণ।’ (আয়াত ৫৯)

কোরআনের এই ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের শর্ত ও ইসলামের সীমা বর্ণনা করেছন। আয়াতটিতে মুসলিম জামায়াতের সংগঠন পদ্ধতির মৌলিক কথাগুলোও বর্ণিত হয়েছে; বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শাসন পদ্ধতি ও ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে। এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এসব কিছুর সূচনা হয়েছে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে, এগুলোর সমাপ্তিও একমাত্র তাঁর কাছেই হবে। সকল শক্তি ক্ষমতা যে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে, এ কথা কোরআনে করীমে স্পষ্ট করে বলা হয়নি, যেহেতু এগুলো মানুষের জীবনে যতোগুলো আনুসাংগিক বিষয় আছে তার অন্যতম এবং এসব বিষয়ে মানুষের বুদ্ধি, মতামত ও বুঝ এর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সেই সব মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন, যা সকল মানুষের যুক্তি বুদ্ধি, মতামত ও বুঝ শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যে শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ হতে হবে, যেহেতু প্রকাশ্য, গোপন এবং বড় ছোট সব কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালাই নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার মালিক।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন এবং মানুষের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্যে তিনি তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন। রসূল সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বললেন, সে মনগড়া কিছু বলে না। অতএব বুঝা যাচ্ছে তাঁর সুন্নত তাঁর চালু করা পদ্ধতি আল্লাহর বিধানেরই অংশ।

আল্লাহর আনুগত্য সবার জন্যেই বাধ্যতামূলক। তাঁর সর্বময় ক্ষমতার মালিক হওয়ার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর রাজ্যে তাঁর বিধানকে সবার কাছে পরিচিত করা ও যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া এবং এরপর সবার জন্যে বাধ্যতামূলক হিসেবে সে বিধানকে চালু করা। যারা ঈমান আনবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমত আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তারপর পদাংক অনুসরণ করতে হবে তাঁর রসূলের, কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁকে তাঁর বার্তাবাহক হওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন ও তাঁর আনুগত্য করার জন্যে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তাঁর আনুগত্য করার অর্থ সেই আল্লাহরই আনুগত্য করা যিনি তাঁকে এই জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাকে এই বিধানের আনুগত্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চালু করা জীবন পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা সেই দ্বীন জীবন পদ্ধতিরই অপরিহার্য্য অংশ চালু ও প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক এবং কোরআনের আয়াত অনুসারে এই আনুগত্য করা না করা এবং তাঁর প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি চালু করা না করার ওপর ঈমান থাকা না থাকা নির্ভর করে তাই, এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।'

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হতে হবে সে 'উলুল আমর' যারা তাদের মধ্যে ঈমানের শর্তগুলোকে কার্যকর করবে এবং নির্ধারণ কর দেবে কোরআনের আয়াতে বর্ণিত ইসলামের সুস্পষ্ট সীমানাকে। ইসলামের এই সীমানা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মানা, রসূলের পদাংক অনুসরণ করে চলা, শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক একমাত্র আল্লাহকেই জানা, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে আইন রচনা করার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা-এ কথা স্বীকার করা ও তাঁর সাথে মোলাকাত হবে ও তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে-কোরআনের আয়াত অনুসারে এ কথা বিশ্বাস করা; আর যেসব বিষয়ে কোরআনে সুস্পষ্টভাবে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যার কারণে এসব বিষয় বুঝা, মতামত কায়েম করা এবং রায় দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে, সেই সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আল্লাহর দিকে রুজু করা।

স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই

এ আয়াতে যেমন আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তেমনি রসূল (স.)-এর আনুগত্যও যে একইভাবে আসল আনুগত্য তাও জানানো হয়েছে, যেহেতু রসূল (স.) তাঁরই প্রেরিত ব্যক্তি; আর তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি 'উলুল আমর' (হুকুমদানকারী) হবে, অর্থাৎ যে নিজে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সেই আনুগত্যবোধ নিয়েই হুকুম দেবে তারও আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। তবে এখানে তার আনুগত্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সরাসরি (অনুগত) শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন করে সে শব্দটি আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর আনুগত্য করার কথা বলতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাচনভংগী ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা জানানো যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে যেসব নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করার নির্দেশ গৃহীত হয়েছে এবং মোমেনদের সম্বোধন করে 'তোমাদের মধ্যে থেকে' বলে যাদের কথা জানানো হয়েছে, অবশ্যই মোমেন হতে হবে এবং ঈমানের শর্তগুলো তারা মেনে চলবে।

তোমাদের মধ্যে থেকে হুকুমদানকারী কর্তৃপক্ষের আনুগত্য হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিধান অনুযায়ী, যেমন এ কথা ওপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুগত্যের যে সীমা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকেই আনুগত্য করতে হবে এবং কোন কোন ব্যক্তির বা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না সে বিষয়ে কোরআনে করীমে খুব স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, তবে শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো হুকুমে যখন মতভেদ হবে তখন আনুগত্য করতে

হবে ততোটুকু যতোটুকুতে আনুগত্য করা নিশ্চিতভাবে হারাম বলে মনে না হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আ'মাশ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে,

'অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে জানা সকল ভালো কাজের ব্যাপারে।'

ইয়াহইয়া আল কাত্তান থেকে উভয়ে আর একটি হাদীস এনেছেন, 'মুসলমান যে কোনো ব্যক্তির জন্যে প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়েই আনুগত্য করা কর্তব্য যতোক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো স্পষ্ট গুনাহের কাজে (আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজের জন্যে) হুকুম না দেয়া হয়। তারপর যখন আল্লাহর না-ফরমানি করার জন্যে কোনো হুকুম দেয়া হবে তা শুনবেও না, মানবেও না।'

উম্মুল হোসাইন (হোসাইন-এর মা)-এর প্রতি বরাত দিয়ে মুসলিম শরীফে একটি হাদীস এসেছে,

'যদি তোমাদের ওপর কোনো দাসকে (যে ব্যক্তি কোনো সময়ে দাস ছিলো এমন ব্যক্তিকে) নেতা নিয়োগ করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কেতাব অনুসারে পরিচালনা করো, সে অবস্থায় তার কথা মেনে চলো এবং তার আনুগত্য করো।'

ইসলাম এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর বিধান ও রসূল (স.)-এর সুন্নত পালন করার ব্যাপারে আমানতদার (বিশ্বস্ত) বানিয়েছে, তার ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারেও আমানতদার বানিয়েছে, তার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির ওপরও আমানতদার বানিয়েছেন এবং আমানতদার বানিয়েছেন তাকে দুনিয়া- আখেরাতের সকল কাজের ব্যাপারে। তাকে আল্লাহ তায়ালা এক বন্য জন্তু বানাননি যে তাকে এখানে ওখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বা থাকতে বলা হবে আর সে শুনবে ও মানবে! মানুষের জন্যে স্পষ্ট পথ খুলে রাখা হয়েছে এবং স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে তাকে আনুগত্যের সীমা সম্পর্কেও এবং যে আইন কানুন সে মেনে চলবে এবং রসূল (স.)-এর যে পদ্ধতি তাকে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা এক ও অভিন্ন, সেখানে আন্দায অনুমান করে চলার জন্যে কাউকে বলা হয়নি!

পারস্পরিক মতভেদ নিরসনে কোরআনের মূলনীতি

যে ব্যক্তি অথবা যে সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতির বিভিন্নতায় এমন কোনো সংকটে বা সমস্যায় পড়েছে যে কোরআন হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বিধান জানতে পারেনি অথবা আদৌ সে বিষয় কোনো বিধান আসেনি, আর এ কারণে বিষয়টির মীমাংসার ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিয়েছে, সে অবস্থায়ও তাকে দিশেহারা হয়ে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়নি, তাকে সত্য মিথ্যা বাছ বিচার করার মতো কোনো মানদন্ড দেয়া হয়নি- এমনও নয়। ছোট বড় যে কোনো বিষয়ে আইন কানুনবিহীনভাবে সে চলবে, এমন অবস্থায়ও তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তাই আলোচ্য ছোট্ট আয়াতটিতে সর্বাবস্থায় তার করণীয় কি হবে তার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে; যার ওপর চিন্তা ভাবনা করলে সে যে কোনো সমস্যা সমাধানের রূপরেখা লাভ করতে পারবে,

'তারপর যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন সে ব্যাপারটিকে সমাধানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের দিকে ফিরিয় দাও।'

বিবাদমান বিষয়টিকে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুরূপ সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বিধানের দিকে এবং সেই আলোকে সতর্কতার সাথে এমনভাবে সমাধান বের করা যা কোরআন ও হাদীসের মূলনীতির বিপরীত না হয় অথবা মানবকল্যাণ বিরোধী না হয়। আসলে, এ কথা সত্য যে, মানুষের জীবনকে ভাসমান অবস্থায় অথবা দিশেহারা হয়ে চলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছেড়ে দেননি, আর এমনও নয় যে, তারা তাদের জীবনের আইন কানুন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে নেবে এবং এমন অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যেও তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, বুদ্ধিহারা হয়ে তারা সমস্যার জটিলতার কারণে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকবে; যেমন

কোনো কোনো ধোঁকাবাজ বা প্রবঞ্চনাকারী বলতে চেয়েছে যে, এই দ্বীন ইসলামের মধ্যে স্পষ্ট করে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে মাত্র, যা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর। তাদের কথায় 'এ দ্বীন মানুষকে একটি সীমা বা ঘোরের মধ্যে আবদ্ধ করে দিলেও এর মধ্যে এমন অনেক ফাটল বা ছিদ্রপথ আছে যা মুসলমানদের মযবুত বিবেকের কাছে গোপন নেই এবং এই দ্বীনকে পরিমাপ করায় জীবনের নানা সমস্যায় খাপ খাওয়ানোর জন্যে সেগুলো যথেষ্ট। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।'

আল্লাহর প্রতি ঈমানের বাস্তব প্রকাশ হচ্ছে, নিসংকোচে ও বিনা যুক্তিতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা, নিরংকুশভাবে রসূল (স.)-এর পদাংক অনুসরণ করা এবং আল্লাহর বিধান ও রসূলের সুন্নত যারা মেনে চলে এমন নেতার আনুগত্য করা এবং মতভেদ সম্বলিত বিষয়সমূহের সমাধানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, এই কাজগুলো যারা করবে তাদেরই আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখেরাত দিবসের ওপর ঈমানের দাবী গ্রাহ্য হবে। যেহেতু এর চাহিদা এটাই যে, বাস্তবে মানুষ বিনা দ্বিধায় আল্লাহর কথা মেনে নিক, রসূলের পুরোপুরি আনুগত্য করুক এবং এসব নেতৃবৃন্দেরও পুরোপুরি আনুগত্য করুক যারা নিজেরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের বিধান মোতাবেক অপরকে চালাতে চায়, আর যখনই সেসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে কারো সাথে কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হবে তখন সে বিষয়ের ফয়সালার জন্যে কোরআন ও হাদীসে কি রূপরেখা দেয়া হয়েছে তা খুঁজে বের করে সেই অনুসারে যেন তারা ফয়সালা করে নেয়। এটিই আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমানের শর্ত যেহেতু এই কাজগুলোই ঈমানদারদের কাছে দাবী করা হয়েছে।

সুতরাং সর্বপ্রথম এই শর্তের অনুপস্থিতি ঘটলে বুঝতে হবে, তার ঈমান নেই। দ্বিতীয় যখনই দেখা যাবে কেউ ঈমানের প্রভাব থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দূরত্বে সরে রয়েছে তখন তারও ঈমান নেই বলে মনে করা হবে।

কোরআনে করীমের জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যটির মধ্যে সাফল্যের জন্যে কিছু শর্ত পেশ করার পর উৎসাহ উদ্দীপনা জাগানোর উদ্দেশ্যে পুনরায় উপদেশ দান করা হচ্ছে, যেমন ইতিপূর্বে আল্লাহর মহব্বতে সুবিচার করা ও আমানত ও রক্ষা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'এইটিই উত্তম ও পরিণতির দিক দিয়ে সুন্দরতম পন্থা।'

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্যেই এটিই ভালো কাজ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করলে বুঝা যাবে আনুগত্য করার জন্যে এই নিয়ম মেনে চললেই তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। তবে এ কাজগুলো করার ব্যাপারে এবং নেতৃত্বের আনুগত্য করার এই নিয়ম নীতি অবলম্বনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণ হবে কি না সে বিষয়ে সুষ্টভাবে কোনো কথা আসেনি।

আখেরাতের সে ব্যাপারটি তো আরও অনেক অনেক ভীতিজনক এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যার চিন্তা এখানে দেয়া হয়নি; বরং আখেরাতের চেতনা দান করায় দুনিয়ার কল্যাণ ও ব্যক্তি এবং দলীয় জীবনে যে কল্যাণ রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই কর্মসূচীর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যেন সেই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে যা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর নির্মাতা, তিনিই বিজ্ঞানময়, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই সবকিছু

দেখেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন। এ কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে, মানুষের অজ্ঞতার মতো কোনো দুর্বলতা এ কর্মসূচীতে নেই। নেই কোনো অযৌক্তিক আবেগ উচ্ছাস বা ত্রুটি, নেই এমন কোনো যথেচ্ছার যা কারো অধিকার খর্ব করতে ভূমিকা রাখে। এ কর্মসূচীতে কোনো বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তি, শ্রেণী, গোত্র, কোনো মানব প্রকৃতি বা বিশেষ কোনো যামানার মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে তা নয়, অথবা বিশেষ কোনো যুগের মানুষকে অন্যান্য যুগের মানুষ থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে, তাও নয়, কারণ আল্লাহ তায়ালা তো সারা বিশ্বের সবার প্রতিপালক, মালিক ও মনিব আর এমনও নয় যে তিনি কারো সাথে আগে থেকে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আছেন। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে উর্ধে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বিনিময়ে এ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তা নয়। বিশেষ মানবগোষ্ঠী, শ্রেণী অথবা কোনো জাতি, কোনো বিশেষ ধরনের মানুষ অথবা কোনো বিশেষ যুগের মানুষের সাথে তাঁর বিশেষভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

মানুষকে যতো প্রকার সুবিধা দান করা প্রয়োজন তার জন্যে আল্লাহর নিজস্ব এক পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু তিনিই সৃষ্টিকর্তা, এ জন্যে তার প্রকৃতির চাহিদার ধরন কেমন এবং তার প্রকৃত চাহিদাই বা কি তা সঠিকভাবে জানা একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব, যেমন করে একমাত্র তিনিই জানেন মানুষের অন্তরের ঝোঁক প্রবণতা কি ও কোন সংকটাবর্তে সে ঘুরপাক খায় আবার তার থেকে বাঁচার উপায়ই বা কি। তাকে কোন কোন পদ্ধতিতে সম্বোধন করতে হবে এবং তাকে সংশোধনের উপায়ই বা কি তা একমাত্র তিনিই জানেন। মহান সে সত্ত্বা যিনি সব বিষয়ে পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হন না। দিশেহারাও হয়ে যান না। আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধে। মানুষের জন্যে কোন পথ ও পদ্ধতি উপযোগী তার খবর আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে সবই সংরক্ষিত রয়েছে। এ যেন এক সীমাহীন মরুভূমিসম অভিজ্ঞতা। এই কঠিন অভিজ্ঞতা অর্জন করা বা এতো প্রশস্ত জ্ঞান গবেষণা করতে গিয়ে মানুষ যখন ভুল করে, তখনই আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করেন না। মানুষ তো মনে করে বস্তুগত ময়দানে তারা যা ইচ্ছা তাই আবিষ্কার করতে পারে। অবশ্যই বস্তুত এ জগৎ মানুষের জগৎ, মানুষের জ্ঞান গবেষণার জন্যে অত্যন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র, এক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর বিস্তর সুযোগ রয়েছে; কিন্তু অসংখ্য জটিল পথের মধ্যে থেকে তার জন্যে উপযোগী ও সঠিক পথ খুঁজে বের করর ব্যাপারে তার বুদ্ধিকে বড় মনে করবে বিধায় তারা স্থায়ী কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না।

মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালাই তার সৃষ্টিকর্তা। তিনি সেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, যার মধ্যে মানুষ বাস করে।

অতএব, মানুষের জন্যে, বিশ্বের সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি জীবন বিধান রচনা করে দেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই তিনি বহন করেন। এমতাবস্থায় সৃষ্টির সেরা এই মানুষ ঝগড়া ফ্যাসাদ করতে থাকবে আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকবেন অথবা খুশীবোধ করবেন এটা কখনোই হতে পারে না বরং তখনই তিনি খুশী হবেন যখন দেখবেন মানুষ তাঁর দেয়া বিধান জেনে বুঝে তার সত্যতা স্বীকার করছে এবং তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এ পথ অবশ্যই তাকে সঠিক পথ দেখাবে এবং যখন সে সংকটাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকবে তখন এই জীবন পদ্ধতিই তাকে উদ্ধার করবে।

চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে আর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে ভাবা প্রয়োজন। যিনি তাকে নানা প্রকার গোলক ধাঁধার মধ্যে থেকে বের করে এনে সঠিক পথে পরিচালনা করছেন এবং সকল ব্যাপারে তাকে নিজ অদৃশ্য হাত সাহায্য করে চলেছেন, অবশ্যই জ্ঞান রূপ এ নেয়ামত দ্বারা তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন এবং জীবন পথে তার বুদ্ধিকে ব্যবহার করার জন্যে তিনি তার জন্যে বিস্তর সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে আগত বার্তা (কোরআনী ভাষা)সমূহের ওপর চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রেও তাকে তিনি এ সুযোগ দিয়েছেন, তারপর আরও ইখতিয়ার দিয়েছেন যে কোনো প্রচলিত রসম রেওয়ায বা কোনো মনীষীর সেই সব কথাকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়ার যা কোরআনের মূল শিক্ষা ও মানুষের কল্যাণের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আসলে এই স্বাধীন বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা দান' মানুষের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মূল জিনিস। এ ব্যাপারে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা আর বস্তুগত আবিষ্কার উদ্ভাবনের জন্যে চেষ্টা-সাধনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এটাই কল্যাণকর ও পরিণতি বিবেচনায় সুন্দরতম পথ ও পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালা সত্য সঠিক কথাই বলেছেন।'

মানবরচিত আইনের কাছে বিচার চাওয়াই হচ্ছে তাগুতের অনুসরণ

ঈমানের শর্ত ও ইসলামের সীমারেখা সম্পর্কিত আলোচনা, মুসলিম উম্মাহর জন্যে মৌলিক জীবন ব্যবস্থা, আইন কানুন, এ সবের উৎস এবং এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ ও সাধারণ মূলনীতির বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। এরপর আলোচনা আসছে সেসব লোক সম্পর্কে যারা ঝুঁকে থাকে সেই সব লোকের দিকে যারা দ্বীন ইসলামের মূলনীতি থেকে দূরে সরে গেছে, আর এর পরেও তারা মনে করে যে, তারাই মোমেন; অথচ তারা প্রকাশ্যভাবে ঈমানের শর্ত ভংগ করে এবং ইসলামের সীমা লংঘন করে। এই সীমা লংঘনকর আচরণ ও কাজ তখনই সংঘটিত হয় যখন তারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন কানুনের কাছে বিবাদমান বিষয়াদির বিচার ফয়সালার জন্যে এগিয়ে যায়। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন শুধু মান্যই করে না, বরং মানুষের তৈরী আইনকে (স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায়) আল্লাহর আইন থেকে ভালো মনে করে। এ জন্যে তারা হচ্ছে 'তাগুত' অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহী। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তাগুত-এর কাছে বিচার পাওয়ার জন্যে যায় অথচ তাদেরকে অস্বীকার করার জন্যেই তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।'

আল্লাহদ্রোহী এসব ব্যক্তির দিকে তারা এই জন্যে ঝুঁকে থাকে যে, ওদের জীবন যাপন, আচার আচরণ এবং ওদের বিভিন্ন অবস্থা তাদেরকে মুগ্ধ করে, আর এ জন্যে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে ওদের তৈরী আইন দ্বারা তারা সুবিচার পেতে চায়; অথবা তাদেরকে তারা ভয় করে, যেহেতু শয়তান তাদেরকে ভুল পথে চলিত করতে চায় বলেই সে আল্লাদ্রোহীদের আতংক এদের অন্তরে জমিয়ে দেয়। যখন তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে আগত আয়াতগুলোর দিকে আহ্বান জানানো হয় এবং রসূলের আনুগত্য করতে বলা হয় তখন তারা দূরে সরে যায় এবং আল্লাহর কথাগুলোকে বাধাদান করে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে। এই বাধাদানকেই নেফাক বা মোনাফেকী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন করে তাগুতী শক্তির কাছে বিচার ফয়সালা চাইতে যাওয়াকে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শামিল মনে করা হয়েছে, বরং এই মানষিকতা যারা রাখে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আদৌ ঈমান আনেনি। যেহেতু এসব মিথ্যা ক্ষমতাধরদের আনুগত্য করার জন্যে তারা যে সমস্ত খোঁড়া ওযর পেশ করতে চায় সেগুলো কোনো যুক্তিতেই টেকে না এবং এসব ওজুহাত তাদেরকে ভীষণ মুসিবত ও চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এতদসত্তেও রসূল (স.) তাদেরকে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তারপর এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে, তাদেরকে পাঠানোই হয়েছিলো যেন মানুষ তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে। এরপর পুনরায় স্পষ্ট আয়াত দ্বারা ঈমানের শর্ত ও ইসলামের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখছো সেসব ব্যক্তিকে যারা মনে করে, তারা ঈমান এনেছে তোমার ওপর ও তোমার পূর্বে .... আর শয়তান তো চায়ই তাদেরকে বহু দূরের ভুল পথে নিয়ে যেতে।' (আয়াত ৬০)

আবার যখন তাদেরকে বলা হয়,

'এসো সেসব জিনিসের দিকে যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের ..... হয় আর সর্বান্তকরণে খুশী মনে সে ফয়সালা মেনে না নেয়।' (আয়াত ৬১-৬৫)

কোরআনের আয়াতগুলোতে মোনাফেকদের সামগ্রিক কাজ ও ব্যবহারের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তাতে হিজরতের পর পরই মোনাফেকদের বিভিন্ন আচার আচরণ ফুটে উঠেছে। এ সময় মদীনা ও তার উপকণ্ঠে অবস্থিত ইহুদীরা মোনাফেকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো, যাতে করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানোর জন্যে তাদের কাছ থেকে ওরা প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করতে পারে।

ওরা ছিলো মোনাফেকদের বিশেষ একটি দল, যারা নিজেদের মধ্যে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে শরীয়তের আইনকে বাদ দিয়ে আল্লাহদ্রোহী শক্তি ইহুদীদের কাছে যাওয়া পছন্দ করতো। আলোচ্য অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াতে এমনই একটি আচরণের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। এ সময় ইহুদীদের একটি দলকে স্পষ্টভাবে আহ্বান জানানো হয়েছিলো, তারা যেন তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের ফয়সালার জন্যে আল্লাহর কেতাবের দিকে এগিয়ে আসে। তারপরও তারা কখনো কখনো তাওরাতের ফয়সালা চাইতো আর কখনো রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আসতো। এ সময় কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর ফয়সালার জন্যে তারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে তৎকালে প্রচলিত জাহেলী রীতি নীতির আশ্রয় নিয়েছে; তাই ওদের সম্পর্কে আল্লাহর উচ্চারিত কথাটিকেই তারা গ্রহণ করতে পারছে না, যাতে বলা হয়েছে

'ওরা মনে করে ও দাবীও করে যে, তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে এবং এমন সব কথার প্রতিও যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো।'

আর (আমাদের জানা আছে যে ইহুদীরা মানতোও না এবং দাবীও করতো না যে তারা রসূল (স.)-এর প্রতি এবং তার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ কথাগুলোকে বিশ্বাস করে [যেহেতু সকল নবী রসূল (স.)-এর ওপর ঈমান আনাই ইসলামী আকীদার দাবী।

আর এসব ঘটনা হিজরতের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে, যেহেতু তখনও বনু কোরায়যা ও বনু নযীর ইহুদী গোত্রদ্বয়ের শক্তি পুরোপুরি চূর্ণ হতে পারেনি এবং ইহুদীদের পতনের পূর্বে মোনাফেকদের অবস্থা দুর্বল হয়নি।

অবস্থা যাই হোক না কেন, আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে আমরা ঈমানের পরিপূর্ণ, সূক্ষ্ম ও অকাট্য সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারছি এবং ইসলামের সীমানাও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি। উপরন্তু আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে আসা স্পষ্ট সাক্ষ্য পেয়ে যাচ্ছি যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের কাছে না এসে অন্যদের কাছে বিচার মীমাংসা পেতে চায় তারা পুরোপুরি মোনাফেক

'অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে অস্বীকার করার জন্যে।'

যেহেতু আল্লাহর শপথ বাণী রয়েছে যে, তারা ঈমানের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তাদেরকে তখন পর্যন্ত মোমেন মনে করা যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা রসূল (স.)-কে তাদের বিবাদ বিসম্বাদে বিচারকর্তা মেনে নেবেএবং তাঁর হুকুমের পুরোপুরি আনুগত্য না করে। সত্যিকারে মোমেন হতে চাইলে তাঁর ফয়সালাকেই সন্তুষ্টির সাথে চূড়ান্ত ফয়সালা বলে মেনে নিতে হবে। অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তি সহকারে এবং পরিপূর্ণ খুশীর সাথে রসূল (স.)-এর সিদ্ধান্তকে নিজেদের জন্যে কল্যাণকর বলে মানতে হবে, কোনো মজবুরীর অনুভূতি নিয়ে নয়; একমাত্র এভাবেই পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখোনি সেই সব ব্যক্তিকে যে দাবী করে ..... তাদেরকে সত্য থেকে বহুদূরে নিয়ে যাবে।'

তুমি কি এই আশ্চর্যের বিষয়টি সম্পর্কে একটু খেয়াল করে দেখোনি যে, একটি জনগোষ্ঠী দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে, তারপর এক মুহূর্তের মধ্যেই তারা নিজেরাই সে দাবীর বিপরীত কাজ করে এবং সে দাবী ভংগ করে। সে জাতির দাবী হচ্ছে যে, তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবী রসূলদের কাছে অবতীর্ণ যাবতীয় জিনিসকে তারা বিশ্বাস করে। এরপর বিবদমান অনেক বিষয়ের মীমাংসার জন্যে তারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রেরিত আইন কানুনের দিকে রুজু করে না বরং বাস্তব জীবনে বিচারক মানে তারা অন্য কাউকে, অন্য পদ্ধতিতে। তারা চূড়ান্ত ফয়সালাদাতা হিসেবে গ্রহণ করে এমন আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে যারা বিচার ব্যবস্থার নীতি হিসেবে তোমার কাছে অবতীর্ণ ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অবতীর্ণ আল্লাহর আয়াতসমূহকে গ্রহণ করে না। তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো জীবন পদ্ধতি নেই, নেই তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অবতীর্ণ কেতাব থেকে গৃহীত কিছু। তাদের হাতে সত্য মিথ্যা বা ভালো মন্দ যাচাই করার মতো কোনো মাপকাঠি নেই। তাদের কাছে যা আছে তা হচ্ছে তাগুত-আল্লাহদ্রোহী বা আল্লাহ তায়ালা বিরোধী শক্তি; এই আল্লাহদ্রোহী শক্তি, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ক্ষমতার কিছু অংশের অধিকারী বলে নিজেকে মনে করে, কিন্তু সে শক্তি কোনো একটি মযবুত মানদন্ডের উপরে টিকে থাকে না বা টিকে থাকতেও পারে না। আর এইভাবে তাগুতকে যারা বিচারক মনে করে তারা না বুঝে বা না জেনেই যে এমন হঠকারিতা করে তারা নিছক একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কাজ করে তা নয়, বরং তারা নিশ্চিতভাবে জানে ও পুরোপুরি বুঝে যে ওদের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

'আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে অস্বীকার করার জন্যে।'

এই হুকুমের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ও আন্দায অনুমান নেই; বরং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তারা এই হুকুম অমান্য করছে, কাজেই তাদের এ ঈমানের দাবী কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। 'তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবী রসূলদের প্রতি অবতীর্ণ কেতাবের প্রতি তারা বিশ্বাসী' এভাবে তাদের এই দাবী নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শয়তান চায় ওরা গোমরাহ হয়ে যাক এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে এতোদূরে নিয়ে যাক যেন কোনো দিন সেখান থেকে তারা আর ফিরে আসতে না পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর শয়তান চায় তাদেরকে গোমরাহীর বহু দূরবর্তী ব্যবধানে নিয়ে যেতো।'

'শয়তানের শড়যন্ত্র' এইটিই হচ্ছে গোপন কারণ যা তাদেরকে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটিই সেই প্ররোচনা যা তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইমানের শর্ত ও সীমার বাইরে

গিয়ে তাগুতকে বিচারক মানতে উৎসাহিত করে। শয়তানের এই প্ররোচনাই তাদেরকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়, বিশেষ করে অনেক সময় সে ষড়যন্ত্র মুসলিম জামায়াতের জন্যেও সমস্যা হয়ে যায়, তবে তারা বুঝতে পারে কে তাদের অন্যায় কাজে প্ররোচনা দিচ্ছে এবং মযবুত ঈমান থাকার কারণে আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং তারা যে কোনো অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে থেমে যায়।

মানুষের প্রকৃতি ও মোনাফেকদের আচরণ

এ প্রসংগে আরো আলোচনা এগিয়ে চলেছে, এগুলো তাদের গুনাবলীর বর্ণনা করছে। তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে এই মহাবাণীর দিকে যা তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে এবং তার পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল করেছিলেন। সেই দল হচ্ছে তারা যারা দাবী করে যে তারা ঈমান এনেছে।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর নাযিল করা কেতাবের দিকে ও রসূলের দিকে তখন দেখবে তারা তোমার থেকে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

সোবহানাল্লাহ এ কি আশ্চর্য! নেফাক বা কপটতা এমন এক জিনিস যার চেহারা মোনাফেক ব্যক্তির নিজের কাছেই খুলে যায়, সে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে এবং নিজেও সে বুঝে যে, সে মোনাফেকী করছে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ হচ্ছে মোমেন এবং ঈমান আনা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সে যা বিশ্বাস করে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিচারপ্রার্থী হয় এবং যে মানব সত্ত্বাকে সে বিশ্বাস করে তার কছেই বিচারপ্রার্থী হওয়াটাও তার জন্যে স্বাভাবিক প্রবণতা। সুতরাং যখন সে দাবী করে যে, সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারপর যখন তাকে তার কোনো বিষয়ে বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহর আইনের দিকে ডাকা হয়, তাঁর দেয়া আইন মানতে বলা হয় এবং তাঁর জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করার দিকে ডাকা হয়, যাঁর ওপর তার ঈমান রয়েছে তখন স্বভাবগতভাবেই পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সে এ আহ্বানে সাড়া দেয়। যদি সে যথাযথভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় এবং অস্বীকার করে তাহলে বুঝতে হবে, সে তার স্বাভাবিক প্রকৃতিরই বিরোধিতা করছে এবং তখন নিজের কাছেই তার মোনফেকী আচরণ ধরা পড়ে যায়, সে নিজেই বুঝতে পারে, যে ঈমানের দাবী সে করেছিলো সে দাবীকে সে নিজেই মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।

এইভাবে একদল মানুষ তাদের স্বভাব প্রকৃতির ডাকেই প্রথমত আল্লাহকে বিচারক বলে মেনে নেয়, তারা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে যখন কোনো বিচার ফয়সালার প্রয়োজন হয়, তখন তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের কাছে তাদের বিচার ফয়সালার জন্যে আসতে চায় না, বরং সার্থরক্ষার জন্যে তখন তারা আল্লাহর আইন মানা থেকে বিরত থাকে।

তারপর মোনাফেকদের নানাপ্রকার ব্যবহারের মধ্যে থেকে মোনাফেকীর চিহ্নস্বরূপ কিছু লক্ষণ তুলে ধরা হচ্ছে। এসব লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো যখন আল্লাহর কেতাব ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার আহবানে সাড়া না দেয়ার কারণে, অথবা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রদর্শনে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো ও তাদের ওপর নানা প্রকার বিপদ আপদ এসে পড়েছিলো। সেসব বিপদ মুহূর্তে তারা যে ওজুহাত ও ওযর আপত্তি করেছিলো, তারই কারণে তাদের মোনাফেকীকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং বলো তাদের অবস্থা কেমন হবে .... এই পদক্ষেপ নিয়েছিলাম।' (আয়াত ৬২)

বাস্তবিকই তাদের ওপর সেদিন সীমাহীন বিপদ এসে পড়েছিলো যখন মুসলিম সমাজে তাদের মোনাফেকী প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিলো, মুসলিম সমাজ থেকে ছাঁটাই করে তাদেরকে

একঘরে করে দেয়া হয়েছিলো, তাদের সাথে সর্বপ্রকারের লেনদেন এবং সম্পর্ক স্থাপন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো এবং গোটা সমাজের কাছে তারা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হয়ে পড়েছিলো, যারা আল্লাহর কেতাব ও রাসূলের ফয়সালাকে বড়ো মনে না করে অন্যদের ফয়সালাকে বড়ো মনে করেছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ফয়সালাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়ার আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো, আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিদের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলো, মুসলিম সমাজের পক্ষে তাদের সহ্য করা সম্ভব ছিলো না। একমাত্র তাদের কাছেই ওদের সম্মান পাওয়া সম্ভব ছিলো যাদের না ছিলো ঈমান, না ছিলো তাদের ইসলাম। সেই সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে যাদের কাছে ঈমান ও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবীটুকু ছাড়া আর কিছু নেই, নেই তাদের কাছে নামকা-ওয়াস্তে মোমেন ও মুসলমান হওয়া ছাড়া বাস্তবে ইসলামের কোনো গন্ধ!

অথবা মুসিবত তাদের ওপর এইভাবেও এসেছে যে, তারা কোনো যুলুম করেছে এবং এই যুলুমের ফল তাদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে। যেহেতু আল্লাহর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বহু বিষয়ের ফয়সালার জন্যে তারা গিয়েছে আল্লাহদ্রোহী যালেমদের কাছে, যার ফলে তাদের এই আচরণ বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে এসেছে।

অথবা, তাদের যুলুমের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা অথবা শাস্তি হিসেবে বিপদ এসেছে, যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়, গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সঠিকপথ অবলম্বন করতে পারে।

মুসিবত আসার কারণ যাই হোক না কেন, কোরআনের আয়াত ঘৃণাভরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে,

'তখন তাদের কি অবস্থা হয়! এরপর কেমন করে তোমার কাছে ফিরে আসবে?'

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এবং ভালো বিবেচিত হওয়ার প্রচেষ্টায় তারা হলফ করে করে বলবে, 'আমরা একমাত্র এহসান করার উদ্দেশ্যে এবং ভালো কাজ করতে সক্ষম হবো বলেই অন্যের কাছে ফয়সালার জন্যে গিয়েছিলাম।

যা-ই তারা বলুক না কেন এবং যতো প্রকার ওজুহাতই তারা পাশ করুক না কেন, তাদের অবস্থা ছিলো তাদের নিজেদের কাছেই লজ্জাজনক এবং বড়ো লাঞ্ছনাকর। যখন তারা তাদের কৃতকর্মের ভ্রান্তি এবং অপরাধের গুরুত্ব বুঝেছিলো তখন রসূল (স.)-এর সামনে যেতে তারা ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলো। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তারা মনে কোনো শক্তিই পাচ্ছিলো না, মিথ্যা শপথ করার তীব্র গ্লানি তাদেরকে তিলে তিলে দহন করছিলো। যেহেতু তারা ভালো করেই বুঝছিলো যে, তারা আল্লাহদ্রোহী শক্তির কাছে গিয়েছিলো বিচারপ্রার্থী হয়ে। তাদের বিবেক তাদেরকে এ কথাও জানাচ্ছিলো যে, এহসান ও তাওফিকের ওজুহাতে অন্যত্র বিচারপ্রার্থী হওয়া এটা ছিলো নিছক ধোঁকাবাজি ও মিথ্যা ওযর যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে দূরে সরে যেতে চায় তারাই এই ধরনের মিথ্যা ওযর সৃষ্টি করে। আসলে তারা যে বিভিন্ন সংকট, কষ্ট এবং কঠিন ত্যাগ তিতিক্ষাকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছিলো এ কথা তাদের কাছেও অবিদিত ছিলো না। এ জন্যে নানা প্রকার মিথ্যা ওজুহাত ও ভুলের দোহাই তারা দিচ্ছিলো। বরাবর সত্য বিরোধীরা এ রকমই ভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে পেরেশান হয় এবং নিজেরাই নিজেদেরকে অশান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করে। যারা প্রকৃত মোমেন নয় অথচ ঈমানদার হওয়ার দাবী করে, তারাই এসব কূটতর্ক করে অন্যদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। মোনাফেকদের কর্মপন্থা অতীতে এ রকমই ছিলো, ভবিষ্যতেও এরকম থাকবে এবং বরাবর তাদের আচরণ একই ধরনের হয়ে থাকবে।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন এবং তাদের সম্পর্কে রসূল (স.) কে পুরোপুরিভাবে অভিহিত করে দিচ্ছেন যেহেতু তিনিই ভালো করে জানেন ওদের মনে ওরা কি লুকিয়ে রাখে। এতদসত্তেও তাদেরকে মোলায়েম কথা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে এবং সর্বোতভাবে সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তো সেই সব ব্যক্তি যাদের অন্তরের মধ্যে কি অবস্থা বিরাজ করছে তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন; সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে উপদেশ দাও এবং বলো এমন কথা যা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।'

ওরা তো সেই সব ব্যক্তি যারা তাদের মনের কথা ও ইচ্ছাকে গোপন রাখে, নানা প্রকার তর্ক দ্বারা বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে এবং নানাপ্রকার ওজুহাত পেশ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো তাদের অন্তরের গোপন কন্দরে লুক্কায়িত কথাগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাদের বিবেককে যে সমস্ত আত্মগ্লানি দংশন করে তা সবই তিনি জানেন। তবুও সে সময়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোনাফেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, তাদের ত্রুটিগুলোর দিকে না তাকানো এবং তাদের সাথে নরম কথা বলার প্রয়োজন ছিলো, উপরন্তু জরুরী ছিলো সদুপদেশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা চালানো। 'তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলো' (যা তাদের অন্তরে গেঁথে যায়)। আল্লাহর কথাগুলো যেনো সরাসরি প্রবেশ করছে তাদের অন্তরের গভীরে।

রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

এসব মিষ্টি মধুর কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মোনাফেকী পরিত্যাগ করে সত্য সঠিক পথে ফিরিয়ে আসার জন্যে উৎসাহিত করছেন। মহব্বতের সাথে তিনি চাইছেন যেন তাও এ ভ্রান্ত বান্দারা তাওবা করে ভুল পথ থেকে ফিরে এসে দৃঢ়ভাবে আলোকোজ্জ্বল পথ অবলম্বন করে এবং পরম প্রশান্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করে। যদিও ইতিপূর্বে তাদের তাগুতি শক্তির কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ার প্রবণতা এবং রসূল (স.) থেকে দূরে সরে যাওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তবু তাদের জন্যে তাওবার দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে, যে কোনো সময় তারা ফিরে আসতে পারে। যদি তারা তাওবা এস্তেগফার করে একমাত্র আল্লাহর আইন মেনে চলতে ও রসূল (স.) কে তাদের বিবাদমান বিষয়সমূহের ফয়সালাকারী বলে মানতে সংকল্পবদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে পাবে এবং অকুণ্ঠচিত্তে রসূল (স.)ও তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন যেন তাদের তাওবা কবুল হয়। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ মেনে চলা ও রসূল (স.) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন। এরপর কোনো ব্যাপারেই তাঁর বিরোধীতা না করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পুরোপুরীভাবে মেনে চলতে হবে। এমন না হয় যে তাদের নিরর্থকভাবে শুধু ওয়ায করেই যাওয়া হবে এবং সঠিক পথের দিকে ডেকেই যাওয়া হবে, কিন্তু তার প্রতি তারা কোনো সাড়া থাকবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

আর আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি, একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠিয়েছি,.... আল্লাহ তায়ালাকে তাওবা কবুলকারী মেহেরবান হিসেবে পেতো।' (আয়াত ৬৪)

এই হচ্ছে আয়াতটির মর্মার্থ। রসূল (স.) কে শুধুমাত্র একজন ওয়ায়েয বা উপদেশদাতা হিসেবেই পাঠানো হয়নি, যে তিনি উপদেশবাণী পৌঁছে দেয়ার পর চলে যাবেন, আর তাঁর কথাগুলো বাস্তবে কোনো ফলদায়ক না হয়ে শুধু বাতাস উড়তে থাকবে। ধোঁকাবাজরাই ধর্মের প্রকৃতি ও রসূলদের কর্মধারা সম্পর্কে এমন কথা বলে থাকে। যারা কোনো যুক্তি প্রমাণসহ কথা বলে না, যারা 'দ্বীন' বুঝে না অথবা স্বার্থ নষ্ট হবার ভয়ে বুঝতে চায় না তারাই সম্পর্কে এইভাবে কথা বলে থাকে। দ্বীন ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্যে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, বাস্তব

জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে প্রদত্ত এ জীবন ব্যবস্থা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ। এ জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সাংগঠনিক যে নিয়ম গ্রহণ করা হয়েছে, উপস্থাপনের জন্যে যে ক্রমিক ধারা অনুসরণ করা হয়েছে, যেভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে এ ব্যবস্থাকে চালু করার জন্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা প্রয়োগের যে সহজ স্বাভাবিক পন্থা ও নিয়ম শৃংখলা গ্রহণ করা হয়েছে, এ ব্যবস্থার মধ্যে এবাদাত ও নিয়মতান্ত্রিক কাজের যে ধারা চালু করা হয়েছে এবং যেসব প্রতীকী কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে– এসব কিছু বিবেচনায়ও এ ব্যবস্থা পূর্ণাংগ।

এ সকল কাজকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো রসূল (স.)-কে ক্ষমতা দান করার, এমন ক্ষমতা যার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া আইন কানুনকে মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। মানুষকে সে ব্যবস্থা মানতে এবং জীবনে প্রয়োগ করতে বাধ্য করা যায়। এজন্যেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন যেন তাঁরই হুকুম অনুসারে এবং তাঁর প্রেরিত শরীয়ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তাদের আনুগত্য করা হয়। যে কোনো রসূলকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য ছিলো যেন মানুষ তাদের আনুগত্য করে, কেননা তাদের আনুগত্য মানেই আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদেরকে শুধুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্যে অথবা আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কিছু নিয়ম-কানুন মানা বা প্রতীকী কিছু এবাদত করানোর জন্যেই পাঠাননি। অবশ্য আমাদের সমাজে দ্বীন সম্পর্কে এ ধরনের কিছু ধারণা বিরাজমান রয়েছে যা রসূলদের পাঠানোর উদ্দেশ্যের সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। এ ধারণার মধ্যে দেখা যায় জীবনের জন্যে ইসলামের নির্দিষ্ট সামান্য কিছু নিয়ম কানুন মানাই যথেষ্ট। তাই যদি হবে তাহলে রসূলের দায়িত্ব নিছক ওয়ায নসীহতের পর্যায়ে এসে যাবে। তিনি আসবেন সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠে ওয়ায নসীহত করবেন এবং চলে যাবেন। এতে কেউ তাকে মিথ্যাবাদী বলবে, খারাপ জানবে, বোকা ঠাওরাবে এবং কেউ বা তার সাথে দুর্ব্যবহার করবে।

কিন্তু ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে একাধারে রসূল (স.) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন মুসলমানদেরকে সংগঠিত করেছেন ও শাসক হিসেবে বিভিন্ন সমস্যার বিচার ফয়সালা করেছেন। তারপর তাঁর অবর্তমানে রসূল (স.)-এর খলীফা বা প্রতিনিধি হয়ে তাঁর অনুসারীরা তাঁর রেখে যাওয়া কাজকে এগিয়ে দিয়েছেন এবং শক্তি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের আইন কানুনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে করে চিরদিন রসূল (স.)-এর নেতৃত্ব ও আল্লাহর আনুগত্য কায়েম থাকে। ক্ষমতা লাভ ও প্রয়োগ এ দুই জিনিসকে বাদ দিয়ে যা থাকবে তাকে ইসলাম বলা যাবে না অথবা তার নাম সেই দ্বীন হবে না- যা নিয়ে আল্লাহর রসূল এসেছিলেন। প্রকৃত 'দ্বীন' হচ্ছে রসূল (স.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য, অন্যভাবে বললে বলা যায় পরিপূর্ণভাবে তাঁর পদাংক অনুসরণ করা। তিনি যেভাবে আল্লাহর 'দ্বীন' কে পেশ করেছিলেন এবং যেভাবে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে সংগঠিত করেছিলেন সেই একই পদ্ধতিতে আজকের মুসলমানদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এরপর এই উপস্থাপন পদ্ধতি কালক্রমে পরিবর্তিত হবে ঠিকই, কিন্তু দ্বীনের মূল বুনিয়াদ ব্যতীত দাঁড়াতে পারবে না, আর তা হচ্ছে আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এরপর রসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পথ পরিক্রমায় আল্লাহর আইনের দ্বারা বিচার ফয়সালা চালু করার ব্যবস্থা করা। আল্লাহর নির্দেশেই তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং একমাত্র আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে জানা ও মানা, যা আমরা কালেমায়ে শাহাদাত-এর মাধ্যমে ঘোষণা করি। এইভাবে শাসন ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর– এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা জানানো যে শাসন ক্ষমতায় আল্লাহর সাথে কেউ বিন্দুমাত্র অংশীদার নেই। এমন পৃথিবী নিশ্চিত করতে হবে যেখানে কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা বিরোধী কোনো শক্তির হাতে

শাসন ক্ষমতার কোনো অংশ থাকবে না। নতুন নতুন যেসব সমস্যা আসবে সেগুলোর ফয়সালার জন্যে আল্লাহর দিকে রুজু করতে হবে এবং তিনি সরাসরি কোনো আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়ে ফয়সালা না দিলেও অন্যে যে কোনোভাবে আমাদেরকে তাঁর ফয়সালা নিশ্চয় জানিয়ে দিবেন। যদিও তাতে কিছু মতভেদ আসবে তবুও শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর সাহায্যক্রম ফয়সালা পেয়ে যাবো।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা যদি নিজেদের ওপর যুলুম করার পর.... তাওবা কবুলকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে।'

যে তাওবা করে তার তাওবা আল্লাহ তায়ালা সদা সর্বদাই কবুল করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে রুজু করে তার প্রতি তিনি সর্বদাই মেহেরবান থাকেন। মহাপবিত্র সেই সত্তা তাঁর রহমান রহীম নামের মর্যাদা অবশ্যই তিনি রক্ষা করেন। যারা তার দিকে অপরাধ করার পর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ফিরে আসে, তিনি তাদের তওবা কবুল করেন ও তাদের দয়া প্রদর্শন করেন, আর যারা কোনা অপরাধ করার পর প্রথম সুযোগেই তাওবা করে, তাদের জন্যে রসূল (স.)-এর এস্তেগফার (সুপারিশী ক্ষমা-প্রার্থনা) সংগে সংগে হাযির হয়ে যায় এবং সে সুযোগকে তারা কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর (ক্ষমার) দরজা চিরদিনের জন্যে খুলে যায়, যা কখনোও আর বন্ধ হবার নয়। আর তার ওয়াদা চিরদিনের জন্যে স্থির ও অমলীন যা কোনো দিন ভংগ হবার নয়। সুতরাং যে তার ওয়াদার হকদার হতে চায় সে যেন এগিয়ে আসে, সে যেন সংকল্পবদ্ধ হয়ে সে যেনো আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়।

অবশেষে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর কথা এসে যাচ্ছে আর তা হচ্ছে, মহান ও মহামহীম আল্লাহ রব্বুল ইযযত নিজেই কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত রসূল (স.) কে তাদের সকল ব্যাপার তারা বিচারক না মানবে; তারপর তাঁর ফয়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে ও খুশি মনে না মেনে চলবে এবং ফয়সালা যাই আসুক না কেন তা গ্রহণ করায় মনের মধ্যে কোনো প্রকার সংকট অনুভব করবে না বা মনের মধ্যে তা মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বও থাকবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং না, তোমার রবের কসম খেয়ে বলছি, কিছুতেই তাদের ঈমান কবুল হবে না .... সর্বান্তকরণে মেনে না নেয়।' (আয়াত ৬৫)

এখানে আর একবারও আমরা ঈমানের শর্ত ও ইসলামের সীমারেখা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই সীমানা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন এবং তিনি নিজের অস্তিত্বের কসম খেয়ে, উক্ত অবস্থায় তাদের ঈমান না থাকা ও ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন। এর পরে ঈমানের শর্ত ও ইসলামের গন্ডীর মধ্যে থাকার যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো কথা বলার তো সাধ্য ও অধিকার আর কারো থাকে না বা কোনো ব্যাখ্যারও অবকাশ থাকে না।

এ ব্যাপারে কিছুতেই এ কথা গ্রাহ্য নয় যে, উপরোক্ত কথাটি বিশেষ এক যামানার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ এক জনগোষ্ঠীর সাথে তা বিশেষিত। আসলে এ হচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তির কথা যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বুঝে না ও কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও কোনো জ্ঞান রাখে না। সুতরাং এটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম সত্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা কসম আকারে আসেছে। এ শপথ সর্বপ্রকার শর্তমুক্ত। এ প্রসংগে কারো একথা ধারণা করার সাধ্য নেই যে, রসূল (স.)-এর ফয়সালা বলতে কোনো ব্যক্তির ফয়সালা বুঝায়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহর আইন ও আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন পথ। তাঁর ইন্তেকালের পরে আল্লাহর বিধান ও রসূল (স.)-এর সুন্নাতের সাথে অন্য কিছু যোগ দেয়া যেতে পারে এমন ধারণা করা বা দেয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে মোরতাদদের ব্যাপারে গৃহীত পদক্ষেপ

থেকে আমরা তাই-ই বুঝতে পারি। আরো লক্ষণীয় যে, মোরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে লড়েছেন যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও তিনি সেই একইভাবে লড়েছেন, বরং আরও কঠিনভাবে লড়েছেন। তারা ছিলো যাকাত দান করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং এই অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকেই অস্বীকার করেছিলো। এরা ছিলো মুনকেরীনে যাকাত, যারা রসূল (স.)-এর ওফাতের পর যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে।

ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই ছিলো যে, মানুষ শাসন কাজ চালাবে আল্লাহর বিধান ও রসূল (স.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী। কিন্তু এ কাজ ততোক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট হতে পারে না যতোক্ষণ এ কাজের সাথে আন্তরিকতা যুক্ত না হয়, এই বিশ্বাসকে অন্তর দিয়ে কবুল না করা হয় এবং হৃদয়ের ভালোবাসা ও তৃপ্তি নিয়ে ইসলামের নির্দেশগুলোকে মেনে নেয়া না হয়।

এরই নাম ইসলাম এবং এইই হচ্ছে ঈমান; অতএব ঈমান ও ইসলামের ধারক বাহক হওয়ার দাবী করার পূর্বে মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, সে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করার কোন পর্যায়ে সে অবস্থান করছে।

এরপর চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, রসূল (স.)-কে সার্বিকভাবে এবং সন্তুষ্টির সাথে জীবনের সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্যে ফয়সালাদাতা হিসেবে না মানা পর্যন্ত কারো ঈমান কবুল হবে না। একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, এই জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যেই তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে এবং শরীয়তের এই আইন মানার জন্যেই তাদেরকে বলা হচ্ছে, যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালার জন্যে এই শরয়ী বিধানের দিকে এগিয়ে এসো, অন্য কারো কাছে তোমাদের কোনো বিরোধের ফয়সালার জন্যে বা অন্য কোনো আইনের আশ্রয় নিয়ো না।

একটি সহজ সরল জীবন বিধান

ইসলামের বিচার ব্যবস্থাকে মন প্রাণ দিয়ে এবং সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করা প্রত্যেক মোমেনের জন্যে কর্তব্য। এটিই সহজ পথ এবং কল্যাণকর আইন, এর ফয়সালা মানুষের মধ্যে জাগায় দয়া মহব্বত। এ আইনে কারো প্রতি তার সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না, দেয় হয় না তাকে তার গ্রহণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব এবং এতো বেশী ত্যাগ স্বীকার করতেও তাকে বলা হয় না যা তার জন্যে বড়ই কঠিন হয়ে যাবে। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুর্বলতাসমূহ জানেন, এ জন্যে তিনি এইসব দুর্বলতা থাকায় তার প্রতি রহমত করেন। আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যে যদি মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তা বহন করা তার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যাবে এবং অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সেসব দায়িত্ব কেউ পালনই করতে পারবে না। তিনি তাদেরকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করতে চান না বা তারা কোনো নাফরমানির মধ্যে (নির্দেশ অমান্যকারী হওয়ার অপরাধে) পড়ে যাক তাও তিনি চান না। এ কারণে তাদের জন্যে এমন কিছু কাজ তিনি বাধ্যতামূলক করেননি যা তাদের জন্যে খুবই কষ্টকর হবে। তিনি তাদের জন্যে যে সহজ কাজগুলো বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন সেগুলো তারা যদি মেনে চলে এবং তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো যদি তারা পালন করে তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে বহু কল্যাণ ও শান্তি লাভ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সেইভাবে সাহায্য করবেন যেভাবে হেদায়াত লাভে দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণকারীদেরকে তিনি সাহায্য করে থাকেন। যারা সাধ্যানুযায়ী আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করেন যারা আল্লাহর পথে সংগ্রামী জীবন যাপন করে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি তাদের ওপর আমি বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে এই নির্দেশ দিতাম যে.... আমি তাদেরকে সরল সহজ ও মযবুত পথ প্রদর্শন করতাম।' (আয়াত ৬৬)

অবশ্যই এই পথ সহজ সরল পথ। এই পথ ধরেই সাফল্যের দ্বারে উপনীত হতে পারে প্রত্যেক সাধারণ বিবেকমান মানুষ। এ জন্যে কোনো বিশেষ ও অসাধারণ এমন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই যা অতি অল্প সংখ্যক মানুষ ছাড়া কেউ হাসিল করতে পারে না। আর এটাও সত্য কথা যে এই 'দ্বীন' সে অল্প কিছুসংখ্যক লোকের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আসেনি, বরং এ দ্বীন (ইসলামী জীবন ব্যবস্থা) গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে শান্তি ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এসেছে। আর মানুষ তো হচ্ছে এমন এক খনির সমাহার যার মধ্যে নানা বর্ণের সম্পদ নানা স্তরে সঞ্চিত রয়েছে। তাদের মূল্য ও যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে কাজে লাগানো হয়। এমনি করে এই দ্বীন (পালন করা) সবার জন্যেই সহজ হয়ে পড়ে। এ দ্বীন যা চায় তা মান্য করার জন্যে সবাইকে সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং যে সব অপরাধজনক কাজ নিষিদ্ধ তা পরিহার করাটাকেও কারো জন্যে কঠিন করা হয়নি।

এখন প্রশ্ন আসছে নিজেই নিজেকে হত্যা ও স্বেচ্ছায় নির্বাসন সম্পর্কে। এ দুটি হচ্ছে খুবই কঠিন কাজসমূহের দুটি উদাহরণ। এ হচ্ছে এমন কঠিন কাজ যার নির্দেশ দিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষ কিছুতেই তা পালন করতে পারতো না, সে জন্যেই এ হুকুম দেয়া হয়নি। মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা তো সাধারণভাবে মানুষকে কষ্ট দিতে চান না, তাই তিনি এমন নির্দেশ দেননি যা সাধারণ মানুষ মানতে পারবে না, তিনি এমন কঠিন কাজ চাইতে পারেন না যা না পারার কারণে সাধারণভাবে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যবস্থা দিয়েছেন যা মান্য করা সাধারণভাবে মানুষের জন্যে সবচেয়ে সহজ এবং যে কোনো মানুষের আয়ত্বেরও মধ্যে। আল্লাহ তায়ালা চান ঈমানের এই গণমিছিলে সাধারণ মানুষ শরিক হয়ে যাক। তিনি চান মুসলিম সমাজ, সর্বস্তরের মানুষের সকল প্রকার দুঃখ বেদনা দূরে করে সার্বিকভাবে সমস্যামুক্ত করুক। ইসলামের বিশাল এই গণমিছিলে যারা অংশ নেবে, দুর্বার এ পথ পরিক্রমায় তাদের সবার জন্যে আল্লাহর দ্বীনের এর এই সুন্দর ব্যবস্থাকে সহজসাধ্য ও সাবলীল করে দেয় হয়েছে।

ইবনে জুরায়েয পর্যায়ক্রমে আল মোসান্না, ইসহাক আবুল আযহার, ইসমাঈল ও আবু ইসহাক আস সাবিঈর বরাত দিয়ে একটি হাদীস এনেছেন। আবু ইসহাক বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলে অবশ্যই আমরা তা পালন করতাম, আল্লাহর শোকর তিনি আমাদেরকে মাফ করেছেন। কথাটা নবী (স.)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, নিসন্দেহে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের ঈমান কঠিন পাহাড় থেকেও মযবুত।

ইবনে আবি হাতেম পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা দিয়ে শেষ রেওয়ায়েতকারী আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের পুত্র আমের এর আনীত একটি হাদীস পেশ করেছেন। তিনি বলছেন, যখন এই আয়াতে নাযিল হলো, 'যদি আমি তাদের হুকুম দিতাম তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো' তখন রসূল (স.) বললেন যদি ওদের ওপর নিজেদেরকে কতল করার ও স্বেচ্ছায় নির্বাসনের হুকুম নাযিল হতো তাহলে তা পালনকারীদের মধ্যে উম্মে আব্দ্ও থাকতো।

অন্য আর একটি হাদীসে ওপরের বর্ণনা পরম্পরাসহ শুবায়েহ ইবনে ওবায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল (স.) যখন এই আয়াতটি পড়লেন, 'তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার দিকে ইশারা করে বললেন, যদি আল্লাহ তায়ালা এ কাজটি বাধ্যতামূলক করেই দিতেন তাহলে তা এ ছোট্ট দলটি অবশ্যই পালন করতো।

রসূল (স.) তাঁর লোকদেরকে গভীরভাবে বিশ্বস্ত ও সূক্ষ্মদর্শী এবং উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে জানতেন। তাঁদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ রাসূল (স.) এতো ভালোভাবে জানতেন যা তারা নিজেরাও জানতেন না, সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিত্র ঘাটলে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে রসূল

(স.) প্রদত্ত এসব সাক্ষ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সেসব ব্যক্তি ও গোত্রসম্পর্কে জানা যাবে যারা তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। সেসব নেতার সম্পর্কেও চোখ খুলে দেয়ার মতো বহু ঘটনা জানা যাবে যাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ সংঘটিত করেছিলেন। তিনি নিজ দলের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে যা করেছিলেন তার সবকিছুই আজো অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সব কিছুই তো রয়েছে কিন্তু এগুলোকে কোনো মুসলিম দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়ানো হচ্ছে না।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামের তফাৎ

এখানে এই বিষয়টি অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আমরা শুধু এতোটুকু বলতে চেয়েছি যে, রসূল (স.) তাঁর তৎকালীন উম্মতের মধ্যকার সেইসব লোকদেরকে ভালো করেই জানতেন যারা যে কোনো কঠিন হুকুম যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাতে যতো কষ্টই হোক না কেন। কিন্তু তারা এ কথাও বুঝতেন যে, তাদের মতো নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির জন্যেই শুধু কোরআনের নির্দেশ আসেনি, আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই মানব প্রকৃতিকে জানেন, কেননা তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের শক্তির সীমাবদ্ধতাকে ভালো করেই জানেন। তিনি মানব মন্ডলীর সকলের জন্যে দ্বীন ইসলামের ছোটো৷ বড়ো সমস্ত কাজকে বাধ্যতামূলক করে দেননি, কেননা দ্বীন ইসলাম এসেছে সকল মানুষের জন্যে। তিনি সবার জন্যে এমন সহজ সরল শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন, যেগুলোকে মানুষের বিবেক বুদ্ধি স্বীকার করে এবং মানব প্রকৃতির সাথে যেগুলো সংগতিপূর্ণ বলে মানুষ বুঝে, যা মানুষ সহজেই পালন করতে পারে, যেগুলোকে মানুষের বিবেক তুচ্ছ নির্বুদ্ধিতা মনে করে না এমন হুকুম আহকামই সবার জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন।

প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতির চাহিদা পূরণের ওজুহাতে আজ গোটা মানব সমাজকে ধ্বংসের যে অতল তলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাশব বৃত্তিকে উস্কে দিয়ে তাদের পরিণত করছে নরকের কীটে, প্রগতির নামে উত্থীত সেই ধ্বংসাত্মক বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করা আজকের সব থেকে বড়ো এবং সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্বীন ইসলামের দাওয়াত মৌখিক কোনো ওয়ায নসিহত নয়, নয় এটা কোনো তাত্ত্বিক কথা, প্রশংসা কুড়ানোর জন্যে কিছু মনোমুগ্ধকর বাক্য সমষ্টিও নয়, বরং এ হচ্ছে সারা বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে দৃষ্টান্তমূলক একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনে এসে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। এর সম্মোহনী শক্তি বিবেকবান ও অবহেলিত এবং নিগৃহিত মানবতাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করবে। এ ব্যবস্থাকে কোনো ব্যক্তি যখন নিজের জীবন ও চরিত্রে জীবন্ত রূপ দেয় তখন শত শত মানুষও তার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে না! এর কারণ হচ্ছে প্রগতিবাদী ও আধুনিক মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির মনোহরী ডাক হচ্ছে একটি নির্জলা মিথ্যা, ধোঁকাবাজী এবং প্রচন্ড অজ্ঞতা, কারণ সে জানে না চূড়ান্ত সত্য কোন্‌টি, সে পরিমাপ করতে পারে না তার সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ভান্ডার পরিধি কতো বিস্তৃত। যিনি মানুষকে তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তার জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা তিনি দিয়েছেন তা অনুসরণ ও বাস্তবায়িত করা যে তার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব ও উপযোগী। এটা তথাকথিত জ্ঞানীগোষ্ঠীরা বুঝে উঠতে পারে না, যেহেতু তারা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ স্বার্থের নিরীখে সবকিছুকে বিচার বিবেচনা করতে চায়, অথচ যে জীবন ব্যবস্থা গোটা মানবতার কল্যাণার্থে এসেছে তা সে আত্মকেন্দ্রিক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বপ্ন প্রাসাদে আঘাত করবেই এবং তা তাদের কল্পিত মায়াজালকে ছিন্ন করে বৃহত্তর মানবতার বিজয় কেতন উডডীন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।

তবে এ কাজ কোনো ছেলে খেলা নয়, নয় এটা নিছক কোনো আবেগ উচ্ছ্বাস, এর জন্যে প্রয়োজন পর্বতসম দৃঢ় সংকল্পের, প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক কাজে অভ্যস্ত সৎকর্মশীল ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতার, তবেই গগনচুম্বী সেই সফলতা আসবে যার ওয়াদা সে কর্ম বীরদের সাথে মহান রব্বুল আলামীন করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি ওরা সেভাবে কর্মতৎপর হতো যেভাবে তাদেরকে.... আমি তাদেরকে সরল সঠিক পথেও চালাতাম।'

খালেস নিয়তে মানুষ যখন কোনো ভালো কাজ শুরু করে তখন থেকেই তাঁর সাহায্যের হাত তাদের দিকে প্রসারিত হয়ে যায়, সত্য সঠিক পথে তার কদমগুলো মযবুত হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর সাহায্যক্রমে দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখে অবস্থিত সরল সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই এই পথে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদাকে সব সময়ই সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে কখনোই ধোঁকা দেন না, এমন ওয়াদা তিনি তাদের সাথে করেন না যা তিনি পূরণ করবেন না। আর অবশ্যই তিনি সত্য কথা বলেন। আল্লাহর থেকে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে?

বর্তমান যামানায় যেভাবে মানুষ জীবন যাপন করছে তাদের বিবেচনায় এটা সহজ জীবন হলেও আসলে তা সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থা নয়, যদিও আপত দৃষ্টিতে তার মধ্যে কিছু শিথিলতা আছে বলে তারা দেখতে পায়। আসলে যে জীবনকে তারা কল্যাণের পথ বলে মনে করে নিয়েছে সেটা প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে কল্যাণ দিতে পারছে না। কারণ সব ব্যাপারেই এবং সব সময়েই তাদেরকে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা কিছু 'ছাড়' দিচ্ছে বা ছাড় দিতে পারছে, তা নয় এবং এভাবে সব ব্যাপারে ছাড় দেয়া তাদের জন্যে কল্যাণকরও হবে না। কিন্তু তবুও মানুষের তৈরী জীবন পদ্ধতি ও আইন কানুনের মধ্যে কখনো কড়াকড়ি এবং কখনো শিথিলতা দেখা যায়। অবশ্য তারা মূলত আইনকে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে চায় এবং জরুরী ও বিশেষ কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে শিথিল করে। যারা আধুনিক আইন কানুন প্রয়োগ করতে চায় তাদের অনেকের মধ্যে কিছু ভালো ও কল্যাণকর ইচ্ছাও মাঝে মাঝে কাজ করে এবং আইন মেনে চলার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু কোনো আইন শিথিল করার প্রয়োজন বোধ করলে জনগণের সামনে তা পেশ করে তাদের সম্মতি নিয়ে পরিবর্তন করে ফেলে; আর তারপর আত্মতৃপ্তির সাথে তাদেরকে বলে, দেখেছো কতো সহজ আমাদের এ আইন? অনেক আইন প্রণেতা আবার শাসককে খুশী করার লক্ষ্যে এবং তার প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে অথবা তার নিজ স্বার্থ উদ্ধার কল্পে বা জনতার ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে আইনের মধ্যে পরিবর্তন আনে। আস্তিক সমাজে যেখানে ধর্মকে সরাসরি অস্বীকার করা হয় না, সেখানেও দেখা যায় জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সংবিধানকে সংশোধন করে নেয়া হয় এবং পরিবর্তিত এ সংবিধানে ধর্মের জামা পরিয়ে তাকে ঐশী জীবন বিধান নাম দেয়া হয়।

কিন্তু দ্বীন ইসলাম এ প্রকৃতির ব্যবস্থা নয়। সামগ্রিকভাবে এ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু চূড়ান্ত বিধি বিধান আছে এবং কিছু আছে স্থানকাল বিশেষে শিথিলযোগ্য। যে ব্যবস্থা সবার জন্যে প্রযোজ্য তা মানা তখনই সহজ হয় যখন সে আন্তরিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তার সাথে তা মানতে চায় এবং সেখানেই মানুষ হিসেবে তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। যেমন করে কোনো একটি বাগিচার পরিচর্যায় তার দক্ষতা ফুটে ওঠে, একজন মালী বাগিচায় নানা প্রকার ফল গাছ লাগায়; আংগুর, পীচ, নাশপাতি, পেয়ারা, শশা ইত্যাদি একই মাটিতে একই আবহাওয়ায় সবগুলো একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন হওয়া সত্তেও এগুলোর স্বাদ হয় বিভিন্ন ধরনের এ ফলগুলো পেকে গেলে সবগুলোর স্বাদ একই না হওয়ায় কোনো কোনো ফল সম্পর্কে তো একথা বলা হয় না যে, না একই প্রকার স্বাদ যখন হয়নি তখন এটা বা ওটা তখনো পাকেনি।

দ্বীন ইসলামের এই বাগিচাতেও উৎপন্ন হচ্ছে নানা প্রকার শাক সবজি, পয়দা হচ্ছে যায়তুন ও ডালিম, পয়দা হচ্ছে আপেল এবং তুতফল, আরও পয়দা হচ্ছে আংগুর ও পীচ ফল। প্রত্যেক প্রকার ফলই পাকে, প্রত্যেকটি স্বাদ ও গন্ধ, আলাদা থাকে। তাই বলে এদের পরিপক্ক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। এতো সব ফল ও ফসল আল্লাহর পরিচালনায় ও তারই মাঠে ময়দানে তাঁরই তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

বর্তমান এই পাঠের আলোচনা সমাপ্তি পর্যায়ে পুনরায় উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলে বিবেকের দরজায় স্বজোরে আঘাত করা হয়েছে। বান্দাকে দেয়া অতুলনীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে আত্মাসমূহকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। নবী রসূল সত্যানুসারী (সিদ্দিক) ও সালেহীন, নেককার লোকদের জন্যে যে নেয়ামতের ব্যবস্থা আখেরাতে থাকবে, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন এবং জানমালের ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে এর প্রতিদান স্বরূপ সীমাহীন নেয়ামত দান করা হবে বলে এখানে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে.... এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত নেয়ামত।'

হৃদয়গ্রাহী এই আয়াতগুলোর প্রতিটি কথা হৃদয়কে ভাবের আবেগে উদ্বেলিত করে তোলে, হৃদয়ের কোষগুলো কল্যাণের আশায় সজীব হয়ে ওঠে, নেকী ও মংগল বার্তার জীবন যেন অনুভূতির গভীরে জেগে ওঠে। মহা সম্মানজনক স্থানে উপনীত হয়ে অতি সম্মানিত মেহমানদের সাথে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সান্নিধ্যে পৌঁছে যাওয়ার সুমহান আশা মোমেনের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করতে থাকে। আল্লাহর সম্মানিত এ মহান মেহমানদের সাথে উপবেশন ও তাদের সাথে জান্নাতের সম্মানিত জীবন যাপন এ তো আল্লাহর মেহেরবানীর দান। শুধু নেক আমল ও আনুগত্য দ্বারা এমন মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভ ও এ সম্মানিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এমন মর্যাদা লাভ আল্লাহর আদিগন্ত প্রশস্ত ও অতলান্ত রহমত সরোবরের অমিয়ধারা প্রাপ্তির পথ সর্বসাধারণের জন্যেই রয়েছে উন্মুক্ত।

এই সোনার মানুষগুলো ছিলেন রসূলের সাথী

আসুন, আমরা এভাবে পৌঁছে যাই রসূল (স.)-এর সাহাবায়ে কেরামের দরবারে। কী আনন্দই না লাগবে কিছুক্ষণ তাদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে যদি তাদের সোহবতে পৌঁছে যেতে পারি। তারা পরকালে পেয়ারা হাবীব (স.)-এর সাথে থাকতে বড়োই আকাংখী ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি আবেগের আধিক্যে রসূল (স.)-এর বিরহ চিন্তায় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম পর্যন্ত হয়েছেন। প্রিয়তম নবী (স.)-এর অন্তর্ধানের চিন্তায় কেউ কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। রসূল (স.) তখনও তাদের মধ্যে বর্তমান, সেই অবস্থায় এবং সেই আবেগ উৎকণ্ঠা যার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান সেই সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়গুলো স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্কর হয়ে রয়েছে।

ইবনে জারীর সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.) থেকে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর কাছে এলো। তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো। তখন নবী (স.) তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে অমুক ব্যক্তি, তোমাকে এতো দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখছি কেন? সে বললো, হে আল্লাহর নবী, একটি বিষয়ে আমি চিন্তা করে অস্থিরতা অনুভব করছি। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, সে বিষয়টি কি? লোকটি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা সকাল সন্ধ্যা আপনার সান্নিধ্যে আসছি এবং আপনার চেহারা আমরা প্রাণভরে দেখছি আর আপনার সাথে সাথে আমরা ওঠাবসাও করছি; কিন্তু একদিন তো আপনাকে অন্যান্য

নবীদের কাছে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তো আমরা আপনার কাছে পৌঁছতে পারবো না। এর জবাব দিতে রসূল (স.) পরে একদিন তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন, 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করবে তারা থাকবে সে সব নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিদের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামত বর্ষণ করেছেন।

আবু বকর ইবনে মারদুইয়াহ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন থেকেও প্রিয়। যখন আমি বাড়ীতে থাকি তখন আপনাকে স্মরণ করতে থাকি, কিন্তু আমার ধৈর্য মানতে চায় না, শেষ পর্যন্ত আপনার দরবারে এসে আপনাকে দেখার পর আমির প্রাণ ঠান্ডা হয়। এরপর যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা চিন্তা করি তখন আমি যেন দেখতে পাই, আপনাকে জান্নাতে দাখিল করানো হয়েছে এবং আপনি অন্যান্য নবীদের সাথে রয়েছেন। এরপর আমার মনে এ কথা জাগে যে আমাকে যদি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, সেখানে হয়তো আপনাকে দেখতে পাবো না। রসূল (স.) কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে নাযিল হলো

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর আনুগত্য করবে .....।'

সহীহ মুসলিম শরীফে আকল ইবনে যিয়াদ রাবীয়া ইবনে ক'াব আল আসলামী থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এনেছে। ক'াব আসলামী বলছেন, একবার আমি রসূল (স.)-এর সাথে রাত্রি যাপন করলাম। সে সময়ে আমি তাঁকে ওযু করার জন্যে ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যে পানি এনে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে খুশী মনে বললেন, কিছু চাও। আমি বললাম, আমার একটিই চাওয়ার বস্তু আছে, আর তা হচ্ছে, জান্নাতে আপনার সংগী হওয়ার সুযোগ। তখন তিনি আবারও বললেন, আর কিছু? বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সেই একই জিনিস। তিনি বললেন,

বেশী বেশী সেজদার মাধ্যমে তুমি যেন আমার সাথে থাকার প্রার্থনা করতে পারো, এই দোয়াই তোমার জন্যে আমি করি।'

সহীহ বোখারীতে একটি মোতাওয়ায়াতের হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। একদল সাহাবা বললেন, রসূল (স.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে তার জাতিকে ভালোবাসে, কিন্তু লোকটি তার জাতির সাথে মিশতে পারেনি, তার অবস্থা কী হবে? তখন রসূল (স.) বললেন, যে ভালোবাসে সে সেদিন তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা.) বলেন, এই কথা শুনে মুসলমানরা এতো খুশী হলেন যে এতো খুশী অন্য কিছুতেই হননি।

এই হাদীসটিতে উক্ত ব্যক্তির দুটি বিষয় সম্পর্কে কথা এসেছে, এক. মানুষের অন্তরকে কিছু জিনিস কাজে লাগায়। আর কিছু জিনিস আছে যা তাদের আত্মাকে শান্তি দেয়। আর আখেরাতের শান্তি হচ্ছে সে দিনে রসূল (স.)-এর সাহচর্য পাওয়া। দুনিয়াতে রসূল (স.)-এর সংগ তো তারা পেয়েছেনই। এই সময়ে তারা অবশ্যই রসূলে কারীম (স.)-এর ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছেন। তারপর রয়েছে আখেরাতের জীবন। সেখানে তাদের জন্যে তার সাথে থাকার আশা করার ও প্রশান্তি লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ দেখা যাচ্ছে যেহেতু দুনিয়ার জীবনে রসূল (স.)-এর ভালোবাসা লাভে তারা ধন্য হয়েছিলেন। আরও পেয়েছিলেন দুনিয়াতে হেদায়াতের নির্মল আলো।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

রুকু ১০

৭১. হে ঈমানদাররা, (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমরা (সর্বদা) তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ করো, অতপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে, কিংবা সবাই একসংগে (শত্রুর মোকাবেলা) করো। ৭২. তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন (মোনাফেক) লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে, তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এলে সে বলবে, আল্লাহ তায়ালা সত্যিই আমার ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না। ৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে (এমনভাবে) বলে, যেন তার সাথে তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্বই ছিলো না, সে (তখন আরো) বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমিও অনেক বড়ো সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিক্রি করে দিয়েছে, সেসব মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করা, কারণ যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে এ পথে জীবন বিলিয়ে দেবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, অচিরেই আমি তাকে (এ উভয় অবস্থার জন্যেই) বিরাট পুরস্কার দেবো। ৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক, আমাদের যালেমদের এই জনপদ থেকে বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও, অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী পাঠাও!

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ

৭৬. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মাবুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে (তোমরা সাহস হারিয়ো না), অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।

রুকু ১১

৭৭. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি, যাদের (প্রথম দিকে) যখন বলা হয়েছিলো, তোমরা (আপাতত লড়াই থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, (এখন) নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো, তখন তারা জেহাদের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো, অথচ যখন (পরবর্তী সময়ে) তাদের ওপর (সত্যি সত্যিই) লড়াইর হুকুম নাযিল করা হলো (তখন)! এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো, যেমনি ভয় শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই করা উচিত; অথবা তার চাইতেও বেশী ভয়! তারা আরো বলতে শুরু করলো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধের এ হুকুম (এতো তাড়াতাড়ি) জারি করতে গেলে কেন? কতো ভালো হতো যদি তুমি আমাদের সামান্য কিছুটা অবকাশ দিতে? (হে নবী,) তুমি বলো, দুনিয়ার এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য; যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তার জন্যে পরকাল অনেক উত্তম। আর (সেই পরকালে) তোমাদের ওপর কণামাত্রও কিন্তু অবিচার করা হবে না। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা যদি (কোনো) মযবুত দুর্গেও থাকো (সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে। এদের অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, (হ্যাঁ) এ তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, অপরদিকে যখন কোনো ক্ষতি (ও অকল্যাণ) তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, এ (সব) তো এসেছে তোমার কাছ থেকে,

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ،

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ

فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ

طَاعَةٌ ز فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ،

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ج فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، وَكَفٰى

بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ

لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ

اَذَاعُوْا بِهٖ ، وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ

তুমি (তাদের) বলে দাও, (কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছুই তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে; এ জাতির হয়েছে কি, এরা মনে হয় কথাটি বুঝতেই চায় না। ৭৯. যে কল্যাণই তুমি লাভ করো (না কেন, মনে রেখো), তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর যেটুকু অকল্যাণ তোমার ওপর আসে তা আসে তোমার নিজের কাছ থেকে; আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। ৮০. যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (তার আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মনে রেখো) তাদের ওপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি। ৮১. তারা (মুখে মুখে) বলে, (আমরা তোমার) আনুগত্য (স্বীকার করি); কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের (অন্ধকার) সময়ে একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরুদ্ধেই সলাপরামর্শ করে বেড়ায়; তারা রাতের বেলায় যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা সেসব কর্মকান্ডগুলো (ঠিকমতোই) লিখে রাখছেন, অতএব তুমি এদের উপেক্ষা করে চলো এবং সর্ববিষয়ে শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা রাখো, অভিভাবক হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট! ৮২. এরা কি কোরআন (ও তার আগমন সূত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করে না? এ (গ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো। ৮৩. এদের কাছে যখনি নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোনো খবর আসে, তখন (সত্য মিথ্যা না জেনেই) এরা তা প্রচার করে বেড়ায়, অথচ তারা যদি এ (জাতীয়) খবর আল্লাহর রসূল এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব

الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ
أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

লোকেরা তা জানতে পারতো, যারা তাদের মধ্যে থেকে সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো; যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (এ প্রচারণার ফলে) হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া তোমাদের অধিকাংশ লোকই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতো। ৮৪. অতএব (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, (কেননা) তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং তুমি (তোমার সাথী) মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো, আল্লাহ তায়ালা হয়তো অচিরেই এ কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবলতর, (আবার) শাস্তিদানেও তিনি কঠোরতর। ৮৫. যদি তার জন্যে কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করে, তাহলে তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে, আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে সুপারিশ করবে তাহলে (তার সৃষ্ট অকল্যাণেও) তার (সমপরিমাণ) অংশ থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (তোমাদের) সব ধরনের কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী। ৮৬. যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু দ্বারা) অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, (উত্তমভাবে না হলেও) কমপক্ষে (যতোটুকু সে দিয়েছে) ততোটুকুই ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) হিসাব রাখেন।

তাফসীর
আয়াত-৭১-৮৬

সম্ভবত সূরার এ অংশটি মাদানী জীবনের প্রথম ভাগে ওহুদ যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের আগে নাযেল হয়েছিলো। এই আয়াতগুলোর মধ্যে দিয়ে যে ধরনের মুসলিম সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে, তা থেকে এ কথাই বুঝা যায়। মনে হয়, সে সময়কার মুসলিম সমাজে এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারেনি কিংবা তারা আসলে ঈমানই আনেনি, কেবল মোনাফেকী ও ভন্ডামীতে লিপ্ত ছিলো। আরো মনে হয় যে, সেই মুসলিম সমাজটার ওপর চিন্তা ও আদর্শগত দিক দিয়ে জাহেলিয়াতের সাথে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শত্রু পক্ষের সাথে সংগ্রামের দিক থেকে যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো, সে দায়িত্ব পালনে তাকে সক্ষম করে তোলার জন্যে আরো অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো। তাকে আরো প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তোলার আবশ্যকতা ছিলো।

তবে এ কথা দ্বারা এই সত্য কিছুমাত্র ম্লান হয় না যে, সেই সমাজে সর্বোচ্চ মানের আদর্শ মুসলমানও বিদ্যমান ছিলো। আমরা কেবল সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের কথাই এখানে বলছি। সার্বিক বিচারে যে সমাজটি তখনো পরস্পর সাযুজ্যহীন একটি মিশ্র সমাজ। সেই অবস্থায় তাতে সমন্বয় ও সমতা বিধানের জন্যে প্রচুর সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ আয়াতগুলোতে যে সব দৃশ্য ফুটে উঠেছে, তা আমাদের এমন কিছু মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। মানুষের স্বভাবে যে সব ভালো ও মন্দ দিক থাকে তাকে এখানে আমরা দেখতে পাই। আমরা এও দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজের মধ্যেই বিদ্যমান কিছু ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতা, জাহেলী চরিত্র এবং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কোরআন কিভাবে একই সাথে সংগ্রাম চালিয়েছে। এখানে কোরআনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও আমরা দেখতে পাই। একটা জীবন্ত মানব সমাজে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে কাজ সমাধা করে তাও আমরা বুঝতে পারি। এ পর্যায়ে যতোটুকু কাজ সে সমাধা করেছে এবং জাহেলী সমাজ থেকে বের করে আনা মানুষগুলোর স্বভাব চরিত্র থেকে জাহেলিয়াতের কলুষ কালিমা মুছে ফেলে ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কোন পর্যায়ে আনা হয়েছে, রসূল (স.)-এর জীবনের শেষ পর্যায়ে এই বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের লোকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানব সমাজ কতোটুকু উন্নততর চারিত্রিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কতোটুকু সাফল্য অর্জন করছে, তা এ আয়াতগুলোতে আমরা ভালোভাবেই দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, এই বিবর্তন ও পরিশুদ্ধি হয়েছিলো, মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির মধ্য থেকে সম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত।

আয়াতগুলোতে এ বিষয়টুকু জানতে পেরে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হই। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি মেযাজ ও অভিরুচি কেমন এবং তার ভেতরে কতোখানি ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সবলতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান তা বুঝতে পারি, বুঝতে পারি রসূল (স.) যে সমাজকে কোরআনী বিধানের আলোকে নিজ হাতে গড়েছেন, সে সমাজ কতোটা উন্নত ছিলো, মানুষের প্রশিক্ষণে কোরআনের অনুসৃত পদ্ধতির ধরন কেমন ছিলো, কিভাবে কোরআন ব্যক্তি গঠন করতো এবং কিভাবেই বা সে বিভিন্ন ধরনের স্বভাব চরিত্র বিশিষ্ট বক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সমাজকে কোনো অস্বাভাবিক ও অবাস্তব পন্থায় আশ্রয় না নিয়ে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা করতো। এ আয়াতগুলো পাঠ করে আমরা রসূল (স.)-এর হাতে গড়া সেই সমাজের সাথে আমাদের এবং অন্যান্য মানষ গোষ্ঠীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারবো। ফলে আমাদের দুর্বল স্থানগুলো দেখে আমরা নিজেদের ওপর হতাশ হয়ে পড়বো না এবং দুর্বলতার চিকিৎসা ও প্রতিকারের চেষ্টা ত্যাগ করবো না, আর সেই প্রথম মানব গোষ্ঠী স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে আমাদের কাছে নিছক স্বপ্নীল কল্পনার বিষয় হয়ে থাকবে না। তাদের অনুকরণে আমরাও যে মহত্বের সিঁড়ি বেয়ে উচ্চতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারি, সে ব্যাপারে আমাদের অবস্থা কখনো নড়বড়ে হবে না।

আয়াতগুলোর প্রতিটিই সবই আমাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান পুঁজি। কোরআনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে জীবন যাপন করার সময় এই পুঁজি দ্বারা উপকৃত হতে পারলে দেখা যাবে যে, আমরা খুবই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি।

রসূলের যুগে মানুষদের শ্রেণীবিন্যাস

আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়কার মুসলমান সমাজে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান ছিলো,

ক. একদল ছিলো যারা আল্লাহর পথের জেহাদে নিজেরাও পেছনে থাকতো, অন্যদেরকেও যেতে নিরুৎসাহিত করতো। তারপর মুসলমানরা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা নিজেরা নিরাপদ

থাকতে পারায় পরম তৃপ্তি বোধ করতো। পক্ষান্তরে যুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা এই ভেবে অনুতপ্ত হতো যে, যারা যুদ্ধে গেছে তারা অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়েছে, অথচ নিজেরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এভাবে তারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াই অর্জন করে। অর্থাৎ জেহাদের মাধ্যমে আখেরাতের যে সাফল্য অর্জন করতো, তা ত্যাগ করে দুনিয়ার সুখ শান্তিতেই তারা বিভোর হয়।

খ. মোহাজেরদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিলো, যারা মক্কায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকাকালেও যুদ্ধ করে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করতে চাইতো। কিন্তু দেখা গেলো মদীনায় আসার পর যখনই যুদ্ধ ফরয করা হলো, অমনি তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লো এবং বললো, আল্লাহ তায়ালা এতো শীগ্রই যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে আরো একটু সময় দিলে ভালো হতো!

গ. কারো কারো স্বভাব ছিলো যে, মুসলমানদের কোনো সুদিন আসলে তার কৃতিত্ব আল্লাহকে দিতো, আর যখন কোনো দুর্দিন আসতো, তখন তার দায় দায়িত্ব রসূল (স.)-এর ঘাড়ে চাপাতো। এ কাজটি তারা এ জন্যে করতো না যে, আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান খুবই সবল ছিলো। আসলে এর উদ্দেশ্য ছিলো রসূল (স.)-এর নেতৃত্বকে হেয় এবং তাকে অশুভ ও কুলক্ষুণা প্রতিপন্ন করা।

ঘ. কেউ কেউ রসূল (স.)-এর সামনে নিজেকে আনুগত্যশীল দেখাতো; কিন্তু তার দরবার থেকে বেরিয়ে এসেই সুর পাল্টে ফেলতো।

ঙ. কেউ কেউ গুজব ছড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকতো। এতে সমাজে উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিতো। অথচ গুজব কানে আসার পর অন্যের কানে দেয়ার আগে তা নেতৃত্বের কানে দিয়ে তার সত্যাসত্য যাচাই করা উচিত ছিলো।

চ. যুদ্ধ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে- না কোনো কোনো নির্দেশ রসূল (স.) কর্তৃক প্রদত্ত, তা নিয়েও অনেকের সংশয় ছিলো।

ছ. কেউ কেউ এমনও ছিলো যে, তারা মোনাফেকদের সাফাই গাইতো, যাতে মোনাফেকদের সম্পর্কে মুসলমানরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই সাফাই গাওয়া থেকে বুঝা যেতো যে, ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের বিশ্বাস, সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্যের মধ্যে তারা সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। (এমনকি নেতার কাজ ও দায়িত্ব কি কি এবং তার সাথে তাদের সম্পর্ক কি, তাও তারা বোঝেনি)।

এই সব কটি শ্রেণীকে একত্রে মোনাফেক নামেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে, আবার এদেরকে মোনাফেক ও দুর্বল মোমেন-এই দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত করা চলে, দুর্বল মোমেন আমরা তাদেরকেই বলি, যাদের ঈমানী দৃঢ়তা ও পরিকপক্কতা অর্জিত হয়নি, যদিও তাদের অনেকে মোহাজেরও ছিলো। রসূল (স.)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম সমাজটা যেভাবে মদীনায় ইহুদী তবে তারা কোনো প্রকাশ্য কুফর শেরেকে লিপ্ত হয়, মক্কায় মোশরেক এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলো, তাতে উল্লেখিত মোনাফেক গোষ্ঠী অথবা মোনাফেক ও দুর্বল মোমেন এই দুই গোষ্ঠীর উপস্থিতি উক্ত সমাজকে বিভেদ ও বিশৃংখলায় আক্রান্ত করতে পারতো। তাই সম্ভাব্য এই বিভেদ ও বিশৃংখলা থেকে মুসলিম সমাজ দেহকে মুক্ত রাখার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো দীর্ঘস্থায়ী প্রশিক্ষণ, অবিশ্রান্ত জেহাদ তথা প্রতিরোধ সংগ্রামের।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা এই জেহাদ প্রশিক্ষণের কিছু নমুনা দেখতে পাই। দেখতে পাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে বিরাজমান গোপন দুর্বলতার সূক্ষ্ম, গভীর ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই সমাজের নেতা ও পথপ্রদর্শক রসূল (স.) ধৈর্যপূর্ণ প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে কোরআনের বিধান অনুসারে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ,

ক. আমরা এখানে দেখতে পাই সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং মোমেন মোজাহেদরা এরপর জেহাদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে একাকী বেরুতে পারবে না। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে অথবা সমগ্র মুসলিম বাহিনী একত্রে বের হতে পারবে। কেননা তাদের চার পাশের গোটা ভূখন্ডই তাদের বৈরী। তারা একাধিক শত্রুর বিচিত্র ধরনের শত্রুতার সম্মুখীন। মোনাফেকদের মধ্যেই অথবা মোনাফেকদের আশ্রিতদের মধ্যেই মুসলমানদের কট্টর দুশমন লুকিয়ে থাকতে পারে।

খ. জেহাদে যেতে গড়িমসি করে এমন এক দল লোকের ছবিও এখানে আমরা দেখতে পাই। দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার অভাব, বৈষয়িক স্বার্থের মোহ এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে আনুগত্যের পরিবর্তনের এক ঘৃণ্য দৃশ্য এখানে পরিস্ফুট। অনুরূপভাবে দেখতে পাই যে, মক্কায় থাকাকালে যারা লড়াই করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো, মদীনায় আসার পর যুদ্ধের নির্দেশ আসা মাত্র তাদের কারো কারো সেই বাহাদুরী নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

গ. এখানে এটাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, তাদেরকে তিনি বিরাট পুরস্কার দান করবেন, চাই সে বিজয়ী হোক অথবা শহীদ হোক।

ঘ. এখানে এও লক্ষণীয় যে, কোরআন যে লড়াইয়ের জন্যে মোমেনদের উদ্বুদ্ধ করে তার উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ এবং তা হলো, সেই নির্যাতিত নারী পুরুষ ও শিশুদেরকে মুক্তি দান, যারা যুলুমের রাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে চিৎকার করছে।

ঙ. আরো লক্ষণীয় যে, মোমেনরা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করে কোরআন তাকে সঠিক ও অগ্রগণ্য এবং কাফেররা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করে তাকে অন্যায়, ভ্রান্ত ও বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছে। যারা মোমেন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। কাজেই শয়তানের বন্ধুদের লড়াই করো। মনে রেখো, শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

চ. আমরা আরো দেখতে পাই যে, কোরআন এখানে কিভাবে মানুষের চিন্তার বিভ্রান্তি দূর করে। এই চিন্তার বিভ্রান্তি থেকেই জন্ম নেয় নানা রকমের কুধারণা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কাজ। এ জন্যে সে মানুষের আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধন করে। কখনো দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা তুলে ধরে, যেমন,

'বলো, দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী অপ্রতুল, আর পরহেযগারদের জন্যে আখেরাতই উত্তম। তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।'

কোরআন মৃত্যু ও ভাগ্যের অনিবার্যতারও উল্লেখ করে, মানুষ যতোই সতর্কতা অবলম্বন করুক এবং যতোই জেহাদ থেকে পিছু হটুক তা ঘটবেই। যেমন,

'তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই, যদি তোমরা মযবুত দূর্গেও অবস্থান করো।'

আবার কখনো মানুষের কাজ ও আল্লাহর ফয়সালার তাৎপর্য বর্ণনা করে, যেমন,

'যদি তাদের কোনো কল্যাণ অর্জিত হয়, তাহলে বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর যদি কোনো অকল্যাণ সংঘটিত হয়, তাহলে বলে যে, এটা তোমার পক্ষ থেকে এসেছে।' তুমি বলো, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এই মানুষদের কি হয়েছে যে, এরা কোনো কথাই বোঝে না? তোমার ওপর যে কল্যাণই আসুক, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর যে অকল্যাণই আসুক, তা আসে তোমার পক্ষ থেকে।

ছ. এ আয়াত কয়টিতে আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের মধ্যকার সম্পর্ক কিরূপ, বলা হয়েছে যে, রসূল (স.)-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং এই সমগ্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করারও আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত করে ।.....'

জ. এর পর আমরা দেখতে পাই, যারা গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে কোরআন অধিকতর নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পথের দিকে পরিচালিত করে, যে পথ সম্পর্কে মুসলিম সংগঠনের নেতৃবৃন্ধ একমত বলা হয়েছে, 'যদি তারা রসূলের কাছে এবং নিজেদের দায়িত্বশীলদের কাছে খবর পৌছাতো, তাহলে তাদের মধ্যে এমন সব লোকেরা বিষয়টি জানতো যারা খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো।'

ঝ. অতপর এই গুজব ছড়ানোর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের সৎপথ প্রাপ্তিতে আল্লাহর যে অনুগ্রহ সক্রিয় রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যথা, 'আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ তোমাদের ওপর না থাকলে সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমাদের সবাই শয়তানের অনুকরণ করতো।'

উল্লেখিত বিষয়গুলো মুসলমানদের সমাজে যে ফাটল সৃষ্টি করেছিলো, তার গুরুত্ব উপলব্ধিতে এ আয়াত আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করে, সেই সাথে উক্ত ফাটল রোধে কিরূপ অব্যাহত ও বিভিন্ন ধরনের সাধনার প্রয়োজন ছিলো তাও আমরা বুঝতে পারি, যখন শুনতে পাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে একাকী হলেও জেহাদ করার আদেশ দিচ্ছেন এবং মোমেনদেরকে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করতে বলছেন। একাকী যখন লড়াই করবেন, তখন তাকে শুধু নিজেরই দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। আর সমস্ত লড়াইয়ের আসল পরিচালক তো আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতএব তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, তুমি নিজের ছাড়া আর কারো জন্যে দায়ী নও। আর মোমেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করো। আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে কঠিন শংকাময় ও কঠিন শাস্তিদাতা।' এই বর্ণনা ভংগীতে মানব মনকে উজ্জীবিত করা, সাহস প্রদান এবং সেই অনুপাতে বিজয়ের আশা ও আল্লাহর শক্তির প্রাধান্য তুলে ধরা হয়েছে।

কোরআন মুসলমানদেরকে বহু যুদ্ধের ময়দানে হাযির করেছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধের ময়দান ছিলো আপন প্রবৃত্তির প্ররোচনা। অসৎ চিন্তা, জাহেলী ধ্যান ধারণা ও মানবীয় দুর্বলতা, যদিও তা ইচ্ছাকৃত মোনাফেকী ও গোমরাহী থেকে উদগত নয়। আল্লাহর নবী মুসলমানদেরকে আল্লাহর বিধান অনুসারে এমনভাবে পরিচালিত করতেন, যাতে তারা দুর্বার শক্তি অর্জন করে পরস্পরে সুসমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। শেষের এই লক্ষ্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী। মুসলিম সমাজ ও সংগঠনের সদস্যদের শুধু সর্বাত্মকভাবে (ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে) শক্তিশালী হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও বিভেদমুক্ত হওয়াটা জরুরী। তারা বিভিন্ন স্তরের হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় থাকতেই হবে। কেননা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনেক বড় বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে।

কোরআনের সমরবিদ্যা

এবার আমরা এই অংশের আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করবো, আয়াত ৭১, 'হে মোমেনরা! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। হয় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অভিযান করো, নচেত সকলে ঐকবদ্ধ হয়ে.... ।'

এ হচ্ছে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পথ থেকে মোমেনদেরকে প্রদত্ত নির্দেশ। এ নির্দেশ মুসলমানদের চলার পথ সুষ্ঠুভাবে দেখিয়ে দেয়। কোরআন অধ্যায়নকারীরা এটা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয় যে, কোরআন কিভাবে তাদেরকে যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম তথা যুদ্ধের 'স্ট্রাটেজি' শিক্ষা দেয়। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে বলেন,

'হে মোমেনরা, তোমরা সম্মিলিতভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়, (সূরা আত তাওবা)। এ আয়াত ইসলামী আন্দোলনের সাধারণ নিয়ম জানিয়ে দিয়েছে। আলোচ্য আয়াত মোমেনদেরকে বলছে! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, অতপর ছোট ছোট দলে অথবা সবাই এক সাথে অভিযানে নামো, এখানে বাস্তব কর্মপন্থার একটি দিক চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে বলা হয় ট্যাকটিক্স বা কলাকৌশল। সূরা আনফালেও এর কোনো কোনো দিক তুলে ধরা হয়েছে,

'যুদ্ধের ময়দানে যদি তাদেরকে পাও তাহলে তাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে, তাদেরকে সহ হটিয়ে দাও, আর যেন তারা উপযুক্ত শিক্ষা পায়।'

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর এই কেতাবে মুসলমানদেরকে শুধু এবাদত, আদব আখলাক ইত্যাদিই শিক্ষা দেয়া হয়নি৷যেমন অনেকে ইসলাম সম্পর্কে এরূপ সংকীর্ণ ধারণাই পোষণ করে। ইসলাম মানুষের গোটা জীবনকেই সর্বাত্মকভাবে নিজের আওতাধীনে নিয়ে নেয় এবং মানব জীবনের সকল বাস্তব সমস্যারই সমাধান পেশ করে।

মানব জীবনের সার্বক্ষণিক অভিভাবক হিসাবে সে তার কাছে দাবী জানায় যে, তার গোটা জীবনকে তার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করে। ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের জীবনের কোনো একটা দিক বা বিভাগ ইসলামের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আসুক, এটা সে মেনে নিতে পারে না। বিশেষত মুসলমানদের জীবনের জন্যে একাধিক বিধান থাকবে তা সে কখনো বরদাশত করে না। উদাহরণ স্বরূপ, তার ব্যক্তিগত জীবন, এবাদত, চরিত্র ও আদব-আখলাক সংক্রান্ত বিধান সে আল্লাহর কেতাব থেকে গ্রহণ করলো, আবার অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক আচার ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান সে'অন্য কারো থেকে গ্রহণ করলো অথবা সার্বিকভাবে তা মানবীয় চিন্তাধারা থেকে গ্রহণ করলো, এটা ইসলামের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মানবীয় চিন্তাধারার দায়িত্ব এই যে, সে মানব জীবনের উদ্ভূত নিত্য নতুন সমস্যার বাস্তব সমাধান কোরআন থেকে চিন্তা গবেষণা করে বের করবে। কি উপায়ে এই চিন্তা গবেষণা করবে তা পূর্ববর্তী পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যথায় সে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী পন্থায় নিজের সমস্যার মনগড়া সমাধান করে নেয়, তাহলে তার ঈমান ও ইসলাম বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা যারা এরূপ করে, তারা ঈমানের অংগীকারে আবদ্ধ হয়নি এবং ইসামের স্তম্ভসমূহের প্রতি তারা স্বীকৃতি দেয়নি, কারণ ইসলামের প্রথম স্তম্ভই হলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ অর্থাৎ কোনো শাসক ও আইনদাতা নেই বলে সাক্ষ্য দান করা।

এখানে আল্লাহর কেতাব মুসলমানদেরকে তাদের সমকালীন পরিস্থিতি-পরিবেশ অনুযায়ী একটা বাস্তব যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিচ্ছে। এই শিক্ষা তাদের তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক ছিলো।

শুরুতেই সে তাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করছে,

' হে মোমেনরা! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো'

অর্থাৎ তোমাদের সকল শত্রু থেকে সাবধান হও। বিশেষত তোমাদের অভ্যন্তরে বিরাজমান গড়িমসিকারী, শিথিল, উদাসীন ও আপোষকামী লোকদের সম্পর্কে সাবধান হও।

'হয় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, নয়তো সবাই এক সাথে অভিযানে বের হও।'

অর্থাৎ একা একা বেরিও না। দলে দলে বের হও। অথবা, গেটা মুসলিম জনতা এক সাথে বের হও। যুদ্ধের দাবী অনুসারে যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করো। এর কারণ এই যে, একক ব্যক্তির ওপর শত্রুরা সহজেই আক্রমণ চালাতে পারে। বিশেষত শত্রুরা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এমনকি ইসলামী শিবিরের ভেতরেও যখন তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। মোনাফেক ও ইহুদীরা তো খোদ মদীনায় সক্রিয় রয়েছেই।

'তোমাদের মধ্যে এমনও অনেক আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসলে সে বলে, ... যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কখনো প্রীতি ভালোবাসা ছিলো না।'

অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে দলে দলে বিভক্ত হয়ে অথবা সকলে এক সাথে বের হও। কেউ বের হবে কেউ বাড়ি বসে থাকবে এমন যেন না হয়। সাবধান হও শুধু বহিশত্রুর থেকে নয়, বরং ভেতরকার অলস, কর্মবিমুখ ও গড়িমসিকারীদের থেকেও।শুধু যারা নিজে গড়িমসি করে তাদের থেকেই নয়, বরং যারা অন্যদেরকে গড়িমসি করতে প্ররোচিত করে তাদের থেকেও।

এখানে ব্যবহৃত 'লাইউবাত্তেয়ান্না' শব্দটি বাস্তব পরিস্থিতির অত্যন্ত নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে। এই শব্দটির উচ্চারণ যেমন কষ্টকর ও ভারী, এর অর্থ 'গড়িমসিকারী' রাও স্বভাবের দিকে থেকে ঠিক তেমনি এতো অলস ও অথর্ব যেন নড়তে চড়তেই তাদের মাস কাভার হয়ে যায়। বাস্তবতায় এটা কোরআনের এক অতুলনীয় বাচন ভংগী যে, একটা মাত্র শব্দ দ্বারা একটা পরিপূর্ণ পরিস্থিতি ও পরিবেশের চিত্র এঁকে দেয়।

অনুরূপভাবে এই গোটা বাক্যটি 'তোমাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যে গড়িমসি করবেই' দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, এই সব গড়িমসিকারীরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা মুসলমান, তারা মুষ্টিমেয় কিছু লোক। 'গড়িমসি করবেই' কথাটায় জোর দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, তারা অনবরতই গড়িমসি করে, পুরোপুরিভাবেই করে এবং এমনভাবে করে যে, গোটা মুসলিম সমাজ এ দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

এ জন্যে কোরআন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও বিস্ময়কর ভংগীতে এই গোষ্ঠীটির মানসিকতা তুলে ধরেছে। তাদের ধ্যান ধারণা, কথা ও কর্মকান্ডকে প্রকাশ করে এবং গোষ্ঠীর এই স্বভাবচরিত্র ও কর্মকান্ড রসূল (স.)-এর আমলে যেমন ছিলো, সর্বকালে ও সর্বত্রই এই লোকগুলো ঠিক তেমনিই থাকে। দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট, মোনাফেক ও সংকীর্ণমনা লোকেরা নিজেদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য আছে বলে জানেই না, নিজেদের সংকীর্ণ ও সীমিত জগতের বাইরে কোনো জগত থাকতে পারে বলেও তারা মনে করে না। গোটা দুনিয়া তারা একই দৃষ্টিভংগীতে দেখে এবং একই জিনিসের চার পাশে সব কিছুকে আবর্তিত করে।

তারা যে লড়াইতে যেতে গড়িমসি করে, তার কারণ এই যে, তারা ঝুঁকি নিতে চায় না। লাভ লোকসান সম্পর্কে তাদের ধারণা মোনাফেক ও দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকদের মতোই তারা ময়দান থেকে পিছিয়ে থাকে। তারপর মোজাহেদরা যদি বিপর্যয়ের শিকার হয়, তাহলে তারা খুশী হয় এবং মনে করে যে, জেহাদ থেকে পিছিয়ে থেকে তারা বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেছে। তাই পালিয়ে থাকাটা তাদের জন্যে একটা বিরাট নেয়ামতে পরিণত হয়েছে।

'তোমাদের ওপর কোনো মুসিবত এলে তারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের সাথে আমরা শরীক হইনি।'

তারা এত নির্লজ্জ যে, জেহাদের ময়দান থেকে পিছিয়ে থেকে তারা যে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে তাকে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করছে। অথচ সেই আল্লাহর আদেশ লংঘন করেই তারা পিছিয়ে থেকেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি কখনো আল্লাহর অনুগ্রহ দিয়ে হয় না। কেননা আল্লাহর আদেশ লংঘন করে কখনো তার অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। যদিও বাহ্যত তা বিপদ থেকে অব্যাহতির আকারে দেখা যায়।

হাঁ এটা নেয়ামত বা অনুগ্রহই বটে। তবে শুধু তাদের কাছে, যারা আল্লাহর সাথে কোনো লেনদেনের সম্পর্ক রাখে না। যারা বোঝে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কী উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন, যারা সার্বক্ষণিক আনুগত্য দ্বারা এবং গোটা জীবনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে জেহাদ দ্বারা আল্লাহর এবাদত করে না, যারা পিপড়ের মতো শুধু পদতলে পিষ্ট যমীনকেই চেনে এবং তার ঊর্ধের কোনো জগতকে চেনে না,

যাদের এ উপলব্ধি নেই, যে, আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা ও বিজয়ী করার পথে যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মুসিবত আসে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অনুগ্রহ, সম্মান ও মনোপূত হওয়ার প্রতীক। সম্মান ও অনুগ্রহ আল্লাহ তায়ালা শুধু তার বিশেষ বিশেষ মনোনীত বান্দাদের জন্যেই নির্দিষ্ট করেন। যাতে তারা তাদের মানবীয় দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হয় এবং পৃথিবীর বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করে এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যে, পৃথিবী তাদের ওপর নয় বরং তারা পৃথিবীর ওপর আধিপত্য লাভ করে। এভাবে তারা যেন শহীদদের ন্যায় নৈকট্য লাভ করে।

পৃথিবীর সকল মানুষই মরণশীল। কিন্তু আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তারাই শুধু অমর। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক মহা অনুগ্রহ।

কিন্তু যখন অন্য ব্যাপারটা ঘটে, আল্লাহর পথে সব কিছুকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়ার মানসিকতা ও প্রস্তুতি নিয়ে যে মোজাহেদরা বের হয় তারা যখন বিজয়ী হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, বিজয় ও গনীমতের নগদ প্রাপ্তিও যখন তাদের জোটে, তখন পিছিয়ে থাকা লোকগুলো অনুতপ্ত হয় যে, এমন লাভজনক যুদ্ধে তারা শরীক হয়নি। লাভ ও ক্ষতির যে স্থুল ও সংকীর্ণ ধারণা তারা পোষণ করে, সে অনুসারে এ ধরনের যুদ্ধকে তারা লাভজনক যুদ্ধ মনে করে থাকে।

'আর যদি তোমাদের ভাগ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ জোটে.... প্রীতি ভালোবাসা কখনো ছিলোই না।

গনীমত সহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরে আসতে পারাকে তারা 'বিরাট সাফল্য' বলে আখ্যায়িত করেছিলো। অবশ্য মোমেনও গনীমতসহ বাড়ী ফিরতে পারাকে অপছন্দ তো করেই না, বরঞ্চ আল্লাহর কাছে সেটাই কামনা করতে তাকে আহবান জানানো হয়েছে। মোমেনের বিপদ মুসিবত কামনা করা উচিত নয় এবং আল্লাহর কাছ থেকে শক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা উচিত। তবে এটা মোমেনের সঠিক চিন্তাধারা নয়। এটা বরঞ্চ কোরআনের দৃষ্টিতে দুর্বল ঈমানধারীদের ও মোনাফেকদের ঘৃণ্য আলামত হিসাবে বিবেচিত।

মোমেন যদিও বিপদ মুসিবত কামনা করে না, বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে, তবে সে যখন জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে, তখন সে মরণপণ করেই বের হয় এবং দুটো সর্বোত্তম পরিণতি-বিজয় অথবা শাহাদাতের যে কোনো একটা কামনা করেই বের হয়। এই

দুটোই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ এবং দুটোই বিরাট সাফল্য। এরপর আল্লাহ তায়ালা যদি তার ভাগ্যে শাহাদাত বণ্টন করেন, তবে সে তাতেই রাযী থাকে। আর যদি তার ভাগ্যে গনীমত ও ফিরে আসা লিখে দেন, তবে সে আল্লাহর এই অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জন্যে আনন্দিত হয়, নিছক পরাজয় ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নয়।

এটাই সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা, যেখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে উন্নীত করতে চান। আর গড়িমসিকারীদের ঘৃণ্য অবস্থানটাও চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের থেকে সাবধান থাকে।

আর এই সব সতর্কবাণী ও হুশিয়ারী যা তৎকালীন মুসলিম সমাজকে সম্বোধনপূর্বক উচ্চারিত হয়েছিলো, এগুলোর মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ নমুনার মানুষ চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সর্বকালে, সকল স্থানে পাওয়া যায়। কোরআনে মাত্র কয়েকটি শব্দে তাদেরকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

অতপর এই সত্যটি চিরদিনের জন্যে মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়ে থেকে যায়, অর্থাৎ সমাজে সব সময় এই ধরনের মানুষ থাকবে। কাজেই কোনো মোমেন যেন নিজের ব্যাপারে হতাশ না হয়, তাকে সতর্ক হতে হবে এবং সামনে চলতে থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ ও সাধনা দ্বারা নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা দূর করতে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং আবেগ, চিন্তা ও বাস্তব তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এরপর কোরআন এই সকল অলস গড়িমসিকারীদেরকে মুক্তি দেয়া ও উর্ধে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। তাদের অনুভূতিতে উত্তম ও চিরস্থায়ী আখেরাতের কল্যাণ লাভের বাসনা জাগায়, দুনিয়া বিক্রয় করে দিয়ে আখেরাতকে কিনে নেয়ার প্রেরণা যোগায় এবং উভয় অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ তথা দুটি সর্বোত্তম জিনিসের একটা হয় বিজয় না হয় শাহাদাত লাভের নিশ্চয়তা দান করে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে বিক্রি করবে,..... তাকে আমি মহান প্রতিদান দেবো। (আয়াত-৭৪)

আল্লাহর পথে লড়াই করার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, ইসলাম আল্লাহর পথে ছাড়া আর কোনো রকমের যুদ্ধ বা লড়াই পছন্দ করে না। সম্পদ লাভের জন্যে, আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে অথবা ব্যক্তিগত ও জাতিগত গৌরবের জন্যে যে লড়াই করা হয়, ইসলাম তার অনুমতি দেয় না। ইসলাম শুধুমাত্র আল্লাহর পথে, তথা পৃথিবীতে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে তুলে ধরা, আল্লাহর বিধানকে গোটা জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দান, মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানের কল্যাণ ও উপকারিতা লাভের সুযোগ দান করা, মানব সমাজে আল্লাহর বিধানের সর্বাত্মক সুবিচার প্রতিষ্ঠা অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পছন্দমত আকীদা বিশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দানের জন্যে লড়াই করার অনুমতি দেয়।

যখন কোনো মুসলমান আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে এবং আল্লাহর বিধানকে জীবনের কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা নিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করতে বেরিয়ে যায় এবং তারপর নিহত হয়, তখন সে শহীদ হয় এবং আল্লাহর কাছে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। আর যখন এই লক্ষ্য ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য নিয়ে লড়াই করে ও মারা যায়, তখন সে শহীদ হয় না এবং আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কারও তার প্রাপ্য থাকে না। যদি কিছু প্রাপ্য থেকে থাকে, তবে সেটা যার

উদ্দেশ্যে লড়াই করেছে তার কাছে প্রাপ্য। যারা তাকে শহীদ বলে তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। যে মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা দেননি সেই অধিকার সে কাউকে অন্যায়ভাবে দিতে চেষ্টা করে। এটাই আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ।

বস্তুত দুনিয়াকে বিকিয়ে দিয়ে আখেরাতকে কিনে নেবে, এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত। এ লড়াইয়ের পরিণতি যাই হোক, সেটা আল্লাহর অনুগ্রহ বলেই বিবেচিত হবে। চাই সেটা শাহাদাত বরণই হোক অথবা বিজয় লাভই হোক।

এ বক্তব্য দ্বারা কোরআন আল্লাহর পথের মোজাহেদদেরকে উচ্চতর মর্যাদা অধিষ্ঠিত করে এবং তাদেরকে আল্লাহর মহান অনুগ্রহের জন্যে আশাবাদী করে তোলে। উপরোক্ত দুই অবস্থায় মৃত্যু অথবা বিজয় ও গনীমত লাভ দুটোর কোনোটাই মোমেনের কাছে গুরুত্ব রাখে না। তার কাছে গুরুত্ব রাখে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ। বেঁচে থাকা ও গনীমত পাওয়া কোনো মতেই আল্লাহর অনুগ্রহের সমকক্ষ নয়। কোরআন এই সাথে ক্ষতিকর ব্যবসায়ের প্রতি মোমেনের ঘৃণা জন্মায়। সেই ক্ষতিকর ব্যবসা হলো আখেরাতকে বিকিয়ে দিয়ে দুনিয়া খরিদ করা– দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে আখেরাত খরিদ করা নয়, আখেরাতে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া খরিদ করা, অন্য কথায় দুনিয়া লাভের জন্যে আখেরাত ও আল্লাহভীতিকে বিসর্জন দেয়া সর্বতোভাবে ক্ষতিকর ব্যবসা, চাই তাতে দুনিয়ায় গনীমত লাভের সুযোগ পাওয়া যাক বা না যাক। আখেরাতের সাথে দুনিয়ার তুলনা কীভাবে হতে পারে? আর আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে গনীমতের কী তুলনা হতে পারে। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহের ভেতর আর্থিক লাভ ও অন্যান্য লাভও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এরপর গড়িমসিকারীদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কোরআন দৃষ্টি দিয়েছে সমগ্র মুসলিম জনতার দিকে। মক্কার যে সকল দুর্বল মুসলিম নারী পুরুষ ও শিশু নিজেদের জানমাল, মান-সম্ভ্রম ও আকীদা বিশ্বাস নিয়ে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করতে সমর্থ না হওয়ায় মোশরেকদের হাতে চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করছিলো এবং ওই যুলুম ও নির্যাতনের রাজত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্যে উদগ্রীব ছিলো পরবর্তী আয়াতে তাদের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লড়াই এর একটা উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাতে এই লড়াইতে মোমেনরা কোনো গড়িমসি ও শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। ৭৫ নং আয়াতটি লক্ষণীয়,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো না.... থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠাও।' (আয়াত ৭৫)

অর্থাৎ এই সকল দুর্বল নারী পুরুষ ও শিশুর মুক্তির জন্যে আল্লাহর পথে লড়াই না করে তোমরা কীভাবে বসে থাকো? এই সকল দুর্বল মোমেনের করুণ চেহারা যে কোনো মুসলমানদের ঈমানী মর্যাদাবোধ এবং সাধারণ মানবিক সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। তারাই সবচেয়ে কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় পতিত, তারা ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় আছে। বস্তুত ঈমানের পরীক্ষা জান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের পরীক্ষার চেয়েও কঠিন। কেননা এ পরীক্ষা মানব সত্ত্বার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত। এ বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করছে মানুষের আত্মসম্মান এবং ঋণ ও ভূমি সংক্রান্ত অধিকার।

অসহায় নারী ও শিশুদের দৃশ্য খুবই করুণ ও মর্মঘাতী হয়ে থাকে। অসহায় বৃদ্ধদের অবস্থাও কম করুণ নয়-যারা আত্মরক্ষায় বিশেষত নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস রক্ষায় অসমর্থ। এই গোটা দৃশ্য মোমেনদের জেহাদের প্রেরণা যুগিয়ে তাকে।

এখানে প্রসংগত একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি এই যে, ভৌগলিক এলাকা বা ভূখন্ড সম্পর্কে ইসলামের একটি দৃষ্টি ভংগী রয়েছে। 'যে ভূখন্ডের অধিবাসীরা অত্যাচারী' তাকে ইসলাম তৎকালে 'দারুল হারব' (অর্থাৎ যুদ্ধের মাধমে বিজয়যোগ্য ভূমি) বলে গণ্য করতো, তা ছিলো 'মক্কা'। মক্কা ছিলো মোহাজেরদের জন্মভূমি এবং সেখানকার আটকে পড়া দুর্বল মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্যে লড়াই করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য ছিলো। এই মোহাজেরদেরকে সেখানকার মোশরেকদের সাথে লড়াই করতে এরূপ আবেগোদ্দীপ্ত ভাষায় আহ্বান জানানো হচ্ছে। সেখানকার দুর্বল মুসলমানদের করুণ দোয়া এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

মক্কা মোহাজের মুসলমানদের মাতৃভূমি হলেও তা ছিলো কোরআনের দৃষ্টি দারুল হারব অর্থাৎ কুফ্রের দেশ। কেননা, সেখানে আল্লাহর শরিয়ত তখনো চালু হয়নি এবং সেখানে মুসলমানরা নিছক মুসলমান হওয়ার কারণে নির্যাতিত হচ্ছিলো। তাই মোহাজেরদেরকে তাদের নিজ মাতৃভূমির বিরুদ্ধে লড়াই করে আপন মুসলমান ভাইবোনদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই মুসলমান যে পতাকা রক্ষার জন লড়াই করবে, তা হচ্ছে তার আকীদা ও ঈমান, জন্মভূমি নয়। যে ভূখন্ডে আল্লাহর আইন চালু হয়, সেটাই প্রত্যেক মোমেনের দেশ এবং তাকে রক্ষা করার জন্যে তাকে মরণপণ লড়তে হবে। এটাই 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামের দেশ, যা ইসলামকে নিজের আইন ও বিধান রূপে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে স্বদেশ ও মাতৃভূমি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগী। এছাড়া অন্য সব দৃষ্টিভংগী ইসলাম বিরোধী ও জাহেলী দৃষ্টি-ভংগী। ইসলামের কাছে এ সব দৃষ্টিভংগীর কোনো মূল্য নেই।

মোমেনরা আল্লাহর পথে আর কাফেররা তাগুতের পথে লড়াই করে

এরপর উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি, চলার পথ আলোকিত করা ও প্রত্যেক পক্ষের অনুসৃত মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য চিহ্নিত করার জন্যে আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক পরশ বুলানো হয়েছে পরবর্তী ৭৬ নং আয়াতে।

'যারা মোমেন, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর কাফেররা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।'

এখানে দুটো দল, দুটো পথ, দুটো উদ্দেশ্য ও দুটো পতাকা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে,

'যারা মোমেন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।'

'যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।'

যারা মোমেন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। তারা আল্লাহর বিধান ও তাঁর আইনকে বাস্তবয়িত করার জন্যে এবং মানব জাতির মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করে, আর এটা শুধু আল্লাহর নামেই হতে হবে, অন্য কোনো নামে নয়। এ দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া হবে যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইলাহ এবং সার্বভৌম শাসক।

আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অথাৎ আল্লাহর বিধান ছাড়া অনান্য বিধান বাস্তবায়নের জন্যে লড়াই করে, যে সব বিধান আল্লাহ কখনো অনুমোদন করেননি।

মোমেনরা আল্লাহর তদারকী, তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বের ওপর নির্ভর করে। আর কাফেররা শয়তানের অভিভাবকত্বের ওপর নির্ভর করে তাদের রকমারি জীবন ব্যবস্থা, আইন বিধান ও নিয়মরীতির মাধ্যমে। তারা সবাই শয়তানের বন্ধু ও মিত্র। আর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে নির্দেশ দেন যেন শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং শয়তানের চক্রান্তের যেন ভয় না করে;

এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। জেনে রেখো শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।'

এভাবে মুসলমানরা এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর অবস্থান করে। তাদের বিবেক এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যে, তারা আল্লাহর পথেই লড়াই করছে। এ লড়াইতে তাদের নিজেদের বা তাদের জাতির বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের কোনো স্বার্থ নেই। এ লড়াই শুধু আল্লাহর জন্যে এবং আল্লাহর আইন ও বিধানের জন্যে। এ লড়াইতে তারা একটা বাতিলপন্থী মানব গোষ্ঠীর মোকাবেলা করছে, যারা সত্যের ওপর বাতিলকে বিজয়ী করতে চায়, যারা মানব রচিত জাহেলী মতবাদ ও মতাদর্শকে আল্লাহর মত ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করতে চায়, মানব রচিত আইনকে আল্লাহর আইনের ওপর বিজয়ী কর্তৃত্বশীল করতে চায়। মানুষের যুলুম ও অবিচারকে আল্লাহর ন্যায় বিচারের ওপর বিজয়ী করতে চায় অথচ মুসলমানদেরকে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু মানবরচিত সকল জীবন ব্যবস্থা ও সকল আইন বিধান সম্পূর্ণ জাহেলিয়াত, তাই এ জাহেলিয়াতকে পরাজিত ও উৎখাত করার জন্যে মুসলমানদেরকে লড়াই করতে বলা হয়েছে। তাই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এ লড়াই পরিচালনায় তারা তাদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার।

মুসলমানরা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়ে লড়াই করে যে, এ লড়াইতে তাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক আল্লাহ তায়ালা। আর তারা যে জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, তাদের অভিভাবক শয়তান, তাই তারা দুর্বল। কেননা শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

এখান থেকেই মোমেনের চেতনায় লড়াইয়ের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। লড়াই শুরু করার আগেই লড়াইয়ের শেষ কোথায়, তা তাদের জানা হয়ে যায়। এরপর সে লড়াইতে শহীদ হোক বা বেঁচে থাক, তাতে কিছু এসে যায় না। শহীদ হলে তো ফলাফল সম্পর্কে সে নিশ্চিতই হয়ে গেলো। আর যদি বেঁচে থাকে এবং স্বচক্ষে বিজয় দেখতে পায়, তা হলেও সে মহান পুরস্কার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে।

আল্লাহর পথে জেহাদের এই উভয় দিক সম্পর্কে এই নির্ভুল ধারণা লাভের কারণেই সেই সব অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিলো, যা প্রথম মুসলিম সংগঠনের জেহাদের ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। সে সব ঘটনা সমগ্র ইতিহাসের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে সেগুলোর উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। সে সব ঘটনা সংখ্যায় প্রচুর। উল্লেখিত নির্ভুল ধারণার কারণেই অতো অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের এমন বিপুল জোয়ার সৃষ্টি হতে পেরেছিলো। আল্লাহর বিধান মুসলিম জাতির জীবনে কি অকল্পনীয় উন্নতি এনে দিয়েছিলো এবং ইসলাম বিরোধী শিবিরগুলোর ওপর তাকে কতো শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলো, সে কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কোরআন মোমেনদের সত্তার অভ্যন্তরে যে সর্বাত্মক লড়াই পরিচালনা করেছিলো এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে ধনে জনে ও সাজ সরঞ্জামে অধিকতর শক্তিধর তাদের দুশমনদের সাথে যে লড়াই চালিয়েছিলো, উল্লেখিত ধারণাটা সৃষ্টি করাও ছিলো সেই লড়াইয়ের একটা অংশ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকে, তাই শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়।

আল্লাহর বিধান উক্ত ধারণাকে গড়ে তোলার ও বদ্ধমূল করার ব্যাপারে কিরূপ চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেটা যখন আমরা দেখি তখন মনে হয় যে, কাজটা সহজ ছিলো না এবং শুধু মুখের কথায় তা করা যায়নি। ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা দ্বারা প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা, যে কোনো মূল্যে তার দীর্ঘ জীবন কামনা এবং লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার চিকিৎসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। বাদবাকী আয়াতগুলোতে এই চিকিৎসা ও এই চেষ্টা সাধনার উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের এক বা একাধিক গোষ্ঠীর কিছু আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এদের মধ্যে কিছু মোহাজেরও ছিলো। তারা মক্কায় থাকাকালে রকমারি নির্যাতনের শিকার হয়ে এতো বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, মোশরেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তখন পর্যন্ত তাদেরকে সে অনুমতি দেয়া হয়নি। এর নিগুঢ় রহস্য কি তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে এর কিছু কিছু অংশ আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করবো। এরপর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন তাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হলো, আর আল্লাহ তায়ালা এটা ফরয করা সমীচীন এবং মুসলমান ও বিশ্ব মানবের জন্যে কল্যাণকর মনে করলেন, তখন তারা এমন ভীত হয়ে পড়লো যে, মানুষকে আল্লাহর চেয়েও বেশী ভয় করতে আরম্ভ করলো। তারা বলতে লাগলো,

'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওপর লড়াই ফরয করলে কেন? অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দিলে না কেন?'

এছাড়া আরো একটি গোষ্ঠীর আচরণেও বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, যারা কোনো সৌভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলে বলতো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোনো অশুভ ঘটনা ঘটলে রসূল (স.)-কে বলতো যে, এটা আপনার পক্ষ থেকে হয়েছে। অনুরূপভাবে আরো একটি গোষ্ঠীর আচরণেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, যারা রসূল (স.)-এর সামনে আনুগত্যের অংগীকার করতো, কিন্তু তাঁর দরবার থেকে রেরিয়ে এসেই সেই অংগীকার লংঘন করতো। আরো একটি গোষ্ঠীর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, যারা কোনো সুখকর বা ভীতিজনক খবর পেলে তা প্রচার করা শুরু করে দিতো।

মোনাফেকী ও দুর্বল ঈমানের ব্যাপারে কিছু কথা

সূরার এই অংশটিতে এই কয় শ্রেণী সম্পর্কে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে কোরআনের স্বভাবসুলভ ভংগীতেই। এতে মানুষের মানসিক অবস্থা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তা দেখা যাচ্ছে। এতে জীবন ও মৃত্যু, অদৃষ্ট ও ভাগ্য, শুভ ও অশুভ, ক্ষতি ও লাভ, ন্যায় অন্যায়ের মানদন্ড ও মূল্যবোধ সব কিছু সম্পর্কেই মানুষের বিদ্যমান ভূল বুঝাবুঝি ও ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে সঠিক ধারণা দেয়া হয়েছে। এই সঠিক ধারণাকে কিরূপ জীবন্ত সত্য রূপে তুলে ধরা হয়েছে তা ৭৭ থেকে ৮৩ নং আয়াতে লক্ষ্য করুন।

'তুমি কি তাদের দিকে দৃষ্টি দাওনি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, হাত গুটিয়ে রাখো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও, অতপর যখন তাদের ওপর লড়াই ফরয করা হলো, তখন সহসা তাদের একদল মানুষকে আল্লাহর মতোই অথবা তার চেয়েও বেশী ভয় করতে লাগলো।... আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে তোমরা সবাই শয়তানের আনুগত্য করতে।'

আলোচ্য আয়াত কয়টিতে যে শ্রেণীটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সে শ্রেণীটি পূর্ব আয়াতগুলোতে আলোচিত 'গড়িমসিকারীরাও' হতে পারে। হয়তো বা ৭১-৮৬ এই সব কয়টি আয়াতের আলোচ্য বিষয় তারা পুরোপুরি মোনাফেক এবং যাদের কথা ও কাজে কিছু নমুনা এই আয়াতগুলোতেও তুলে ধরা হয়েছে। আমি এই ধারণাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছিলাম। কেননা, এই সব কটি আয়াতে (৭১-৮৬) যে দোষ ত্রুটিগুলো আলোচিত হয়েছে তা স্পষ্টতই মোনাফেকীর আলামত এবং তা মুসলিম সমাজে বিদ্যমান মোনাফেকদের স্বভাবেরই কাছাকাছি। ইতিপূর্বে তাদের যে সব কর্মকান্ডের পরিচয় পাওয়া গেছে, এগুলোর তার সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ। আর

কোরআনের বাচনভংগীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যও এই যে, তার আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। তাই এ আয়াতগুলোতে একই শ্রেণীর অর্থাৎ মোনাফেকদের বিষয়ই আলোচিত হবে-এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ৭৭-৮৩ নং আয়াত কয়টির মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে,

'তুমি কি তাদের দিকে দৃষ্টি দাওনি যাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও'

এই বক্তব্যটি দেখে আমি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি এবং ৭১-৮৬ পর্যন্ত সমগ্র আলোচনাটাই মোনাফেকদের নিয়ে আবর্তিত-এ ধারণা সম্পর্কে আমার মনে সংশয় জন্মে। যদিও এখানে মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পেয়েছে এবং সামগ্রিক আলোচনার বিষয়বস্তুই অব্যাহত রয়েছে বলে মনে হয়, তবুও এতে শুধুই মোনাফেকদের কথা আলোচিত হয়েছে এ কথা ভাবতে মনে সায় দেয় না। বরঞ্চ মনে এরূপ ধারণা জন্মে যে, ৭৭-৮৩ আয়াত গুচ্ছটি এমন এক শ্রেণীর মোহাজের সম্পর্কে নাযিল হয়ে থাকবে, যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, কিন্তু মোনাফেক নয়। যদিও ঈমানের দুর্বলতা দৃশ্যতা মোনাফেকীর মতোই, তবুও তা হুবহু মোনাফেকী নয়। ৭১-৮৬ আয়াত সমষ্টিতে যে ৪টি আয়াত গুচ্ছ রয়েছে, তার প্রতিটি গুচ্ছেই মোনাফেকদের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বর্ণনা থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, এগুলো সামগ্রিকভাবে মোনাফেকদের একটা সাধারণ বিবরণ। এ জন্যেই হয়তো এতে তাদের বিচিত্র কথা ও কাজের উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৭-৮৩ এ আয়াত গুলো দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট মোহাজেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। আমাদের এ ধারণার কারণ এই যে, মক্কায় থাকাকালে মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও তাদের দুঃসহ নির্যাতন রুখে দাঁড়ানো ও প্রতিরোধ করার জন্যে যাদের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিলো, তারা মোহাজেরদেরই একটি গোষ্ঠী-অন্য কেউ নয়। এ জন্যেই তাদেরকে বলা হয়েছে,

'তোমরা হাত গুটিয়ে রাখো (অর্থাৎ যুদ্ধ করো না) এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।'

এমনকি আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী ৭২ জন ইয়াসরেরবাসী মুসলমান যখন সমগ্র মিনাবাসীকে হত্যা করতে রসূল (স.)-এর অনুমতি চাইলো এবং রসূল (স.) 'আমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি' বলে তাদেরকে নিবৃত্ত করলেন, (বাইয়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আকাবার পর্বত থেকে শয়তান চিৎকার করে মিনাবাসীকে বাইয়াতের ঘটনা জানিয়ে দিয়েছিলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিলো বলেই তারা মিনাবাসীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন) তখনকার সেই ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা বলতে পারি না যে, আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী আনসাররা মোনাফেক অথবা দুর্বল মোমেন ছিলেন। কেননা, এই পূতপবিত্র মানব গোষ্ঠীর ভেতরে মোনাফেকী কিংবা দুর্বলতার নামগন্ধও ছিলো না।

সুতরাং সর্বাধিক সম্ভাব্য ব্যাপার এটাই যে, এ আয়াত কয়টি কতিপয় মোহাজের সম্পর্কে নাযিল হয়ে থাকবে, যারা মদীনায় নিরাপদ অবস্থানের সুযোগ এবং মোশরেকদের যুলুম নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর জেহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিথিল ও উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র যুদ্ধের ব্যাপারে উদাসীনতা ছাড়া আর যে সব দোষ ত্রুটির কথা এ কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা মোহাজেরদের নয়, বরং মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। কেননা মানবীয় দুর্বলতার দিকটি আমরা যতোই লক্ষ্য করি না কেন, ইসলামের প্রতি অগ্রণী এই মহান

মানব গোষ্ঠীটিকে আমরা এতোটা মন্দভাবে চিহ্নিত করতেই পারি না যে, তারা কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্যে রসূল (স.)-কে দায়ী করবেন, আর সৌভাগ্যজনক কোনো ঘটনার কৃতিত্বই রসূল (স.)-কে দেবেন না, অথবা তার সামনে আনুগত্যের অংগীকার করবেন এবং বাইরে গিয়েই তার খেলাপ করবেন। গুজব ছড়ানোর কাজটি তাদের দ্বারা সংঘটিত হওয়াকে আমরা অসম্ভব মনে করি না। কেননা, এটা পরিচায়ক নয় বরং নিয়মতান্ত্রিক কাজে অদক্ষতার পরিচায়ক।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আয়াতগুলোর ব্যাপারে আমরা কোনো কিছুই নিশ্চয় করে বলতে পারি না। এ আয়াতগুলো সম্পর্কে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই, এমনকি প্রথমোক্ত আয়াত গুচ্ছটি সম্পর্কে কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তা মোহাজেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে তা মোনাফেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এ জন্যেই আমরা সর্বাধিক সতর্ক পথ অবলম্বন করেছি। আমরা বলেছি যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে গড়িমসি ও শৈথিল্য, মোমেনদের ওপর আপতিত ভালোমন্দ ঘটনার ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, রসূল (স.)-কে সকল দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী করা এবং সকল ভালো ঘটনার কৃতিত্ব শুধু আল্লাহকে দেয়ার উল্লেখ রয়েছে তার দায়-দায়িত্ব মোহাজেরদের ওপর পড়ে না। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর সাথে আনুগত্যের অংগীকার করে পরে তার খেলাপ করার মতো ঘৃণ্য কাজটিও মোহাজেররা করেনি। অবশ্য, কোরআনের বর্ণনাভংগিকে দীর্ঘকাল সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেই এটা উপলব্ধি করা সম্ভব, নিছক স্থূল পর্যালোচনা দ্বারা নয়।

এবার আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যায় আসা যাক। ৭৭ ও ৭৮ নং আয়াতের আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি কি তাদের অবস্থা দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, হাত গুটিয়ে রাখো..... তোমরা যেখানেই থাকো মৃত্যু তোমাদেরকে আক্রান্ত করবেই, যদি দৃঢ়ভাবে নির্মিত দুর্গে বাস করো।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা সেই মোমেনদের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করছেন, যারা মক্কায় থাকাকালেই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার আতিশয্যে যুদ্ধ করতে চাইত এবং এ ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করতো। তারা মোশরেকদের অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অবিলম্বেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সে সময় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। না দেয়ার পেছনে তাঁর নিশ্চয়ই কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিলো। এরপর যখন আল্লাহর মনোনীত সময় এলো, পরিস্থিতি সব দিক দিয়ে উপযোগী হয়ে উঠলো এবং তাদের ওপর আল্লাহর লড়াই ফরয করা হলো, তখন তাদের একটি দল এতো ভীত সন্ত্রস্ত ও বেসামাল হয়ে পড়লো যে, যে সব মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মতো ভয় করতে শুরু করে দিলো। অথচ আল্লাহর মতো কঠোর আযাব আর কেউ দিতে পারে না।

'এমন কি আল্লাহর চেয়েও বেশী ভয় করতে লাগলো।'

'তারা ভয়ে অস্থির হয়ে বলতে লাগলো;

'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওপর লড়াই ফরয করলে কেন?'

কোনো মোমেনের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন ওঠা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এ প্রশ্ন তোলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নকারীর ওপর ইসলাম যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে তা তার কাছে স্পষ্ট নয়। এরপর শুধু প্রশ্ন তুলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং অত্যন্ত হীনমন্যতাসুলভ বাসনাও প্রকাশ করেছে যে,

'আর অল্প কিছু সময় দিলে না কেন?'

অর্থাৎ এমন ভয়ংকর দায়িত্ব চাপানোর আগে কেন একটু সময় দিলে না?

অতিমাত্রায় দুঃসাহসী উগ্র, রগচটা ও দুরন্ত লোকেরা অনেক সময় কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হলে সবচেয়ে বেশী ভীতসন্ত্রস্ত, কাপুরুষ সাব্যস্ত হয়ে থাকে ও পরাজিত হয়। এর কারণ এই যে, পূর্বে যে বীরত্ব ও সাহসিকতা তারা দেখিয়েছিলো, তা প্রকৃত শৌর্য-বীর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও দুর্ধর্ষতার পরিচায়ক ছিলো না এবং প্রকৃত দায় দায়িত্বের উপলব্ধির ভিত্তিতেও তা গড়ে ওঠেনি। এমনকি ধৈর্যহীনতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার অভাবের কারণে এ ধরনের দুরন্তপনা ও দুঃসাহসিকতার জন্ম নিতে পারে। এর ফলে তারা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই যেন তেন প্রকারে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ও বিজয়ী হওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে, অথচ এ জন্যে কী কী প্রস্তুতির প্রয়োজন তা জানে না। অতপর যখন বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দেখতে পাই যে, লড়াই ও সংঘর্ষের দায় দায়িত্ব, যা ধারণা করেছিলো তার চেয়েও অনেক বেশী এবং অনেক বেশী কঠিন, তখন তারাই সবার আগে পরাজয় বরণ করে রণে ভংগ দেয়। পক্ষান্তরে যারা অপেক্ষাকৃত সংযত ও সহিষ্ণু, লড়াই সংঘাতের দায় দায়িত্ব বোঝে ও উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারা অবিচল থাকে। অথচ রগচটা মাথা গরম লোকেরা তাদেরকে কাপুরুষ ভাবে। এরপর যুদ্ধের ময়দানে প্রমাণিত হয়ে যায় কারা অধিকতর সহিষ্ণু ও দূরদর্শী।

খুব সম্ভবত এ আয়াতগুলোতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা এই অসহিষ্ণু শ্রেণীরই লোক ছিলো। মক্কায় তীব্র নির্যাতন তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। তারা সম্ভ্রান্ত লোক ছিলো বিধায় এ নির্যাতনকে তারা অপমানজনকও মনে করেছিলো। তাই আত্মরক্ষা বা মর্যাদা রক্ষার খাতিরে এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করার জন্যে তারা রসূল (স.)-এর কাছে অনুমতি চাইতো। কিন্তু রসূল (স.) আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকতেন এবং প্রশিক্ষণ দান প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপযুক্ত সময়ের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন। অতপর যখন এই গোষ্ঠীটি হিজরত করে মদীনায় এসে নিরাপত্তা লাভ করলো এবং এখানে আর কোনো লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও নির্যাতন রইলো না। তখন তাদের চোখে লড়াইয়ের আর কোনো যুক্তি রইলো না, অন্ততপক্ষে এতো দ্রুত তার দরকার হবে বলে তারা মনে করেনি

'অতপর যখন তাদের ওপর লড়াই ফরয করা হলো ....।'

সম্ভবত এই শ্রেণীটি মোমেন ছিলো। কেননা বিপদে আপদে তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতো একনিষ্ঠভাবে। এ অবস্থাটা আমাদের নযরে রাখতে হবে। তবে তখনও পর্যন্ত তাদের ঈমান হয়তো পরিপক্কতা অর্জন করেনি এবং ইসলামের দাবী ও চাহিদা কী, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। ইসলামের চাহিদা শুধু ব্যক্তি দেশ ও জাতির রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যেই সীমিত নয় বরং তা হচ্ছে আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর ন্যায় সংগত বিধান কায়েম করা, পৃথিবীতে এমন একটি সর্বোচ্চ পরাক্রান্ত শক্তি প্রতিষ্ঠা করা, যা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের পথে কোনো বাধা থাকতে দেবে না, পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর দ্বীনের কথা শোনার পথে কোনো অন্তরায় থাকতে দেবে না এবং কেউ স্বাধীনভাবে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করতে চাইলে কেউ তাকে নির্যাতন করে তার জীবিকার পথ বন্ধ করে বা অন্য কোনো উপায়ে তাকে বাধা দিতে সক্ষম হবে না। এ সব দিক বিবেচনা করতে গেলে মদীনায় তখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে সর্বপ্রকার হুমকিমুক্ত অবস্থায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ তখনও সুগম হয়নি। তাই মোমেনদের দায়িত্ব তখনো শেষ হয়নি এবং তাদেরকে জেহাদ থেকে নিবৃত্ত রাখারও অবকাশ ছিলো না।

তাদের ঈমান যে তখনো পরিপক্কতা অর্জন করেনি, তার একটি লক্ষণ ছিলো তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারটাকে ইসলামের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করে বসেছিলো এবং শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ মেনে চলাটা যে তাদের দায়িত্ব তা বুঝতে পারেনি, চাই তার যৌক্তিকতা তাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। মোমেনদের এই শ্রেণীটি তখনো পর্যন্ত ইসলামকে ভালো করে বুঝতে পারেনি, আর তাই পৃথিবীতে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, তাও তাদের অজানা থেকে গেছে। আর মোমেন হিসাবে তাদের দায়িত্ব কী, তাও উপলব্ধি করতে পারেনি। এ কারণেই তাদের এই মনোভাবের সৃষ্টি হতে পেরেছিলো, যা এই দুটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।

মক্কী জীবনে যুদ্ধের হুকুম দেয়া হয়নি কেন?

মক্কায় থাকাকালিন সময়ে মুসলমানদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের যৌক্তিকতা কী তা নিশ্চিতভাবে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা যা নিজে ব্যাখ্যা করেননি, তা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? আমরা নিশ্চিতভাবে এর যৌক্তিকতা নির্দেশ করতে পারি না বটে, তবে কয়েকটি বিষয় আমরা এজতেহাদ করে বলতে পারি এবং এগুলো সঠিক কিনা তা, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

ক. এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, মক্কী যুগটি ছিলো প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের যুগ, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট জাতিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করা ছিলো প্রধান কাজ। এই প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো আরব জনতাকে এমন সব যুলুম নির্যাতনে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত করা, যাতে তারা সাধারণত ধৈর্যধারণ করে না। এতে করে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ ও উত্তেজনার উর্ধে উঠতে পারবে এবং প্রথম উস্কানীতেই বেশামাল ও উত্তেজিত হবে না। এতে তাদের ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া একটি সুশৃংখল ও সসংগঠিত সমাজের অনুগত সদস্য হওয়ার জন্যেও এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো। এই সদস্যরা সমাজের নেতার নির্দেশ ছাড়া নিজের ব্যক্তি বা গোত্রীয় ভাবাবেগের বশে কোনো পদক্ষেপ নেবে না, এ ব্যাপরে নিশ্চয়তা লাভ করা সত্যিকার সুসভ্য ও প্রগতিশীল 'ইসলামী সমাজ' গঠনের জন্যে প্রযোজনীয় ছিলো।

খ. এর একটা কারণ এও হতে পারে যে, শান্তিপূর্ণ দাওয়াত অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে থাকে এবং তা মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়, বিশেষত কোরায়শদের ন্যায় উগ্র আভিজাত্যবাদী পরিবেশে। কেননা, মুসলমানরা মক্কায় তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তা হতো আরবদের চিরাচরিত প্রতিশোধ পরায়নতাকে চিরস্থায়ী করা ও তাকে আরো বাড়িয়ে তোলার পদক্ষেপ মাত্র। ইতিপূর্বে তার দাহিস, গাবরা ও চাসুসের যুদ্ধ যুগ যুগ কাল ধরে চালিয়েছে। সে সব যুদ্ধে কোনো গোত্র একেবারে যুক্ত হলে চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করতো, ফলে কখনো শান্তি ফিরে আসতো না। ইসলাম একটি দাওয়াত হিসাবে নয়, বরং একটি ধারাবাহিক প্রতিশোধের প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতো। সূচনা পর্বেই তাঁর মূল তত্ত্ব বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেতো। আর কোনো কালে কেউ তাকে স্মরণ করতো না।

গ. এর আরো একটা কারণ এই হতে পারে যে, এভাবে ঘরে ঘরে ও পরিবারে পরিবারে লড়াই সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডের সম্ভাবনা এড়ানো যেতো না। তৎকালীন আরবে কোনো সুসংগঠিত সরকার বা শাসন ব্যবস্থা ছিলো না, যা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলো। এটা ছিলো প্রত্যেক পরিবারের প্রধানের দায় দায়িত্বের আওতাধীন, তারাই ইসলাম গ্রহণকারীদের নানাভাবে

'শায়েস্তা' করতো। এই পরিবেশে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়ার অর্থ দাঁড়াতো ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যাওয়া। তারপর বলা হতো, 'এই দেখো ইসলামের অবস্থা।' লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া তো দূরের কথা, লড়াই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া সত্তেও ইসলাম অপবাদ থেকে রক্ষা পায়নি। হজ্জ ও ব্যবসা উপলক্ষে আগত লোকদেরকে কোরায়শ নেতারা বলতো যে, মোহাম্মদ সন্তান ও পিতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, গোত্র ও আত্মীয়দের মধ্যে তো করেছেই। এর ওপর যদি পুত্রকে আদেশ দেয়া হতো পিতাকে হত্যা করার এবং গোলামকে আদেশ দেয়া হতো মনিবকে হত্যা করার এবং প্রত্যেক পরিবারে ও প্রত্যেক পাড়ায় মহল্লায় তা যদি কার্যকরী হতো, তাহলে ভেবে দেখুন, সমাজের দৃশ্যটা কেমন হতো?

ঘ. এর একটি কারণ হয়তো এও ছিলো যে, এই সব অত্যাচার নির্যাতনকারীদের অনেকেই ভবিষ্যতে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকে এমনকি নেতায় পরিণত হবে বলে আল্লাহ তায়ালা জানতেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কথাই ধরুন না।

ঙ. আরো একটি কারণ হয়তো এই ছিলো যে, গোত্রীয় সমাজে আরবীয় মহানুভবতা ও সহানুভূতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তারা মযলুমের বিশেষত যে মযলুম নীরবে যুলুম সহ্য করে ও প্রতিশোধ নেয় না তার পক্ষে থাকতো। বিশেষত মযলুম যখন ভদ্র ও শান্তশিষ্ট লোক হতো। বেশ কিছু ঘটনা থেকে এর সমর্থক পাওয়া যায়। ইবনুদ দাগনাহ সেই কঠিন দুর্দিনে হযরত আবু বকরকে মদীনায় যেতে দিতে রাযী হয়নি, বরং তাকে আশ্রয় দিতে ও রক্ষা করতে চেয়েছে। কেননা এমন ভদ্র ও মহানুভব ব্যক্তির মক্কা থেকে হিজরত করে চলে যাওয়াকে সে আরবদের জন্যে কলংকজনক মনে করেছিলো। সর্বশেষ উদাহরণ হলো, বনু হাশেমের বিরুদ্ধে অবরোধের দলীল ছিন্ন হওয়া। বনু হাশেমের অনাহার ও দুর্ভোগ যখন দীর্ঘস্থায়ী ও চরম আকার ধারণ করলো, তখন কোরায়শরাই স্ব-উদ্যোগে এই অবরোধ ভেংগে ফেললো। পক্ষান্তরে প্রাচীন সভ্যতার ধারকবাহকদের কোনো কোনো সমাজ নিরীহ মানুষদের ওপর আরো বেশী ঔদ্ধত্য দেখিয়ে থাকে এবং যুলুমকে নীরবে সহ্য করলে সেখানে বিদ্রূপ, উপহাস ও ঘৃণার মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং আগ্রাসী যালেমের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।

চ. আর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, তৎকালে মক্কায় মুসলমানরা ছিলো মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু। তাদের অবস্থান ছিলো মক্কায় সীমাবদ্ধ। তখনো আরব উপদ্বীপের অন্যান্য জায়গায় দাওয়াত পৌঁছেনি, পৌঁছলেও ছিটেফোঁটা মাত্র। মক্কার বাইরের সকল গোত্র কোরায়শদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলো। তারা এই বিবাদের শেষ দেখার অপেক্ষায় ছিলো। এরূপ পরিস্থিতিতে একটি সীমাবদ্ধ লড়াই সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ ঘটাতে পারতে, এমন কি তারা যদি নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক মোশরেককে হত্যা করে মারা যেতো, তবু শেরেক বিলুপ্ত হতো না। মুসলমানদের দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং পৃথিবীতে বাস্তবে কোনো ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র গঠিত হতো না। অথচ ইসলাম একটি বাস্তব সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলো।

ছ. উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো উপেক্ষা করে যুদ্ধের আদেশ দান ও নির্যাতন প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে এমন কোনো পরিস্থিতি তখনো দেখা দেয়নি। কেননা ইসলামী দাওয়াতের মূল ভিত্তি অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন ছিলো। এই ভিত্তি রসূল (স.)-এর ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে অক্ষুণ্ন ছিলো। বনু হাশেমের তরবারীগুলো তাঁকে সংরক্ষণ করে যাচ্ছিলো এবং রসূল (স.)-এর দিকে কেউ হাত বাড়ানোর ধৃষ্টতা দেখালে বনু হাশেমের তরবারীগুলো সে হাত কেটে ফেলার জন্যে প্রস্তুত ছিলো।

তৎকালে প্রচলিত গোত্রীয় প্রতাপের কারণে প্রতিটি গোত্রই বনু হাশেমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ভয় পেতো। আর রসূল (স.)-এর দিকে হাত বাড়ালে সেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতো। সুতরাং ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের মূল ব্যক্তিত্ব যে যথেষ্ট সংরক্ষিত অবস্থায় ছিলো, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রসূল (স.) বনু হাশেমের তরবারীর রক্ষাব্যূহের আওতায় এবং গোত্রীয় ব্যবস্থার অধীন আপন দাওয়াতের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা বিন্দুমাত্রও লুকাচ্ছিলেন না, আর কাবা শরীফের মিলনায়তনে কোরায়শদের সভা সমিতিতেই হোক, সাধারণ সভা সমাবেশেই হোক কিংবা সাফা পাহাড়ের চূড়ায়ই হোক-ইসলামের দাওয়াত প্রচারে রসূল (স.)-কে বাধা দেয়ার ধৃষ্ঠতা দেখাতে পারে এমন কেউ ছিলো না। রসূল (স.)-এর কণ্ঠ রোধ বা তাঁর বাক স্বাধীনতা হরণ করার সাহস কারো ছিলো না, তাঁকে অপহরণ করা, কারাগারে আটক করা বা হত্যা করার ক্ষমতাও কারো ছিলো না, এমনকি তাকে কোনো নির্দিষ্ট কথা বলতে এবং ইসলামের কতকাংশ প্রকাশ ও কতকাংশ গোপন করতে বাধ্য করার স্পর্ধা দেখাতে পারে এমনও কেউ ছিলো না। উপরন্তু লোকেরা যখন রসূল (স.)-কে তাদের দেবদেবীর সমালোচনা করতে নিষেধ করেছে, তখন তিনি নিষেধ মানেননি। তাদের বাপদাদার ধর্মের খুঁত ধরতে এবং তারা জাহান্নামে যাবে এ কথা বলতে তাঁকে বারণ করা হলেও তিনি নিবৃত্ত হননি। তাঁকে আপোস করতে বলা হলে অর্থাৎ তাঁকে তারা তাদের ধর্মের কিছু পালন করতে বললে এবং তার বিনিময়ে তারা ইসলামের কিছু বিধি পালন করবে বলে আশ্বাস দিলেও তিনি আপোস রফায় রাযী হননি। মোটকথা, রসূল (স.)-এর ব্যক্তিসত্ত্বার আকারে বনু হাশেমের তরবারির তত্ত্বাবধানে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পরিপূর্ণ আস্তিত্ব বজায় ছিলো এবং তা পূর্ণমাত্রায় সর্বত্র সর্বপ্রকারে সক্রিয় প্রচারমুখর ছিলো। তাই অবিলম্বে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে যে পরিবেশ ইসলামের অনুকূলে ও সহায়ক ছিলো, তাকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে আরো জটিল বানিয়ে দেয়ার জন্যে অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে এমন কোনো অনিবার্য প্রয়োজন তখনো দেখা দেয়নি।

বস্তুত আমাদের ধারণা মতে এই কারণগুলোর প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে লড়াই থেকে নিবৃত্ত থাকা এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার আদেশ দেয়াকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করেছিলেন। এতে করে তাদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ যেমন পূর্ণতা লাভ করতে পারতো এবং বিদ্যমান পরিবেশ দ্বারা যতোটুকু সম্ভব উপকৃত হয়ে মুসলমানরা পরবর্তী উপযুক্ত সময়ে নেতার আদেশের অপেক্ষায় থাকতে পারতো, তেমনি সর্ব প্রকারের স্বার্থ ও সাময়িক লাভের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকতে পারতো। বিশেষত দাওয়াতের কাজ যখন কোনো না কোনোভাবে অক্ষুণ্ন ছিলো এবং তার অস্তিত্ব সংরক্ষিত ছিলো।

কিন্তু এ সব সত্তেও কিছু আবেগপ্রবণ লোক যুদ্ধের অনুমতির অপেক্ষায় ব্যাকুল থাকতো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর যখনই তাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হলো, অমনি তাদের একটি দল বলতে লাগলো, হে আমাদের প্রভু, এক্ষুণি আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলে কেন? কেন আমাদেরকে নিকটবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিলে না?'

এই আবেগপ্রবণ গোষ্ঠীটি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছিলো। মোমেনদের যে দলটি ছিলো স্থিরচিত্ত, অবিচল, শান্ত,

দৃঢ়চেতা এবং সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও বিপুল উদ্যমে জেহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তাদের সাথে এই অস্থিরচিত্ত ও আবেগপ্রবণ গোষ্ঠীর একটা সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর মধ্যেও বীরত্ব সাহস ও উদ্যম বিদ্যমান ছিলো, তবে তা ছিলো যথাস্থানে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে সংরক্ষিত। আসলে সেই বীরত্বই আসল বীরত্ব, যা আদেশ জারী হওয়ার পর তা কার্যকরী করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আদেশ আসার আগেই যে বীরত্ব প্রদর্শিত হয় তা নিছক আবেগ এবং প্রকৃত বিপদ দেখা দেয়ার সময় হয়তো তা চুপসে যাবে।

মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই

কোরআন আল্লাহর বিধান অনুসারে এই পরিস্থিতির প্রতিকার করেছিলো। কোরআন বলেছে,

'বলো, দুনিয়ার সহায়-সম্পদ নিতান্তই সামান্য'

আর আল্লাহভীরুদের জন্যে পরকালই উত্তম। তোমরা বিন্দুমাত্রও অত্যাচারের শিকার হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত দুর্গেও থাকো না কেন।'

তারা মৃত্যুকে ভয় পেতো, জীবনের জন্যে লালায়িত থাকতো এবং কাতর কণ্ঠে মিনতি জানতো, 'আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে কিছুটা সময় দিতেন এবং আয়ু সামান্য একটু বাড়িয়ে দিতেন।'

মৃত্যু ও আয়ুষ্কাল সংক্রান্ত ধারণার অস্পষ্টতা দূর করে দিয়ে কোরআন এই মানসিকতাকে অংকুরেই বিনষ্ট করেছে,

'বলো, দুনিয়ার সহায়-সম্পদ নিতান্তই সামান্য।'

অর্থাৎ গোটা দুনিয়ার সহায় সম্পদ এবং গোটা দুনিয়ার যুগ যামানার জন্যেই অপ্রতুল। কাজেই কয়েকটি দিন, কয়েকটি সপ্তাহ, মাস ও বছরের প্রশ্ন অবান্তর। অতএব সামান্য কটা দিন বাড়িয়ে দিলেই বা কী লাভ?

'আল্লাহভীরুদের জন্যে পরকালই উত্তম।'

বস্তুত দুনিয়া চূড়ান্ত নয়, শেষ কথাও নয়, এটি একটি স্তর মাত্র। এর পরেই আখেরাত। সেই আখেরাতের সম্পদই আসল সম্পদ। উপরন্তু সেখানকার সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী ও অফুরন্ত, আর সেই সম্পদই উত্তম। 'আল্লাহভীরুদের জন্যে উত্তম।' যারা আল্লাহভীরু যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা মানুষকে ভয় করে না। তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের কিছু করতে চান না, তখন অন্য কেউ তা করতে পারে না।

'তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।'

সুতরাং দুনিয়ার কোনো সম্পদ খোয়া গেলেও কোনো ক্ষতির আংশকা নেই। কেননা আখেরাত রয়েছে এবং সেখানে পরিপূর্ণ কর্মফল পাওয়া যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতের হিসাব চুকিয়ে সার্বিক প্রতিদান দেয়া হবে, কোনো যুলুম ও ক্ষতি হবে না।

কিন্তু দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতে বিশ্বাস থাকা সত্তেও কিছু লোক দুনিয়ার ব্যাপারে অধিকতর লালায়িত হয়ে থাকে। আখেরাতের উত্তম প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকা সত্তেও, বিশেষত ঈমানের প্রাথমিক স্তরে থাকা অবস্থায় দুনিয়ার অধিকতর লোভ ও মোহ অনেককেই পেয়ে বসে।

জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত সঠিক ধারণা দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে। মানুষ যে তার আয়ুষ্কাল ও ভাগ্যের নিগড়ে বন্দী এবং মৃত্যুকে যতো ভয়ই পাক মৃত্যু যে অবধারিত সে কথা তাকে জানিয়ে তার যুদ্ধের ভীতি দূর করা হয়েছে এবং যুদ্ধের জন্যে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, এমনকি যদি তোমরা শক্ত দুর্গে থাক তবুও।'

অর্থাৎ মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে আসবেই। যুদ্ধ ও শান্তির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ব্যক্তি যে স্থানে আশ্রয় নেয়, তা সুরক্ষিত হোক বা অরক্ষিত হোক, যুদ্ধের আদেশ দ্রুত আসুক বা বিলম্বে আসুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই আসবে। যারা জেহাদে যাবে তারাও অগ্রিম মৃত্যু বরণ করবে না। আর যারা জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকবে, তাদেরও মৃত্যু বিলম্বিত হবে না।

যুদ্ধ ও মৃত্যু আলাদা আলাদা জিনিস। উভয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধু মৃত্যু ও আয়ুষ্কালের মধ্যে। এ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং যুদ্ধের আদেশ বিলম্বিত হওয়ার আক্ষেপ নিরর্থক। আর যুদ্ধে কিংবা শান্তিতে মানুষকে ভয় করাও অর্থহীন। এভাবেই কোরআন মানুষের মন থেকে ভয়ভীতি ও অস্থিরতা দূর করে।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করবে না এবং সাধ্যমত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ, তা তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন, তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ভীতিপূর্ণ পরিবেশে সতর্কতার সাথে নামায তথা 'সালাতুল খাওফ' পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এসব ভিন্ন জিনিস, আর এর সাথে মৃত্যুকে জড়িত করা ভিন্ন জিনিস। সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ। এর পেছনে গোপন ও প্রকাশ্য যুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহর পরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে। পক্ষান্তরে মৃত্যু ও তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাও ভিন্ন জিনিস। হাজারো সতর্কতা সত্তেও মৃত্যুর আগমন এক অবধারিত সত্য। এর জন্যে প্রস্তুতি থাকাও একটি অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। এর পেছনেও গোপন ও প্রকাশ্য যুক্তি রয়েছে এবং এর পেছনেও আল্লাহর পরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে।

এ সব কিছুর মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় বিধানই হলো ইসলাম। আর এটাই ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্যে ইসলামের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

মোনাফেকদের দৃষ্টিভংগী

সম্ভবত এখানে মোহাজেরদের এই গোষ্ঠীটি সংক্রান্ত আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে। আর এখান থেকে অপর একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইসলামী সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো এ গোষ্ঠীও। যদিও মাঝখানে এমন কোনো আলামত নেই যা দ্বারা বুঝা যায় যে, পরবর্তী কথাগুলো অন্য একটি গোষ্ঠী সংক্রান্ত এবং বর্তমান গোষ্ঠী সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, তথাপি ইতিপূর্বে আমরা যে কটি তত্ত্ব আলোচনা করেছি তার আলোকেই আমি এ কথা বলেছি। পরবর্তী গোষ্ঠী সংক্রান্ত আলোচনা এভাবে শুরু হয়েছে,

যদি কোনো শুভ ঘটনা ঘটে তবে তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে, আর যদি কোনো অশুভ ঘটনা ঘটে, তবে তারা বলে, এটা তোমার পক্ষ থেকে হয়েছে। ... সে আল্লাহরই আনুগত্য করে আর যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে না, তার জন্যে আমি তোমাকে রক্ষক বানিয়ে পাঠাইনি।' (আয়াত নং ৭৮)

যারা কল্যাণকর ঘটনার কৃতিত্ব আল্লাহকে দেয় এবং ক্ষতিকর ঘটনার দায়িত্ব রসূল (স.)এর ওপর বর্তায়, তাদের এ আচরণের ব্যাখ্যা থাকতে পারে,

প্রথম, তারা রসূল (স.)-কে অকল্যাণ ও অশুভের উৎস মনে করে এবং তাঁর কারণেই তাদের যতো অমংগল আসে বলে ধারণা করে। যদিও এট একেবারেই অসম্ভব। দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা হলে, গবাদিপশুর মড়ক লাগলে অথবা অন্য কোনো বিপদ ঘটলে তারা রসূল (স.)-কে সেই দুর্ভাগ্যের কারণ বলে বিবেচনা করে। আর ভালো কিছু ঘটলে তার কৃতিত্ব দেয় আল্লাহকে।

দ্বিতীয়ত, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বকে কলংকিত করতে চায়, যাতে তাঁর আদেশ, বিশেষত যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে তার আদেশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতা স্বীকার না করে এই বক্রপথ অবলম্বন করে। তারা বলে যে, যা কিছু কল্যাণকর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ক্ষতিকর তা রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে ও তার আদেশ থেকে সংঘটিত হয়, আর কল্যাণ ও অকল্যাণ বলতে তারা দুনিয়ার জীবনে লাভ-লোকসানকেই বুঝায়।

তৃতীয়ত, তারা তাদের ও অন্যান্য লোকের জীবনে এই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে ও তার সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সংযোগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, আর রসূল (স.)-এর আদেশ মানার ব্যধ্যবাধকতা ও তাঁর সাথে আল্লাহর সংযোগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত।

শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি যদি সত্য হয়, তাহলে এটি মোহাজেরদের সে গোষ্ঠীটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতেও পারে। কেননা মৃত্যু ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কে তাদের ভুল বুঝাবুঝির কারণে তারা মানুষকে আল্লাহর মতো বা তার চেয়েও বেশী ভয় পেয়েছিলো এবং কেন আর কটা দিন পরে যুদ্ধ ফরয করা হলো না সে জন্যে খেদোক্তি করেছিলো। তথাপি আমার এখনো এই ধারণা প্রবল যে, এই বৈশিষ্ট্যটি অন্য একটি গোষ্ঠীর বেলায় প্রযোজ্য, যাদের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সবই সমবেত ছিলো।

আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন

এ আয়াত কটিতে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, তা অদৃষ্ট সংক্রান্ত বিরাট ও সুপরিচিত বিষয়ের একটি দিকমাত্র। উল্লেখিত মানবগোষ্ঠীর বিবরণ দান করা এবং তারপর তার জবাব দেয়া ও তাদের ধারণা সংশোধন করতে গিয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন এ বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে। বিষয়টি কোরআনে যেভাবে বর্ণনা করেছে তা হলো,

'তাদের জীবনে কোনো শুভ ঘটনা ঘটলে তারা বলে যে, এটি তোমার পক্ষ থেকে এসেছে। তুমি বলো যে, 'সব কিছুই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এদের কী হয়েছে যে, তারা কোনো কথাই বুঝতে চায় না?'

বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে, আর মানব জাতির জীবনে এবং তাদের জন্যে যা কিছু ঘটে, তার সব কিছুর মূল কর্তা ও একমাত্র কর্তা আল্লাহ তায়ালা। মানুষ কোনো কিছুর জন্যে শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করে যেতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ফলবান হয় না।

কাজেই কোনো ভালো বা মন্দ ঘটনার কৃতিত্ব বা দায় দায়িত্ব রসূল (স.)-এর ওপর আরোপ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ও অপবাদ মাত্র। এ দ্বারা বুঝা যায়, যারা এই ধারণা পোষণ করে, তারা এ বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝেনি। কেননা, রসূল (স.) একজন মানুষ মাত্র এবং তিনি আল্লাহর সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা যে সব উপায় উপকরণকে কোনো কল্যাণমূলক ও লাভজনক কাজ করার উপায় উপকরণ রূপে চিহ্নিত করেছেন, তা দ্বারা মানুষ কোনো কল্যাণমূলক ও লাভজনক কাজ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কার্যত সেই ইপ্সিত কাজটি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই

সংঘটিত হতে পারে। কেননা, মহাবিশ্বের কোথাও কোনো ঘটনা ঘটানো বা কোনো জিনিস তৈরী করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই আছে, আর কারো নেই। সুতরাং মানুষ কোনো উপায় উপকরণ অবলম্বন করে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা যে কল্যাণমূলক কাজ সংঘটিত করে, তা আল্লাহর ক্ষমতা বলে সংঘটিত কাজ বলেই গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে মানুষ কোনো অকল্যাণমূলক কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পারে অথবা এমন কোনো কাজ করতে পারে, যাতে অকল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই অকল্যাণ সংঘটিত করা ও তার অস্তিত্ব দান করা আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, এই মহাবিশ্বে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া কোনো জিনিস বা ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে না।

এই উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনা যা ঘটুক– আল্লাহর পক্ষ থেকেই ঘটে। প্রথম আয়াতের বক্তব্য এটাই।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে:

'তোমার ওপর যা কিছু শুভ ঘটনা ঘটে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ঘটে, আর যা কিছু অশুভ ঘটে, তা তোমার পক্ষ থেকেই ঘটে।'

এ আয়াতে অন্য একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রথম বিষয়টি থেকে আলাদা। এ বিষয়টি হলো,

আল্লাহ তায়ালা একটি আইন ও বিধান দিয়েছেন এবং পথ বাতলে দিয়েছেন। ভালোর পথ দেখিয়েছেন এবং মন্দ থেকে সাবধান করেছেন। মানুষ যখন আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে ভালো কাজ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা আমার জন্যে সংগ্রাম করে তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথ দেখাবো' এ ভাবে আল্লাহর সাহায্যে মানুষ সৎকাজ করতে সক্ষম হয়। এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ যাকে উপার্জন বলে মনে করে, তা যদি নাও হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় সেটি একটি ভালো কাজ-এটাই বড় কথা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই তাকে এ কাজের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ভালো কাজ করতে বলেছিলেন ও মন্দ কাজ থেকে সাবধান করেছিলেন। মানুষ যখন আল্লাহর বিধান ও পথ অনুসরণ করে না, আল্লাহর নির্দেশিত ভালো কাজ করে না এবং তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হয় না, তখনই সে প্রকৃত খারাপ কাজ ও অকল্যাণকর কাজে লিপ্ত হয়। চাই তা দুনিয়ার ব্যাপারেই হোক, আখেরাতের ব্যাপারেই হোক বা উভয় ব্যাপারেই হোক। এটা তার নিজের পক্ষ থেকেই হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা সে নিজেই আল্লাহর বিধান ও উপদেশ উপেক্ষা করে এটা করেছে।

আর এ বক্তব্যটা যে প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্য থেকে আলাদা তা সুস্পষ্ট। এ বক্তব্য প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্যকে কিছুমাত্র পরিবর্তন করে না। অর্থাৎ ভালো বা মন্দের জন্যে মানুষ যত ইচ্ছা এবং চেষ্টাই করুক না কেন, তা বাস্তবে কার্যকর হওয়া ও সংঘটিত হওয়া আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছা ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা পৃথিবীতে যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই তার অস্তিত্বদাতা। পৃথিবীতে যা কিছুই সংঘটিত হয় তিনিই তার সংগঠক। মহাবিশ্বে যতো সৃষ্টি আছে তিনিই তার স্রষ্টা।

দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই নবীদের কাজ

অতপর আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর দায়িত্ব, কাজ, তার সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে তার আচরণ বর্ণনা করেন। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে সব কিছুই যে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত তাও বর্ণনা করেন,

'আর আমি তোমাকে মানুষের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি রসূল (স.)-এর আনুগত্য করে না, তার জন্যে আমি তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক বানাইনি।'

অর্থাৎ রসূল (স.)-এর দায়িত্ব আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। ভালো বা মন্দ সৃষ্টি করা নয়। কেননা, এটা আল্লাহর কাজ। আল্লাহ তায়ালা যে এই দায়িত্ব পালনের জন্যে রসূল (স.)-কে পাঠিয়েছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী রয়েছেন।

'আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

রসূল (স.)-এর সাথে মানুষের আচরণের মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে, সেই আল্লাহর অনুসরণ করবে। কাজেই এ অনুসরণের দিক থেকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, আল্লাহর কথা এবং রসূল (স.)-এর কথায়ও পার্থক্য নেই। আর যে ব্যক্তি এই আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং রসূল (স.)-কে অস্বীকার করবে, তার কর্মফল ও জবাবদিহী সংক্রান্ত ব্যাপার আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত হবে। এ ধরনের লোককে জোরপূর্বক হেদায়াত করতে রসূল (স.)-কে পাঠানো হয়নি। তাকে গুনাহ ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব নয়। এটা রসূল (স.)-এর দায়িত্ব ভুক্ত নয় এবং এটা তার ক্ষমতারও আওতাভুক্ত নয়।

এই বক্তব্য দ্বারা মানুষের কার্যকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণা শোধরানো হয়েছে। মানুষের কোনো কাজই আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছাড়া বাস্তবায়িত ও সংঘটিত হয় না। আর মানুষের জীবনে কল্যাণ ও অকল্যাণ যা-ই ঘটুক, চাই তা আপাত দৃষ্টিতে কল্যাণ বা অকল্যাণ হোক অথবা প্রকৃত পক্ষেই কল্যাণ বা অকল্যাণ হোক, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। কেননা আল্লাহর ছাড়া আর কেউ কোনো কিছু সৃষ্টিও করে না ও সংঘটিতও করে না। আর আল্লাহ তায়ালা দাঁড়িপাল্লায় যথার্থ ভারত্ব রাখে এমন কোনো প্রকৃত সৎকর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়। কেননা, আল্লাহর হেদায়াত ও আল্লাহর বিধানের কারণেই তা করা হয়েছে, আর যা কিছু প্রকৃত অন্যায় ও অসৎকর্ম, তা মানুষের নিজের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। কেননা এটা সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও তাকে উপেক্ষা করার এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণে।'

রসূল (স.)-এর প্রথম ও শেষ দায়িত্ব এই যে, তিনি রসূল। তিনি কোনো কিছুর স্রষ্টাও নন, সংগঠকও নন। আর স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্যে তিনি কাউকে শরীকও করেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যা আসে তিনি তা বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন মাত্র। সুতরাং তাঁর আদেশের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্য যে করতে চায় না তার জন্যে হেদায়াত সৃষ্টি করতে রসূল (স.) দায়িত্বপ্রাপ্ত নন, তাদেরকে অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে আনতেও তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। প্রচার পর্যন্তই তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত, এর পরে তাঁর আর দায়িত্ব নেই।

এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্য। এ সত্যের ভিত্তিতেই চিন্তা গড়ে ওঠে, চেতনা ও মন-মানুষ তৈরী হয়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সমাজকে ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং বিরাট ও মহান দায়িত্বের জন্যে তাকে প্রস্তুত করেন।

মোনাফেকদের ঘৃণ্য তৎপরতা

পরবর্তী আয়াতে অপর একটি গোষ্ঠীর অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। এ গোষ্ঠীটি মুসলিম সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তারা সম্ভবত মোনাফেক ভন্ড, বর্ণচোরা ও কপট মুসলমানদের গোষ্ঠী। এখানে তাদের একটা নতুন কাজের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখান থেকে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করা হয়েছে। তাদের অবস্থা বর্ণনা করার সাথে সাথে তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পাশাপাশি বুঝানো, শিখানো, শোধরানো ও সংগঠিত করা হয়েছে এবং তা হয়েছে অত্যন্ত অল্প কথায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা বলে, আনুগত্য করলাম। তারপর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে এসেই তাদের একটি গোষ্ঠী রাতারাতি কথা পাল্টে ফেলে.... তারা অনেক স্ববিরোধিতা দেখতে পেতো।'

এই গোষ্ঠীটি যখন রসূল (স.)-এর কাছে থেকে কোরআন শুনতো এবং কোরআনে যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জাননো হয়েছে, তা জানতো, তখন তারা শর্তহীনভাবে সর্বাত্মক আনুগত্যের অংগীকার করতো। কোনো বাদ প্রতিবাদ করতো না, প্রশ্ন করতো না, আপত্তি তুলতো না এমনকি ব্যাখ্যাও চাইতো না। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরই তাদের ভূমিকা বদলে যেতো। তারা সেই অংগীকার আর কাজে পরিণত করবে না বলে স্থির করতো এবং দায়িত্ব এড়ানোর পরিকল্পনা করতো।

এ আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, প্রথমে সমগ্র মুসলিম সমাজের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা এক বাক্যে আনুগত্যের ওয়াদা করতো। কিন্তু এই বিশেষ চরিত্রধারী মোনাফেক গোষ্ঠীটি তাদের অংগীকার লংঘন করতো। এভাবে মুসলিম সমাজের বিশৃংখলা ও বিভেদের চিত্রই ফুটে ওঠে। কেননা এ দলটি তো মুসলমানদের সমাজেই অবস্থান করে। সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা যখন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতি অংগনে লড়াইতে ব্যস্ত থাকে, তখন এই গোষ্ঠীটির পিছুটান ভাব গোটা সমাজকে কষ্ট দেয় ও বিভেদে লিপ্ত করে।

আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষেত্রে রসূল (স.) ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন য, এই বর্ণচোরা ভন্ডদের ভন্ডামি ও ধোকাবাজীর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে। আর এদের দিকে যে আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে, সে বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে মুসলমানরা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারবে ও এই ধোকাবাজরা যে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এ আয়াতে এই ভন্ডদেরকে এই মর্মে হুমকিও দেয়া হয়েছে যে, তারা মুক্তি পাবে না ও সফল হবে না।

এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এভাবে যে,

'তারা যে পরিবর্তিত ভূমিকা গ্রহণ করে, তা আল্লাহ তায়ালা লিখে রাখেন।'

এই মোনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে যে নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো, তাদের বাহ্যিক আচরণকে হিসাবে ধরতে হবে, তাদের নিয়ত, উদ্দেশ্য ও মানসিকতাকে নয়। তাদের আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামানো ও তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা– এই নীতির কারণে এই গোষ্ঠী ক্রমশ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই নীতির একটি অংশ হলো,

'অতএব তাদেরকে উপেক্ষা করো।'

এই সাথে আল্লাহর হেফাযত ও তত্ত্বাবধানের ওপর নির্ভর করারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

'আর আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট সংরক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। তিনি যার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, কারো ষড়যন্ত্র তার ক্ষতি করতে পারে না।

যে গোষ্ঠীটি অন্য সবার সাথে রসূল (স.)-এর সামনে আনুগত্যের অংগীকার করতো এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেই অংগীকার থেকে বিচ্যুত হতো, তাদের এই আচরণের মূল কারণ সম্ভবত এই ছিলো য, রসূল (স.)-এর আদেশের উৎস সম্পর্কে তাদের সন্দেহ ছিলো এবং তারা হয়তো মনে করতো যে, এই কোরআন রসূল (স.)-এর নিজের রচিত। এরূপ সন্দেহ থাকলে রসূল (স.)-এর আদেশের গুরুত্ব ও প্রতাপ একবারেই ম্লান হয়ে যায়। তাঁর আদেশের যা কিছু গুরুত্ব ও প্রতাপ, তা শুধু এই কারণে যে, কোরআন আল্লাহর কালাম এবং রসূল (স.) নিজের মনগড়া কিছুই বলেন না। এ কারণেই কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে, সে কথাটা বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

কোরআনের শিল্পগত সৌন্দর্য

এখানে কোরআন একটা বিশেষ নীতি অনুসরণ করে। এই নীতি অনুসারে সে মানুষের ও তার বিবেকবুদ্ধির প্রতি যতোটা সম্মান প্রদর্শন করে, অতোটা সম্মান আর কেউ কখনো দেখায়নি। এই বিবেকবুদ্ধি মহানুভব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাই তাকে দিয়েছেন। কোরআন আল্লাহর রচিত গ্রন্থ কিনা, সেটা স্থির করার ভার সে তার বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ ও চিন্তা গবেষণার ওপর ন্যস্ত করেছে। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সঠিক বিচার বিবেচনার পদ্ধতিও নির্দেশ করেছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলে সে যে অভ্রান্ত একটি আলামত ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পায়, তাও এখানে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এই আলামত বা বৈশিষ্ট্যটি একদিকে কোরআনে খুবই স্পষ্টভাবে বিদ্যমান, অপরদিকে মানবীয় বিবেকবুদ্ধির পক্ষেও তার উপলব্ধি করা সম্ভব। এই বৈশিষ্টটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, কোরআন আল্লাহরই রচিত গ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা এ কথাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

'তারা কি কোরআনকে বুঝে পড়ে না? (অর্থাৎ কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?) কোরআন যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তারা এতে অনেক মতবিরোধিতা দেখতে পেতো।'

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার বোধ শক্তির প্রতি এর চেয়ে বেশী সম্মান প্রদর্শন আর কোনোভাবে সম্ভব নয়, আর এই বোধশক্তির প্রতি সেই অভ্রান্ত বৈশিষ্টটি উদ্ধারের দায়িত্ব অর্পন করে যে সুবিচার করা হয়েছে, এমন সুবিচারও আর কোথাও আশা করা যায় না। কোরআন যে আল্লাহর রচিত সে ব্যাপারে এ বৈশিষ্টটি একটি অকাট্য প্রমাণও বটে, যেমন আমি ইতিপূর্বেই বলেছি।

এই বৈশিষ্ট্য আর কিছু নয়-কোরআনের ভাষার পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সমন্বয়। কোরআনকে নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা গবেষণা করে এবং কোরআনকে যে বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করে, এ বৈশিষ্টটি কখনো তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই সমন্বয়ের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের মানুষ ও বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ একই পর্যায়ের সাফল্য লাভ নাও করতে পারে। তবে প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষ ও প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষ নিজ নিজ ক্ষমতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আল্লাহভীতি অনুসারে এ সমন্বয় উপলব্ধি করবেই।

এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রজন্মকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি প্রজন্ম সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা গবেষণা করলে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোরআনে কি নিখুঁত সমন্বয় ও সাযুজ্য বিদ্যমান। আর এই সমন্বয়ের উপলব্ধির মাধ্যমে সে জানতে পারবে যে,

তার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও আল্লাহভীতি তার জন্যে কী বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছে।

তৎকালীন প্রজন্মের সেই মানবগোষ্ঠীটিকে তার বোধগম্য ভাষাতেই সম্বোধন করা হয়েছিলো, আর সে তার নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে তা কার্যকরীও করতে পেরেছিলো।

এই সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যটি শুরুতে কোরআনের বাচনভংগিতে তার শৈল্পিক প্রকাশ ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের ভাষায় অনেক বৈচিত্র থাকে। কখনো তা খুব উচ্চমানের অলংকর সমৃদ্ধ হয়, আবার কখনো হয় অত্যন্ত নিম্নমানের। কখনো তাতে সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়, আর কখনো মনে হয় খাপছাড়া। কখনো দুর্বল আবার কখনো বলিষ্ঠ উচ্চারণ। কখনো প্রাঞ্জল, কখনো দুর্বোধ্য। কখনো স্বচ্ছ সাবলীল, আবার কখনো ভারী ও অস্পষ্ট। এরূপ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুসারে আরো বহু রকমের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষত সার্বক্ষণিক 'পরিবর্তনশীলতা' মানের উত্থাপন ও ক্রমাগত বিভিন্নতা ও স্ববিরোধিতা। একই সাহিত্যিক, একই চিন্তাবিদ, একই শিল্পী, একই রাজনীতিক বা একই সমরনায়কের বিভিন্ন সময়ের উক্তি পর্যালোচনা করলে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। বৈশিষ্ট্যটিকে এক কথায় বলা যায় বিভিন্নতা ও স্ববিরোধিতা।

মানুষের ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ স্থিতি ও সমন্বয় কোরআনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। যদিও আমরা শুধু ভাষাগত ও বাচনভংগি সংক্রান্ত দিক নিয়েই আলোচনা করছি। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে, এই অলৌকিক গ্রন্থের মান একই রকম, যতোই তার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ও রকমারি হোক না কেন। এর মান ও উৎকর্ষে কোনো তারতম্য নেই, এর ভাষাগত চমৎকারিত্ব ও সাবলীলতা সর্বত্র একই পর্যায়ের। মানুষের তৈরী কোনো শিল্পে এই অভিন্নতা ও স্থিতিশীলতা দেখা যাবে না, বরং তা সর্বত পরিবর্তনশীল। কোরআনের এই স্থিতিশীল মান মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও চমৎকারিত্বের পরিচায়ক। এটি এক অপরিবর্তনশীল চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব স্রষ্টার প্রতীক, যার মধ্যে কখনো কোনো ভাবান্তর ঘটে না।

এই বিরোধহীনতা এবং এই পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সমন্বয় আল্লাহর সেই বিধানের মধ্যে পরিস্ফুট, যা তাঁর গ্রন্থের সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষার মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে। এ বিধান মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে রচিত। এটি ব্যক্তি ও সমাজের তৎপরতাকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করার বিধান। যুগে যুগে ও প্রজন্মে প্রজন্মে মানব সমাজে যে সমস্যাবলী দেখা দেবে, তার সমাধান রয়েছে এ বিধানে। মানব সমাজ যাতে নিজেকে, নিজের বিভিন্ন যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে ও তার কার্যকলাপকে বিশুদ্ধ করতে পারে, নিজেকে গোটা প্রকৃতির সাথে সমন্বিত করতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে জন্যে এ বিধানে রয়েছে উপযুক্ত দিক নির্দেশনা।

শুধুমাত্র ভাষাগত ও বর্ণনাগত দিক দিয়েই যখন আল্লাহর কথায় ও মানুষের কথায় এতো সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তখন চিন্তায়, ব্যবস্থাপনায় ও আইন রচনায় আল্লাহ তায়ালা ও মানুষের মাঝে স্বভাবতই এর চেয়েও সুস্পষ্ট ব্যবধান থাকবে। মানুষের রচিত যে কোনো মতবাদে ও ব্যবস্থায় মানবীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দৃষ্টি ও চিন্তার ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা, সাময়িক সমস্যাবলী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং প্রতিটি মতবাদ ও নীতিতে পরস্পর বিরোধী উপাদানসমূহের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার কারণে সে উপাদানসমূহের মধ্যে আজ হোক কাল হোক সংঘর্ষ বেধে যাওয়া অনিবার্য।

অনুরূপভাবে পরস্পর বিরোধী উপাদানগুলোর প্রতি নযর না দিলে একই মানুষের বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্যের কোনো কোনোটির ওপর অত্যাচার করা হয়। এভাবে মানুষের সীমাবদ্ধ উপলব্ধি থেকে এবং চলমান অবস্থার বাইরের অবস্থা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা থেকে শত শত রকমের ত্রুটি ও বিরোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোরআনী বিধান ঠিক এর বিপরীত। এ বিধান পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্থিতিশীল, প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতিশীল, অথচ স্থিতি ও সংগতিশীলতা সহকারেই তা মানুষকে সদা তৎপর ও সদা-সক্রিয় থাকতে অনুমতি দেয়, যেমন প্রাকৃতিক নিয়মও তার অনুমতি দিয়ে তাকে।

কিন্তু এই বৈশিষ্টটি উপলব্ধি করার মানে সকল প্রজন্মের সকল সমস্যা উপলব্ধি করা নয়। বরঞ্চ সত্য কথা এই যে, প্রত্যেক প্রজন্ম নিজ নিজ সমস্যা উপলব্ধি করবে এবং যেটুকু তার উপলব্ধির বাইরে থাকবে, তা পরবর্তী উম্মত প্রজন্মের জন্যে রেখে যাবে। তাছাড়া নিজ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পূঁজি তো রেখেই যাবে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার ব্যাপারে মানব সমাজে যে বিপুল মতভেদ ঘটে, তার আড়ালে অনেক কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই অবশিষ্টাংশ উপলব্ধি করতে অনেকেই সমবেত হয় এবং প্রতিটি প্রজন্মই সচেষ্ট হয়। এই অবশিষ্টাংশ এই যে, আল্লাহর তৈরী জিনিস ও মানুষের তৈরী জিনিস সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহর এ সৃষ্টিতে কোনো বিরোধ বা ব্যবধান নেই, আছে কেবল ঐক্য ও সমন্বয়। অতপর এই সমন্বয়ের ধরন, ব্যাপকতা ও পরিধি নির্ণয়ে মানব সমাজে মতবিরোধ ঘটে থাকে।

আর যে পর্যন্ত কোনো চিন্তা-গবেষণাকারী ভুল করে না-আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে, তাদের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রজন্মকে এই কোরআনের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পন করেন। উপলব্ধির এই অভিন্ন সীমার অভ্যন্তরে কোরআনের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কাছে ন্যস্ত করেন এবং কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সে কথা বিশ্বাস করার দায়িত্বকে, কোরআন যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো রচনা হতে পারে না, সে বিশ্বাস এই উপলব্ধির আলোকেই সম্ভব।

মানবীয় বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা

এখানে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে আমাদের এই বিষয়ে এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিষয়ে মানুষের উপলব্ধির সীমা কতোদূর সেটা স্থির করে নেয়া সমীচীন হবে। এতে করে মানুষকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেছেন, তা তার অহংকারী হবার পথ সুগম করবে না, তার নিরাপদ সীমা অতিক্রম করার পথ উন্মুক্ত করবে না এবং এবং সংরক্ষিত জায়গা অতিক্রম করে অজানা ও ঝুঁকিপূর্ণ তেপান্তরের মাঠের দিকে ঠেলে দেবে না।

পবিত্র কোরআনের এ ধরনের বক্তব্যসমূহকে সাধারণত ভুল বুঝা হয়। এ কারণে প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি গোষ্ঠী ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে মানুষের বোধশক্তিকে সার্বিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়ার পক্ষপাতী। তারা এ ক্ষেত্রে মানুষের বোধশক্তিকে আল্লাহর আইনের সমান ক্ষমতা দেয়, এমনকি তাকে আল্লাহর বিধানের ওপর আধিপত্য দান করে।

প্রকৃতপক্ষে তার কিন্তু এতোটা ক্ষমতা ও অধিকার নেই। এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, মানুষের বোধশক্তি একটা মস্তবড় হাতিয়ার এবং আল্লাহ তায়ালা একে যথেষ্ট সম্মানিত করেছেন। আর এ কারণে তার ওপর প্রাথমিক সত্য উপলব্ধির দায়িত্বও অর্পন করেছেন। প্রাথমিক সত্যটি হলো ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং আল্লাহর রচিত জীবন ব্যবস্থা। একথাটি সহজে এমন

বোঝার জন্যে কিছু আলামত রয়েছে, যা আপনা থেকেই প্রমাণ করে যে, ইসলাম আল্লাহর রচিত জীবন ব্যবস্থা। এই বৃহৎ মূলনীতি অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহর রচিত জীবন ব্যাবস্থা এ কথা যখন স্বীকৃত তখন ইসলামের সমস্ত বিধিমালাকে আপনা আপনি মেনে নেয়া এবং বোধশক্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়; চাই তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিসমূহ তার পক্ষে বোধগম্য হোক বা না হোক। ইসলাম যখন আল্লাহর রচিত জীবন ব্যবস্থা, তখন তার প্রতিটি বিধির পেছনে যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। অনুরূপভাবে, ইসলামের যে কোনো বিধির কল্যাণকারিতা ও আপাত দৃষ্টিতে দৃশমান ও বোধগম্য হোক বা না হোক, উক্ত বিধিকে নির্বিবাদে কল্যাণকর মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বিধান যখন আল্লাহর রচিত তখন তা অবশ্যই চিরদিন কল্যাণকর। মানবীয় বোধশক্তি ও বিবেকবুদ্ধি আল্লাহর বিধানের বিকল্প বা সমকক্ষ নয়, আল্লাহর বিধানের ওপর তার আধিপত্য বা কর্তৃত্ব লাভের তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তার উপলব্ধি অসম্পূর্ণ সীমিত এবং। তার বিবেকবুদ্ধি কোনো জিনিসের সকল দিক দেখতে পায় না এবং তার সকল কল্যাণকারিতাও সে দেখতে পায় না। অথচ আল্লাহর আইন একই সময়ে সব কিছু দেখতে পায়। কাজেই আল্লাহর আইনের কোনো অকাট্য ও স্থায়ী বিধিও মানুষের বোধগম্যতার শর্তাধীন হতে পারে না। বড়জোর মানুষের বোধশক্তির কাছ থেকে এতোটুকু প্রত্যাশা করা যেতে পারে যে, সে উক্ত বিধি সম্বলিত কোরআন বা হাদীসের উক্তির প্রামাণ্যতা ও প্রযোজ্যতা খুঁজে দেখবে, তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতা আছে কি নেই তা নয়। কেননা এ উক্তি যখন আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহীর অন্তর্ভুক্ত, তখন তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতা স্বতসিদ্ধ ও প্রশ্নাতীত। যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতা খুঁজে দেখতে হবে, সেই জিনিষের যা ওহীর মাধ্যমে আগত নয়, অথচ গুরুতর বিতর্ক রয়েছে তাতে। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান এই যে, উক্ত বিতর্ককে আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর বক্তব্যের আলোকে বিচার করতে ও নিষ্পত্তি করতে হবে। এটা হচ্ছে সত্যিকার ইজতেহাদের ক্ষেত্র। ওহীর বক্তব্যকে বুঝার জন্যে যে ইজতেতহাদ বা চিন্তা গবেষণা চালাতে হয়, সে ইজতেহাদ তার অতিরিক্ত। তবে কোনো অবস্থাতেই ওহীর যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতা যাচাই করার ক্ষমতা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে দেয়া হয়নি, দেয়া যেতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম ও সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্যে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির প্রকৃত বিচরণ ক্ষেত্র হলো বস্তুজগত, আর এ জগত এক বিশাল ও বিস্তৃত জগত।

আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা মানবীয় বোধশক্তিকে ঠিক ততোটুকুই সম্মান দেবো, যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে দিতে চেয়েছেন, আর ঠিক সেই সীমার মধ্যেই দেবো, যা তার জন্যে সমীচীন। অতপর সীমার বাইরে তাকে আর কোনো মর্যাদা দেয়া হবে না। আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রমাণ ও নির্দেশিকা ছাড়া কোনো অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবো না। ভ্রান্ত পথের সন্ধান দেয় এমন প্রমাণ ও নির্দেশিকা আমরা মানবো না। কেননা ভ্রান্ত প্রমাণ অনুসরণ করা বিনা প্রমাণে পথ চলার চেয়েও বিপজ্জনক।

পরবর্তী আয়াতে অন্য একটি গোষ্ঠীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে অথবা মুসলিম সমাজের একটি গোষ্ঠীর অন্য একটি কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তাদের কাছে কোনো শান্তি বা ভয়ের খবর আসে, ... তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতো।' (আয়াত ৮৩)

কেউ কোনো গুজব ছড়ালে করণীয় ......

এ আয়াতে যে দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে, তা মুসলিম শিবিরের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দৃশ্য। এই গোষ্ঠীটি তখনো ইসলামী বিধিবিধানের সাথে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি এবং গুজবের ফলাফল কি হতে পারে আর সমাজে তা কতোখানি বিভেদ বা বিশৃংখলার জন্ম দিতে পারে, তা তারা বুঝতে পারেনি। গুজবের ফলাফল ধ্বংসাত্মকও হতে পারে। কেননা সে সমাজের লোকেরা তখনো তেমন পরিপক্কতা অর্জন করেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝার ক্ষমতা তাদের হয়নি। একটি অসতর্ক ও বেফাঁস কথা যে কোনো ব্যক্তি বা গোটা মুসলিম সমাজের জন্যে এমন ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, যা কল্পনাও করা যায় না এবং যার ক্ষতিপূরণ পরবর্তীতে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেহেতু সে সময়কার মুসলিম সমাজের লোকেরা উক্ত সমাজের প্রকৃত ও পূর্ণাংগ আনুগত্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলো না, তাই একটি গুজব ছড়ালে এবং এক কান থেকে আরেক কানে গেলে তার কি পরিণতি হতে পারে, তা তারা বুঝতো না, চাই তা শান্তির গুজবই হোক বা ভয়ের গুজবই হোক। সুতরাং উভয় ধরনের গুযবের ফল অত্যন্ত মারাত্মক ও সর্বনাশা হতে পারতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সমাজকে প্রতি মুহূর্তে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রতি মুহূর্তে শত্রুর কোনো কোনো তৎপরতার খবর যার প্রত্যাশিত, সে সমাজে কোনো ভিত্তিহীন শান্তির গুজব এক ধরনের শৈথিল্য ও উদাসীনতা এনে দিতে পারে, চাই যতই সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হোক না কেন। কেননা বিপদ ও হুমকিজনিত সতর্কতা নিছক আদেশজনিত সতর্কতা থেকে ভিন্ন জিনিস। এ ধরনের শান্তির গুযব থেকে যে শৈথিল্য ও উদাসীনতা জন্মে, তাতেই সর্বনাশ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে যে সমাজ নিজের শক্তি সামর্থের ব্যাপারে নিশ্চিত, তার জন্যেও কোনো ভীতিজনক গুযব বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ ধরনের ভিত্তিহীন গুজব সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে এবং ক্ষতির আশংকা দূর করার জন্যে নিষ্প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর এর পরিণামে ঘটে যেতে পারে কোনো ভয়াবহ সর্বনাশা ঘটনা।

মোট কথা, এটা এমন একটা সমাজের লক্ষণ, যে সমাজে এখনো পুরো শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা যে সমাজ নেতার পূর্ণ আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়নি, অথবা এই দুটোর কোনোটিই হয়নি। মনে হয়, তৎকালীন মুসলিম সমাজে এই দুটো অবস্থাই বিদ্যমান ছিলো। আর তার পাশাপাশি সমাজে বিরাজ করতো বিভিন্ন মানের ঈমান, বিভিন্ন মানের বুদ্ধিমত্তা এবং বিভিন্ন মানের আনুগত্য। আর এই বিশৃংখলার প্রতিকারই কোরআন এখানে আল্লাহর বিধান অনুসারে করছে।

কোরআন মুসলিম সমাজকে সঠিক কর্মপন্থা নির্দেশ করেছে এই বলে যে,

'তারা যদি সেই গুজব বা খবরকে রসূল ও নিজেদের দায়িত্বশীলদের কাছে ব্যক্ত করতো, তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে, তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারবো।'

অর্থাৎ তাদের কাছে শান্তি অথবা ভীতি সম্পর্কে যে খবর আসতো, তা যদি তারা রসূল (স.)-এর উপস্থিতিতে তাঁর কাছে আর তাঁর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের দায়িত্বশীলের কাছে পৌঁছাতো, তাহলে ঘটনা সত্যাসত্য নির্ণয়কারীরা প্রকৃত রহস্য উদ্ধার করতে পারতো।

একজন ঈমানদার নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজের একজন সৎ সদস্যের কর্তব্য এই যে, তার কানে ভালো-মন্দ কোনো খবর আসা মাত্র তা তার নবী বা নেতার কানে পৌঁছাবে, সমাজে সাধারণ লোকদের কাছে তা ছড়াবে না। কেননা, সমাজের ঈমানদার নেতৃত্বই তার সত্যাসত্য যাচাই করতে সক্ষম এবং খবরটি সত্য প্রমাণিত হলেও তা সমাজে প্রচার করার যোগ্য কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

এভাবেই কোরআন মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবে যে মোমেনদের মধ্যে ঈমানকে এবং ঈমানদার নেতার আনুগত্যকে সংহত করে। সেই সাথে সামাজিক শৃংখলাও তাদেরকে শেখায়। অথচ এতো সব শিক্ষা দিতে সে পুরো আয়াত নয় বরং তার একটি অংশকে মাত্র ব্যবহার করেছে। আয়াতের শুরুতে একজন মুসলিমের জন্যে সত্যমিথ্যা যাচাই না করে গুজব ছড়ানো এবং গুজবকে প্রথমে নেতার কাছে না পৌঁছে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোকে ঘৃণাই ও নিন্দনীয় কাজ হিসাবে বর্ণনা করেছে। আয়াতের মধ্যবর্তী অংশে এরূপ ক্ষেত্রে কী করণীয় তা শিক্ষা দিয়েছে। আর শেষাংশে মোমেনদের মনকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করেছে এবং তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শয়তান থেকে সাবধান করেছে।

একটি মাত্র আয়াতে এতো শিক্ষার সমাবেশ ঘটানো, মূল সমস্যাটাকে এতো ব্যাপকভাবে আলোচনা করা এবং হৃদয়ের গভীরে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কেবল এ জন্যেই সম্ভব হয়েছে যে, এটি আল্লাহর কাছ থেকে আগত।

'যদি এটি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো রচিত হতো, তাহলে তারা এতে অনেক খাপছাড়া ও সমন্বয়হীন ব্যাপার দেখতে পেতো।'

কিছু সমস্যা ও তার সমাধান

এ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দোষত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষত যে সব দোষত্রুটি জেহাদ ও ইসলামী জীবনধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে যুদ্ধের জন্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ জন্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। যাতে কোনো গড়িমসি বা শৈথিল্য তাদেরকে পিছু হটার সুযোগ না দেয়। অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ কোনো বিশৃংখলা বা পথের বাধাকে যেন তারা পিছু হটার ওজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে না পারে, এ জন্যে এ আয়াতে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যে একাকী হলেও তিনি যেন লড়াই করেন। কেননা, তাকে জেহাদে নিজের ব্যক্তিগত পরিণতি ছাড়া আর কিছু ভোগ করতে হবে না। এই সাথে তাকে আদেশ দেয়া হচ্ছে মোমেনদেরকে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করতে। অনুরূপভাবে মোমেনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের আশা পোষণ করতে ও অবিচল থাকতে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন লড়াইয়ের প্রকৃত সেনাপতি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতএব তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো। তুমি নিজের ছাড়া আর কারো জন্যে দায়ী হবে না।.... সবচেয়ে বেশী শাস্তিদাতা।' আয়াত (৮৪)

এ আয়াতে ও এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলো থেকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের এবং সর্বকালের সকল মুসলমানের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যথা,

ক. মুসলিম সমাজে কিছু না কিছু বিভেদ, বিশৃংখলা ও অনৈক্য সেকালেও ছিলো এবং চিরকালই থাকবে। ঢিলেমি, উদাসীনতা ও গড়িমসি এতো গভীরভাবে বিদ্যমান ছিলো যে, তাদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করার উপায় হিসাবে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি একাকী হলেও যেন লড়াই করেন। সেই সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও যেন উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন, কিন্তু তাদের সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় যেন বসে না থাকেন। অবশ্য মুসলমানরা সকলেই অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, এটা কখনো হবে না। কিন্তু বিষয়টি এভাবে উপস্থাপিত করা থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলামের একটি শাশ্বত মূলনীতি হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী।

খ. তৎকালে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে কিরূপ ভীতি ছিলো, তাও এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণে মুসলমানদের মনে এই আশার সঞ্চার করা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর থেকে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করবেন। এই সাথে আল্লাহর শক্তিমত্তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,

'আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বেশী ভীতিময় এবং সবচেয়ে কঠিন শাস্তিদাতা।'

এই আয়াত থেকে তৎকালীন কাফেরদের শক্তির তীব্রতা ও মুসলিম সমাজে তাদের সম্পর্কে কি প্রচন্ড ভীতি ছিলো তা বুঝা যায়। এটা সম্ভবত ওহুদ ও খন্দকের মধ্যবর্তী সময়কার কথা। মদীনায় মুসলমানদের জন্যে এ সময়টা ছিলো সবচেয়ে বিভীষিকাময়। একদিকে গৃহশত্রু মোনাফেকদের অপতৎপরতা, অপরদিকে ইহুদীদের বিভীষিকাময় ষড়যন্ত্র। একদিকে মোশরেকদের আস্ফালন। এই তিনটি কুচক্রী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো তখনকার মুসলমানরা। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ সংক্রান্ত জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও মুসলমানদের মাঝে সমন্বয় ও ঐক্যের অভাব এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিলো।

গ. অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, মানুষ যতো কঠিন বিপদ মুসিবতে পড়ে ততোই তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, তাঁর কাছে আরো বেশী করে সাহায্য চাওয়া, তাঁর শক্তির ওপর আরো বেশী করে নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। কেননা বিপদ মুসিবত যখন চরমে পৌঁছে, তখন এই উপকরণটি ছাড়া শক্তি অর্জনের আর কোনো উপায় উপকরণই কাজে লাগে না। ইসলামী জীবন বিধান এই উপকরণগুলোকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগায়। যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই সকল প্রাণীর স্রষ্টা, তাই প্রাণীকূলকে কিভাবে লালন ও বিকাশ দান করতে হবে, কিভাবে শক্তি যোগাতে হবে, কিভাবে প্রেরণা দান করতে হবে এবং কিভাবে সে প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে, তা তিনিই সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে বেশী জানেন।

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে মোমেনদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে। আর এর শুরুতে জেহাদে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শনের সমালোচনা করা হয়েছে। এই প্রসংগে সুপারিশ করা সংক্রান্ত একটি সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সুপারিশ বলতে আদেশ, উপদেশ ও সহযোগিতা এই তিনটি জিনিসই বুঝায়। ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ সুপারিশ করবে, সেও তার অংশ পাবে। আর আল্লাহ তায়ালা সব কাজেরই শক্তি যোগান।'

অতএব আল্লাহর পথে জেহাদের ন্যায় ভালো কাজে যে ব্যক্তি উৎসাহ দেয়, প্রেরণা যোগায় ও সাহায্য সহযোগিতা করে, সে ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ও তার ফলাফলের অংশ পাবে, আর যে ব্যক্তি যুদ্ধে শৈথিল্য ও গড়িমসি করে, সেও তার ফলাফলের অংশ পাবে।' 'কিফল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে দায়। এদ্বারা ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, খারাপ সুপারিশ করা একটা অপরাধ এবং এ অপরাধের দায়ভার তাকে বহন করতে হবে। ভালো বা খারাপ সুপারিশ সংক্রান্ত এ নীতি একটা সাধারণ মূলনীতি। কোরআনের স্বভাবসূলভ পন্থায় এখানে বিশেষ সমস্যা উপলক্ষে সাধারণ নীতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাকেও একই ভাবে সাধারণ মূলনীতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর গোটা বিষয়কে আল্লাহর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যিনি যাবতীয় জীবিকা সরবরাহ করেন এবং সর্বকাজের শক্তি যোগান। 'মুকীত' শব্দের অর্থ এটাই। 'আল্লাহ সকল বিষয়ে 'মুকীত' অর্থাৎ শক্তির যোগদানদাতা।

সালাম বিনিময়ের গুরুত্ব

পরবর্তী আয়াতে সম্ভাষণ ও অভিবাদনের জবাবে অবিকল তদ্রূপ বা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাতে বলা হয়েছে। সমাজে পরস্পরকে অভিবাদন জানানো এমন একটা সম্পর্ক, যা জীবনের গতিকে সচল ও স্বচ্ছন্দ রাখে-যখন তাতে জরুরী আদব ও সৌজন্যে বজায় রাখা হয়। সামাজিক পরিবেশ অভিবাদনের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতে নির্দেশিত সুপারিশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তোমাদেরকে কোনো অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও, অথবা অনুরূপ অভিবাদন জানাও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের হিসাব রাখেন।'

ইসলাম নিজস্ব অভিবাদনের প্রচলন করেছে। এ অভিবাদন মুসলিম সমাজকে অন্যান্য সমাজ থেকে মর্যাদা দান করেছে। মুসলিম সমাজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে এমনকি তার দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারকে পর্যন্ত তা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। অন্যান্য সমাজের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না।

ইসলামের প্রচলিত অভিবাদন হলো, 'আস সালামু আলাইকুম' অথবা 'আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' কিংবা আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু।' তন্মধ্যে যদি কেউ প্রথমটি উচ্চারণ করে তবে দ্বিতীয়টি দ্বারা, দ্বিতীয়টি উচ্চারণ করলে তৃতীয়টি দ্বারা তৃতীয়টি উচ্চারণ করলে হুবহু তৃতীয়টি দ্বারাই জবাব দিতে হবে। রসূল (স.) এভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। শেষেরটি সালামের সবচেয়ে সম্প্রসারিত রূপ বিধায় তার জবাবে আর কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রথম দুটির ক্ষেত্রে বাড়িয়ে জবাব দেয়া শ্রেয়।

অভিবাদন সংক্রান্ত এ আয়াতে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি।

প্রথমত, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্যে এটাকে একটা অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে। মুসলিম সমাজের যেমন স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, আইন ও বিধান রয়েছে, যেমন তার স্বতন্ত্র কেবলাও রয়েছে, সালামও তার তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় আমরা কেবলার প্রসংগে এ বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়, সালামের আদান প্রদান হচ্ছে মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার একটি সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। সালামের ব্যাপক প্রচলন এবং সালামের জবাবে আরো উত্তমভাবে সালাম দেয়া এই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থায়ী করা ও দৃঢ়তর করার সর্বোত্তম পন্থা। রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম। তিনি জবাব দিলেন, 'আহার করানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।' এ হচ্ছে মুসলিম সমাজে সালামের প্রথম প্রচলন করা সংক্রান্ত শিক্ষা। এটা সুন্নাত, কিন্তু জবাব দেয়াটা আলোচ্য আয়াতের আলোকে ফরয। এ প্রথাটি যে কতো মূল্যবান এবং কতো উপকারী, তা এর বাস্তব প্রয়োগ থেকেই বুঝা যায়। মনের গ্লানি দূর করা, অপরিচিতদের মধ্যে পরিচিতির বিনিময় করা, পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ব্যাপারে এর গুরুত্ব ও সুফল অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতের মাঝখানে এটি উদারতা ও শান্তির একটি পেলব পরশ। এ থেকে সম্ভবত ইসলামের একটা মৌলনীতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে শান্তি বা সালাম। ইসলাম শান্তিরই বিধান। সে যুদ্ধও করে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে। তবে ইসলামের এ শান্তিকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যমেই এ শান্তির উদ্ভব ঘটে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَمَنْ
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ
بِمَا كَسَبُوْا ۖ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ
تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ

৮৭. আল্লাহ তায়ালা (এক মহান সত্তা)– তিনি ছাড়া (দ্বিতীয়) কোনো মাবুদ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদের কেয়ামতের দিন এক জায়গায় জড়ো করবেন, তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আর এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে?

রুকু ১২

৮৮. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছেন; আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তোমরা কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার (হেদায়াতের) জন্যে তুমি কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না। ৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী করো, তাহলে তোমরা উভয়ে একই রকম হয়ে যেতে পারো, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে (ঈমানের প্রমাণ) না দেবে, আর যদি তারা (হিজরতের) এ কাজটি না করে তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (যুদ্ধরত শত্রুদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে, আর কোন অবস্থায়ই তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না। ৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে, আবার (তাদের ব্যাপারও নয়–) যারা তোমাদের সামনে এমন (মানসিক) অবস্থা নিয়ে আসে যে, (মূলত) তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমনি) লড়াই করতে বাধা দেয়, (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়; (অপরদিকে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি

اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا

اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا

فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ

তোমাদের ওপর এদের ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন, তেমন অবস্থায় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে লড়াই করতো, অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, (ময়দানের) লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (উন্মুক্ত) রাখবেন না। ৯১. (এই মোনাফেকদের মাঝে) তোমরা (এমন) আরেক দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়; (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকেও নিরাপত্তা (ও নিশ্চয়তা) পেতে চায়, কিন্তু এদের যখনি কোনো বিপর্যয় সৃষ্টির কাজের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই এরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এরা যদি সত্যিই তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না দাঁড়ায় এবং কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (চরম বিদ্রোহের জন্যে) তাদের তোমরা হত্যা করবে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ক্ষমতা দান করেছি।

রুকু ১৩

৯২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে (তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা) যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (তার বিনিময় হচ্ছে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং (তার সাথে) নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (তার) রক্তের (ন্যায়সংগত) মূল্য পরিশোধ করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির পরিবারের) লোকেরা যদি (রক্তমূল্য) মাফ করে দেয় (তবে তা স্বতন্ত্র কথা); এ (নিহত) ঈমানদার

كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ

السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ

كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

ব্যক্তি যদি এমন কোনো জাতির (বা গোত্রের) লোক হয় যারা তোমাদের শত্রু এবং সে (নিহত ব্যক্তি) মোমেন হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মোমেন দাসের মুক্তি; অপরদিকে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবত আছে, তবে তার রক্তের মূল্য আদায় করা ও একজন ঈমানদার দাসের মুক্তিও (অপরিহার্য), যে ব্যক্তি (মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে ক্রমাগত দুই মাসের রোযা রাখা, এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (মানুষের) তাওবা (কবুল করানোর ব্যবস্থামাত্র, বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী। ৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভয়ানকভাবে রুষ্ট, তাকে তিনি লানত দেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। ৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার পথে (জেহাদের) রাস্তায় বের হবে, তখন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে, কোনো ব্যক্তি (কিংবা সম্প্রদায়) যখন তোমাদের সামনে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় তাকে তোমরা বলো না যে, না, তুমি ঈমানদার নও, (আসলে) আল্লাহ তায়ালার কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে, আগে তোমরাও এমনি ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা (বিষয়টি) যাছাই বাছাই করে নিয়ো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

তাফসীর

আয়াত-৮৭-৯৪

সূরার এ অংশটি ইসলামের মূলতত্ত্ব তাওহীদ তথা ইলাহ হিসাবে আল্লাহর একত্বের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর এই মূলতত্ত্ব থেকে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। তার আগে মুসলমানদের দুটি দলে ও দুটি মতে বিভক্ত হওয়ার সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে মোনাফেকদের সাথে আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধি ঘোষিত হয়েছে। অবশ্য এখানে যে সব মোনাফেকের প্রসংগ এসেছে, তারা মদীনায় বহিরাগত বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে আলোচিত সকল বিধি ও সকল সমালোচনা ইসলামী বিধানের মূলনীতি থেকে উৎসারিত যা আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ ও প্রতিটি আইন রচনার প্রসংগেই আলোচিত হয়ে থাকে।

অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে আচরণের জন্যে প্রণীত এই সব বিধি ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতিমালার একটি অংশ। মানব জাতির ইতিহাসে ইসলামই প্রথম আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালার প্রচলন ও প্রবর্তন করেছে। এর আগে এই ময়দানে তরবারীর শক্তি ও জংগলী আইনের শাসন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রথম প্রচলন

আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে ইউরোপ যে অন্যান্য জাতির প্রতি সভ্য আচরণে মনোযোগ দিয়েছে- মাত্র সতের শ' শতাব্দীতে অর্থাৎ হিজরী একাদশ শতাব্দীতে তার সূচনা হয়েছে, তার আগে নয়। অথচ এগুলোকে সর্বতোভাবে তারা আজও কাগজ কলমেই সীমিত করে রেখেছে, বাস্তবে কোনো ভূমিকা পালন করতে দেয়নি। আজ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা তো একান্ত শোচনীয়। এগুলোর আড়ালে লুকিয়ে আছে আন্তর্জাতিক শোষণ ও আগ্রাসনের কুৎসিত অভিলাষ। কার্যত এ প্রতিষ্ঠাগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থ করার হাতিয়ার এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের মঞ্চ বিশেষ। সভ্যতা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার খাতিরে এগুলোর জন্ম হয়নি। সমান শক্তিমান বৃহৎ দেশগুলোর সাথে বিবাদ দেখা দেয়ায় এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু যখনই সমতা তথা শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গেছে, তখন আন্তর্জাতিক আইনেরও কোনো গুরুত্ব থাকেনি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা ও ভূমিকাও অর্থহীন ও নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে।

অথচ মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রচিত বিধান ইসলাম খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেই আন্তর্জাতিক আচরণের এসব ভিত্তি ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলো সে নিজ থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছে, শক্তির ভারসাম্যের ধার ধারেনি এবং তার সাথে কোনো সংস্রবও রাখেনি। ইসলাম এগুলোকে কার্যে পরিণত করা ও বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করেছে। এর ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুক এবং বিশ্বমানবতার জন্যে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পতাকা সমুন্নত করুক- এ উদ্দেশ্যেই এ সব মূলনীতি প্রণয়ন করেছে। এমনকি অমুসলিম সমাজগুলো যদি মুসলিম সমাজের সাথে এসব মূলনীতির আলোকে আচরণ না করে তবুও তাদের সাথে এসব আচরণ করতে হবে। কেননা ইসলামই এগুলোর প্রথম প্রবর্তক।

আন্তর্জাতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী এই সব মূলনীতি কোরআনের বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এগুলোর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আচরণের একটি পূর্ণাংগ আইন তৈরী হয়। মুসলিম সমাজের সাথে অমুসলিম সমাজের যুদ্ধ বা শান্তি, মৈত্রী বা নিরপেক্ষতা প্রতিটি অবস্থার জন্যে এ আইনে এক একটি বিধান রয়েছে।

এই সকল মূলনীতি ও বিধিসমূহকে সর্বস্তরে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, (কেননা এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের কোনো বিশেষজ্ঞ দ্বারা আলোচিত হবার দাবী রাখে।) তবে আলোচ্য আয়াত কটিতে এ প্রসংগে যা যা বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। নিম্নলিখিত গোষ্ঠীসমূহ ও অবস্থাসমূহের সাথে এ বিধিগুলো সম্পৃক্ত,

ক. মদীনার বাইরে অবস্থানকারী মোনাফেক (মুসলিম নামধারী অমুসলিম)।

খ. যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিম গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত।

গ. যারা নিরপেক্ষতার মনোভাব পোষণ করার কারণে মুসলমানদের সাথেও লড়াই করতে উৎসাহ বোধ করে না, আবার তাদের স্বধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাথেও লড়তে চায় না।

ঘ. যারা আকীদা বিশ্বাসকে খেলা ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিলো এবং মদীনায় এলে ইসলামের প্রতি আর মক্কায় ফিরে গেলে কুফুরীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো।

ঙ. ভুলক্রমে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে কোনো ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত লোককে হত্যা করার উদ্ভূত পরিস্থিতি

এই সব কটি ক্ষেত্রে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন বিধি আমরা শীঘ্রই জানতে পারবো। কেননা, এও আন্তর্জাতিক আচরণের একটি দিক। অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিগুলোর মতোই এ বিধিগুলো সমান গুরুত্ববহ।

এবার কোরআনের আয়াতে সর্বপ্রথম ইসলামের যে মৌলিক বিধানটি তুলে ধরা হয়েছে তা দিয়েই তাফসীর শুরু করছি।

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি যে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে?'

বস্তুত আল্লাহর বিধানের প্রতিটি আইন ও বিধি আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা থেকেই উদ্ভূত- চাই তা ব্যক্তি গঠন সংক্রান্তই হোক, সমাজ গঠন সংক্রান্তই হোক, ব্যক্তি বা সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন সংক্রান্তই হোক, আর এই সব বিধিবিধান মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক তার ভিত্তি হবে তাওহীদ। এজন্যেই আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আচরণের বেশ কিছু সংখ্যক বিধি ও নীতিসহ এ আয়াত কটির ভূমিকায় এভাবে তাওহীদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে এ আয়াতে আখেরাত বিশ্বাস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। একটি বাক্যে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, তিনি তার বান্দাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন এবং এ পৃথিবীতে তাদেরকে কাজের যে সুযোগ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ আলোচনা দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠনের কাজের সূচনা করা হয় এবং ইসলামের আইন ও বিধান সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা হয়। দুনিয়াতে ছোট বড় সব কিছুতে তার পরীক্ষা হবে এবং আখেরাতে ছোট বড় সবকিছুতে তাকে জবাবদিহী করতে হবে, এই কথাই তাকে এ আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আইন বাস্তবায়নের জন্যে এটি হচ্ছে অব্যর্থ গ্যারান্টি। কেননা এই সচেতনতা তার মনের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। শাসক ও প্রহরী যেখানে উদাসীন, সেখানে মোমেন হৃদয়ের গভীরের চেতনা তাকে নিরন্তর পাহারা দিচ্ছে।

এ হচ্ছে আল্লাহর উক্তি এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি,

'আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যভাষী আর কে আছে?'

মোনাফেকদের ব্যাপারে কোরআনের নীতি

মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার পন্থা ও মুসলিম সমাজের আকীদাগত ও বাস্তব বিধানের ভিত্তি নির্দেশকারী এই আয়াতের পর পরবর্তী আয়াতে মোনাফেক ও মোনাফেকীর প্রতিরোধে গড়িমসির নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজ যেখানে কঠোরতা প্রয়োগের প্রয়োজন, সেখানে কঠোরতা প্রয়োগ করতে পারে না কেন এবং মদীনার বাইরে থেকে আগত একদল মোনাফেকের ব্যাপারে তারা দ্বিধাবিভক্ত হলো কেন, সে ব্যাপারে এখানে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিস্ময় ও নিন্দা সমালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে এক ধরনের সামঞ্জস্যহীনতা বিরাজ করতো। অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলো থেকে এটাও জানা গেছে যে, বিভিন্ন জিনিসকে সীমার ভেতরে রাখা ও কড়াকড়ি করা মোনাফেকদের সাথে আচরণে ও দৃষ্টিভংগিতে কোনো অন্যায় আপোস না করা এবং তাদের বাহ্যিক আচরণে সন্তুষ্ট না হওয়ার ওপর ইসলাম জোর দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে বলেন,

'মোনাফেকদের ব্যাপারে তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে?....

এই সকল মোনাফেক সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি হাদীস অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ,

রসূল (স.) যখন ওহুদ যুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন, তখন পথিমধ্যে তাঁর দলের কিছু লোক মদীনায় ফিরে গেলো। এই ঘটনা সম্পর্কে রসূল (স.)-এর সাহাবীরা দ্বিমত পোষণ করেন। একদল বললেন, 'তারা মুসলমান তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।' এই প্রসংগেই এই আয়াত নাযিল হয়। রসূল (স.) বললেন, মদীনা একটি পবিত্র শহর। কামারের চুল্লী যেমন লোহার মরিচা দূর করে, তেমনি মদীনা দুষ্ট স্বভাবের মানুষকে দূর করে দেয়।' (সহীহ বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, 'একদল লোক মুখে ইসলামের কথা বলতো, কিন্তু তারা মোশরেকদের সাহায্য করতো। তারা নিজেদের কোনো প্রয়োজনে মক্কা থেকে বেরিয়ে এলো। তারা বললো, মোহাম্মাদ (স.)-এর সংগীদের সাথে দেখা হয়ে গেলে তাদের দিক থেকে আমাদের কোনো ভয় নেই। ওদিকে মুসলমানরা যখন এদের মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার খবর জানালো, তখন তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো। একদল বললো যে, শত্রুদেরকে সাহায্যকারী এই সব কাপুরুষকে হত্যা করতে হবে। অপর দল বললো, সোবহানাল্লাহ, যারা তোমাদেরই মতো ইসলামের কথাবার্তা বলে, তাদেরকে শুধু হিজরত করেনি বলে তোমরা হত্যা করবে নাকি? রসূল (স.) এ দুই পক্ষের কাউকেই বাধা দিতে পারছিলেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

সনদের দিক থেকে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য হলেও ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে আমি দ্বিতীয় বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কেননা, মদীনার মোনাফেকদের সাথে লড়াই করার কোনো আদেশ যে দেয়া হয়নি, সেটা প্রমাণিত ব্যাপার। রসূল (স.) তাদের সাথে লড়াইও করেননি বা তাদেরকে হত্যাও করেননি। তাদের সাথে আচরণের জন্যে অন্য একটা ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিলো। সেটি হলো তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও তাদের এড়িয়ে চলা, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে রাখা এবং তাদেরকে আশকারা দানকারী ইহুদীদেরকে প্রথমে মদীনা থেকে ও সর্বশেষে গোটা আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে বন্ধুহীন করা। কিন্তু এখানে আমরা অন্য একটা ব্যবস্থা লক্ষ্য করছি। এ থেকে মোনাফেকদেরকে যেখানে পাওয়া যায়-বন্দী ও হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, তারা মদীনায় বসবাসকারী মোনাফেকদের থেকে ভিন্ন ধরনের মোনাফেক। বলা যেতে পারে যে, তাদেরকে বন্দী করা ও হত্যা করার নির্দেশ হিজরত না করার শর্তযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না যতোক্ষণ না তারা হিজরত করে। তারা হিজরত না করলে তাদেরকে যেখানে পাও, পাকড়াও করো ও হত্যা করো।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে তাদেরকে তাদের বর্তমান বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা ও অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পরে হয়তো তারা তা করেছে। তাই রসূল (স.) তাদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকরী করেননি অর্থাৎ গ্রেফতার ও হত্যা করেননি। তবে 'যতোক্ষণ না তারা হিজরত করে' এই কথাটা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তারা মদীনাবাসী নয় এবং তাদেরকে মদীনায় চলে আসার তাগিদ দেয়াই এ কথার উদ্দেশ্য। কেননা, এটা ছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ঘটনা। আর মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতের অর্থই ছিলো মদীনায় হিজরত। এ হিজরত অর্থ কুফরীর রাজ্য ত্যাগ করে ইসলামের রাজ্যে আগমন, মুসলিম সমাজের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের বিধি ব্যবস্থার অনুগত হওয়া। যে ব্যক্তি তা করবে না সে কাফের অথবা মোনাফেক রূপে চিহ্নিত হবে। যে সব মুসলমান কোনো ওযর ছাড়া মক্কায় থেকে গিয়েছিলো, পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তাদের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়েছে। কেননা মক্কা তাদের জন্মস্থান হলেও তা তাদের জন্যে কুফুরীর রাজ্য ও শত্রু রাজ্যে তথা দারুল হরব ও দারুল কুফরে পরিণত হয়েছিলো। এ সব বক্তব্য দ্বিতীয় বর্ণনার অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত করে। অর্থাৎ এসব মোনাফেক মক্কা অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি দলই ছিলো, যারা মুখে ইসলামের দাবীদার ছিলো, কিন্তু কার্যত মুসলমানদের দুশমনদের সহযোগী ছিলো।

মুসলমানদের মতভেদ নিরসন

এবার ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতের দিকে পুনরায় দৃষ্টি দেয়া যাক,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, মোনাফেকদের ব্যাপারে দু'ভাগে বিভক্ত হচ্ছ?'

এ আয়াত দুটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোনাফেকদের ব্যাপারে মোমেনদের দু'ভাগে ভাগ হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের এ আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং মোনাফেকদের সাথে আচরণে বাস্তববাদী হবার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে এ সব বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মুসলিম সমাজে শৈথিল্য, উদাসীনতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও মোনাফেকীর সাথে আপোষকামিতাকে প্রশ্রয়দানের আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, এতে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মূল চেতনার প্রতিই শৈথিল্য প্রকাশ পায়। মুসলমানদের একটি দল বলতো, 'সোবহানাল্লাহ! একটি দল হুবহু আমাদের মতো কথাবার্তা বলা সত্তেও কেবল হিজরত না করার কারণে তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের রক্তপাত করাতে বৈধ মনে করা কি আমাদের উচিত হবে?' অথচ এই মোনাফেকরা নিজেরা বলাবলি করতো যে, 'মোহাম্মদের সহচরদের দিক থেকে আমাদের কোনো ভয় নেই।' আর মোমেনদের আর একটি দল বলতো, 'ওরা তো মুসলমানদের শত্রুদের এজেন্ট।' পরিস্থিতির মূল্যায়নে এরূপ দ্বিধাবিভক্তি মূল ঈমানী চেতনার ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকার অস্পষ্টতা ও উদাসীনতা প্রমাণ করে। অথচ এরূপ পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট ভূমিকা ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যাবশ্যক। কেননা, একদিকে ইসলামের পক্ষে কথাবার্তা বলা এবং অপরদিকে তারই পাশাপাশি মুসলমানদের প্রকাশ্য দুশমনদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সক্রিয় ভাবে কাজ করা মোনাফেকী ছাড়া আর কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে আপোস করা বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, সেটা হবে স্বয়ং ইসলামী আদর্শের প্রতি অবজ্ঞার নামান্তর। এই অবজ্ঞার আশংকাই আলোচ্য আয়াতে অসন্তোষ, বিস্ময় ও কঠোর ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

মদীনার মোনাফেকদেরকে যে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা হতো, সে ক্ষেত্রে ঠিক এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিলো না। কেননা, মদীনার পরিবেশে ইসলামী আদর্শে কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না। সেখানে মোনাফেক ছিলো ঠিকই। তবে তাদের সাথে আচরণের জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ছিলো। তাদের সাথে তাদের বাহ্যিক আচরণ অনুসারে আচরণ করা এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করা হয়েছিলো।

তাই বলে যে মোনাফেকরা মুখে মুসলমানদের মতো কথা বলবে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই ও মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেবে, অথচ মুসলমানদের দুশমনদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাবে, মুসলমানদের কোনো দল তাদেরকে প্রশ্রয় দিক এটা কোরআন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি।

একই সময়ে মুসলমানদের একটি দল নিছক শিথিল ও উদার মনোভাবের কারণে তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল তাই এই শৈথিল্য এবং মোনাফেকদের সাথে আচরণে এবং মতভেদের কারণেই আয়াতের শুরুতে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, আর এর অব্যবহিত পরই এই সব মোনাফেকের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,

'অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অপকর্মের দরুণই অধপতনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ মোনাফেকদের ব্যাপারে তোমাদের দুই দল বিভক্ত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? তাদের এই বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যে তো তাদের অপকর্ম ও অসদুদ্দেশ্যই দায়ী। এ কথা দ্বারা কার্যত আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, গোপনে খারাপ উদ্দেশ্য পোষণ ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকার কারণেই তারা বর্তমান বিভ্রান্তি ও মোনাফেকীতে পতিত হয়েছে।

এরপর আরেকবার অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এই বলে,

'আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাদেরকে তোমরা কি সুপথ দেখাতে চাও?'

মোমেনদের যে দলটি তাদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতো, তাদের একটি যুক্তি সম্ভবত এই ছিলো যে, মোনাফেকদেরকে আরো একটা সুযোগ দেয়া উচিত, হয়তো তারা একদিন হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং কপটতা ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করবে। কিন্তু যে গোষ্ঠী তাদের অপকর্মের পরিণতি ভোগ করার যোগ্য হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদেরকে এর পরিণাম স্বরূপ বর্তমান গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের ব্যাপারে মোমেনদের এই আপোসমূলক মনোভাবে আল্লাহ তায়ালা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালা যাকে বিপথগামী করেন, তুমি কখনো তার জন্যে হেদায়াতকারী পাবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বিপথে ধাবিত লোকদেরকেই বিপথে চালিত করেন, তারা যখন স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে গোমরাহীর দিকে যেতে চায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে বিপথগামী হবার সুযোগ উন্মুক্ত করে দেন, তার সামনে হেদায়াতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, তারা সে পথ থেকে দূরে সরে গেছে ও পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এরপর সে সব মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করে পুনরায় বলা হয়েছে যে, তারা শুধু নিজেরাই বিপথগামী হয়নি, বরং তারা মোমেনদেরকেও বিপথগামী করতে চায়,

'তারা এই বাসনা পোষণ করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও তা অবলম্বন করো এবং সবাই সমান হয়ে যাও।'

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা যতোই মুসলমানদের মতো কথাবার্তা বলুক এবং মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করুক-তারা আসলে কাফের হয়ে গেছে। কেননা, ইসলামের

শক্রদের সাথে দহরম মহরম পাতিয়ে তারা নিজেদের কালেমা উচ্চারণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি, তাদের ভূমিকা ছিলো আরো মারাত্মক। বস্তুত যে ব্যক্তি কুফুরীতে লিপ্ত, সে পৃথিবীতে একজন মোমেনও অবশিষ্ট থাকুক, তা দেখতে চায় না। সে চায়, বাদ বাকী মুসলমানরাও কাফের হয়ে যাক। যাতে তারা সবাই সমান হয়ে যায়। এ জন্যে তারা সব রকমের ফন্দি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

এ হচ্ছে মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচনকারী প্রথম বক্তব্য। এতে ঈমান সংক্রান্ত চেতনাকে অস্পষ্টতা ও শৈথিল্য থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে সুস্পষ্ট ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। নচেৎ মিথ্যা ও ভন্ডামির সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা অবস্থায় মুখের কথার কোনো মূল্য নেই, আর কোরআন মোমেনদের চেতনা ও অনুভূতিকে একটি ভীতিজনক সম্ভাবনার ইংগিত দিয়ে তাদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে,

'তারা এই বাসনা পোষণ করে যে, তারা যেমন কুফুরী অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও তা অবলম্বন করো, আর এভাবে সবাই সমান ও একাকার হয়ে যাও।'

এই সতর্কীকরণের কারণ এই যে, মোমেনরা মাত্র কিছু দিন আগেই কুফুরীর তিক্ততা পেরিয়ে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে। জাহেলিয়াত থেকে তাদের ইসলামে স্থানান্তরের এই কাজটি ছিলো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিরাট কাজ। জাহেলী সমাজে তাদের যে আবেগ অনুভূতি এবং মান মর্যাদা ছিলো, ইসলামে এসে তাদের সে সব পাল্টে গেছে, তাদের বাস্তব অবস্থায় ও আবেগ অনুভূতিতে যে পার্থক্য সূচিত হয়েছিলো তা ছিলো সুস্পষ্ট। এই পার্থক্য বুঝানোর জন্যে এ কথা বলাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে যে, তাদের শক্ররা তাদেরকে তাদের সাবেক জাহেলিয়াতে ফিরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ইসলাম তাদের এই কু-বাসনাকে প্রতিহত করে তাদেরকে আরো উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর।

এ জন্যে কোরআন তাদেরকে সেই ভয়ংকর হুমকি থেকে সতর্ক করে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করে,

মোনাফেকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ

'অতএব তাদেরকে ততোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। হিজরত যদি না করে তবে তাদেরকে যেখানে পাও, পাকড়াও করো ও হত্যা করো এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না।'

তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা থেকে আমার মনে হয় যে, তখনো পর্যন্ত মদীনার মুসলমানদের মনে কিছু কিছু পারিবারিক ও গোত্রীয় বন্ধন বিদ্যমান ছিলো। এটা অর্থনৈতিক কারণেও দেখা দিয়ে থাকতে পারে। কোরআন এই ত্রুটি শোধরে দিয়েছে। কোরআন মুসলিম উম্মাহর জন্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের নিয়ম ও বিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে যেমন একই সাথে সে তাদের তাত্ত্বিক ও আদর্শিক নীতিমালাও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

কোরআনের শিক্ষা এই যে, মুসলিম উম্মার ভিত্তি আত্মীয়তা এবং গোত্রীয় ও রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন নয়। তার ভিত্তি একই দেশ বা শহরের অধিবাসী হওয়া কিংবা অর্তনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় নয়। তার ভিত্তি হচ্ছে একমাত্র ইসলামী তত্ত্ব ও আদর্শ, আর তা থেকে উদ্ভূত সমাজ ব্যবস্থা ও এর ভিত্তি।

এ জন্যেই দারুল ইসলামের মুসলমানদের সাথে দারুল হারবের ইসলামের দাবীদারদের কোনো সম্পর্ক বন্ধন ইসলামে স্বীকৃত নয়, যতোক্ষণ তারা হিজরত করে মুসলিম সমাজ তথা

মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত না হয়। এ হিজরত হবে তাদের আল্লাহর পথে ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ হিজরত হবে নিছক আদর্শের খাতিরে– অন্য কিছুর খাতিরে নয়।

এর উদ্দেশ্য খাঁটি ও পরিপূর্ণ ইসলামের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এ হিজরতের লক্ষ্য ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, মক্কা মোহাজেরদের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি হলেও তৎকালে তা ছিলো দারুল হারব তথা কুফুরী উপদ্রুত স্থান এবং সেখান থেকে হিজরত করা এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে ফরয ছিলো, যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে।

যারা আপন মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে ইসলামী জীবন বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার মানসে দারুল ইসলাম মদীনায় হিজরত করে চলে আসবে, তারা মুসলিম সমাজের সদস্য এবং মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর যদি হিজরত না করে, তাহলে তাদের মুখের কথার কোনো মূল্য নেই। কেননা তারা তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে বন্দী করা ও হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমরা আগেই বলেছি যে, এই লোকগুলো মদীনার মোনাফেক নয়। কেননা, মদীনার মোনাফেকদের ব্যাপারে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হতো।

ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি ইসলামের উদারনীতি

ইসলাম তার বিপরীত আকীদা পোষণকারীদের ব্যাপারে উদার। তাদেরকে ইসলামী আকীদা গ্রহণ করতে সে কখনো বাধ্য করে না। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও তাদের ইসলাম বিরোধী আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে, যদি তারা মুসলমানদেরকে দলে ভিড়ানোর জন্যে না ডাকে এবং ইসলামকে আক্রমণ বা বিদ্রুপ না করে। আহলে কেতাবদের এ ধরনের আক্রমণ ও বিদ্রুপের প্রতি কোরআন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে এই অধিকার দেয় না যে, তারা ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। এ যুগের আপোসবাদীদের কারো কারো ধারনা অবশ্য এটাই যে, তারা ইচ্ছা করলে ইসলামের ক্ষতিও সাধন করতে পারবে। ইসলামের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোর জবরদস্তি করে না, তাদের জীবন, সম্পদ ও রক্তের হেফাযত করে, ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কল্যাণে অংশীদার হবার সুযোগ দেয় এবং এ ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ও বৈষম্য করে না। আর তাদেরকে তাদের নিজস্ব বিষয়ে তাদের ধর্ম অনুযায়ী ফয়সালা করার স্বাধীনতা দেয়।

ইসলাম তার বিরোধীদেরকে এতোখানি স্বাধীনতা প্রকাশ্যভবেই দিয়ে থাকে। কিন্তু যারা মুখে ইসলামের দাবী করে অথচ তাদের কাজ সেই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে সে এই স্বাধীনতা দেয় না। যারা এক আল্লাহকে ইলাহ বলে মানার কথাও ঘোষণা করে, আবার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যাদের আইন, নির্দেশ ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম উদার নয়। ইসলাম আহলে কেতাবদের মোশরেক গণ্য করে এ জন্যে যে, তারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বিকল্প 'খোদা' হিসাবে মেনে নিয়েছিলো। ওই ধর্মীয় নেতাদেরকে তারা কিন্তু পূজা করতো না, কিন্তু তারা যাকে হালাল বা হারাম বলতো, চোখ বুজে তাই তারা মেনে নিতো। তা ছাড়া তারা হযরত ঈসা (স.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মানতো।

যারা নিজেদেরকে মোমেন দাবী করা সত্তেও দারুল কুফরে থেকে গেছে এবং মুসলমানদের শত্রুদের সাথে দহরম মহরম পাতিয়েছে, তাদের প্রতিও ইসলাম উদারতা প্রদর্শন করেনি। কেননা, এক্ষেত্রে উদারতা দেখালে তা ইসলাম হতো না, হতো আপোসকামিতা। ইসলামে উদারতা আছে– আপোসকামিতা নেই। আর উদারতা হচ্ছে আপোসকামিতার বিপরীত।

বস্তুত কোরআনের এ নির্দেশাবলীতে প্রথম সে মুসলিম সমাজটির জন্যে পর্যাপ্ত পথ নির্দেশনা রয়েছে।

এরপর ইসলাম ও মুসলমানদের শক্রদের দোসর এই মোনাফেক গোষ্ঠীকে কোন্ অবস্থায় গ্রেফতারী ও হত্যা থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে সেটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। যে শিবিরের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি রয়েছে– চাই তা অমুসলিম হোক, সেই শিবিরের কাছে যদি উক্ত মোনাফেকদের কেউ আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে শিবিরের লোকেরা যে নিরাপত্তা লাভ করবে, তা তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী মোনাফেকরাও লাভ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

'তবে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো গোষ্ঠীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ছাড়া।'

এই বিধি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা যাবে– যদি সেখানে ইসলামের মূলনীতির সাথে সংঘর্ষ না বাঁধে, তার প্রচারের স্বাধীনতা ও গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত না করে, ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে ব্যাহত না করে, মুসলমানদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তা তাদেরকে কোনো বিপদের হুমকিতে নিক্ষেপ না করে অথবা ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনকে বিপন্ন বা অচল না করে তাহলে সেখানে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। এসব জায়গায় শান্তি ও সন্ধিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

এ জন্যে যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে, তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী বা তাদের সাথে অবস্থানকারীও মুসলমানদের কাছ থেকে তাদেরই মতো আচরণ পাওয়ার অধিকারী এবং তারাও তাদের মতো নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। এ ধরনের বিধিতে এটি একটি সুস্পষ্ট শান্তির প্রেরণা।

নিরপেক্ষ লোকদের ব্যাপারে কোরআনের নীতি

অনুরূপভাবে আরো একটি দলকে গ্রেফতার ও হত্যা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ দলটিতে মুসলমানদের সাথে মোশরেকদের চলমান যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গোত্রভুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছে। তারা মোশরেকদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেমন ইচ্ছুক নয়, তেমনি ইচ্ছুক নয় মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে স্বজাতীয় মোশরেকরদের বিরুদ্ধে লড়তে। তাই তারা দুই গোষ্ঠীর কোনোটির সাথেই লড়াইতে যোগ দেয় না।

'অথবা যারা তোমাদের কাছে এমনভাবে আসে যে, তোমাদের সাথেও লড়তে বিব্রত বোধ করে, আর তাদের স্বজাতির সাথেও।'

এই বিধির মধ্যে এটাও স্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষ যেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতায় অংশ গ্রহণে বিরত থাকে এবং মুসলমানদের ও তাদের শত্রুদের মধ্যে চলমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চায়, সেখানে তাদের সাথে বা স্বজাতীয় মোশরেকদের সাথে লড়াই করতে বিব্রত বোধকারী এ গোষ্ঠীটি আরবে বিদ্যমান ছিলো, এমনকি স্বয়ং কোরায়শের মধ্যেও ছিলো। ইসলাম তাদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেনি যে, তাদেরকে মুসলমানদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে থাকতে হবে। কেননা, তাদের মুসলমানদের বিপক্ষে না থাকাকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করেছিলো। (পরে অবশ্য সূরা তাওবার আয়াতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যে, আরব উপদ্বীপে ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো।) এ গোষ্ঠীটি পরবর্তীতে সকল প্রতিকূলতা অপসৃত হলে ইসলামের দিকেই ঝুঁকবে বলে আশা করা হয়েছিলো এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিলো।

বিব্রত বোধকারী নিরপেক্ষ লোকদের সাথে এই নীতি অনুসরণে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, যাতে তারা দ্বিতীয় বিকল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়।

সে বিকল্পটি এই যে, তারা এভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার পরিবর্তে মুসলমানদের যুদ্ধরত শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে পারতো। আল্লাহ তায়ালা যখন এভাবে শত্রুতা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন, তখন শান্তির পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। তাদেরকে তাদের মনোনীত পথে চলতে দেয়াই ভাল। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর যদি আল্লাহ তায়ালা চইতেন তবে তাদেরকে (নিরপেক্ষ লোকদেরকে) তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দেননি।'

এভাবে আল্লাহ তায়ালা জেহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত মুসলমানদেরকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নচেত তারা হয়তো এ গোষ্ঠী সম্পর্কে শান্তির নীতি অবলম্বনে রাজী হতো না। এতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও বিচক্ষণ কর্মকুশলতা নিহিত রয়েছে। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে একটি বাড়তি শত্রুতা ও যুলুম থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, শান্তি ও কল্যাণ অর্জনের যে সুযোগই আসুক, তা যেন তারা গ্রহণ করে এবং অপশক্তি যখন তাদেরকে এড়িয়ে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন তাদেরকে তারাও যেন এড়িয়ে যায় ও তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন না করে। এ অনুমতির জন্যে শর্ত শুধু এই যে, এতে যেন ইসলামের কোনো বিধি লংঘিত না হয়, ইসলামের কোনো আকীদার প্রতি যেন শৈথিল্য প্রদর্শিত না হয় এবং সস্তা শান্তি অর্জনের জন্যে কোনো অবমাননাকর ব্যবস্থার প্রতি যেন সম্মতি জ্ঞাপন করা না হয়।

সস্তা শান্তি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা, যে কোনো মূল্যে শান্তি অর্জন করা ইসলামের লক্ষ্য নয়। ইসলাম চায় এমন শান্তি, যা ইসলামী আন্দোলনের, ইসলামী বিধানের অথবা মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোনো অধিকার ব্যাহত বা বিনষ্ট না করে। কেননা, এসব অধিকারই হচ্ছে মুসলমান হিসাবে তাদের পরিচিতির প্রতীক।

ইসলামী বিধানের একটি অধিকার এই যে, তার দাওয়াত যাদের কাছে পৌঁছে, তাদের কেউ যদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তবে পৃথিবীর কোথাও সে যেন ইসলামে প্রবেশে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয় এবং এ জন্যে সে কোনো নির্যাতন বা ক্ষতির শিকার না হয়। ইসলামী আদর্শের এতোটা শক্তিশালীও হওয়া চাই যেন যারা তার পথ আগলে দাঁড়াতে চায়, তার ক্ষতি সাধন করতে চায়, তারা যেন তাকে ভয় করে। এ সব শর্ত অর্জিত হওয়ার পর যে কোনো সন্ধি বা শান্তি চুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হলে ইসলাম তাকে স্বাগত জানায়, আর সর্বাবস্থায় জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

মোনাফেকদের জন্যে আরো কিছু ধমক

তবে মনে রাখতে হবে যে, মোনাফেকদের আর একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সাথে ইসলাম এই উদার নীতি অবলম্বন করে না। কেননা, তারা প্রথম গোষ্ঠীর মতোই মোনাফেক অপশক্তি। তারা কোনো চুক্তিতেও আবদ্ধ নয় বা কোনো চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত নয়। এই গোষ্ঠীর ব্যাপারে ইসলাম স্বাধীন। প্রথমোক্ত মোনাফেক গোষ্ঠীর সাথে সে যে ভাবে আচরণ করে তাকে, এই গোষ্ঠীর সাথেও সেভাবেই আচরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন।'

'অচিরেই তোমরা অপর এক গোষ্ঠীর সাক্ষাত পাবে।.... আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত মক্কাবাসীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে লোক দেখানো সালাম করতো। অতপর কোরায়শদের মধ্যে ফিরে গিয়ে যথারীতি মূর্তিপূজা করতো। এভাবে তারা মোমেন ও কাফের উভয় গোষ্ঠীর কাছে নিরাপদ থাকতে চাইতো। তারা যদি শোধরে না যায় এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরে না যায়, তাহলে তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এভাবে আমরা ইসলামের উদারতার পাশাপাশি তার কঠোরতার একটি দিকও দেখতে পাই। উভয়টিই পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তা যথাস্থানে তার ট্রাজেডি হবে।

এভাবে এই দুটো দিককে সামনে রেখে একাধারে ইসলামী বিধানকে এবং মুসলমাদের ভাবাবেগ ও মনমানসকে ভারসাম্যপূর্ন করে গড়া নিশ্চিত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই ভারসাম্যই ইসলামের প্রধান ও মৌল বৈশিষ্ট্য। উগ্রপন্থীরা এখন গোটা ইসলামকে কেবল কঠোরতা ও উগ্রতার সমষ্টি হিসাবেই তুলে ধরে, তখন ইসলামের জেহাদ নীতির ব্যাপারে এমনভাবে তারা সাফাই দিতে আরম্ভ করে যেন ইসলাম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা এক ভয়ংকর অপরাধীর মামলা লড়ছে—জেনে রাখতে হবে যে, এটাও ইসলাম নয়। শেষোক্ত মহলটি ইসলামকে এমনভাবে পেশ করে যেন তাতে উদারতা, ক্ষমা, শান্তি ও অন্যায়কারীকে অবাধ বিচরণের সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। যেন ইসলামী আবাসভূমি ও মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষা ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধের কোনোই অবকাশ নেই, ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকে পৃথিবীর সর্বত্র বাধামুক্ত করা, সারা বিশ্বে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই যে আল্লাহর বিধানের অধীন শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে, সেই বিধানকে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যেন মোটেই শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি নেই! এই মহলটি যেভাবে ইসলামকে পেশ করে, সেটা ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ নয়।

এই মহলটির সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে ইসলামের আন্তর্জাতিক বিধানের সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত পথ নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে।

ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা

এতোক্ষণ আলোচনা হলো অমুসলিমদের সাথে মুসলমাদের আচরণ সংক্রান্ত অবস্থার কিছু নমুনা। খোদ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পরবর্তী দুটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। একমাত্র 'হুদুদ' ও 'কেসাস'- তথা ইসলামী ফৌজদারী দন্ডবিধি ব্যতীত আর কোনো কারণে কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারবে না। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে আকীদা ও আদর্শের ঐক্যের যে বন্ধন রয়েছে, তার উর্ধে উঠে কোনো মুসলমানদের হত্যাকে বৈধ করতে পারে—এমন কোনো কারণ নেই। তাই এই অটুট আদর্শিক বন্ধন ছিন্ন করে কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে কখনো হত্যা করতে পারবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যা একটা ভিন্ন ব্যাপার। এ ধরনের হত্যার শাস্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যার কোনো কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা ওটা হিসাবের বাইরের বিষয়, ইসলামের সীমার বহির্ভূত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কোনো মোমেনের জন্যে অপর মোমেনকে হত্যা করা বৈধ নয়।....'

হত্যা সংক্রান্ত বিধানের চারটি অবস্থা হতে পারে। তন্মধ্যে তিনটি অবস্থা অনিচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের হত্যাকান্ড একই দেশে অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুসলমানদের

মধ্যে সংঘটিত হতে পারে, আবার একাধিক জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেশেও সংঘটিত হতে পারে। আর চতুর্থ অবস্থাটা ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন হত্যাকান্ড, যাকে কোরআন আদৌ মেনে নেয়নি। এ ধরনের ঘটনা কেরআনের দৃষ্টিতে আদৌ সংগটিত হওয়ারই কথা নয়। কেননা, একজন মুসলমান কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে আর একজন মুসলমানদের রক্তপাত এমন একটি ঘৃণ্য কাজ যে, সারা দুনিয়ার সম্পদ বিলিয়ে দিলেও তার ক্ষতিপূরণ হয় না। আর পার্থিব জীবনে এমন কোনো জটিল ও দুঃসহ পরিস্থিতি কল্পনাও করা যায় না, যা এক মুসলমানের সাথে আর এক মুসলমানের সম্পর্ককে এতো নীচে নামাতে পারে যে, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। মুসলমানদের এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ইসলাম এতো গভীর, এতো গাম্ভীর্যপূর্ণ, এতো অটুট, এতো মূল্যবান ও এতো সম্মানজনক করেছে যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ড তাদের মধ্যে আদৌ সংঘটিত হতে পারে-এটা সে কল্পনায়ই আনতে চায় না। এ জন্যে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ড দিয়েই আলোচনা শুরু করেছে।

'কোনো মোমেনের পক্ষে এটা বৈধ নয় যে, অপর মোমেনকে হত্যা করবে তবে ভুলক্রমে হয়ে গেলে সেটি আলাদা কথা।'

ইসলামী চেতনার বিচারে এ কাজটি একমাত্র অনিচ্ছাকৃতভাবেই ঘটতে পারে। বাস্তবে এটাই একমাত্র সম্ভাব্য ঘটনা। কেননা, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে প্রতিবেশী হিসাবে পাবে এটা খুব বড়ো কথা। আর পেয়ে গেলে তা হবে একটি অমূল্য নেয়ামত। এই অমূল্য নেয়ামতকে ধ্বংস করার জন্যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে পদক্ষেপ নেবে এটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কেননা, পৃথিবীতে একজন মুসলমানের অস্তিত্ব যে কতো মূল্যবান এ কথা সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে তারই মতো আর একজন মুসলমান। কাজেই তার পক্ষে তাকে হত্যা করতে উদ্যোগী হওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথী মুসলমানদের সম্পর্কে এ কথাই জানে ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাকে এটা জানিয়েছেন। এই আদর্শের বন্ধনে রসূল (স.) তাদেরকে আবদ্ধ ও একীভূত করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও প্রীতি জন্মিয়েছেন এক বিস্ময়কর ভংগিতে।

অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের তিনটি অবস্থা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

প্রথম অবস্থা এই যে, নিহত ব্যক্তি এমন একজন মুসলমান, যার পরিবার পরিজনও মুসলমান এবং তারা দারুল ইসলামে অর্থাৎ মুসলিম দেশে বাস করে। এরূপ ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি হলো একজন মুসলমান দাস বা দাসীকে মুক্ত করা এবং নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দেরকে রক্তপণ (দিয়ত) দান করা। মোমেন দাসদাসীকে স্বাধীন করার তাৎপর্য এই যে, একজন মোমেনকে হত্যা করে মুসলিম সমাজের যে ক্ষতি করা হয়েছে, একজন মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীন করে তাকে নবজীবন দান করে সেই ক্ষতি পূরণ করা হলো। দাসদাসীকে স্বাধীন করার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে এ রকমই। আর 'দিয়ত'টা হচ্ছে হৃদয়ের প্রচন্ড প্রতিশোধস্পৃহা প্রশমিত করা। শোকাহতদের মনে সান্ত্বনা দান এবং নিহত ব্যক্তির উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে পরিবার যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার কিঞ্চিত পূরণ করার ব্যবস্থা। এ সব ব্যবস্থার পর ইসলাম নিহতের পরিবারকে ক্ষমার প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। কেননা, মুসলিম সমাজে উদারতা ও স্নেহ-মমতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত উপকারী। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেন,

'যে ব্যক্তি কোনো মোমেনকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার কর্তব্য হচ্ছে একজন মোমেন দাস বা দাসীকে মুক্ত করে দেয়া এবং নিহতের পরিবারকে 'দিয়ত' প্রদান করা। তবে তারা যদি দিয়ত মাফ করে দেয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।'

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, নিহত মুসলমানের পরিবার পরিজন অমুসলিম, দারুল হারবে তথা কাফেরদের দেশে বাস করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধরত। এ রূপ ক্ষেত্রে শুধু দাস বা দাসীকে মুক্ত করে নিহত মোমেনের বাবদে কাফফারা দিতে হবে। এটি হবে মুসলিম সমাজের ক্ষতিপূরণ। কেননা, সে তার একজন মুসলিম সদস্যকে হারিয়েছে। এই নিহত ব্যক্তির বাবদে তার পরিবার পরিজনকে কোনো দিয়ত দেয়া হবে না। কেননা, তারা দারুল হারবে বসে মুসলমানদের সাথে লড়াইতে লিপ্ত এবং তাদেরকে দিয়ত দিলে তারা তা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আরো শক্তি সঞ্চয় করবে। এখানে নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে খুশী করে তাদের ভালোবাসা অর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত শত্রু।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, নিহত ব্যক্তি মুসলমান এবং তার পরিবার পরিজন মুসলমানদের সাথে কোনো সন্ধি চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ। এ অবস্থায় নিহত ব্যক্তির মোমেন হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় মোফাসসেররা একে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মেনে নিয়েছে। তাদের মতে, এই নিহত ব্যক্তি মুসলমান না হলেও তার পরিবারকে 'দিয়ত' তথা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে। কেননা, মুসলমানদের সাথে চুক্তি থাকায় তাদের রক্ত মুসলমানদের মতোই সংরক্ষিত।

তবে আমার মতে, যেহেতু আলোচনার সূচনাই হয়েছে মোমেনের হত্যা প্রসংগে, তাই পরবর্তী সব কটি অবস্থা মোমেন হত্যারই রকম ফের বিবেচিত হবে। যেহেতু দ্বিতীয় অবস্থায় নিহত ব্যক্তিকে শত্রু গোষ্ঠীর লোক অথচ মোমেন হিসাবে দেখানো হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি করার সময় আর তার মোমেন হওয়ার বিষয়টি পুনরুল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায়ও মোমেন দাস বা দাসীকে মুক্ত করতে হবে–এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তৃতীয় অবস্থাও মুসলিম নিহতের সাথে সংশ্লিষ্ট। নচেত শুধু একটা গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকা হতো এবং 'মোমেন' বিশেষণটি যুক্ত করা হতো না।

হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) চুক্তিবদ্ধদের মধ্য থেকে নিহতদের কারো কারো জন্যে দিয়ত দিয়েছেন, কিন্তু গোলাম-বাঁদী মুক্ত করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম নিহতের বাবদ 'দিয়ত' দেয়াই যথেষ্ট, আর এটা এই আয়াত দ্বারা নয় বরং রসূল (স.)-এর বাস্তব কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়। বস্তুত আলোচ্য আয়াতে কেবল কোনো মোমেন নিহত হলে কী করণীয় সেটাই বলা হয়েছে, চাই সে দারুল ইসলামের মুসলিম পরিবারের সদস্য হোক, দারুল হারবের অমুসলিম পরিবারে সন্তান হোক অথবা কোনো চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর সদস্য হোক। আয়াতের ভাষা থেকে এই ধারণাই অধিকতর পরিস্ফুট।

এতো গেলো অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যাকান্ডের কাফফারার বিধান, আর ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ড এমন এক কবীরা গুনাহ, যা কেউ ঈমানদার অবস্থায় করতে পারে না। এ ধরনের হত্যাকান্ডের কাফফারা কোনো কিছু দিয়ে হয় না। গোলাম-বাঁদী মুক্ত করেও হয় না। এর শাস্তি শুধু আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মোমেনকে হত্যা করবে তার প্রতিফল চিরস্থায়ী জাহান্নাম.....'

বস্তুত হত্যা শুধু অন্যায়ভাবে প্রাণবধ করার নাম নয়, বরং মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে মহামূল্যবান সম্পর্কের সৃষ্টি করেছেন, সেই সম্পর্ককেই হত্যা করার নাম। এটা আসলে স্বয়ং ঈমানকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

এ জন্যে এ কাজটিকে বহু জায়গায় শেরেকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস সহ কারো কারো মত এই যে, এ পাপের কোন ক্ষমা ও তাওবা নেই। তবে অন্যরা 'আল্লাহ তায়ালা শেরেকের গুনাহ মাফ করেন না, তা ছাড়া আর সব গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন' -এই আয়াতের বরাত দিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তাওবা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের অপরাধীও ক্ষমা পেতে পারে। অত্র আয়াতের যে 'চিরস্থায়ী' জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে, তাকে তারা 'দীর্ঘস্থায়ী' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

যারা ইসলামের প্রথম বিদ্যালয়টিতে শিক্ষা লাভ করেছেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পর সেই সব লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখতেন, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের পিতামাতা, সন্তান ও ভাইবোনকে হত্যা করেছে। দেখতেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন তাদের মনে তিক্ত অনুভূতি জেগে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু চরম তিক্ততা ও উত্তেজনার সময়ও একটি মুহূর্তের জন্যেও তাদেরকে হত্যা করার কথা তাদের মাথায় আসতো না। এমনকি ইসলাম প্রদত্ত কোনো একটি অধিকার থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করার কথা তারা ভাবতো না।

ইসলাম কখনো গণহত্যাকে সমর্থন করে না

মুসলমানরা যাতে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডেও লিপ্ত না হয় এবং মোজাহেদদের মনে যাতে একমাত্র আল্লাহর পথে জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা না আসে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন জেহাদের উদ্দেশ্যে বেরুনোর পর ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে কাউকে প্রথমে হত্যা না করে বা আক্রমণ না করে, আর তাদেরকে বাহ্যিক বিবেচনায় যেমন প্রতীয়মান হয়, সে রকমই যেন মনে করে। কেননা মুখের কথা অবিশ্বাস করার কোন উপযুক্ত প্রমাণ সেখানে নেই। আল্লাহ তায়ালা তাই ৯৪ নং আয়াতে বলেন,

'হে মোমেনরা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হও, তখন ভালো করে খোঁজ-খবর নিও, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয়, তাকে বলো না যে, তুমি মোমেন নও। .....'

এ আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণসমূহ বহু সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সে সবের সংক্ষিপ্তসার এই যে, মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল টহল দেয়ার সময় এক পাল মেষসহ এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়। লোকটি 'আস সালামু আলাইকুম' বলে নিজের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ করতে চাইলো। কিন্তু মুসলিম সেনাদলটি ভাবলো যে, সে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সালাম দিয়েছে। তারা এই ভেবে তাকে হত্যা করে ফেললো।

এ কারণেই এ আয়াত নাযিল হয়, এ ধরনের কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা এবং পার্থিব সম্পদের লোভ থেকেও তাদেরকে পবিত্র করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত রাখাই এর উদ্দেশ্য। ইসলাম এ সব জিনিস অপছন্দ করে।

জেহাদের ময়দানে পার্থিব সম্পদের মোহে মুসলমানদের মন কলুষিত হোক, এটা মোটেই বৈধ নয়। সম্পদের মোহ কখনো জেহাদের উদ্দীপক হতে পারে না। অনুরূপভাবে ভালো মতো তদন্ত না করে তাড়াহুড়ো করে রক্তপাত করাও ইসলামে বাঞ্ছিত নয়। কেননা, এভাবে যে রক্ত প্রবাহিত করা হবে, তা কোনো মুসলমানের সম্মানিত রক্তও হতে পারে।

এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যে এ ধরনের জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত ছিলো এবং রগচটা ও একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ ছিলো, সেটা বেশী দিন

আগের কথা নয়। তাদের মাথায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মোহ ছিলো তখন প্রবল। তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি আপন অনুগ্রহ বলে তাদের সেই বদ স্বভাব শুধরে দিয়েছেন এবং তাদের উচ্চতর লক্ষ্যে সংগ্রাম করার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই তারা আর জাহেলি যুগের ন্যায় তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের লোভে আগ্রাসী যুদ্ধ চালায় না। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের জন্যে সীমা ও নিয়মবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই জাহেলী যুগের ন্যায় সামাজিক উত্তেজনা বা হুজুগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের উচিত নয়। এ আয়াতে ইশারা-ইংগিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তোমরাও এক সময় ভীতি ও দুর্বলতার কারণে স্বজাতির কাছ থেকে ঈমান আকীদা ও আদর্শকে সমূহ ক্ষতির ভয়ে লুকিয়ে রাখতে। আজ তোমরা যে লেকটিকে হত্যা করেছো, সে হয়তো তোমাদেরই মতো নিজের পরিচয় জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইতিপূর্বে তোমরাও এ রকম ছিলে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা উত্তমভাবে তদন্ত করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।'

এভাবে কোরআন মুসলমানদের মনে প্রেরণা যুগিয়েছে, সতর্ক করেছে এবং আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আর এই সচেতনতা ও সংযমের ভিত্তিতেই সে শরীয়তের বিধিসমূহ বাস্তবায়িত করেছে।

এভাবেই চৌদ্দশ' বছর আগে কোরআন আন্তর্জাতিক আচরণের এতো পরিচ্ছন্ন নীতিমালা মানুষদের শিক্ষা দিয়েছে।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ
قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ
اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ
مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক পংগুত্ব ও) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে– এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজোহেদদের– যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালার পথে) জেহাদ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, (জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন; (কিন্তু এটা ঠিক যে,) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মোজাহেদদের অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ৯৬. এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, এর সাথে রয়েছে তাঁর ক্ষমা ও দয়া, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

রুকু ১৪

৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের প্রাণ কেড়ে নেয়ার সময় (মওতের) ফেরেশতারা যখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, (বলো তো! এর আগে) সেখানে তোমরা কিভাবে ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল (ও অক্ষম) ছিলাম; ফেরেশতারা বলবে, কেন, (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা ইচ্ছা করলে যেখানে চলে যেতে পারতে, (আসলে) এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের (আবাসস্থল) জাহান্নাম; আর তা কতো নিকৃষ্টতম আবাস! ৯৮. তবে সেসব নারী-পুরুষ ও শিশু সন্তান, যাদের (হিজরত করার মতো শারীরিক) শক্তি ছিলো না, কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিলো না, তাদের কথা আলাদা।

فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ
يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ وَمَنْ
يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ
فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا
فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ

৯৯. এরা হচ্ছে সেসব মানুষ– আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত যাদের কাছ থেকে (গোনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে কেউই আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরত করবে সে (অচিরেই আল্লাহ তায়ালার) যমীনে প্রশস্ত জায়গা ও অগণিত ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে; যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের উদ্দেশে হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হয় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে নেয়, তাহলে তার (সে অপূর্ণ হিজরতের) পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর; আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু ১৫

১০১. তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন তোমাদের যদি এ আশংকা থাকে যে, কাফেররা (নামাযের সময় আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে সে অবস্থায় তোমরা যদি তোমাদের নামায সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে তোমাদের কোনোই দোষ নেই; নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশমন। ১০২. (হে নবী,) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের (ইমামতির) জন্যে (নামাযে) দাঁড়াবে, তখন যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (নামাযে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র সাথে নিয়ে সতর্ক থাকে; অতপর তারা যখন (নামাযের) সাজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে থাকবে, দ্বিতীয় দল– যারা নামায (তখনো) পড়েনি তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কিন্তু সর্বাবস্থায়ই) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশস্ত্র (অবস্থায়) থাকে, (কারণ,) কাফেররা তো এ

تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا

اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا

اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا

مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ

كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

(সুযোগটুকুই) চায় যে, যদি তোমরা তোমাদের মালসামানা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে একটু অসাবধান হয়ে যাও, যাতে তারা তোমাদের ওপর (আকস্মিকভাবে) ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অবশ্য (অতিরিক্ত) বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও, তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) তোমরা অস্ত্র রেখে দিতে পারো; কিন্তু (অস্ত্র রেখে দিলেও) তোমরা কিন্তু নিজেদের সাবধানতা বজায় রাখবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (তথা সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (যথারীতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদরাদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে। ১০৪. কোনো (শত্রু) দলের পেছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো (তাহলে জেনে রেখো), তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক যেমনিভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে (জান্নাত) আশা করো, তারা তো তা করে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

তাফসীর

আয়াত-৯৫-১০৪

এ আয়াত কয়টির বক্তব্য পূর্ববর্তী আয়াত কয়টির বক্তব্যের সাথে এতো গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে, এটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াত কয়টির উপসংহার বলেও বিবেচিত হতে পারে। ইসলামের আন্তর্জাতিক আচরণের নীতিমালাকে তুলে ধরার ইচ্ছা না থাকলে এই তিনটি আয়াত সমষ্টিকে একত্রে একটি পাঠ হিসেবে বিবেচনা করতাম। আসলে এই তিনটি আয়াত সমষ্টি একই ধারায় তিনটি পাঠ মাত্র।

আলোচ্য পাঠটির (৯৫-১০৪) মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দারুল ইসলামে হিজরত, দারুল কুফুর ও দারুল হারবে অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে জান ও মাল দিয়ে সংগ্রামরত মুসলিম মোজাহেদদের কাতারে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং মক্কায় আপনজনদের সাহচর্যে ও নিজ সহায়-সম্পদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জীবন যাপনকে বিসর্জন দিতে উৎসাহ প্রদান করা।

এ আলোচনার শুরুতেই 'হিজরত থেকে বিরত মোমেনরা এবং জান ও মাল দিয়ে জেহাদকারী মোমেনরা সমান নয় .... ' এ কথা বলার উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই।

মদীনায় যারা জেহাদ থেকে বিরত থেকে ঘরে বসে থাকতো, তারা ঘরকুনো মোনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে অন্য রকম ভংগিতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পরবর্তী একটি আয়াতে মক্কার দারুল কুফুরে অবস্থানকারী এবং হিজরতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

অতপর আর একটি আয়াতে হিজরতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর আশ্বাসবাণী তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কষ্টকর হিজরতের ব্যাপারে মোমেনদের মন থেকে ভীতি দূর করে দেয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, হিজরতকারী যে মুহূর্তে নিজ বাড়ীঘর থেকে বের হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই আল্লাহ তায়ালা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জেহাদ ও হিজরত বিষয়ক আলোচনাই মূলত এখানে অব্যাহত রয়েছে, দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে মুসলমানদের পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন কেমন হওয়া চাই এবং দারুল ইসলামের (মদীনা) বাইরের হিজরত যারা করেনি এমন ধরণের মুসলমানসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে আচরণ কেমন হওয়া চাই, সে সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

এই পাঠটিতে ভীতিজনক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কিভাবে নামায পড়তে হয়-চাই তা জেহাদের ময়দানেই হোক অথবা হিজরতের পথেই হোক, তাও আলোচনা করা হয়েছে। এমন সংকটজনক অবস্থায় নামাযের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কতো কঠোর। অনুরূপভাবে এ পাঠে মদীনার মুসলিম সমাজের জন্যে তাদের শত্রুদের দিক থেকে যে ভয়ংকর বিপদ অপেক্ষা করছে, তার মোকাবেলার জন্যে তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

উপসংহারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ভংগিতে কঠিন বিপদ-মুসিবতের মধ্যেও মুসলমানদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এতে মোজাহেদ মুসলমানদের মর্মন্তুদ অবস্থা এবং যুদ্ধরত শত্রুদের বিপরীতমুখী অবস্থাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,

'কাফেরদের পিছু ধাওয়া করতে তোমরা দুর্বলতা দেখিও না। তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, তবে তারাও তো কষ্ট পায়। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে যা আশা করো, তা তারা আশা করে না।'

এই দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে দুই পক্ষের পথ আলাদা হয়ে গেছে। এতে সকল কষ্টই ক্ষুদ্র মনে হয়। কেননা, অন্যরাও তো কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু মোমেনদের মতো পুরস্কার পাবার আশা তাদের নেই।

মুসলিম সমাজ স্বীয় পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় আপন সদস্যদের মানবিক দুর্বলতা, অতীত জাহেলিয়াত এবং স্বভাবগত সমস্যাবলীর কারণে যে সব জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছিলো, আলোচ্য আয়াতগুলোতে সেই সব জটিলতার নিরসন করা হয়েছে। এই সকল জটিলতার মধ্য দিয়েও মুসলিম সমাজকে প্রাণান্তকর দুঃখকষ্ট সহ্য করে কঠিন দায়িত্ব পালন করে যেতে হচ্ছিলো এবং এই দুঃখ-কষ্ট ভোগের সাথে সাথে তাদের মধ্যে প্রবল উচ্চাভিলাস ও আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছিলো। এগুলোকে ইসলামের প্রাজ্ঞ বিধান মানবীয় স্বভাবের চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্টি করে দিচ্ছিলো, যাতে মুসলমানরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে এই সব বিষয়েই প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।

এ দু'টি আয়াত মুসলিম সমাজ ও তার আশপাশের একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। মুসলিম সমাজের কিছু ব্যক্তি জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিলো, তাদের ব্যাপারে এ আয়াত কয়টিতে আলোচনা করা হয়েছে। সহায়-সম্পদ রক্ষার নিমিত্তে যারা হিজরত করা থেকে বিরত ছিলো তারাও এদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মোশরেকরা কোনো মুসলমানকে নিজের সহায়-সম্পদের বিন্দুবিসর্গও নিয়ে হিজরত করতে দিতো না। যারা হিজরতের কষ্ট ও ঝুঁকি বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় বলে হিজরত করতে চাইতো না, তারাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। মোশরেকরা মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধা দিতো। অনেক সময় হিজরত করতে ইচ্ছুক মুসলমানদেরকে তারা আটক করতো ও নির্যাতন করতো অথবা হিজরত করার ইচ্ছা জানতে পারলে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতো। মোটকথা, এ আয়াত দুটিতে হিজরতে অনিচ্ছুক লোকদেরকেই লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হয়েছে বলে আমার ধারণা। তবে মদীনায় বসবাসকারী জান ও মাল দিয়ে জেহাদে অনিচ্ছুক লোকদেরকে লক্ষ্য করেও এ আয়াত দুটি নাযিল হয়ে থাকতে পারে। তবে ইতিপূর্বে আলোচিত সেই সব মোনাফেক এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা জেহাদে যেতে নিজেরাও গড়িমসি করতো এবং অন্যদেরকেও নিরুৎসাহিত করতো। আবার এমনও অসম্ভব নয় যে, এ দুটি আয়াতের আলোচ্য বিষয় মক্কার হিজরতবিমুখ ও মদীনার জেহাদ বিমুখ-এই উভয় গোষ্ঠীই।

আল্লাহর কাছে মোজাহেদের মর্যাদা

এ দুটি আয়াত উল্লেখিত বিশেষ পরিস্থিতি প্রসংগে নাযিল হলেও কোরআনের গৃহীত বাচনভংগি একটি সাধারণ মূলনীতিকে তুলে ধরেছে, যা স্থান ও কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে মূলনীতি এই যে, যারা কোনো সমস্যা ছাড়াজান ও মাল দিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করে না, তারা জান ও মাল দিয়ে জেহাদকারীদের সমকক্ষ হতে পারে না। এটি একটি সাধারণ মূলনীতি। কথাটাকে এখানে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে জান ও মাল দিয়ে জেহাদকারীদের মর্যাদার স্তর অধিক দান করেছেন।'

এই স্তরের বর্ণনা প্রসংগে রসূল (স.) বলেছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথে জেহাদকারীদের মর্যাদার জন্যে বেহেশতে এক একটি স্তর নির্ধারণ করে রেখেছেন। এর প্রতি দুটি স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর সমান ব্যবধান বিরাজমান রয়েছে।'

রসূল (স.) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি বর্শা নিক্ষেপ করলো, তার জন্যে সওয়ারের একটি স্তর নির্ধারিত হলো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! এই স্তরটি কি রকম? রসূল (স.) বললেন, 'শোনা, এটা তোমার মায়ের ঘরের দরজার কপাট নয়। দুই স্তরের মাঝে একশ বছরের দূরত্ব বিরাজমান রয়েছে।'

রসূল (স.) এখানে যে দূরত্বের বিবরণ দিয়েছেন, আমরা এ যুগে তা আরো ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম বলে মনে হয়। কেননা, বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের দূরত্ব সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন রকমের ধারণা পেয়েছি। এমনকি গ্রহ থেকে একটি নক্ষত্রে আলো পৌঁছুতে শত শত আলোকবর্ষ লেগে যায়। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে যা শুনতেন, ঈমানের দাবীতে তাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের দূরত্ব সম্পর্কে আমরা যে সব বিস্ময়কর তথ্য লাভ করেছি তার আলোকে আমরা হয়তো ঈমানের দাবী ছাড়াও আরো বেশী রসূল (স.)-এর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি।

মোমেনদের মধ্যে যারা ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে ঘরে বসে থাকে তাদের মধ্যে এবং জান মাল দিয়ে জেহাদকারীদের মর্যাদার স্তরভেদ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, তিনি তাদের সকলের জন্যেই উন্নত মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

'সকলের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা উন্নত মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

ঈমানের দাবীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের তারতম্য অনুসারে মর্যাদার তারতম্য থাকলেও সর্বাবস্থায় ঈমানের স্বতন্ত্র মুল্য ও গুরুত্ব থাকবেই। এরপর জান ও মাল দিয়ে জেহাদ যে যতো বেশী করবে, তার মর্যাদা ততো বাড়বে। মোমেন মাত্রের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা উন্নত মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই মন্তব্য দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে যে ঘরে বসে থাকা লোকদের কথা বলা হয়েছে, তারা পূর্বে আলোচিত গড়িমসিকারী মোনাফেক নয় বরং তারা মুসলমান সমাজেরই একটি সৎ ও নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী, কিন্তু তাদের মধ্যে জেহাদী বলিষ্ঠতার ঘাটতি ছিলো। কোরআন তাদের এই ঘাটতি পূরণে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির আশা সব সময়ই বিদ্যমান রয়েছে।

এই স্বতন্ত্র মন্তব্যটির পর পুনরায় মোজাহেদদের বিপুল মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর জেহাদকারীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, বিপুল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুটি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

মোজাহেদদের এই বাড়তি মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে দুটো জিনিস জানা যায়,

প্রথমত কোরআন মুসলিম সমাজে বিদ্যমান একটি বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেছে ও তার প্রতিকারের চেষ্টা চালিয়েছে। এ দ্বারা আমরা মানব মনের ও মানব সমাজের স্বভাব প্রকৃতি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে ঈমান ও প্রশিক্ষণে যত অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন–তার দুর্বলতা, দুনিয়ার মোহ, সংকীর্ণতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার অভাবের প্রতিকারের জন্যে সর্বদা চিকিৎসা চালু থাকা আবশ্যক। বিশেষত জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করতে যে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহর পথে যে নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রয়োজন, তার জন্যে মুসলমানদেরকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। এ কথাও বুঝা যায় যে, মুসলিম সমাজে বা ব্যক্তিতে এই সব মানবীয় বৈশিষ্ট্য তথা লোভ, সংকীর্ণতা, পাশ্চাদমুখিতা ও উদ্যমহীনতা প্রকাশ পাওয়া কোনো হতাশাব্যাঞ্জক ব্যাপার নয়। মোমেনদের মধ্যে যতোক্ষণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা,

আনুগত্য, ইসলামী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বহাল থাকবে, ততক্ষণ এসব ত্রুটির জন্যে তাদের প্রতি একেবারে হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে এর অর্থ এ নয় যে, এ সব দুর্বলতা ও ত্রুটিকে বহাল থাকার সুযোগ দিতে হবে, কিংবা তাকে 'বাস্তবতা' হিসাবে মেনে নিতে হবে। বরং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের চরিত্রের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন এবং এইসব ত্রুটি থেকে তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাতে হবে, যেমন কোরআনের এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর সযত্ন প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দৃষ্টিতে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করার গুরুত্ব অত্যধিক এবং এটি ইসলামের একটি মৌলিক ও স্থায়ী উপাদান। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই বিধান, সাধারণ মানুষ ও ইসলাম বিরোধীদের সার্বক্ষণিক স্বভাব সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত।

ইসলাম ও জেহাদ দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়

ইসলাম ও জেহাদ দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়

জেহাদ তৎকালীন সমাজের কোনো সাময়িক সমস্যা ছিলো না। এটা ইসলামী কাফেলার চিরস্থায়ী সংগী। কোনো কোনো নিষ্ঠাবান লেখকের মতানুসার ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের যুগে আবির্ভূত বলে তার প্রভাব বিরাজমান সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদের এই ধারণাটি গ্রহণ করে নিয়েছে যে, শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে মুসলমানদের একটি কার্যকর সামরিক প্রাধান্য ও আধিপত্য প্রয়োজন, কিন্তু জেহাদ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

এসব বক্তব্য থেকে অন্তত এতোটুকু বুঝা যায় যে, যারা এ সব ধারণা ব্যক্ত করেছে, তারা ইসলামের প্রকৃত ও মৌলিক স্বভাব খুব কমই আত্মস্থ ও হৃদয়ংগম করতে পেরেছে।

জেহাদ যদি মুসলমানদের জীবনে নিছক একটি সামরিক ব্যাপার হতো, তাহলে আল্লাহর কেতাবে ও রসূল (স.)-এর সুন্নাহ হতে তা এতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতো না, আর তাহলে রসূল (স.) কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মুসলমানদের জন্যে জেহাদ প্রযোজ্য– এ কথাটা বলতেন না,

'যে ব্যক্তি কোনো জেহাদ না করে এবং জেহাদের কোনো বাসনা হৃদয় পোষণ না করে মারা যায়, সে মোনাফেকীর একটি স্তরে অবস্থানকারী হিসাবে মারা যায়।' (মাসাবীহুস্ সুন্নাহতে উদ্ধৃত সহীহ হাদীস)

এ কথা সত্য যে, কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে কোনো কোনো মোজাহেদকে রসূল (স.) তাদের বিশেষ পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে জেহাদ থেকে ফেরত পাঠিয়ে পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দিয়েছেন। তবে এটা নিছক ব্যক্তিগত অবস্থা, এ দ্বারা সাধারণ মূলনীতি ক্ষুণ্ন হয় না। এক ব্যক্তির কারণে বিপুল সংখ্যক মোজাহেদের অবস্থা পাল্টে যেতে পারে না। সম্ভবত রসূল (স.) তাঁর অভ্যাস মতো প্রত্যেক মোজাহেদের ব্যক্তিগত অবস্থা জানতেন বলে একটি বিশেষ হাদীসে জনৈক সাহাবীকে জেহাদে যাওয়ার পরিবর্তে পিতামাতার সেবায় নিয়োজিত থাকতে বলেছিলেন। কেননা, তিনি সেই সাহাবীর পিতামাতা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর রাখতেন।

সুতরাং কারো এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, জেহাদ শুধু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জারীকৃত একটি সাময়িক নির্দেশ ছিলো, এখন সে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে বলে তার এখন আর দরকার নেই।

ইসলামের জেহাদের বিধানের এ উদ্দেশ্য নয় যে, মুসলমানরা সর্বদা তরবারি দেখিয়ে চলতে থাকবে এবং মানুষের মাথা কাটতে থাকবে। মানব জীবনের বাস্তবতা এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতিই এই দাবী করে যে, মুসলমানরা যেন সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।

আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, ইসলাম এমন একটা জিনিস, যা শাসক ও রাজা বাদশাহ আমীর ওমারাদের পছন্দনীয় নয়। এসব লেবাসে যারা ক্ষমতাসীন তারা এর দাওয়াতকে প্রতিহত করতে চাইবে। কেননা ইসলাম তাদের জীবন পদ্ধতির বিপরীত। শুধু সেই কালেই নয় বরং আজ, আগামী কাল এবং সর্বকালেই এ কথা সত্য।

আল্লাহ তায়ালা এ কথাও জানতেন যে, অপশক্তি ও বাতিল শক্তি আগ্রাসী হয়ে আছে এবং তার পক্ষে ইনসাফ করা অসম্ভব। সে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণকে কখনো ফলে ফুলে সুশোভিত ও বিকশিত হতে দিতে পারে না। সত্য ও কল্যাণকে শান্তির পরিবেশে বাস করতে দিলে তা বাড়ে। সত্য ও ন্যায়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ তো দূরের কথা, তার অস্তিত্বই বাতিল ও অপশক্তির জন্যে হুমকি স্বরূপ। এ কারণেই অপশক্তি বিনা উস্কানিতেই আগ্রাসী আক্রমন চালানোর প্রবণতা রাখে। সত্যকে গায়ের জোরে কণ্ঠরোধ করা ও হত্যা করা ছাড়া সে আত্মরক্ষার আর কোনো পথ খুঁজে পায় না।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, এটা কোনো সাময়িক বিষয় নয়, চিরস্থায়ী ও স্বভাবগত ব্যাপার।

এ কারণেই জেহাদ ছাড়া উপায় নেই। সর্বাবস্থায়ই তা আবশ্যক। প্রথমে বিবেকের মধ্যে তার প্রেরণা জাগাতে হবে। অতপর বাস্তব জগতে তার স্ফুরণ ঘটাতে হবে। সশস্ত্র অপশক্তির মোকাবেলায় ন্যায় ও সত্যকে সশস্ত্র হতেই হবে। সংখ্যাশক্তির বলে বলীয়ান বাতিল শক্তিকে সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত সশস্ত্র 'সত্য' দিয়ে রুখতে হবে। নচেত ইসলামের পরিণতি দাঁড়াবে আত্মহত্যা অথবা এমন অবমাননাকর অস্তিত্ব, যা মোমেনদের জন্যে শোভনীয় নয়।

আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে জান ও মালের কোরবানী চেয়েছেন, সেই কোরবানীর জন্যে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। এরপর তাদের পরিণতি হয় বিজয়, নচেত শাহাদাত। আল্লাহ তায়ালা এই দুটো উত্তম বিকল্পই তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষ মাত্রই তার আয়ুস্কাল শেষ হলে মারা যাবে। কেবলমাত্র শহীদরাই উৎকৃষ্টতম শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করবে।

সুতরাং এটা ইসলামের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। এটা তার সেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

মুসলমানদের চেতনায় এ সত্য দেদীপ্যমান থাকা চাই। কোনো অবস্থায়ই তাদের জেহাদ থেকে গাফেল হয়ে গেলে। তবে আল্লাহ তায়ালা সর্বদা একে 'জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' বলেছেন। অর্থাৎ জেহাদ হতে হবে আল্লাহর পথে এবং আল্লাহরই পতাকার তলে। এই জেহাদেই মৃতরা 'শহীদ' নামে আখ্যায়িত হয়। এই শহীদরাই মহান আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের দ্বারা সসম্মানে সম্বর্ধিত হয়ে থাকে।

কোরআনে হিজরতের প্রসংগ

অতপর আলোচনা করা হয় ঘরকুনে একটা দল সম্পর্কে। এরা হিজরত না করে দারুল কুফুরেই অবস্থান করে এবং সেখানেই বসে থাকে। ধন সম্পদ আর সুযোগ সুবিধার মোহ তাদেরকে আটকে রাখে, অথবা তাদেরকে নিজেদের দুর্বলতা হিজরতের কষ্টক্লেশ আর পথ-ঘাটের অসুবিধার মুখোমুখি থেকে বিরত রাখে। অথচ যদি তারা ইচ্ছা করতো এবং কোরবানী আর ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্যত হতো, তাহলে হিজরত করতে তারা সক্ষম হতো। এ হায়াত একদিন এমনিই ফুরিয়ে যাবে আর তাদের প্রাণ ছিনিয়ে নিতে ফেরেশতারা আগমন করে। ফেরেশতারা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের চিত্র অংকন করেন। সে চিত্র এক বীভৎস বিকৃত চিত্র! তাদের অবস্থানের যে চিত্র অংকন করা হয়, তা এ রকম,

যারা নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণকালে ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেমন অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখন্ডে আমরা ছিলাম, দুর্বল অসহায়। ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের নিবাস হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা হচ্ছে নিতান্ত নিকৃষ্ট স্থান। তবে পুরুষ, নারী আর শিশুদের মধ্যে যারা 'মোস্তাদআফীন'-দুর্বল অসহায় যারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও যাদের জানা নেই তাদের কথা আলাদা। অতএব আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তো হচ্ছেন গাফুরুর রাহীম-অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু।

রসূল (স.)-এর হিজরত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জাযিয়াতুল আরব তথা মক্কায় যে বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছিলো, আলোচ্য আয়াতে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে। সেখানে এমন কিছু মুসলমান ছিলো, যারা হিজরত করেনি, ধন সম্পদ আর স্বার্থ সুবিধাই তাদেরকে হিজরত থেকে বিরত রাখে। এমতাবস্থায় কোনো সম্পদ সংগে নিয়ে হিজরত করতে মোশরেকরা তাদেরকে দেয়নি। অথবা হিজরতের কষ্ট ক্লেশের ভয় তাদেরকে হিজরত থেকে বিরত রেখেছিলো, আটকে রেখেছিলো। কেননা হিজরত করতে চাইলে ধন-সম্পদ টাকা পয়সা নিয়ে যেতে কাফেররা বাধা দিতো এবং পথ রোধ করে দাঁড়াতো। আর মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা দলও ছিলো, যারা সত্যিকার অর্থেই অক্ষম অসহায় এবং দুর্বল ছিলো যাদেরকে হিজরত করতে দেয়নি। এরা ছিলো বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। পলায়নের কোনো উপায় বের করার সাধ্য তাদের ছিলো না, আর হিজরতের কোনো পথও তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না।

হিজরতকালে আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সফরসংগীর সাথী হতে অক্ষম হওয়ার পর মক্কায় যেসব মুসলমানরা অবশিষ্ট ছিলো, মোশরেকরা তাদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। এমনকি তারা রসূলে খোদা এবং তাঁর সফরসংগীকেও হিজরত থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালায়। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বদর নামক স্থানে কোরায়শদের বাণিজ্য বহরে ইসলামী রাষ্ট্রের বাধা দান এবং মুসলমানদের চরম বিজয় লাভের পরও মোশরেকদের নির্যাতন অব্যাহত থাকে, মক্কার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর তারা নানা ধরনের নির্যাতন চালায়, তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। চরম রোষ আর আক্রোশে তারা মুসলমানদের ওপর যুলুম নির্যাতন করতে চায়। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে কার্যতই ফেতনা আর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরুপায় হয়ে কৌশলে কুফুরী প্রকাশ করতেও বাধ্য হয়। আর এ কৌশল অবলম্বন করা তখন তাদের জন্যে ছিলো জায়েয, বৈধ শরীয়ত সম্মত। কারণ, যতো চেষ্টাই তারা করুক না কেন, তখন এমন রাষ্ট্র ছিলো না, ছিলো না এমন কোনো অঞ্চল যেখানে তারা হিজরত করতে পারে-পারে সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর দারুল ইসলাম অস্তিত্ব লাভ করার পর নির্যাতনের কাছে নতি স্বীকার করা, কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং হিজরত আর ইসলাম প্রকাশ করার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার পর এবং বিশেষ করে দারুল ইসলামে জীবন যাপন করে, এমন করার কোনো অনুমতি নেই তখন এমনটি করলে এটা গ্রহণযোগ্যও হবে না।

যখন হিজরত না করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়

এ ধরনের পরিস্থিতিতেই বর্তমান আয়াতগুলো নাযিল হয়। হিজরত না করে যারা ধন সম্পদ আর স্বার্থ সুবিধা হেফাযত করার উদ্দেশ্যে বসেছিলো, অথবা হিজরতের কষ্ট-ক্লেশ আর পথের ঝক্কি ঝামেলার ভয়ে ঘর থেকে বের করা হয়নি এবং এ অবস্থায়ই তাদের মৃত্যুর দিন ক্ষণ ঘনিয়ে

আসে। তারা নিজেদের জন্যে দারুল ইসলামের জীবনকে হারাম করে নিয়েছিলো এবং নিজেদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছিলো অথচ দারুল ইসলামের জীবন হচ্ছে মহান, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, মর্যাদা আর স্বাধীনতার জীবন। তারা নিজেদের ওপর অবধারিত করে নিয়েছিলো দারুল কুফুরের জীবনকে, যে জীবন হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা অবমাননা, দুর্বলতা আর কষ্টের জীবন। কোরআন মজীদ এদেরকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে জাহান্নামের, যা নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তনস্থান। কোরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা সেখানে কার্যত দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনায় পতিত হয়েছিলো, আর এ ফেতনায় পতিত হয়ে বাস্তবে তারা দ্বীনই ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু কোরআন মজীদ এমনভাবে চিত্র অংকন করে, এমন এক ভংগিতে দৃশ্যটি উপস্থাপন করে যা কোরআনের নিজস্ব ষ্টাইল। এর ফলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক জীবন্ত দৃশ্য, বাস্তব চিত্র, যা মনকে নাড়া দেয়, উদ্বেলিত আর সংগ্রামমুখর করে তোলে,

'যারা নিজেরা নিজের ওপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণকালে ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেমন অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখন্ডে আমরা ছিলাম 'মোস্তাদআফীন'–দুর্বল অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে?

কোরআন মজীদ মূলত মানব মনের চিকিৎসা করে। কল্যাণ, ভদ্রতা আর মর্যাদার উপাদানকে জাগ্রত আর উদ্দীপ্ত করে তার লক্ষ্যবস্তুসমূহকে নির্ণয় করতে চায়। এ কারণেই কোরআন এভাবে এক এক করে দৃশ্য উপস্থাপন করে। কোরআন বাস্তবতার ছবি আঁকে এবং মানব মনের চিকিৎসায় বাস্তবতাকে ভালোভাবে কাজে লাগায়, তাকে ব্যবহার করে। বাস্তবতার দৃশ্য উপস্থাপন এমনিতেই এমন, যাতে মানব মন হয়ে ওঠে প্রকম্পিত, সে দৃশ্যে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে কল্পনা করতেও সে ভয় পায়। তাছাড়া এসব দৃশ্যে ফেরেশতাদের প্রকাশ মনকে আরো বেশী প্রকম্পিত ভীত বিহ্বল আর অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে।

এই ঘরে বসে থাকা লোকেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের প্রাণ হরণের জন্যে ফেরেশতা হাযির হলেন। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা যুলুম অবিচারকারী, নিজেদের অন্তরকে নাড়া দেয়া ও তাকে প্রকম্পিত করে তোলার জন্যে কেবল এটুকুই যথেষ্ট। সে চিন্তা করছে, এসময় ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছে তার জান কবয করার জন্যে এমন অবস্থায়–যখন সে যুলুম করছে নিজের নফসের ওপর, নিজের সংগে ইনসাফ করার কোনো সুযোগও নেই তার হাতে। এটাই হচ্ছে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। কিন্তু ফেরেশতারা চুপ করে থেকে নীরবে নিঃশব্দে এ যালেমদের প্রাণ হরণ করবে না, বরং তাঁরা কথা তোলেন অতীত সম্পর্কে, তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কী কাজে তারা দিবা-রজনী নিশেষ করেছিলে? তারা যখন পৃথিবীতে ছিলো, তখন কী ছিলো তাদের কর্ম, কী ছিলো ব্যস্ততা? তারা যে অবস্থায় ছিলো তা ছিলো কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি, কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস, যেন এ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজই ছিলো না। যাদের কাছে ফেরেশতারা হাযির হয়েছেন সে সব লোকেরা জবাব দেবে। তখন তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত, তারা অস্বীকার করে জবাব দেবে, যে জবাবের সবটাই লাঞ্ছনা, তারা সে জবাবকে মনে করবে বুঝি ক্ষমা ভিক্ষা, অথচ তাতে রয়েছে লাঞ্ছনা। এরশাদ হচ্ছে,

'আমরা ছিলাম দুর্বল অসহায়।'

তাদের এ জবাব আর প্রতিবাদের মধ্যেও নিহিত রয়েছে তুচ্ছতা, যা তাদেরকে নিয়ে যায় আরো তুচ্ছতার দিকে। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে এ অবস্থা হবে, কেউ তা চায় না, বরং সকলেই

এমন অবস্থা আর ভূমিকাকে অপছন্দ করে। অথচ গোটা জীবনে এটাই ছিলো তার ভূমিকা, এমনটিই ছিলো তার অবস্থান। কারণ, ফেরেশতারা তো এসব দুর্বল ও অক্ষমদের ছাড়বে না, যারা নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে, অবিচার করেছে; বরং তাঁরা তাদের জবাব দেবেন, সুযোগ থাকতেও হিজরত না করার ভয়াবহ পরিণতি তাদের জানিয়ে দেবে।

ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে? লাঞ্ছনা, অবমাননা, দুর্বলতা আর ঈমানের ব্যাপারে ফেতনায় পতিত হওয়ার কথা তারা এখানে বলছে। যে ওযর আপত্তি তারা পেশ করছে, তা সত্যিকার ওযর আপত্তি নয়, সেখানে ব্যাপার ছিলো আসলে ভিন্ন, ছিলো অন্য কিছু। আসল ব্যাপার ছিলো অর্থ সম্পদ আর স্বার্থ-সুবিধার লোভ ও জীবনের মায়া। এসবই ধরে রেখেছিলো তাদেরকে দারুল কুফুরে। অথচ, তাদের সামনে দারুল ইসলামও ছিলো। সংকীর্ণতা তাদেরকে আটকে রেখেছিলো, অথচ আল্লাহর দুনিয়া ছিলো বিশাল বিস্তীর্ণ। দারুল ইসলামে হিজরত করে চলে যাওয়ার সামর্থও তাদের ছিলো। যদিও এ পথে বিপদ আর কোরবানী তথা ত্যাগ স্বীকারের কিছু ঝুঁকি ছিলো। অবশেষে উপস্থাপন করা হয় এখানে কার্যকর দৃশ্য, যা চূড়ান্ত ভীতি আর আতংক স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা কতোই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। এরপর ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে তাদেরকে, যাদের দারুল কুফুরে অবস্থান না করে উপায় ছিলো না এবং দারুল ইসলামের জীবন থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাদের সত্যিই কোনো উপায় ছিলো না। এরা হচ্ছে বৃদ্ধ-দুর্বল নারী এবং শিশু। এদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা আর দয়ার আশার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কারণ, অক্ষমতা আর ওযর আপত্তি তাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। এরশাদ হচ্ছে,

'কিন্তু নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা মোস্তাদআফীন-যারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও যাদের জানা নেই তাদের কথা ভিন্ন। আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন, অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা দয়াবান।'

শেষ যমানা পর্যন্তই এ হুকুম বহাল থাকবে, ইতিহাসের বিশেষ ধারায় এবং বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে সাধারণ বিধি হিসাবে এ নিয়ম বহাল থাকবে। যে কোনো দেশে যে কোনো ভূমিতে যে কোনো মুসলমান দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন ফেতনায়, এমন পরীক্ষায় পতিত হবে এবং ধন-সম্পদ আর সুযোগ সুবিধা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক তাকে হিজরত থেকে নিবৃত্ত করবে অথবা হিজরতের কষ্টক্লেশ আর ঝক্কি ঝামেলা হিজরতের পথে বাঁধ সাধবে, তার জন্যে এই একই হুকুম থাকবে। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কোনো ভূখন্ডে যদি দারুল ইসলাম থাকে, তাহলে সেখানে হিজরত করে শান্তিতে দ্বীন পালন করা, আকীদা বিশ্বাসকে প্রকাশ এবং প্রচার করতে পারা, শান্তিতে এবাদাত পালন করতে চেষ্টা করা, আল্লাহর শরীয়তের ছায়াতলে ইসলামী জীবন যাপন করতে পারা, প্রতিটি মুসলমানের অধিকার এবং এটি তার ওপর ফরয। জীবনের এই উন্নত মর্যাদা ভোগ করতে-সেখানে হিজরত করে তাকে অবশ্যই যেতে হবে।

অবশ্য কোরআন মাজীদের বর্ণনাভংগি হামেশাই মানব মনের লালন করে, যে মানব মন হিজরতের কষ্ট-ক্লেশের, ঝক্কি ঝামেলার সম্মুখীন হয় এবং ভয় ভীতিতে শংকিত হয়, তার চিকিৎসা করে। এসব ব্যাপারে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মানব মনের চিকিৎসার এমন এক দৃশ্য অংকন করেছে, যে দৃশ্য মনকে যুগপৎ ভীত এবং সংকুচিত করে তোলে। কোরআন এমনভাবে মনের চিকিৎসা করে যে তাতে শান্তি-স্বস্তির কার্যকারণ বিস্তৃত হয়। মোহাজের তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হোক, অথবা আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকালে পথিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটুক। আল্লাহর রাস্তায়

হিজরত করার উদ্দেশ্যে সে গৃহ ত্যাগ করলে আল্লাহ তায়ালা তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন এবং তিনি তাকে স্বস্তি আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। সুতরাং দুর্গম পথ আর দীর্ঘ রাস্তা তাকে সংকুচিত করতে পারে না, পারে না তাকে ভীত বিহ্বল করতে, এরশাদ হচ্ছে,

মোহাজেরদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা

'আর যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে সে লাভ করবে অনেক মর্যাদাপূর্ণ স্থান .... আল্লাহ তায়ালা তো অতিশয় ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু।'

এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বিধানটি মানব মনের অনেক ভয় ভীতির প্রতিকার করে। মানব মন হিজরতকালে স্বাভাবিকভাবেই ভয় ভীতির সম্মুখীন হয়। সে সময়ে মক্কায় যে অবস্থা বিরাজমান ছিলো, ঠিক সেই অবস্থা অথবা অনুরূপ অবস্থা বারবার দেখা দিতে পারে। কোরআন মাজীদ স্পষ্টভাবে মনের সমস্যার প্রতিকার প্রতিবিধান করে। ভয়ের কোনো বিষয়কেই মনের আশপাশে গোপন রাখে না, বিপদের কোনো বিষয়ই তার কাছে প্রচ্ছন্ন রাখে না। এর মধ্যে মৃত্যুর আশংকাও রয়েছে। কিন্তু কোরআন মনকে ভিন্ন এক স্বস্তিতে ভরে তোলে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর যিম্মাদারী। কোরআন প্রথমেই হিজরতকে আল্লাহর রাস্তায় সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলামে কেবল এ হিজরতই গ্রহণযোগ্য। সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে কষ্ট-ক্লেশ থেকে উদ্ধার লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত অথবা মনষ্কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হিজরত কিংবা জীবনের অন্য কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্যে হিজরত ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে, সে স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ পাবে, পৃথিবী তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে দেখা দেবে না, মুক্তি আর জীবন জীবকার উপায় উপকরণও তাকে হারাতে হবে না।

'আর যে কেউ হিজরত করবে আল্লাহর রাস্তায়, সে পৃথিবীতে পর্যাপ্ত স্থান আর প্রচুর প্রশস্ততা পাবে।'

অবশ্য মনের দুর্বলতা আর লোভ লালসার ফলে তার কাছে এমন ধারণা জাগে যে, জীবন জীবিকার উপকরণ কোনো একটা দেশে, কোনো একটা স্থানেই বুঝি সীমাবদ্ধ। তার কাছে মনে হবে যে, এসব উপকরণ এই অবস্থার সংগেই সম্পৃক্ত, যা হারালে জীবনের কোনো উপায়ই থাকবে না তার, থাকবে না বেঁচে থাকার কোনো পথ। জীবন জীবিকা আর মুক্তির আসল কারণ আর বাস্তব তত্ত্ব সম্পর্কে এ মিথ্যা ধারণাই তার মনকে এ অপমান মেনে নিতে বাধ্য করে, দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনা আর পরীক্ষা তাকে চুপ করিয়ে রাখে এবং তাকে এক নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থলে নিক্ষেপ করে আর নিজেদের ওপর এই যুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে। যে কেউ হিজরত করে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে বাস্তব প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহর রাজ্যে সে অনেক স্থান আর অনেক প্রশস্ততা-সচ্ছলতা পাবে। সর্বত্র সে আল্লাহকে কাছে পাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দেবেন জীবন-জীবিকা আর মুক্তি।

কিন্তু এই সফরকালে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকালেই তার মৃতু ঘনিয়ে আসতে পারে। সূরার আলোচনাধারায় ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর সংগে বাহ্যিক কার্যকারণের কোনো সম্পর্ক নেই। তা তো একটা অবধারিত নির্ণীত বিষয়, যখন নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসবে, তখনই তার মৃত্যু হবে। সে নিজ ঘরে থাকুক, বা হিজরত করা অবস্থায় থাকুক, তাতে কিছুই যায়-আসে না। কারণ, কখনো মৃত্যু আগ-পর হয় না। অবশ্য মানব মনে রয়েছে তার নিজস্ব চিন্তাধারা, রয়েছে বাহ্যিক কার্যকারণ আর উপায় উপকরণ সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতি ও তার প্রতিক্রিয়া। কোরআনী জীবনধারা এসব কিছুর প্রতিও লক্ষ্য রাখে এবং এ সবের প্রতিবিধানও

করে। তাই তো তাকে আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের গ্যারান্টি দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার নিমিত্ত ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্ত থেকে এটা অবধারিত হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে কেউ নিজ ঘর থেকে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতের লক্ষ্যে বের হবে অতপর সে এ পথেই মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব অবধারিত হয়ে যাবে।'

সে সম্পূর্ণ সাওয়াব পাবে, হিজরতের সাওয়াব, সফরের সাওয়াব, দারুল ইসলামে পৌঁছার সাওয়াব এবং দারুল ইসলামে জীবন যাপনের সাওয়াব। আল্লাহর এই গ্যারান্টির পর আর কী গ্যারান্টির প্রয়োজন হতে পারে? এই সাওয়াবের গ্যারান্টির সংগে সংগে গুনাহ মাফ এবং হিসাব-কেতাব রহমতের প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। আর এটা তো হচ্ছে সাওয়াবের চেয়েও বড়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা মহা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'

সন্দেহ নেই যে, এটা হচ্ছে বিশাল লাভজনক গুণ। আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর প্রতি হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া মোহাজের তার পুরাপুরি মূল্য পেয়ে যাবে, আর মৃত্যু তো মৃত্যুই। মৃত্যুর ওয়াদার কোনো খেলাফ হবে না, বিলম্বিতও হবে না। ঘরে অবস্থান বা হিজরতের সাথে মত্যুর কোনো সম্পর্কই নেই। হিজরত না করে কেউ যদি ঘরে বসে থাকে, তাহলেও প্রতিশ্রুত সময় মতোই তার মৃত্যু আসবে। তখন সে লাভজনক গুণ থেকে বঞ্চিত হবে। তখন তার ভাগ্যে সাওয়াব জুটবে না, জুটবে না মাগফেরাত আর রহমতের কিছুই বরং ফেরেশতা তখন তার প্রাণ হরণ করবে এমন এক অবস্থায়, যখন সে থাকবে নিজের প্রতি অত্যাচারী। এ দু'টি অবস্থা আর গুণের মধ্যে কতো ব্যবধান, কতো ব্যবধান এ দু'প্রত্যাবর্তনস্থলের মধ্যে!

এ আয়াতগুলো থেকে যে শিক্ষা আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, পরবর্তী আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে তার সারনির্যাস পেশ করতে চাই। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ত্যাগ করে এবং মুসলিম মোজাহেদ বাহিনীর সারিতে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ঘরে বসে থাকা ইসলামের কাছে নিন্দনীয়, কোনো ক্রমেই এটা পছন্দনীয় কাজ নয়। অবশ্য সংগত ওযরের কারণে আল্লাহ তায়ালা যাদের ওযর কবুল করেছেন এবং হিজরত করতে যারা অক্ষম, যারা হিজরত করার কোনো উপায় বের করতে পারে না এবং পথও যাদের জানা নেই, তারা ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, ইসলামী জীবনধারা আর এ জীবনধারার বাস্তব দাবীতে 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহর' স্থান ও গুরুত্ব অনেক গভীরে নিহিত। ইসলামী শরীয়ত জেহাদকে ইসলামের অন্যতম রোকন বলে গন্য করে। তার কাছে এজন্যে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে এবং বাস্তবে এর মূল্য যে কতো বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। অবশ্য পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত–এ হাদীসে ইসলামের বুনিয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জেহাদের দায়িত্ব পালন, ইসলামী জীবন যাপনে জেহাদের গুরুত্ব ও মৌলিকতা এবং সকল দেশে সকল সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সময়ের দাবীর কথা বাদ দিলেও জেহাদ একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন। এসব কথা আমাদের মনে জেহাদের মৌলিকতা আর অভিনবত্বের তীব্র অনুভূতি আনে।

অনুরূপভাবে এ আয়াত আমাদের সামনে এই বাস্তব সত্যটাকেও উপস্থাপন করে যে, মানুষের মন তো মনই; কষ্ট-ক্লেশের সামনে তা দমে যায়, অথবা বিপদাপদের সামনে ভয় পায় এবং শক্ত প্রতিরোধের সামনে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। উত্তম যুগে এবং উত্তম সমাজ পরিবেশেও এমনটি হয়।

এ ধরনের অবস্থায় সেসব ব্যক্তিরা হতাশ হওয়ার চিকিৎসা আর প্রতিকারের কোনো পন্থা পেতে চায়। এমতাবস্থায় প্রতিকার আর প্রতিবিধানের উপায় হচ্ছে কোরআন মাজীদে বর্ণিত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সেসব মনকে চাংগা করা, উদ্দীপ্ত করে তোলা, তাতে জোশ আর জযবা সৃষ্টি করে পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে তোলা এবং একই সংগে মনে শান্তি ও স্থিতি স্থাপন করা।

সর্বশেষে আমাদের কাছে এ বক্তব্যগুলো যে সারবস্তু উপস্থাপন করে তা হচ্ছে এই যে, কোরআন মাজীদ কিভাবে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখী হয়, কিভাবে সে ইসলামী সমাজকে পরিচালিত করে এবং কিভাবে তাকে সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্যে, সংগ্রামের জন্যে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করে–আর এসব ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রটিই হচ্ছে মানুষের মন। মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। জাহেলী ধ্যান-ধারণা থেকে কিভাবে কোরআন মানব মনকে রক্ষা করে, কিভাবে আমাদের কোরআন মাজীদ অধ্যায়ন করা উচিত সর্বোপরি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আমরা কোরআন মজীদের সংগে কেমন আচরণ করবো। কোরআনের শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাবো তাও কোরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে।

'সালাতে খওফ'

অতপর আলোচনা এসেছে সালাতের ক্ষেত্রে মোজাহেদ ও মোহাজেরদেরকে দেয়া আল্লাহর বিশেষ ছাড় প্রসংগে। মোহাজের, জেহাদ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যারা বাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ অবকাশকে করেছেন মোবাহ তথা অনুমোদিত। অবকাশের এ সুযোগ সে সময়ের জন্যে, যখন তাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তাদেরকে বন্দী করবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে সমস্যায় ফেলে দেবে। এ যেন নামাযে 'কসর' করার অনুমতির মতো; তবে মোসাফেরের জন্যে নামায কসর করার যে অনুমতি রয়েছে, এটা ঠিক সে রকম অনুমতি নয়। মোসাফেরের জন্যে এ অনুমতি হচ্ছে অবাধ এবং মুক্ত। কাফেরদের ফেতনার আশংকা থাকুক আর না থাকুক, মোসাফের সফরেও নামায কসর করবে। মোহাজের আর মোজাহেদের জন্যে এটা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের কসর। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে, তখন নামাযে কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, যদি তোমরা আশংকা করো যে, কাফেররা তোমাদেরকে উতক্ত করবে, আর কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।'

পৃথিবীতে পরিভ্রমণকারীকে সব সময় আল্লাহর সংগে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। তার জন্যে এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সে যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য তার জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে তার জন্যে প্রস্তুতি আর অস্ত্রশস্ত্র অগ্রগণ্য, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক এ অভাব পূরণ করবে। পথে এ সবের প্রয়োজন হলে আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করবেন। আল্লাহর সংগে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে সালাত বা নামায। আর এ নামাযের মাধ্যমেই মুসলমানদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, বিপদাপদে সাহায্য কামনা করতে হবে। কোনো ভয়-ভীতি বা কষ্ট-ক্লেশ দেখা দিলে তাদের প্রতি বলা হয়েছে,

'তোমরা সাহায্য কামনা করো নামায আর সবরের মাধ্যমে।'

এ কারণে এখানে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন আল্লাহর সংগে সম্পর্কের তাদের খুব প্রয়োজন এবং সে যখন অস্থির, ব্যাকুল। ভীতবিহ্বল ভ্রমণারীর জন্যে আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরকে শান্তি-স্বস্তিতে ভরে তোলা কতোই না প্রয়োজনীয়, আর স্বদেশ ত্যাগ করে যাওয়া মোহাজেরের জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিরাপদ আশ্রয়ের

প্রয়োজন কতোই না তীব্র! পুরো নামায- আদায় করতে গেলে মোসাফেরের জন্যে তা কঠিন হতে পারে, আশপাশ থেকে কেউ আক্রমণ করলে তা থেকে আত্মরক্ষা করা তার জন্যে দুস্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে, অথবা তার ওপর দুশমনের দৃষ্টি পড়লে সে তাকে চিনে ফেলতে পারে কিংবা রুকু'-সেজদারত অবস্থায় দুশমন তাকে ধরেও ফেলতে পারে এ কারণে ফেতনাশংকা থাকলে মোসাফেরের জন্যে নামায 'কসর' করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এখানে আমরা 'কসর'-এর যে অর্থ গ্রহণ করেছি, ঠিক একই অর্থ গ্রহণ করেছেন ইমাম জাসসাস।(১) আর সে অর্থ হচ্ছে এই যে, এই 'কসর' অর্থ নামাযের রাকাত হ্রাস করা নয় যে; চার রাকাতের নামাযে দু'রাকাত আদায় করবে। এ অবকাশ রয়েছে মোসাফেরের জন্যে সাধারণভাবে। মোসাফেরের জন্যে ফেতনার আশংকার কোনো শর্ত নেই। বরং মোসাফেরের ক্ষেত্রে নামাযের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে পছন্দনীয়। রসূলে খোদা সমস্ত সফরে এ রকম কসরই করতেন। বিশুদ্ধ উক্তি মতে, মোসাফেরের জন্যে সফরে পুরো নামায আদায় করা জায়েয হবে না। সমস্ত মোসাফেরের জন্যে যে 'কসর'-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, এটা তার চেয়ে ভিন্ন এক নতুন অবকাশ। এ অবকাশটি ফেতনার আশংকাজনক অবস্থার জন্যে। এ 'কসর' হচ্ছে একেবারে নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের মাঝে। যেমন রুকু-সেজদা এবং তাশাহহুদের জন্যে বসা আর কোনো রকম নড়াচড়া ছাড়াই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং এ সময় মুসল্লী দাঁড়িয়ে বা সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে বা চলমান অবস্থায় নামায আদায় করবে এবং ইশারা-ইংগিতে রুকু-সেজদা আদায় করবে। এমনিভাবে ফেতনার আশংকার অবস্থায়ও মোসাফের তথা মোজাহেদ এবং মোহাজের আল্লাহর সংগে তার সম্পর্ক ত্যাগ করবে না। যুদ্ধের প্রথম অস্ত্রও ত্যাগ করবে না, বরং শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন করবে, কেননা 'নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

কাফেরদের ফেতনার ভয়ে ভীত সফরকারীদের নামায প্রসংগে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ের নামাযের বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম দিক এ ফেকহী বিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, কোরআন মাজীদের প্রতিবিম্বিত আল্লাহর জীবনধারার রহস্য আর তরবিয়ত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, সে-ই এই বিস্ময়কর পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, যে পরিবর্তন একেবারে হৃদয়ের দরজায় গিয়ে আঘাত করে। যুদ্ধক্ষেত্রের এ পরিবর্তন তার একটা অংশ মাত্র। কোরআনী বর্ণনাধারায় কেবল ভয়ের নামাযের হুকুম বর্ণনা করার জন্যে এখানে আয়াতের সন্নিবেশ ঘটানো হয়নি, বরং এখানে এ আয়াত সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে মুসলিম দলটিকে প্রস্তুত করার জন্যে, তাদের শিক্ষা দেয়া, তাদের মন-মানসকে গড়ে তোলা সবই বর্তমান আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাযের বিষয়; কিন্তু ঈমানের দিকটির কথা চিন্তা করলে এটাকে নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হবে। কারণ নামায হচ্ছে যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র; বরং নামাযই হচ্ছে যুদ্ধের একমাত্র অস্ত্র। সুতরাং এ অস্ত্রকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে এ অস্ত্রকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে, যাতে যুদ্ধের প্রকৃতি আর পরিবেশের সংগে তা খাপ খেতে পারে।

যে সব মহামানব কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী তাদের মন-মানস গঠন করেছেন, তাঁরা এ অস্ত্র দ্বারাই দুশমনদের মোকাবেলা করেছেন এ অস্ত্রকে তাঁরা অন্য সব অস্ত্রের উর্ধে স্থান দিতেন। এটা নিশ্চিত সত্য যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়েই তারা নিজেরাও সকলের উর্ধে স্থান পেয়েছেন। তাঁরা ঠিক তেমনি করেই আল্লাহকে

(১) আহকামুল কোরআন, দ্বিতীয় খন্ড, আল-বাদিয়্যা প্রেস সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০৭-৩০৮।

জানতেন, যেমন করে জানা উচিত। তাঁরা অনুভব করতেন যে, যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাদের সংগেই রয়েছেন। অনুরূপভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে, ঈমানের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁরা সকলের উর্ধে স্থান পেয়েছেন, যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্যে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সে উদ্দেশ্যও সফল করেছেন। এ সফলতা এ কারণেই তিনি দিয়েছেন যে, তারা বিশ্বাস করতো যে, তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সবকিছুর উর্ধে, সবকিছুর সেরা। তেমনিভাবে জগত এবং মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা আর দৃষ্টিভংগির স্বচ্ছতার জন্যে তাঁরা উর্ধে-স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। নবী প্রদর্শিত জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস থেকে তাদের সামাজিক নিজেদের জন্যে সংস্থা গড়ে উঠেছিলো। নামায হচ্ছে এসব কিছুর ভেদ-রহস্য, এসব কিছুর স্মারক। এ কারণে তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহে নামায ছিলো একটা অস্ত্র। বরং বলতে গেলে নামাযই ছিলো তাঁদের একমাত্র অস্ত্র!

যুদ্ধকালীন নামায

বর্তমান আয়াতে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে তা হচ্ছে দুশমনদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি। সেই সব দুশমনদের ব্যাপারে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্যে মোমেনদেরকে ওসীয়ত করা হয়েছে, যারা ক্ষণিকের তরে হলেও মোমেনদের অস্ত্রশস্ত্র আর উপায় উপকরণ থেকে বিমুখ হওয়ার এই সময়টির প্রতীক্ষায় রয়েছে। যাতে তারা মুসলমানদের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ ভীতিপ্রদর্শন এ আশ্বাসবাণী আর অন্তর দৃঢ় করণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদেরকে এমন এক জাতির মুখোমুখি হতে হবে, যাদের ওপর আল্লাহর লাঞ্ছনা অবধারিত হয়ে আছে, এরশাদ হচ্ছে,

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

ভয়-ভীতি ও তার অনুভূতি জাগ্রত করা আর মনকে আশ্বস্থ করে তোলা– এ দুয়ের মধ্যে এমন ভারসাম্য রক্ষা করা কেবল ইসলামী জীবন বিধানেরই একক বৈশিষ্ট্য। এ ভারসাম্য রক্ষা করা হয় চরমপন্থী চক্রান্তকারী জঘন্য দুশমনের মোকাবেলায়ও।

ভয়ের নামায কিভাবে আদায় করতে হবে, সে বিষয়ে ফেকাহ শাস্ত্রে নানা মত রয়েছে। ফকীহদের সকলেই এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে নানা মত পোষণ করেছেন। আমরা সেসব বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল সাধারণ বর্ণনায় মনোনিবেশ করবো। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে এবং নামাযে ইমামতি করবে.... ভাবে তারা তোমাদের সংগে এক রাকাত নামায আদায় করবে।' (ইমাম এখানে সালাম ফেরাবেন। কারণ, তার দু'রাকাত নামায আদায় সম্পন্ন হয়েছে)।

এ সময় প্রথম দল আসবে এবং তারা দ্বিতীয় রাকাত পুরা করবে, যা ইমামের সংগে আদায় করতে পারেনি এবং তারা সালাম ফেরাবে। এ সময় দ্বিতীয় দল হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দল এসে দ্বিতীয় রাকাত পুরা করবে, যারা আগে আদায় করতে পারেনি এবং তারা এবার সালাম ফেরাবে। এ সময় প্রথম দল হেফাযতের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবে। এভাবে রসূল (স.)-এর ইমামতিতে উভয় দলের নামায আদায় করা হবে। এভাবে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে খলীফা ও আমীরুল মোমেনীনদের সংগে তারা নামায আদায় করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারা যেন নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সংগে রাখে, আত্মরক্ষার হাতিয়ার সংগে রাখে। কাফেররা তো কামনা করে তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে অসতর্ক থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে।'

মোমেনদের সম্পর্কে কাফেরদের অন্তরের এ কামনা চিরন্তন, বছরের পর বছর আর যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে তাদের এ কামনা। এ কারণে বিষয়টি নিতান্ত তাকীদ করে বুঝানো

হচ্ছে। মোমেনদের প্রাথমিক দলের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা এ তত্ত্ব বদ্ধমূল করেন। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রথম দলের জন্যে যুদ্ধের সাধারণ রূপরেখা নির্ণয়কালেই ব্যাপারটা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের জন্যে আন্দোলনের রূপরেখাও স্থির করে দিয়েছেন, আর তিনি তা করেছেন এমনভাবে যা আমরা ভয়ের নামায প্রসংগে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। অবশ্য এসব আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র, মানসিক প্রস্তুতি আর এসব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার প্রস্তুত রাখা– এসব কিছু দ্বারা মেমেনদের কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করা আল্লাহর শান নয়, সুতরাং মোমেনরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবে তাদের শক্তি সামর্থ অনুপাতে। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি বৃষ্টি বাদলের কারণে তোমাদের কোনো কষ্ট হয়, অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।'

কারণ এ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র বহন করা কষ্টসাধ্য, তা কোনো কল্যাণও বয়ে আনবে না। তখন কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহর সাহায্য সহায়তার আশা পোষণ করাই যথেষ্ট, 'তবে তোমরা নিজেদের সাবধানতা অবলম্বন করো। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

সম্ভবত মোমেনদের এ সতর্কতা, এ জাগ্রত অবস্থা আর আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থাই হবে কাফেরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক। এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং মোমেনরা হবে আল্লাহর কুদরতের হাতিয়ার। তাদের মাধ্যমে আসলে আল্লাহর ইচ্ছাই মূলত বাস্তবায়িত হবে।

'অতপর তোমরা যখন নামায সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে, তোমরা যখন বিপদ মুক্ত হবে, তখন নামায কায়েম করবে। নিসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ে নামায সম্পন্ন করা মোমেনদের ওপর ফরয করা দেয়া হয়েছে।'

এমনিভাবে আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো ধরন প্রকরণে নামাযের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এটাই হচ্ছে বড় প্রস্তুতি, এটা এমন অস্ত্র, যা কখনো পুরানো হয় না। অবশ্য তোমরা যখন বিপদমুক্ত হবে, যখন তোমাদের পূর্ণ মানসিক স্বস্তি অর্জিত হবে, তখন নামায কায়েম করবে। কোনো 'কসর' অর্থাৎ ভয়ের কসর ছাড়াই পরিপূর্ণ নামায কায়েম করবে। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নামায ঠিক সময়মতো আদায় করাই হচ্ছে ফরয, যে সময়টা নামায আদায় করার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সে সময়েই তা করতে হবে। যখন অবকাশের কারণটি দুর্বল হয়ে যায়, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে আসবে, যা সব সময়ের জন্যে প্রজোয্য।

কোনো কোনো ব্যক্তি এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে যে, নামায বাদ পড়ে গেলে তার কাযা আদায় করার কোনো সুযোগ নেই, মানে বাদ পড়া নামায কাযা আদায় করতে হবে না। আর কাযা করলেও তা যথেষ্ট এবং বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া নামায তা শুদ্ধই হবে না। কিন্তু অধিকাংশ আলেমরা মনে করেন যে, বাদ পড়া নামাযের কাযা আদায় করা শুদ্ধ এবং সহীহ। অবশ্য তাদের মতেও তা কাযা না করে যথাসময়ে আদায় করাই উত্তম। নামায বিলম্বিত করা মাকরূহ তথা নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে খুঁটিনাটির বিস্তারিত বিবরণের দিকে আমরা যেতে চাই না।

মোমেনের মনোবলের আসল উৎস

জেহাদ অব্যাহত রাখার উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এ পাঠের সমাপ্তি করা হয়েছে। জেহাদ মোমেন চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, তাকে আবেগে আপ্লুত করে। এরশাদ হচ্ছে,

‘শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তারাও তোমাদের মতো আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আর তোমরা আল্লাহর কাছে যা আশা করো, তারা তা করে না? আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, বিশাল প্রজ্ঞাময়।’

কথাগুলো খুব ছোটো, কিন্তু এ অল্প কথার মধ্যে সত্যের চূড়ান্ত রূপরেখা নিহিত রয়েছে। সংঘাত-সংঘর্ষের দু'প্রান্ত থেকে তা মোমেনের জন্যে সুদীর্ঘ যাত্রাপথ উন্মোচিত করে। মোমেনরা যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, ব্যথা বোধ করে; কিন্তু শুধু মোমেনরাই আঘাত আর ব্যথা বোধ করে না, তাদের দুশমনরাও ব্যথা বোধ করে, আঘাত আর যন্ত্রণা তাদেরকেও স্পর্শ করে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মোমেনরা বিপদকালে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা করে। পক্ষান্তরে কাফেররা নিজেদেরকে বিনাশ করে, বিনাশ করে নিজেদের কর্মফল। তারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে না, জীবনের শেষে আল্লাহর কাছে তারা কিছুই প্রত্যাশা করে না। কাফেররা যখন যুদ্ধের জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তখন মোমেনদের কর্তব্য হচ্ছে তার চেয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করা, আরো তীব্রভাবে তাদের ওপর হামলা চালানো। কাফেররা যখন যুদ্ধে ব্যথা বোধ করে, তখন নিজেদের ব্যথার জন্যে মোমেনদেরকে আরো বেশী সবর করতে হবে, ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। তেমনিভাবে কাফের জাতির পেছনে ধাওয়া করা থেকেও তারা নিবৃত্ত থাকবে না। মোমেনরা কাফেরদের পদচিহ্ন ধরে পশ্চাদ্ধাবন করবে। এমনভাবে ধাওয়া করবে, যাতে তাদের কোনো শক্তিই অবশিষ্ট না থাকে; যাতে কোনো ফেতনা বিপর্যয় অবশিষ্ট না থাকে এবং দ্বীন আর আনুগত্য সর্বতোভাবে আল্লাহর জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধ বিগ্রহে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় মর্যাদা। এ সময় মোমেন চিত্তের অবস্থা এমন হয় যে, তখন তারা সাধ্য আর সামর্থের অতিরিক্ত কষ্ট করতে পারে এবং আঘাত আর ব্যাথাকে প্রয়োজনে প্রতিরোধ করতে পারে। তখনই সাহায্যকারীর কাছে থেকে সাহায্য আসে এবং পথের সম্বল আসে মহান দয়াময়ের পক্ষ থেকে।

এ ব্যাখ্যা হচ্ছে উন্মুক্ত যুদ্ধ আর সম্মুখ যুদ্ধ উভয়টা সম্পর্কে। এ যুদ্ধে মানুষ আহত হয়, উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কেননা, উভয় পক্ষই অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করে। কিন্তু কখনো কখনো মোমেন দলের ওপর এমন একটা সময় আপতিত হয়, যেখানে যুদ্ধ খোলাখুলি হয় না, আর নয় তা সমস্তরের কারো সঙ্গে, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। বাতিল পক্ষ কখনো সুখ-শান্তির সম্মুখীন হয়। সম্মুখীন হয় তাদের আভ্যন্তরীন বিরোধ আর বিসংবাদের। তখন মোমেন দলের পথ হচ্ছে হিম্মতহারা না হয়ে ধৈর্য অবলম্বন করা। তাদেরকে একথা জানতে হবে যে, তারা আঘাত আর ব্যথা পেয়ে থাকলে তাদের দুশমনরাও অনুরূপ আঘাত আর ব্যথা পেয়েছে, আর ব্যথা তো সব এক রকমই কিন্তু এক এক ব্যথার রং এক এক রকম। এরশাদ হচ্ছে,

‘আর তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে এমন কিছু আশা করো, যা তারা করে না’,

আর এটা হচ্ছে তার জন্যে মর্যাদা আর এটা হচ্ছে তাদের উভয়ের পথের ভিন্নতার বাস্তব প্রতিফলন,

‘আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, সূক্ষাতিসূক্ষ্মদর্শী।’

তিনি জানেন কিভাবে অন্তরের অনুভূতিসমূহের চিকিৎসা করতে হয় আর কিভাবে মনকে গড়ে তুলতে হয়, যাতে মানুষের মন আঘাত আর ব্যথা বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম হয়।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ
وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن
يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

রুকু ১৬

১০৫. অবশ্যই আমি সত্য (দ্বীনের) সাথে তোমার ওপর এ গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা (জ্ঞানের আলো) দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো; (তবে বিচার ফয়সালার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না। ১০৬. তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১০৭. যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি কখনো এমন সব লোকের পক্ষে কথা বলো না, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকদের কখনো পছন্দ করেন না। ১০৮. এরা মানুষদের কাছ থেকে (নিজেদের কর্ম) লুকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা (তো হচ্ছেন সেই মহান সত্তা) যিনি রাতের অন্ধকারে– তিনি যেসব কথা (বা কাজ) পছন্দ করেন না, এমন সব বিষয়ে যখন এরা সলাপরামর্শ করে, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন; এরা যা কিছু করে তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের পরিধির আওতাধীন। ১০৯. হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো, কিন্তু কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, কিংবা কে তাদের ওপর (সেদিন) অভিভাবক হবে? ১১০. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা (গুনাহ করে) নিজের ওপর অবিচার করে, অতপর (এ জন্যে যখন) সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (তখন) সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا

مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ

يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ

اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ

اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১১. যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করলো, সে কিন্তু এর দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করলো, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তিনি কুশলী। ১১২. যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করলো; কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, এ কাজের ফলে সে (প্রকারান্তরে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।

রুকু ১৭

১১৩. (এ পরিস্থিতিতে) যদি তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়) ভুল পথে পরিচালিত করেই ফেলেছিলো! যদিও তারা এই আচরণ দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারছিলো না, (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামূলক) কাজ দ্বারা তারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রন্থ ও (সে গ্রন্থলব্ধ) কলা-কৌশল তোমার ওপর নাযিল করেছেন এবং তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা (আগে) তোমার জানা ছিলো না; তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিলো অনেক বড়ো!

তাফসীর

আয়াত-১০৫-১১৩

এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আমরা একটা দৃঢ়তা অনুভব করতে পারি, এর মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তীব্র আবেগ আর সুবিচার ও ন্যায়নীতির জন্যে প্রচন্ড ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়। আয়াতগুলোর পরিমন্ডল থেকে এসবই ফুটে ওঠে।

অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন নিষিদ্ধ

সর্বপ্রথম এখানে যে জিনিসটা প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে আল্লাহর নবীকে এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাঁর ওপর সত্য সহকারে কেতাব নাযিলের কথা এবং এ কেতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, সে সত্য অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করা, খেয়ানতকারী তথা বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে কথা বলা থেকে তাঁকে বারণ করা,

অর্থাৎ ওদের পক্ষ হয়ে প্রতিরোধ আর বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হতে বারণ করা হচ্ছে। এ বিতন্ডা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে-

'আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)সহ কেতাব নাযিল করেছি.... নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহান মার্জনাকারী, অতি দয়াবান।'

অতপর এ নিষেধবাণীর পুনরুক্তি করা হয়, আর যে খেয়ানতকারীদের পক্ষ নিয়ে নবী বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হচ্ছিলেন, তাদের পরিচয় দিয়ে বলা হয় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর খেয়ানত করছে। এর প্রতিফল হিসাবে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা বড় খেয়ানতকারী ও বড়ো পাপীকে ভালোবাসেন না।

'যারা নিজেরা নিজেদের ওপর খেয়ানত করে, তুমি তাদের পক্ষ হয়ে বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হবে না। কারণ, যারা চরম খেয়ানতকারী আর বড় পাপী, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন না।'

বাহ্যত মনে হচ্ছে তারা অন্যদের প্রতি খেয়ানত করছে, কিন্তু আসলে তারা নিজেদের প্রতিই খেয়ানত করছে, তারা খেয়ানত করেছে মুসলিম জামায়াতের। জামায়াতের মূলনীতি আর কর্মপদ্ধতিরও যা মূলত মুসলিম জামায়াতের একক বৈশিষ্ট্য। অথচ তারা ছিলো সে জামায়াতেরই লোক। অতপর অন্যভাবে, অন্যরূপেও তারা এর প্রতি খেয়ানত করছে, আর তা ছিলো এভাবে যে, তারা নিজেদেরকে এমন পাপের সামনে পেশ করছে যে পাপের জন্যে একদিন তাদেরকে কঠোর দন্ড দেয়া হবে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা যা করেছে এটা হচ্ছে মূলত তারই দন্ড। সন্দেহ নেই যে, এ দন্ডও হচ্ছে নিজেদের প্রতি খেয়ানত, নাফসের প্রতি খেয়ানত-এর আরেক রূপ হচ্ছে, নিজেদের নাফসকে কলুষ কালিমা লিপ্ত করা, সলা-পরামর্শ, মিথ্যা আর খেয়ানতে তাকে সংকীর্ণ করে তোলা।

'যারা বেশী খেয়ানত করে, যারা বেশী পাপাচারী, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন না।'

এ শাস্তি হচ্ছে সব শাস্তির চেয়ে বড়। এতে আর একটা বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ভালোবাসেন না, তাদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক-বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া কারো জন্যে জায়েয নেই। পাপ আর খেয়ানতের জন্যেই তো আল্লাহ তায়ালা তাদের না-পছন্দ করেন। এসব খেয়ানতকারী পাপীদের আচরণ সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করার জন্যে সব শেষে তাদের পাপ আর খেয়ানতের কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

'তারা লজ্জিত হয় মানুষের কাছে গোপন করে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তো কিছুই গোপন করতে পারবে না ....।'

এটা হচ্ছে এক নিকৃষ্ট রূপ, যা তাদের তাচ্ছিল্য আর উপহাসের দিকে নিয়ে যায়। নিকৃষ্ট এ জন্যে যে, তাতে দুর্বলতা আর ছল-চাতুরী প্রকাশ পাচ্ছে, তারা রাতের বেলায় সলা-পরামর্শ করার মাধ্যমে চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানত সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলে, আবার তা মানুষের কাছ থেকে গোপন করে। অথচ মানুষ তাদের লাভ-ক্ষতি কিছুরই মালিক নয়। লাভ-ক্ষতির যিনি মালিক, তিনি তো তাদের সংগেই রয়েছেন তারা রাত্রিকালে যে সলা-পরামর্শ করে, তা তিনি জানেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য গোপন করছে, তুচ্ছজ্ঞান করছে। এ গোপন করাকে তারা মিথ্যা কথা বলছে, ভাবছে এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। মূলত এর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো অবস্থান হতে পারে, যা মানুষদের নীচতা আর উপহাসের দিকে ডাকতে পারে?

'আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তায়ালা সে সবকে পরিবেষ্টন করে আছেন।'

আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন। তারা যেসব সলা-পরামর্শ করছে, তা নিয়ে তারা যাবে কোথায়? কোথায় পালাবে তারা? তারা রাত্রিকালে যখন গোপন পরামর্শ করে, তখনো তো আল্লাহ তায়ালা তাদের সংগেই থাকেন। আর আল্লাহ তায়ালা তো সমুদয় বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন। তারা আল্লাহর দৃষ্টির নীচে এবং তাঁরই কবযায় রয়েছে।

যে হামলা থেকে এ গযব ছড়িয়ে পড়ে, তার বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। খেয়ানতকারীদের পক্ষ নিয়ে যে বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হয়, সে গযবে পতিত হয়।

'তোমরা তাদের পক্ষ হয়ে পার্থিব জীবন নিয়ে আজ তাদের জন্যে বিবাদ করছো, অতপর কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সংগে কে তর্ক করবে, অথবা কে হবে সেদিন তাদের কার্যনির্বাহী?'

আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী, কেউ সেদিন তাদের পক্ষ হয়ে তর্ক করবে না, কেউ হবে না তাদের কার্যনির্বাহী! তাহলে দুনিয়ায় তাদের পক্ষ হয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায় লাভ কি? সে কঠিন দিনে এটা তো তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না, কোনো কাজেই তো আসবে না।

নিন্দনীয় খেয়ানতকারীদের ওপর গযব দিয়ে তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিরোধকারী বিতন্ডাকারীদের ওপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে এ কাজের প্রতিক্রিয়া এবং তার প্রতিদানের সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হচ্ছে। বিধি বর্ণনা করা হচ্ছে সাধারণ প্রতিদানেরও। এ হচ্ছে এমন এক সাধারণ বিধি, যে বিধি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সংগে আচরণ করেন। এ বিধি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে তাদের নিজেদের মধ্যকার আচরণ আর কর্মকান্ড সমাধা করার দাবী করেন। তিনি বান্দাদের কাছে দাবী করেন আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্যে, আর আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে, বান্দাদের নিজেদের মধ্যেকার কাজে কর্মে সুবিচার করা।

ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো পাপ নেই

'যে কেউ মন্দকাজ করে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল মহা দয়াবান পাবে। আর যে কেউ গুনাহ করে, অতপর কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে, (তার জানা দরকার) সে অপবাদ হচ্ছে প্রকাশ্য গুনাহর কাজ।'

এ তিনটি আয়াতে মূলনীতির সূত্র অনুযায়ী কিছু কথা বলা হয়েছে, এ সূত্র অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সংগে আচরণ করেন। সে সূত্র অনুযায়ী বান্দারাও নিজেদের মধ্যে আচরণ করতে পারে। আর সে মূলনীতি অনুযায়ী বান্দারা আল্লাহর সংগে আচরণ করলে কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

প্রথম আয়াতে তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, বার বার যে পাপ করে তার জন্যেও মাগফেরাত আর ক্ষমার দরজা প্রশস্ত করে খুলে দেয়া হয়েছে। এতে প্রত্যেক তাওবাকারী পাপীকে ক্ষমা আর তাওবা কবুলের লোভ দেখানো হয়েছে।

'যে পাপ করবে বা নিজের ওপর যুলুম করবে, অতপর ক্ষমা চাইবে আল্লাহর কাছে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল দয়ালু পাবে।'

আল্লাহ তায়ালা তো ক্ষমা আর দয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত রয়েছেন। কোনো অপরাধী তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়া পাবে। যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে এবং অন্যের ওপর এবং নিজের ওপরও যুলুম করে, সে যদি এমন কাজ করে, যার

ক্ষতি তার নিজেকে অতিক্রম করে যায় না, সে কেবল নিজের ওপরই যুলুম করে তাহলে সর্বাবস্থায় দয়াবান আল্লাহ তায়ালা এমন ক্ষমা প্রার্থীদেরকে স্বাগত জানান। তারা তাওবা করে ফিরে এলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা আর দয়া করেন। এভাবে তিনি তাদেরকে কোনো শর্ত, কোনো বাধ্যবাধকতা, কোনো অন্তরায় ছাড়াই বরণ করে নেন। যখনই তারা তারা তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে তার কাছে হাযির হবে, আল্লাহকে তারা অতি ক্ষমাশীল, মহা দয়াবান হিসাবে পাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে ব্যক্তিগত অপরাধের দন্ড। এ হচ্ছে এমন এক মূলনীতি, যার ওপর দাড়িয়ে আছে পুরো ইসলামী চিন্তাধারার প্রাসাদ। এ মূলনীতি প্রতিটি অন্তরে ভয় আর আশার অনুভূতি জাগ্রত করে। ভয় নিজের কর্ম আর অর্জন সম্পর্কে, আর আশা এ ব্যাপারে যে, অন্যের বোঝা তার ওপর চাপানো হবে না।

'আর যে ব্যক্তি কোনো পাপ অর্জন করবে, সে তা অর্জন করবে নিজের নাফসের ওপরেই। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, মহা কুশলী।'

ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রের কোনো পাপ নেই, যেমনটি গীর্জার চিন্তাধারা ব্যক্ত করে থাকে। তেমনি নিজের নাফসের কাফফারা আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো কাফফারা প্রায়শ্চিত্তও এখানে নেই। এ অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অর্জন সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। সে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত থাকবে যে, যা কিছু সে অর্জন করবে, কেবল তার হিসাবই তার কাছ থেকে নেয়া হবে। ইসলামের অনন্য চিন্তাধারায় এ এক বিস্ময়কর ভারসাম্য। এটা হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারা এবং তার অবকাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি আশ্বস্ত হয়, আর আল্লাহ তায়ালা সর্বাত্মক সুবিচারও প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবজাতি আল্লাহকে হাকেম বিচারক মেনে নেবে, তাদের কাছে এটাই তাঁর দাবী।'

তৃতীয় আয়াতে সে ব্যক্তির পাপের কদর্যতা, জঘন্যতা প্রমাণ করা হয়েছে, যে নিজে অন্যায় করবে এবং তা অপর নির্দোষের ঘাড়ে চাপাবে। এটা হচ্ছে সে দলের কথা যাদেরকে কেন্দ্র করে এ আলোচনাটি চলে আসছে।

'যে কেউই ভুল বা পাপ অর্জন করবে আর তা কোনো নির্দোষের ওপর চাপাবে সাংঘাতিক একটি অপবাদ জঘন্য গুনাহের বোঝা ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।'

অপবাদ হচ্ছে নির্দোষকে দোষী করা আর এই পাপ হচ্ছে একজন নির্দোষকে পাপী বানানো এ দুটো বোঝাই তাকে বহন করতে হবে। এগুলো যেন বোঝা, যা সে বহন করবে, পাপকে দৈহিক অবয়ব দিয়ে কোরআন মাজীদের এ চিত্র অংকন এভাবে এর অর্থকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে।

এ তিনটি মূলনীতি দ্বারা কোরআন মজীদ সুবিচারের মানন্ডকে দাঁড় করায় যে মানদন্ডে প্রতিটি ব্যক্তিকে তুলাদন্ডে ওযন করা হবে। অপরের ওপর অপবাদ আরোপের অপরাধের অপরাধী সেদিন ছাড়া পাবে না। তাওবাকারী ক্ষমাপ্রার্থীদের জন্যে তাওবা আর মাগফেরাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, আল্লাহর ওয়াদার কথাও প্রতিনিয়ত প্রচার করা হবে, যাতে অপরাধীরা সব সময় তার কাছে হাযির হতে পারবে। কোনো রকম অনুমতি ব্যতীতই তারা আল্লাহর দরবারে ধরণা দিতে পারবে এবং তাঁর দরবারে গিয়ে রহমত আর মাগফেরাত লাভ করবে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেন, রাত্রিকালে গোপনে সলা পরামর্শকারীদের পেছনে পড়া, অনুসরণ করা থেকে তিনি তাঁর রসূল (স.)-কে হেফাযত করেন, তাদের গোপন সলা-পরামর্শ সম্পর্কে তিনি তাকে অবহিত করেন। তারা মানুষ থেকে গোপনে

সলা-পরামর্শ করছিলো, কিন্তু তা আল্লাহর কাছে গোপন করতে পারেনি। কারণ, তারা যখন রাত্রিবেলা এমন সব সলা-পরামর্শ করছিলো, যাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট নন—তখনো আল্লাহ তায়ালা তাদের সংগেই রয়েছেন। অতপর তিনি তাঁর রসূল (স.)-এর ওপর আরো বড় অনুগ্রহ করেন, তাঁর ওপর কেতাব আর হেকমত নাযিল করেন। তাঁকে এমন শিক্ষা দান করেন যা তিনি জানতেন না। এটা কেবল রসূল (স.)-এর প্রতিই নয়, বরং এ অনুগ্রহ গোটা মানবতার প্রতি। গোটা মাবতার প্রতি এ অনুগ্রহের সূচনা হয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে যিনি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে বেশী নৈকট্যধন্য। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার প্রতি যদি আল্লাহর এই অনুগ্রহ না হতো তাহলে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিলো। আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি মহান।'

এ প্রচেষ্টা নিসন্দেহে অন্যান্য প্রচেষ্টাসমুহের অন্যতম। সে সব প্রচেষ্টার রং রূপ এবং ধরন প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন। রসূল (স.)-এর দুশমনরা সত্য, ন্যায় আর সুবিচার থেকে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার নিমিত্তে এসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সকল দফায়ই তাঁর রসূল (স.)-কে রহমত আর অনুগ্রহ দ্বারা বেষ্টন করে নিয়েছেন। চক্রান্তকারী বিভ্রান্তকারী সলা-পরামর্শকারীরা নিজেরাই পরিনামে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারাই গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সীরাতে সে সব আজও সংরক্ষিত। তিনি নামায আর হেদায়াত লাভ করেছেন। পরামর্শকারীরা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে এই রহমত আর অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন এবং ঠিক সে সময় তাঁকে সান্ত্বনা আর নিরাপত্তা দ্বারা ধন্য করেছে যে, আল্লাহর রহমত আর অনুগ্রহে তারা তাঁর কোনো ক্ষতিই সাধন করতে সক্ষম হয়নি। এ সলা-পরামর্শে নবীকে রক্ষা করার অনুগ্রহ প্রসংগে এবং প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে স্পষ্ট ব্যক্ত করা এবং সলা পরামর্শের পরিচয় তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত করার প্রসংগে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে রেসালাত। এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'এবং আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি কেতাব আর হেকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এমন কিছু, যা তুমি জানতে না, আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি মহান।'

মূল কথা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে 'মানুষের' প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। এমন এক অনুগ্রহ যার ফলে মানুষ বলতে গেলে নবজন্ম লাভ করেছে। এর ফলে মানুষ নতুন রূপে গড়ে উঠেছে, যেমন প্রথম রুহটি গড়ে উঠেছিলো। এমন এক অনুগ্রহ যা মানবতাকে জাহেলিয়াতের নীচতা থেকে বিস্ময়করভাবে খোদায়ী জীবন বিধানের আলোকে তাকে উন্নতির শীর্ষ দেশে নিয়ে যেতে চায়। এ এমন এক অনুগ্রহ, যার মূল্য কেবল সে ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে, যে ব্যক্তি ইসলাম আর জাহেলিয়াত বুঝতে পারে, প্রাচীন আর আধুনিক জাহেলিয়াত সবকিছুকে অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর প্রতি এ অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন এ জন্যে যে, তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সে অনুগ্রহকে চিনতে পেরেছেন, যিনি নিজে সে অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করেছেন। যারা সে অনুগ্রহের পরিচয় লাভ করেছে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করেছে, তিনি হচ্ছেন তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়।

'এবং তিনি তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এমন কিছু, যা জানতে না তুমি। আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি মহান।'

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوٰىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ

مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَّشَآءُ ؕ

وَمَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَّدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّآ

إِنٰثًا ۚ وَإِن يَّدْعُونَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ

مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ

১১৪. এদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, তবে যদি কেউ (এর দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খয়রাত, সৎকাজ ও অন্য মানুষের মাঝে (সম্প্রীতি ও) সংশোধন আনয়ণের আদেশ দেয়– তা ভিন্ন কথা; আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে অতি শীঘ্রই আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো। ১১৫. (আবার) যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে (বেঈমান লোকদের) নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

রুকু ১৮

১১৬. আল্লাহ তায়ালা (এ বিষয়টি) ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে (কোনো রকম) শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (কাউকে) শরীক করলো, সে (মূলত) চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেলো। ১১৭. আল্লাহকে ছাড়া এরা (আর কাকে ডাকে)– ডাকে (নিকৃষ্ট) দেবীকে কিংবা কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে! ১১৮. তার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, (কারণ) সে (আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে) বলেছিলো, আমি তোমার বান্দাদের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো। ১১৯. (সে আরো বলেছিলো,) আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের গোমরাহ করে দেবো, আমি অবশ্যই তাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা কামনা (বাসনা) জাগিয়ে তুলবো এবং আমি তাদের নির্দেশ

فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ
الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ
وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز
وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ
اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

দেবো যেন তারা (কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্তু-জানোয়ারের কান ছিদ্র করে দেয়, আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো যেন তারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়; (মূলত) যে ব্যক্তি (এসব কাজ করে) আল্লাহ তায়ালার বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে। ১২০. সে (অভিশপ্ত শয়তান) তাদের (নানা) প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের (সামনে) মিথ্যা বাসনার (মায়াজাল) সৃষ্টি করে, আর শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১২১. এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি; যাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যার (আযাব) থেকে মুক্তির কোনো পন্থাই তারা (খুঁজে) পাবে না। ১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে? ১২৩. (মানুষের ভালোমন্দ যেমনি) তোমাদের খেয়াল খুশীর সাথে জড়িত নয়, (তেমনি তা) আহলে কেতাবদের খেয়ালখুশীর সাথেও সম্পৃক্ত নয় (আসল কথা হচ্ছে), যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে, আর এ (পাপী) ব্যক্তি (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। ১২৪. (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে– নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা (সম্পাদন) করে, তাহলে (সে এবং তার মতো) সব লোক অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, (পুরস্কার দেয়ার সময়) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ

حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার জন্যে মাথানত করে দেয়, মূলত সে-ই হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, (তদুপরি) সে ইবরাহীমের আদর্শের অনুসরণ করে; আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ক্ষমতা দিয়ে) সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।

তাফসীর

আয়াত-১১৪-১২৬

এ পাঠটি একাধিক সূত্রে পূর্ববর্তী পাঠের সংগে সম্পৃক্ত। এর কোনো কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদীর ঘটনার পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে। এর মধ্যে রয়েছে সে ইহুদী বশীর ইবনে আবীরাকের মোরতাদ হয়ে যাওয়া, রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তার জাহেলী জীবন ধারায় প্রত্যাবর্তন করার ঘটনা। আলোকপাত করা হয়েছে জাহেলী ধ্যান ধারণা, জাহেলী যুগের বোকামী, শয়তানের সংগে তার সম্পর্ক এবং তাতে শয়তানের ভূমিকা সম্পর্কেও। এতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সংগে শেরেক করাকে ক্ষমা করবেন না। এখানে সলা পরামর্শের কথা বলা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা যে সব কানা-ঘুষা করে, তার অধিকাংশের মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। তারা রাত্রিকালে সলা পরামর্শ করেছে, কানা-ঘুষা করেছে, কানা-ঘুষাকে নানা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে, আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে ভালোবাসেন না, পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন তা হচ্ছে ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ এবং মানুষের মধ্যে সংস্কার সংশোধনমূলক কাজের জন্যে কানা-ঘুষা করা। এ কানা-ঘুষার প্রতিদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুবিচারপূর্ণ নীতিমালার কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী সব আমলের তিনি প্রতিদান দেন। তাতে এ কথাও আছে যে, আল্লাহর নির্ণীত এ নীতিমালা কোনো ব্যক্তির আগ্রহ আকাংখার অধীন ও অনুবর্তী নয়, অনুবর্তী নয় তা মুসলমানদের কিংবা আহলে কেতাবের কোনো নিজস্ব আকাংখারও। আল্লাহর সর্বব্যাপী শর্ত হিসেবে সুবিচারই তা কেবল অনুসরণ করে। এটা এমন এক সত্য ও ন্যায়, যা মেনে না চললে আসমান যমীন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো, ধ্বংস হয়ে যেতো। এদিক থেকে গোটা পাঠটাই পূর্ববর্তী পাঠের কার্যকারণের সংগে যুক্ত-সম্পৃক্ত। বিষয় বস্তুর বিচারে এবং দৃষ্টি-ভংগির বিবেচনায়ও।

অপর আলোচিত বিষয়টি হচ্ছে মহান প্রতিপালনসুলভ জীবন-ধারার একটা স্তর, মুসলিম জামায়াতকে এমনভাবে প্রস্তুত করার জন্যে এখানে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা একটা উম্মাতে পরিণত হতে পারে, যে উম্মাত মানবতার নেতৃত্ব দেবে, তরবিয়ত তানযীম তথা পরিশীলন ও সংগঠনে অন্য সব জাতির উর্ধ্বে উঠতে পারে, মানবীয় দুর্বলতা এবং জাহেলী সমাজের রসম রেওয়ায আর ধ্যান-ধারণার সকল ক্ষেত্রেই সে ধ্যান-ধারণা এসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। মূলত গোটা কোরআনী জীবনধারাই হচ্ছে এ দৃষ্টিভংগির সহায়ক।

মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য

'তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই।'

কানাঘুষা করতে কোরআন মাজীদে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। 'নাজওয়া' তথা কানাঘুষা হচ্ছে কোনো একটি মুসলিম দলের নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে একত্রিত হয়ে রাতে কোনো বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা। ইসলামী সংগঠনের গঠন-কাঠামোটি এমন ছিলো যে, যে কোনো ব্যক্তি তার সমস্যা বা তার প্রয়োজনীয় বিষয় নবীর কাছে পেশ করতে পারতো। সবার সামনে বলার মতো না হলে তা গোপনে পেশ করতে পারতো। সাধারণ মানুষের জানার মতো বিষয় হলে সবার সামনেই উপস্থাপন করতে পারতো। কোনো ব্যক্তি বিশেষের একান্ত ব্যক্তিগত প্রসংগ না হয়ে তা কোনো একাডেমিক প্রসংগ হলে প্রকাশ্যে তা উপস্থাপন করা হতো।

এ ধারা অবলম্বন করায় যে একটা ফায়দা নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুসলিম জামায়াতে কোনো কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকবে না, তাদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্যা কোনো কিছুই এখানে বিচ্ছিন্ন থাকবে না এবং মুসলিম জামায়াতের কোনো অংশ রাতের অন্ধকারে কোনো বিষয়ে গোপন পরামর্শ করবে না। মুসলিম দলের কাছে কোনো কিছু গোপন করা হবে না, গোপন কোনো বিষয় তাদের চক্ষু থেকে বাইরে থাকবে না। আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। তিনি তো সদা তাদের সংগেই রয়েছেন। রাত্রিকালে তারা যখন এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, তা তিনি পছন্দ করেন না, তখনো আল্লাহ তায়ালা তাদের সংগেই থাকেন। যেসব কারণে গোপনে সলা-পরামর্শ আর কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছে, এ হচ্ছে তার কয়েকটি কারণ।

মাসজিদ হচ্ছে মুসলিম জামায়াতের মন্ত্রণা সভা। মুসলমানরা সেখানে মিলিত হতো নামাযের জন্যে, মিলিত হতো জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে, গোটা মুসলিম সমাজ ছিলো একটা উন্মুক্ত সমাজ। যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কিছু গোপনীয় বিষয় ছাড়া সকল সমস্যাই সেখানে পেশ করা হতো। আবার নিতান্তই কিছু ব্যক্তিগত প্রসংগ বাদে, যে বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এটা পছন্দ করে না যে, মানুষের মুখে মুখে তার চর্চা হোক সর্ব সাধারণের মধ্যে তার প্রচার হোক। এ কারণে সে উন্মুক্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন সমাজে, পেছনে কথা বলা আর গোপন পরামর্শ করার জন্যে কাউকে একান্ত গোপন স্থানে যেতে হতো না। অবশ্য মুসলিম সমাজ বা মুসলিম সমাজের বুনিয়াদী বিষয়ের বিরুদ্ধে যারা সলা পরামর্শ করতো তাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণত এরা ছিলো মোনাফেক। অধিকাংশ বড় বড় বিষয়ের কানাঘুষা তাই মোনাফেকদের সংগে সংশ্লিষ্ট।

এটা এমন এক ব্যাপার যাতে আমাদের কল্যাণ নেই। মুসলিম সমাজকে এসব লক্ষণ আর আচরণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে। মুসলিম সমাজের সদস্যরা তাদের প্রয়োজনে সমাজের কাছে, সমাজের নেতৃত্বের কাছে যাবে। তাদের মনে যেসব বিষয় আর ভাবের উদয় হয়, কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় তা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলবে।

কোরআন মাজীদের আয়াত এখানে এক ধরনের কানাঘুষাকেই ব্যতিক্রম রেখেছে। তা 'নাজওয়া' তথা গোপন কানাঘুষা নয়; যদিও বাহ্যিক আকারে তাকে 'নাজওয়াই' মনে হয়,

'অবশ্য সে ব্যক্তি ব্যতিক্রম যে দান-সদকার নির্দেশ দেয়, অথবা নির্দেশ দেয় কোনো ভালো কাজের কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের সংস্কার সংশোধনের চেষ্টা করে।'

এটা হচ্ছে একটা ভালো লোক আরেকটা ভালো লোকের সংগে মিশবে এবং তাকে বলবে এসো, আমরা অমুক ব্যক্তিকে কিছু দান করি। তুমি তো সংগোপনে তার অভাব অনটন প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পেরেছো, অথবা এসো, আমরা এই নির্দিষ্ট ভালো কাজটি করি, বা সে জন্যে অমুককে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করি, কিংবা এসো, আমরা অমুক আর অমুক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদমান বিষয়টির মীমাংসা করে দিই, তুমি তো জানতে পেরেছো যে, তাদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ রয়েছে। আবার কখনো দু'জন ভালো লোকের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে উভয়ে মধ্যে আপোষমূলক কোনো একটা কাজ করার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। এ কাজটা করার জন্যে তারা গোপনে মিলিত হয়। সেসব কিন্তু কানাঘুষা বা গোপন সলা-পরামর্শ নয়। এ কারণে কোরআন মাজীদে একে বলা হয়েছে 'আমর' বা নির্দেশ, যদিও এর আকার কানাঘুষার মতোই। একজন ভালো মানুষ তার জানা মতে ভালো কাজে জন্যে অগ্রসর হয় এবং কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দান করে। অবশ্য এ জন্যে একটা শর্ত রয়েছে যে এর কারণ হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান।

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এটা করবে, অবিলম্বে আমি তাকে এক মহা প্রতিদান দেবো।'

কাউকে দান করা বা দু'জন লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা নাফরমানির উদ্দেশ্যে হতে পারবে না, ভালো মানুষ বলে খ্যাতি লাভ করবে এমন উদ্দেশ্যেও হতে পারবে না। দান-সদকা করার জন্যে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবে, অনুপ্রাণিত করবে, চেষ্টা করবে মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করার জন্যে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাকে কলুষিত করতে পারেওএমন নাম-গন্ধও এতে থাকতে পারবে না। যাবতীয় কল্যাণ কাজ হতে হবে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কেবল তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে। দু'জন মানুষের কাজের মধ্যে এখানেই হচ্ছে পথ ও পন্থার ব্যবধান। একজন মানুষ কাজ করে আর তার কাজে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং তাকে সাওয়াব দান করেন, আর অন্য একজন লোক কাজ করে এবং তার কাজে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, ক্রুদ্ধ হন এবং তার সে কাজকে লিপিবদ্ধ করেন খারাপ কাজের চালান বইতে।

জেনে শুনে সত্যের বিরোধীতা করা

'আর যে কেউ রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে হেদায়াত প্রতিভাত হওয়ার পরও।'

এ আয়াতগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো বাশীর ইবনে আবীরাক সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কারণ সে মোরতাদ হয়ে মোশরেকদের সংগে যোগ দিয়েছিলো। একাজটি তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরই করেছে। সে ছিলো মুসলিম দলের লোক অতপর সে মোমেনদের অনুসৃত পন্থার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এ আয়াতটি হচ্ছে সাধারণ এবং ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক, কোনো বিশেষ কারণ, ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। সর্বাবস্থায়ই তা প্রযোজ্য হবে। রসূলের বিরুদ্ধাচারণের যে কোনো অবস্থার সাথেই আয়াতটি মুখোমুখী হবে। মুখোমুখী হবে রসূল (স.)-এর সমালোচনা, কুফুর, শেরেক এবং মোরতাদ হওয়ার যে কোনো ঘটনার সাথেই।

অভিধান গ্রন্থে 'মোশাকাত' তথা বিরুদ্ধাচরণ বলা হয় অপর কোনো ব্যক্তির বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধাচারণ করে, সে নবীর বিপরীতে কোনো পক্ষ অবলম্বন করে এখানে তাকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে নবীর জীবন বিধানের বিপরীতে জীবন বিধান গ্রহণ করা, নিজের জন্যে নবীর তরীকা আর কর্মপন্থার বিপরীতে কর্মপন্থা ও তরীকা অবলম্বন করা। রসূল (স.) তো আল্লাহর কাছ থেকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান নিয়েই আগমন করেছেন। আকীদা বিশ্বাস আর এবাদাত অনুষ্ঠানের রীতি নীতি সবই এ জীবন বিধানের অন্তর্ভুক্ত। মানব জীবনের সকল আইন-বিধান এবং বাস্তব দিককে এটা অন্তর্ভুক্ত করে। এটা হচ্ছে সে জীবন বিধানের অংগ। দেহকে বিভক্ত করে কোনো অংশকে গ্রহণ আর কোনো অংশ বর্জন করলে এ জীবন বিধানের রূহ তথা মূল প্রাণ সত্ত্বাই অন্তর্হিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি রসূল (স.)-এর খোদা বিরুদ্ধাচারণ করে, সে গোটা ইসলামী জীবন ধারাকেই অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, এতে করে সে ইসলামী জীবন ধারার একটা দিক গ্রহণ করে আর অপর একটা দিক প্রত্যাখ্যান করে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমতের দাবী হচ্ছে এই যে, সে যেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়। কারণ, জাহান্নাম হচ্ছে নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। রসূল প্রেরণ না করে এবং হেদায়াত স্পষ্ট না করে আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করে গোমরাহী গ্রহণ করলে তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এ সিদ্ধান্ত নেবেন। এ দুর্বল সৃষ্টি মানুষের ওপর এটা হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপক বিশাল রহমত। মানুষের কাছে যখন হেদায়াত স্পষ্ট হয় অর্থাৎ যখন সে জানতে বুঝতে পারে যে, এ জীবন বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, এটা জানার পরও জীবন বিধানের ক্ষেত্রে সে রসূল (স.)-এ বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর আনুগত্য করে না, তাঁর অনুসরণ করে না, তাঁর কাছে আল্লাহর যে জীবন বিধান প্রতিভাত হয়েছে তাতে সে মোটেই সন্তুষ্ট হয় না, তখন আল্লাহ তায়ালা যেদিকে সে মুখ করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা সেদিকে তার মুখ ফিরিয়ে দেন। তাকে তিনি কাফের-মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই আয়াতে স্পষ্ট করে যে আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে তিনি তার যোগ্য করেন, তার হকদার বানিয়ে দেন।

যে পাপের কোনো ক্ষমা নেই

'তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার প্রত্যাবর্তন স্থল অতি নিকৃষ্ট।'

এ নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থলের কারণও আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফেরাত সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে, কেবল আল্লাহর সংগে শেরেক বাদে। শেরেক এমন এক গুনাহ, যার কোনো ক্ষমা নেই, যদি সে মোশরেক অবস্থায় মারা যায়।

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন না তাঁর সংগে যদি শেরেক করা হয়, সে নিপতিত হয় সুদূর গোমরাহীতে।'

বর্তমান খন্ডে এ ধরনের আয়াতের তাফসীরে আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর সংগে স্পষ্টভাবে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা দ্বারাই শেরেক প্রতিপন্ন হয়। তা হতে পারে যেমন আধুনিক জাহেলিয়াতের ধারায়, হতে পারে তা তেমনি প্রাচীন জাহেলিয়াতের ধারায়ও। অন্যের মাঝে ইলাহ হওয়ার কোনো একটি বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিলেও শেরেক সাব্যস্ত হয়। যেমন ইহুদী খৃষ্টানদের শেরেক করার কথা কোরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ত্যাগ করে তারা পাদ্রী পুরোহিতদেরকে রব তথা পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। অথচ তারা কিন্তু আল্লাহর সংগে পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে পূজা করেনি, তারা কেবল আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের জন্যে আইন বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাটুকুকেই মেনে নিয়েছিলো। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়েই এসব পাদ্রী-পুরোহিতরা হারাম-হালাল নির্ধারণ করতো, এ ক্ষেত্রে

তারা পাদ্রী-পুরোহীতদের কথার অনুসরণ করতো। এভাবেই তারা পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করতো। এ কারণেই তাদের ক্ষেত্রে শেরকের গুণ প্রমাণ হয়েছে। এ কারণেও তাদের মোশরেক বলা যথার্থ হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাওহীদ মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদেরকে কেবল এক আল্লাহর এবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে এক আল্লাহর জন্যে এবং আইন বিধান আর নির্দেশও গ্রহণ করবে কেবল এক আল্লাহর কাছে থেকেই।

শেরেকের গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই, যদি মোশরেক ব্যক্তি শেরেক অবস্থায় মারা যায়। অথচ শেরেক ব্যতীত অন্য সব গুনাহের জন্যে ক্ষমার দরজা খোলা, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তার সব গুলো তা ক্ষমা করতে পারেন, শেরেকের গুনাহ এতো বড় শেরেক হওয়া এবং ক্ষমার আওতা থেকে তা দূরে থাকার কারণও এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সংগে শেরেক করে, সে আল্লাহর রহমতের সীমা থেকে সম্পূর্ণ বাইরে যায়, অনেক দূরে বেরিয়ে যায়। তার গোটা প্রকৃতিই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার সুস্থ হওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরেক করে সে সুদূর গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

তার মধ্যে প্রকৃতির একটা সুস্থ সূত্রও যদি অবশিষ্ট থাকতো তাহলেও সে সূত্রটি তাকে আল্লাহর একত্বের অনুভূতির সংগে বেঁধে রাখতো। মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগে হলেও সে ফিরে আসতো। মৃত্যু যখন তার ওষ্ঠাগত আর মৃত্যু পথযাত্রী তখনো যদি শেরেকে অবিচল থাকে তাহলে তার ক্ষমার আশা নেই, তার সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

'আমি তাকে নিক্ষেপ করবো জাহান্নামে, আর তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।'

অতপর শেরেকের ব্যাপারে আরব জাহেলিয়াতের ধ্যান-ধারণার কতিপয় বিবরণ পেশ করা হয়েছে, আল্লাহর কন্যা সন্তান গ্রহণকে কেন্দ্র করে রচিত কতিপয় জাহেলী কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে তারা সাব্যস্ত করে আল্লাহর কন্যা। শয়তানী পূজাকে কেন্দ্র করে জাহেলী রূপমালার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা শয়তানের পূজা করে ফেরেশতাদের মূর্তি নির্মাণ করে। দেব-দেবীর জন্যে উৎসর্গকৃত জন্তুর কান কেটে চিহ্ন দেয়ার বিশেষ কর্মকান্ডের বর্ণনা আসছে। আল্লাহর সৃষ্টিতে রদ-বদলের শেরেকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আর আল্লাহর সৃষ্টিতে রদ-বদলের এই শেরক তো স্বভাব ধর্মেরও পরিপন্থী, যে স্বভাব ধর্মের ওপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল দেবীর আরাধনা করে এবং পূজা করে শুধু অবাধ্য শয়তানের। যে শয়তানের প্রতি আল্লাহ তায়ালা লানত বর্ষণ করেছেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।'

জাহেলী যুগে আরবরা ধারণা করতো যে, ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর কন্যা সন্তান। অতপর তারা এদের নামকরণ করে 'নারী' নামে। লাত-মানাত, ওযযা আরো কতোভাবে তারা তাদের পূজা করে। আল্লাহর কন্যা নামে এসব মূর্তির নামকরণ এবং বিশ্বাস পোষণ করে যে, এসব মূর্তি তাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাবে, প্রথম দিকে এটাই ছিলো তাদের ধারণা। অতপর তারা প্রতিকৃতির মূল সূত্র সরাসরি মূর্তির পূজা শুরু করে। তারা নিছক পাথরেরও পূজা করতে শুরু করে। চতুর্থ পারার তাফসীরে এ সম্পর্কে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। জাহেলী যুগের আরবদের কেউ কেউ শয়তানের প্রতিকৃতি স্থাপন করত, তাদের পূজা করতো। কালবী বলেন, খোযায়া গোত্রের বনু মাসহি জ্বিনদের পূজা করতো। অবশ্য এখানে আয়াতের অর্থ আরো ব্যাপক আরো বিস্তৃত। জাহেলী যুগের আরবরা শয়তানের পূজা করতো, শয়তানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। এ শয়তানের তো রয়েছে বাবা আদমের সংগে সুদীর্ঘ দুশমনী। এ শয়তানকেই আল্লাহ তায়ালা তার নাফরমানী আর মানব জাতির প্রতি দুশমনীর কারণে লানত করেছেন।

বিতাড়িত-অভিশপ্ত হওয়ার পর তার বিদ্বেষ এমন চরমে পৌঁছে যে, সে মহান আল্লাহর কাছে থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত-বিপথগামী করার অনুমতি গ্রহণ করে।

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল দেবীর বন্দনা করে।'

তারা শয়তানের পূজা করে, তারা তাদের প্রাচীন দুশমনেরই পূজা করে। তারা তার আশ্রয় চায়, তার নামে গোমরাহী করে। অথচ এ তো হচ্ছে সে শয়তান, যার প্রতি আল্লাহর লানত করেছেন। বনী আদমের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করার কথা তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। বিভ্রান্তির পথে শিক্ষা লোভ-লালসা দেখাবার কথাও তো আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যে সে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে, কাল্পনিক সৌভাগ্য দেখাবে এবং সর্বশেষে শাস্তি থেকে মুক্তিদানের আশ্বাস দেবে। আল্লাহর নবী (স.) স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন যে, সে অন্ধ অনুকরনের নিকৃষ্ট আচার অনুষ্ঠান আর অশ্লীল কর্মকান্ড চালাবে, যেমন কোনো পশুর কান ছেদন করা, যাতে সে পশুর পিঠে সওয়ার হওয়া বা তার গোস্ত খাওয়া হারাম হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা তা হারাম করেননি। দেহের কোনো অংশ কাটা বা তার আকার-আকৃতির পরিবর্তন সাধন করা, যেমন কোনো ক্রীতদাসকে খাসী করা বা তার দেহে দাগ দেয়া এবং এমন কোনো পরিবর্তন সাধন করা যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন।

মানুষের অনুভূতিতে এ বিষয়টা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, শয়তান মানুষের প্রাচীন দুশমন। সে মানুষকে শেরেকের নির্দেশ দান করে, শেরেকের অনুরূপ পৌত্তলিক কর্মকান্ডের নির্দেশ দেয়। অন্তত মানব মনে এমন ভাব জাগ্রত করা যাতে দুশমনের পাতানো জালকে সে ভয় করতে পারে, আর ইসলাম তো মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে বড় যুদ্ধের কথা আগেই বলে দিয়েছে এবং শয়তানের সংগে মোকাবেলায় সকল শক্তি নিয়োজিত করার জন্যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পৃথিবীতে শয়তানের ছড়ানো অপকর্মের প্রতিরোধের প্রতিও। আল্লাহর পতাকা এবং তাঁর দলের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। শয়তান ও তার দলের প্রতিরোধের জন্যে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ হচ্ছে মূলত তাদের এক চিরন্তন যুদ্ধ। যে যুদ্ধের হাতিয়ার কখনও সংবরণ করা যাবে না। কারণ, শয়তান বিতাড়িত আর অভিশপ্ত হওয়ার পর থেকে তার ঘোষিত অস্ত্র প্রয়োগে কখনো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না। একজন মোমেন এ যুদ্ধ সম্পর্কে কখনো গাফেল উদাসীন অমনোযোগী থাকতে পারে না। তা থেকে সে সন্তর্পণে কেটে পড়তে পারে না। কারণ মোমেন ব্যক্তি জানে যে, তাকে হয় আল্লাহর বন্ধু হতে হবে, অথবা বন্ধু হতে হবে শয়তানের। এ দুয়ের মধ্যখানে অন্য কোনো পথ নেই। শয়তান মানব মনে প্রতিবিম্বিত হয়, তার মনে লোভ লালসা, আশা আকাংখা জাগায়, সে তার মোশরেক অনুসারী এবং সাধারণ অন্যায়কারীদের মধ্য প্রতিবিম্বিত হয়। এ এমন এক যুদ্ধ, যা গোটা জীবন ব্যাপী চলবে। যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের বন্ধু বানান সে-ই এ থেকে নাজাত লাভ করে, সে-ই বিজয়ী হয়। শয়তানকে যার বন্ধু করা হয় সে ব্যর্থ-পরাজিত হয়, সে ধ্বংস হয়।

শয়তান মানবজাতির চির শত্রু

'যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেয়, সে হয় স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।'

কোরআন মাজীদ বন্ধুদের সংগে শয়তানের আচরণের চিত্র অংকণ করে, চিত্র অংকণ করে উপহাস আকারে পেশ করা একটি উদাহরণের মাধ্যমে,

'শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, লোভ লালসা দেখায়। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এ হচ্ছে শয়তানের নির্দিষ্ট প্রবঞ্চনাকর অবস্থা। এ অবস্থা মানব প্রকৃতিকে ঈমান আর তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে। তাকে কুফরী শেরেকের দিকে নিয়ে যায়। শয়তানের এ প্রবঞ্চনা হলো

মানুষের স্বভাব প্রকৃতির হাতিয়ার। শয়তান মানুষের মন্দ কাজকে সুশোভিত করে দেখায়। ফলে মানুষ খারাপ কাজকে ভালো হিসাবে দেখতে পায়। শয়তান মানুষকে অবাধ্যতা পাপাচারের প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয় কল্যাণ আর সৌভাগ্যের। আর সে মানুষের সাথে পথ চলতেও শুরু করে। মানুষ যা করে, তার পরিণতিতে তাকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে নিশ্চয়তা নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে সে ধ্বংসের পথে এনে ছেড়ে দেয়।

'শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

দৃশ্য যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে, প্রাচীন দুশমন যখন তার রশি পাকায় জাল বুনে, ফাঁদ বিস্তার করে, তখন সেখানে বিকৃত প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদিকে সেদিক সে কিছুই দেখতে পায় না, কোনো চেষ্টা চালাতে পারে না, বুঝতেও পারে না যে কোন দিকে ছুটে চলেছে।

মোমেনরাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়, তাদের শেষ পরিণতিই হচ্ছে চূড়ান্ত বিষয়। কারণ, তারা আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান দ্বারা শয়তানের ওয়াসওয়াসা মুক্তি লাভ করে। শয়তানের ওপর আল্লাহর লানত অভিশম্পাত রয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে গোমরাহ বান্দাদের বিভ্রান্ত করার অনুমতি দান করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দা তাদেরকে স্পর্শ করার ক্ষমতাও আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে দান করেননি। শয়তান আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের কাছে অতি দুর্বল থাকে। মানুষ যতো শক্তভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করবে, শয়তান ততোই তাদের কাছে দুর্বল হয়ে উঠবে।

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এই হচ্ছে শয়তানের বন্ধুদের জন্যে রক্ষিত জাহান্নাম, শয়তানের বন্ধুদের জন্যে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো স্থান নেই। অপরদিকে মোমেনদের জন্যে রয়েছে 'জান্নাতুল খুলদ' তথা চিরন্তন জান্নাত, আল্লাহর বন্ধুদেরকে সেখান থেকে কখনো বের হতে হবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা,

'আর আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্য কার কথা হতে পারে?'

এখানে আল্লাহর উক্তিতে নিরেট সত্যের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনামূলক প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মোমেনদের জন্যে এ কথাটা বলে দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াদায় আস্থা স্থাপন করে, আর যে ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করে শয়তানের প্রতারণার তাদের মধ্যে কতোই না ব্যবধান!

কর্মফল নির্ধারণের মূলনীতি

মূলত বাস্তবতার ভিত্তিতেই মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়, আর সে কর্মফল সম্পর্কে এখানে ইসলামের মূলনীতির উল্লেখ করা হচ্ছে। সাওয়াব আর শাস্তির মানদন্ড কখনো আশা-আকাংখার ওপর নির্ভরশীল নয়। তা এক স্থায়ী মূলনীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যাতে কোনো ব্যতিক্রম হয় না, কোনো রদবদল হয় না, তা এমন এক বিধান, যার সামনে সকল জাতি সকল মানুষ এক সমান। বংশধারা দিয়ে কেউ এখানে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। কারো জন্যে এখানে নিয়মও লংঘন করা হবে না। কারো জন্যে আইনকে শিথিল করা হবে না। যে মন্দ কাজ করবে তাকে মন্দ প্রতিফল দেয়া হবে। যে ভাল কাজ করবে, তাকে দেয়া হবে ভালো প্রতিফল। এতে কোনো ব্যত্যয় হবে না, ঘটবে না কোনো ব্যতিক্রম।

'তোমাদের আকাংখার ওপর এর পরিণতি নির্ভরশীল নয়, নির্ভরশীল নয় আহলে কেতাবের আকাংখার ওপরও।'

ইহুদীরা বলতো, আমরা হচ্ছি আল্লাহর প্রিয়, গুটি কতেক দিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। এরা সর্বদাই বলতো, তারা হচ্ছে মনোনীত জাতি! হয়তো কোনো কোনো মুসলমানের

অন্তরেও এমন ভাবের উদয় হয়ে থাকবে যে, তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবতার কল্যাণের জন্যে যাদের উথান হয়েছে তারা যদি কিছু পাপ করে ফেলে আল্লাহ তায়ালা তা হিসাবের খাতা থেকে মুছে ফেলবেন। কারণ, তারা যে মুসলমান! এদের এবং ওদের সবাইকে 'আমর' তথা কর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে–এ আয়াতটি সকল মানুষকে একই মানদন্ডের দিকে নিয়ে যায়, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সমীপে সকলের আত্মসমর্পণ করা, মিল্লাতে ইবরাহীমী তথা ইসলামের অনুসরণ করা, যে ইবরাহীমকে খলীল তথা অন্তরংগ বন্ধু হিসাবে আল্লাহ তায়ালা বরণ করে নিয়েছিলেন। ইসলামই হচ্ছে সকল মতের সেরা মত। মিল্লাতে ইবরাহীমী হচ্ছে সর্বোত্তম এহসান। আর এহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর এবাদাত করা, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাই-পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন-এ ধারণা করা। সব বিষয়ে, সব ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা এহসান অবধারিত করে দিয়েছেন। এমনকি পশু যবাই করার সময়ও পশুকে কম কষ্ট দেয়া এবং ছুরিকে ধারালো করাও তিনি কর্তব্য করে দিয়েছেন, যাতে যবাই করার সময় তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দেয়া হয়।

আয়াতে দুদিকের মধ্যে এ সমতা বিধান করা হয়েছে, সমতা বিধান করা হয়েছে কাজ এবং তার প্রতিদানের মধ্যে। ঈমান কবুল হওয়ার জন্যে আমলের মধ্যে ঈমান থাকাটা হচ্ছে মূল শর্ত। আর সে ঈমান হবে সম্পূর্ণ আল্লাহর প্রতি।

'নারী-পুরুষ যে কেউ নেক আমল করবে এবং তারা মোমেনও হবে তবে, এমন লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণ যুলুমও করা হবে না।'

নারী-পুরুষ নির্বিশষে সকলের ক্ষেত্রে যে একই নিয়ম সেখানে কার্যকর, এ আয়াতটি হচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ। এটি একথাও প্রমাণ করে যে, ঈমান থেকে উৎসারিত নয়, এমন আমলের আল্লাহর কাছে কোনোই মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার জন্যে আমলের সংগে ঈমানও থাকতে হবে। এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। কারণ আল্লাহর প্রতি ঈমান নেক আমলকে নির্দিষ্ট চিন্তা আর জ্ঞান উদ্দেশ্য থেকে উৎসারিত করে। সেক্ষেত্রে এখানে ব্যক্তি বিশেষের কোনো কামনার জবাব দেয়া হয়, কিন্তু তাকে গ্রহণ করা হয় না, কেননা তা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন উদ্দেশ্যহীন কর্ম কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না।

ওস্তাদ ঈমাম মোহাম্মদ আবদুহু আমপারার তাফসীরে 'যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র ভালো কাজ করবে সে তার বিনিময় পাবে' এ আয়াতে ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তা এ স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন এই শব্দমালার বিরোধিতা করছে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, আয়াতের শব্দমালা মুসলিম অমুসলিম সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ কোরআনের অন্যান্য স্পষ্ট আয়াত এটাকে পুরোপুরিই নাকচ করে দেয়। অনুরূপভাবে ওস্তাদ শায়খ আরাগী যে মত ব্যক্ত করেছেন, আলোচ্য আয়াত তাও প্রত্যাখ্যান করে। আমপারার তাফসীরে আমি এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছি।

আল্লাহর এ উক্তি সত্যি সত্যিই মুসলমানদের কাছে কঠিন মনে হয়,

'আর যে কেউ মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রাপ্য দন্ড দেয়া হবে এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সে কোনো সমর্থক পাবে না, কোনো সাহায্যকারী লাভ করবে না।'

যারা মানব মনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতো তারা এটাও জানতো যে, প্রকৃতি যতোই সুস্থ আর বিশুদ্ধ হোক না কেন, যতোই তা ভালো হোক না কেন, মন্দ কাজ সে করবেই। মানুষের মন আসলে জিনিসটা কি, তারা জানতো–জানতো নিজেদের নফস সম্পর্কেও। নফসের এ দুর্বলতার ব্যাপারে তারা নিজেদের সংগে কখনো প্রতারণা করেনি। আর মাঝে মধ্যে মানব মনকে যে দুর্বলতা আচ্ছন্ন করে নেয়, সে বিষয়েও তারা ছিলো না অজ্ঞ-অনবহিত। এ কারণে তারা তা অস্বীকার করেনি, অথবা তাকে তারা গোপনও করেনি। কারণ, তারা নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা

অনুভব করতো, এ কারণে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠতো। তারা স্বীকার করতো যে, যেসব খারাপ কাজ তারা করছে, তার দন্ড তাদেরকে ভোগ করতে হবে, তার শাস্তি পেতে হবে। তাদের অন্তর এমনভাবে কেঁপে উঠতো, যেন কোনো এক ব্যক্তি তার ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখী হচ্ছে, এটাই ছিলো তাদের বৈশিষ্ট্য, এভাবেই তারা পরকালকে অনুভব করতো। তারা কার্যত এমনভাবে জীবন যাপন করতো যেন তারা পরকালেই রয়েছে। পরকাল ছিলো তাদের চিন্তা-চেতনায় আর অনুভূতিতে। পরকাল অবশ্যই আসবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এ কারণে তাদের অন্তর সর্বদাই প্রকম্পিত হতো।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র আমাদের কাছে, তিনি বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, আবু বকর (রা.) বলেছেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! প্রতিটি মন্দ কাজের পরিণাম ভোগ সংক্রান্ত এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমাদের কল্যাণের উপায় কি? যে মন্দ কাজই আমরা করি না কেন, তার ফল আমাদেরকে ভোগ করতে হবেই। নবী বললেন,

'হে আবু বকর! তুমি কি অসুস্থ হও না? তুমি কি বিপদে পড়ো না? তুমি কি দুঃখিত হও না? তুমি কি অসুবিধায় পড় না? তিনি বললেন, অবশ্যই এটা রাসুলুল্লাহ! নবী বললেন, এটাই হচ্ছে তোমাদের প্রতিদান, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়।'

হাকেম সুফিয়ান সাওরীব সূত্রে ইসমাঈল থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর ইবনে মারদুইয়াহ তাঁর সনদে ইবনে ওমরের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন আমি নবী (স.)-এর কাছে ছিলাম। তিনি তখন বললেন, হে আবু বকর! আমার ওপর যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, আমি কি তোমাকে তা পাঠ করে শোনাবো? আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে তা পাঠ করে শোনান। আয়াতটি শুনে বললাম আমি একটা ভার অনুভব করছি, আপনি তা দূর করুণ। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আবু বকর তোমার হয়েছেটা কি? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে খারাপ কাজ করেনি? যে কোনো খারাপ কাজ আমরা করবো, তার শাস্তি আমাদেরকে পেতে হবেই! তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আবু বকর এবং তোমার মোমেন সংগীরা! তোমরা যা কিছু খারাপ কাজ করবে দুনিয়াতেই তার প্রতিদান পাবে, তোমরা এমনভাবে আল্লাহর সংগে সাক্ষাত করবে, যেন তোমাদের কোনো গুনাহই নেই। অবশ্য অন্যদের জন্যে তা জমা করে রাখা হবে এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে (অনুরূপ বর্ণনা ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন)।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আয়েশার সনদে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোরআন মাজীদের কঠোর আয়াত কোনটি তা আমি জানি। রসূলাল্লাহ (স.) বললেন, আয়েশা কোন্‌টি সে আয়াত? আমি বললাম, 'মানুষ যাই করবে তার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে' এই আয়াতটি।

তখন রসূল (স.) বলেন, মোমেন বান্দার ওপর যেসব বিপদ-আপদ আসে, তা তার সব কিছুকেই পরিষ্কার করে দেয় (হাদীসটি ইবনে জরীর বর্ণনা করেছেন)। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

এই আয়াতটি নাযিল হলে মুসলমানদের কাছে তা খুব ভারী মনে হয়, তখন রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, 'তোমরা এটা বন্ধ করো এবং আমার নিকটবর্তী হও। কারণ, মোমেনের ওপর যেসব বিপদ আপতিত হয়, তা হচ্ছে তার জন্যে কাফফারা। এমনকি মোমেন যখন কাঁটা বিদ্ধ হয় এবং অকস্মাৎ যে যখন দুর্যোগে পড়ে, তাও তার জন্যে কাফফারা।'

যে কোনো অবস্থায়ই হোক না কেন, কর্ম আর তার প্রতিদান সম্পর্কে সঠিক ঈমানী ধারণা সৃষ্টিতে এ আয়াতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এক দিকে এ আয়াত চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করে, আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তার বাস্তব জীবনকে ঠিক করে দেয়। সন্দেহ নেই যে, এ আয়াতটি তাদের অস্তিত্বকে আন্দোলিত করে তোলে, মনকে প্রকম্পিত করে। কারণ, তারা ব্যাপারটা ভালো করেই জানতেন এবং এটাকে ভীষণভাবে গ্রহণ করেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং যথার্থ। এ ওয়াদা আর আখেরাতকে সামনে রেখেই তারা জীবন যাপন করতেন। কার্যত তাঁরা ছিলেন দুনিয়া থেকে দূরে।

আমল আর প্রতিদান প্রসংগে আবারও মন্তব্য করা হচ্ছে। মন্তব্য করা হচ্ছে উল্লেখিত শেরেক আর ঈমান সম্পর্কে। আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকেই সোপর্দ করা হয় আল্লাহর কাছে। জীবন পরবর্তীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুকেই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

'আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে এসব কিছুই আল্লাহর। আর সমুদয় বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।'

কোরআন মাজীদের বহু স্থান 'উলুহিয়্যাতকে' কেবল এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মালিকানা, কর্তৃত্ব-রাজত্ব প্রতাপ সম্পত্তি-এসবই নির্দিষ্ট করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর জন্যে। ইসলামের তাওহীদ কেবল আল্লাহর সত্ত্বাকে মৌখিকভাবে এক বলে মেনে নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামে তাওহীদের ধারণা হচ্ছে ইতিবাচক। বিশ্বে কর্তৃত্ব আর তার ক্রিয়ার মূল যে কথা তা হলো তাওহীদ, (আমার লেখা 'খাসয়েসুত তাছাওয়ারুল ইসলামী ওয়া মোকাওয়ামাতেহি' গ্রন্থের প্রথম খন্ড দ্রষ্টব্য।)

আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর এবং তিনি সমুদয় বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, কোনো বস্তুই তাঁর জ্ঞান আর কর্তৃত্বের বাইরে নয়, এবাদাত এবং উলুহিয়াত কেবল এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট ও বিশেষিত করার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কারণ। এ কারণে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চালাতে হবে। আর এ চেষ্টা চালাতে হবে তাঁর দেয়া জীবন বিধান মেনে নিয়ে এবং তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েই তা করতে হবে।

কোনো কোনো দর্শন আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, আবার কোনো কোনো দর্শন আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়কে অস্বীকার করে। আবার কোনো কোনো দর্শন আল্লাহর জ্ঞানকে অস্বীকার করে। কোনো কোনোটা আবার তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। আবার কেউ কেউ অস্বীকার করে তাঁর মালিকানাকে। এমনিভাবে অনেক কিছুই চিন্তা দর্শণ নামে সমাজে খ্যাত হয়েছে। এভাবে এ চিন্তাধারা নেতিবাচক হয়ে ওঠে, মানব জীবনে এগুলোর কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই তাদের কর্মকান্ড আর আচার-আচরনেরও। কোনো কর্তৃত্ব নেই তাদের নীতি আর চরিত্রেরও। এটা কিন্তু কোনো দর্শন নয়, ইসলামে যিনি আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীনের সব কিছু তাঁর জন্যেই নিবেদিত। তিনিই সমুদয় বস্তুর মালিক। তিনি সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন। সব কিছুর ওপর তিনিই একচ্ছত্র কর্তা। এ চিন্তার ছায়াতেই মানুষের মন পরিশুদ্ধ হয় তাদের আচার-আচরণ এবং তাদের গোটা জীবন পরিশীলিত হয়।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

فِى الْكِتٰبِ فِى يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ

اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى

بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَاِنِ امْرَاَةٌ

خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۖ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۖ وَاِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا اَنْ تَعْدِلُوا

بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ

وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

রুকু ১৯

১২৭. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, আর এ কেতাব থেকে যা কিছু তোমাদের ওপর পঠিত হচ্ছে, সেই এতীম নারীদের সম্পর্কিত (ব্যাপার), আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যেসব অধিকার দান করেছেন, যা তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও। অসহায় শিশু সন্তান ও এতীমদের ব্যাপারে (তোমাদের বলা হচ্ছে,) তোমরা যেন সুবিচার কায়েম করো; তোমরা যেটুকু সৎ কাজই করো আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছু সম্পর্কেই সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন। ১২৮. যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবজ্ঞার আশংকা করে, তাহলে (সে অবস্থায়) পারস্পরিক (ভালোর জন্যে) আপস-নিষ্পত্তি করে নিলে তাদের ওপর এতে কোনো দোষ নেই; কারণ (সর্বাবস্থায়) আপস (মীমাংসার পন্থাই) হচ্ছে উত্তম পন্থা, (কিন্তু সমস্যা হচ্ছে) মানুষ আপসে লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে; (কিন্তু) তোমরা যদি সততার পন্থা অবলম্বন করো এবং (শয়তানের কাছ থেকে) নিজেকে রক্ষা করো, তাহলে (সেটাই তোমাদের জন্যে ভালো, কারণ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকান্ড অবলোকন করে থাকেন। ১২৯. তোমরা কখনো (একাধিক) স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও (মনে প্রাণে) তোমরা তা চাইবে, তাই তাদের একজনের দিকে তুমি (সমস্ত মনোযোগ দিয়ে) এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, (দেখে মনে হবে) আরেকজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় (রেখে দিয়েছো); তোমরা যদি সংশোধনের (চেষ্টা করো এবং) আল্লাহ তায়ালাকেও ভয় করো, তাহলে (তুমি দেখবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ
يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩০. (অতপর) যদি (সত্যি সত্যিই) তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ভান্ডার থেকে দান করে তাদের সবাইকে পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, আল্লাহ তায়ালা (নিসন্দেহে) প্রাচুর্যময় ও প্রশংসাভাজন। ১৩১. আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমাদের আগেও যাদের কাছে কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, তাদের আমি এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে; (আমি) তোমাদেরও নির্দেশ দিচ্ছি, আর যদি তোমরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আকাশ-পাতালে যা কিছু আছে সব কিছুই তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সব প্রশংসা তাঁরই (প্রাপ্য)। ১৩২. অবশ্যই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের মালিকানা তাঁর, যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট! ১৩৩. হে মানুষ, তিনি চাইলে যে কোনো সময় (যমীনের কর্তৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারণ করে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এ কাজে তিনি অবশ্যই ক্ষমতাবান। ১৩৪. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতেই (তার) পুরস্কার পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালার কাছে তো ইহকাল পরকাল (এ উভয়কালের) পুরস্কারই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন।

তাফসীর

আয়াত-১২৭-১৩৪

জাহেলী যুগে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যে সব রীতি নীতি চালু ছিলো তার ভ্রান্তি ও ক্ষতি থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে সূরাটির শুরুতে বিশদ আলোচনা এসেছে এবং বর্তমান অধ্যায়ে তার পরিপূরক কথাগুলো পেশ করে মানুষকে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে নারী ও পরিবার সংগঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সমাজের এতীম ও শিশুসহ সকল দুর্বল লোকদের সম্পর্কে। তারপর এসব কুসংস্কার থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করে এক মহান সত্ত্বার প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, যাতে করে গরীব ধনী উভয় দল একই সাথে বসবাস করতে পারে, সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিটি শক্তিশালী হতে পারে। পারিবারিক বন্ধনসমূহ এবং পারিবারিক জীবনে নানাবিধ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারে। পরিবার সংগঠনে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রথম। কোনো বাড়ীতে যখন কোনো এক ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকে তখন তার স্ত্রী তার অনুগামী হয়। এভাবে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এক সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার। তাদের পারস্পরিক চেষ্টার মাধ্যমে মযবুত হয় পারিবারিক বন্ধন এবং কোনো সমস্যা জটিল হওয়ার পূর্বেই নানা কারণে সংগঠিত নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতিসম-হকে সংশোধন করে নিতে পারে। মানুষের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের মূলত সূচনা হয় এই পারিবারিক জীবন থেকে এবং সে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মায়ের কোলের বাচ্চার ভূমিকা মোটেই নগণ্য নয়। এই বাচ্চার মহব্বতেই পারিবারিক জীবনের অনেক ভাংগন থেমে যায়। এমনি করে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের প্রতি সদাচারণ ও কর্তব্য পালন করার কারণে সংগোপনে অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে থাকে যা অনেক সময় অনেক সাবধানী চোখেও ধরা পড়ে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ কোরআনের এই ধরনের কিছু জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা আমরা দেখতে পাবো, যা গোটা সৃষ্টি জগতের মূল ধারার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল এবং আরো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ সকল বিষয়ই আদিগন্ত বিস্তৃত সৃষ্টি মল্লিকার পথে একই সূতায় গাথা এবং তা আলোচ্য আয়াতসমূহের যে কোনো পাঠকের কাছে ধরা পড়বে বলে। নারী, ঘর, পরিবার এবং সমাজের দুঃস্থ জনতা, এই চারটি বিষয় হচ্ছে যে কোনো জনপদের জন্যে চরম গুরুত্ববহ এবং সত্যিকারে বলতে কি সামাজিক শান্তি বিধানের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকাটাই সর্বপ্রধান। তাই সূরাটির সর্বত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে, বিশেষ করে চতুর্থ অধ্যায়টি মনে হয় পারিবারিক জীবন সম্পর্কেই নিবেদিত। এ অধ্যায়ে মুসলিম সমাজকে জাহেলিয়াতের বিভিন্ন রীতি নীতি ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করার জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক মান বৃদ্ধির, যাতে করে চতুষ্পার্শ্বস্থ বিরূপ পরিবেশে এর কার্যকর প্রভাব পড়ে এবং মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং এখনও যারা দ্বীন ইসলা-মের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারেনি তারাও যেন বিমুগ্ধ নয়নে এ মর্মস্পর্শী জীবন ব্যবস্থার সম্মোহনী প্রভাবকে অবলোকন করে। বস্তুত ইসলামের এ জীবন পথের আগমন কারো পরিচালন-াধীনে থাকার জন্যে নয় বা অন্য কোনো ব্যবস্থার সামনে এ ব্যবস্থা নতি স্বীকার করতে পারে না।

আসুন, এবারে আমরা কোরআনের আয়াতগুলোকে পুংখানুপুংখরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি।

ওরা জিজ্ঞাসা করছে, তোমাকে নারীদের সম্পর্কে, বলো (হে রসূল) আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন। কালামে পাকে যা কিছু আলোচনা এসেছে এসব এতীম মেয়েদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের পাওনা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দাও না, অথচ তাদেরকে বিয়ে করার জন্যে তোমরা লালায়িত। আর যে সকল এতীম বালক তোমাদের তত্ত্বাবধানে এসে যাওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে তাদের প্রতি সঠিক ব্যবহার করার জন্যেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা সকল এতীম বালক বালিকার প্রতি সুবিচার করো। জেনে রেখো, যা কিছু ভাল কাজ তোমরা করবে সে সবই আল্লাহ তায়ালা জানবেন।

নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোরআন

সূরাটির প্রারম্ভে স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তাদের যে সব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে সে বিষয়ের সমাধান কল্পে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে এবং চমৎকারভাবে এতে তাদের সমাধান পেশ করা হয়েছে, মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও এতে জবাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের জীবন জিজ্ঞাসার অনেক জটিলতারও দূর করা হয়েছে যাতে করে উদীয়মান এ মুস-লিম সমাজ আশপাশের সকল জনপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং মুসলমানরাও যেন তাদের জীবনের নানা প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে। ইসলামের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ এসব কথা আরবের বহু ব্যক্তিকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করেছিলো এবং তারা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু জাহেলী যুগে চলতে থাকা অনেক প্রথা সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন জাগতে থাকে, ইসলাম কি এ প্রথাগুলো রহিত করবে, না সেগুলোকে বৈধ বলে ঘোষণা করবে। এই কারণেই তারা দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের জবাব পাওয়ার উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-এর দরবারে হাযির হতো। তাদের এই জাগ্রত মনোভাব এবং ইসলামের সকল ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা সঠিকভাবে চলছে কিনা তা জানার প্রবল আগ্রহকেই আলোচ্য অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও কিছু কিছু জাহেলী রীতি-নীতির প্রতি কিছু আকর্ষণ তাদের অন্তরে তখনও বর্তমান ছিলো। অতএব, এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইটিই যে, ইসলামের বিধি মোতাবেক চলার প্রবল আকাংখাই তাদেরকে নানা প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মনের মধ্যে যখনই যে কোনো প্রশ্ন উদিত হয়েছে, সংগে সংগে তা সমাধানের জন্যে তারা নবী (স.)-এর দরবারে হাযির হয়ে গেছে। তাদের এ জিজ্ঞাসা শুধু প্রশ্নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন অথবা শুধু জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ছিলো না, যেমন আজকের অনেক মুফতী ছাহেবান লক্ষ্যহীনভাবে বাহাস মোবাহাসাতে লিপ্ত হয়ে যায়।

দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সঠিক বুঝ ও জ্ঞান মুসলিম জাতির আজ বড় প্রয়োজন, কারণ এই জ্ঞানের হাতিয়ার দিয়েই আধুনিককালের নব্য জীবন ব্যবস্থার মোকাবেলা করা সম্ভব। এই সঠিক জ্ঞান লাভের জন্যে মুসলমানদের মধ্যে থাকতে হবে প্রবল এক বাসনা। যাতে করে বাস্তব জীবন ও দ্বীন ইসলামের বিধানের মধ্যে তারা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের সমতুল্য আলো তারা দেখতে পায়, অন্ধ আনুগত্য, নানা প্রকার বদ অভ্যাস, কুসংস্কার এবং মানব নির্মিত হুকুম আহকামের মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সুতীব্র অনুভূতি ও সমুচিত মূল্যবোধ নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে ইসলাম প্রদত্ত এই পরিপূর্ণ পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারে বরং প্রকৃত সত্য এই যে, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করার পরে যে নতুন জাতির জন্ম হয়েছে তা অতীতের যে কোনো জাতি থেকে সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে।

এ পর্যায়ে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের মধ্যে যে মনোভাব আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে, তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির প্রবল বাসনা এবং রসূল (স.)-এর আনুগত্য করার স্বতস্ফূর্ত আকাংখা, আর এটা অবশ্যই আল্লাহরই বিশেষ মেহেরবানী যার কারণে ওদের প্রশ্নের সঠিক জবাব তারা তাঁর কাছ থেকে যথা সময়ে পেয়ে গেছে।

'আর ওরা তোমার কাছে নারীদের জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিষয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছেন।'

ওরা এসে রসূল (স.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করছিলো আল্লাহ তায়ালা সে সব প্রশ্নকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে নবী (স.)-কে বলছেন, বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সে সব বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। এরপর বাকি কথাগুলো আয়াতের মধ্যে আসছে। এখানে প্রশ্নকারীদের এমন মর্যাদা দেয়া হয়েছে যা দেখে আল্লাহর মহান করুণারই অংশ বলে বুঝা যায় এবং মুসলিম জামায়াতের জন্যে এটা এক বিশেষ সম্মান, কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে সম্বোধন করছেন এবং যথাযথভাবে তাদেরকে পরিচালনা করছেন, যার ফলে মুসলিম উম্মাহ সত্যি সত্যি এক নতুন জীবন লাভ করছে।

জাহেলিয়াতের সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা নতুন এই সমাজের লোকেরা আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে গিয়ে মাঝে মাঝে যে সব সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলো তার নিরসনের জন্যে রসূল (স.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতো এবং সঠিক পথ খুঁজে নিতে গিয়ে যে আগ্রহ প্রদর্শন করতো তারই একটি জীবন্ত ছবি এ আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

'বলো, (হে রসূল), আল্লাহ তায়ালা তাদের (সে স্ত্রী লোকদের) সম্পর্কে তোমাদেরকে চূড়ান্তভাবে জানাচ্ছেন।'....

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আলী ইবনে আবি তালহা বর্ণনা করছেন, জাহেলী যুগে বহু এতীম বালিকা সমাজপতিদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো। অতপর সেই আশ্রয়দাতারা তাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে কোনো সময় (মাল্যদানের ন্যায়) তাদের ওপর চাদর নিক্ষেপ করতো, যার ফলে চিরদিনের জন্যে তারা অপর লোকের জন্যে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো এবং কেউ আর তাদের বিয়ে করতে পারতো না। আর সুন্দরী হলে তো কথাই ছিলো না। তাদেরকে সেই আশ্রয়দাতারা বিয়ে করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। আর চেহারা-ছবি আকর্ষণীয় না হলে মৃত্যুদম পর্যন্ত তারা কোনো পুরুষের সংগ পেতো না। আর মারা গেলে তাদের আশ্রয়দাতারা তাদের উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতো। এ পথকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রহিত বলে ঘোষণা করেন এবং স্পষ্টভাবে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন এধরনের দুর্বলতায় আবদ্ধ ছেলেদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। জাহেলী যুগে এদের অবস্থা এতোই মর্মন্তুদ ছিলো যে (তখনকার সমাজ ব্যবস্থায়) বালক বা বালিকাদেরকে পিতামাতা বা ভাই ব্রাদারের উত্তরাধিকার দেয়া হতো না। তাই এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, সে সব মেয়েদের পাওনা হিসাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে না দেয়ার এ অভ্যাস চালিয়ে যাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক অংশিদারের অংশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন 'মেয়েদের অংশের দ্বিগুণ পুরুষরাও পাবে, চাই তারা ছোট হোক বা বড় হোক।'

'সাঈদ বিন যোবায়র বলেন, কালামে পাকের এ আয়াতে' এতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ সুশ্রী চেহারার অধিকারিণী হলে সে সব বালিকাদের

সম্পর্কে অভিভাবকরা বলতো, আমি তাকে নিকাহ করেছি এবং তাকে স্ত্রী হিসাবে আদরের সাথে গ্রহণ করেছি। কিন্তু মেয়েরা সম্পদশালীনী বা সুন্দরী না হলে অন্যের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দিতো কিন্তু নিজেরাও তাদেরকে ভোগ ব্যবহার করতো।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, এরা হচ্ছে প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার কাছে কোনো এতীম বালিকা আশ্রয় প্রার্থীনী হয়ে পড়লে সেই ব্যক্তি তার অভিভাবক ও উত্তরাধিকার হয়ে যেতো। ফলে সেই মেয়েকে সে ব্যক্তি তার নিজের মাল দৌলতের সাথে একীভূত করে নিতো। এমনকি সে মেয়েটির খেজুরের কান্দিগুলোকেও তার নিজের বানিয়ে নিতো। তারপর তাকে বিয়ে করে নিতো। তারা চাইতো না যে, তাকে অন্য কেউ বিয়ে করে তার সম্পদে অংশীদার হয়ে যাক। এমনিভাবে তাকে সমস্যায় ফেলে দিতো যার কারণে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে (বোখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আবী হাতেম বলেন, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহসহ আমি হাদীসটি পড়েছি, যাতে আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়, 'এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা রসূল (স.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'আর ওরা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা ওদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন'।

তোমাদের কাছে কেতাবের যে আয়াতটি পেশ করছেন। কেতাবে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রা.) যে আয়াতটির কথা উল্লেখ করেন তা হচ্ছে এই প্রথম আয়াত, যাতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর যদি তোমাদের ভয় হয়ে যে তোমরা সুবিচার করতে পারবে না এতীম (স্ত্রীদের) ব্যাপারে সে অবস্থায় নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো তাদেরকে বিয়ে করো।'

এখানেও একই প্রকার বর্ণনা ধারায় আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর এই বাণী যে,

'তোমরা তাদের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে আগ্রহ বোধ করো অর্থাৎ তোমাদের কার্যত এ আগ্রহ যে সে এতীম বালিকা যার তেমন সম্পদ নেই, নেই তেমন কোনো রূপ-চেহারা, এমতাবস্থায় সে তোমার বাড়ীতে রয়েছে বলে তাকে বিয়ে করে তার প্রতি অবহেলা করবে, তা না করে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে বলে মনে করতে পার তবে বিয়ে করো।'

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনামতে স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, এতীম যুবতীদের সাথে জাহেলী যুগে নিদারুন দুর্ব্যবহার করা হতো। এ সব এতীম মেয়েদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে সমাজপতিরা যুগপৎ লালসা চরিতার্থ করতো এবং তাদেরকে ধোঁকা দিতো বা পাওনা থেকে বঞ্চিত করতো। তারা তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো এবং তারা তাদেরকে তাদের পাওনা মোহর থেকে বঞ্চিত করতো। বিয়ে করে নিলে সম্পদ ভক্ষণ ও মোহর থেকে বঞ্চিত এ উভয়টাই করতে পারতো। আর দেখতে ভালো না হলে সেক্ষেত্রেও অন্য কেউ তাদের সম্পদের মালিক হয়ে যাবে বলে তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে দিতো না; এভাবেও তাদেরকে বঞ্চিত করতো।

একই প্রকার দুর্ব্যবহার করা হতো শিশু ও বয়স্ক মহিলাদের সাথেও। তাদেরকেও দুর্বল পেয়ে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো, যেহেতু তারা তাদের হক বুঝে নেয়ার মতো শক্তি রাখতো না অথবা লড়াই ঝগড়া করার ক্ষমতা তাদের থাকতো না। আর এই কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ তার ভোগ দখল করতে পারতো না। তৎকালীন গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থার নীতি এটাই ছিলো যে, লড়াই করে যারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো তারাই তাদের পাওনা আদায় করে নিতে পারতো। দুর্বলদের অধিকার লাভ সে নিষ্ঠুর সমাজে মোটেই স্বীকৃত ছিলো না।

একটি সভ্য সমাজের গোড়াপত্তন

প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিলো এই যুক্তিহীন ও অন্ধ আনুগত্য, যা পরিবর্তন করার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মানবতার ক্রমবিকাশের এমন সুন্দর পথ দেখিয়েছে যা ইতিপূর্বে আর কখনও সংঘটিত হয়নি। এ বিষয়ে যদি বলি এ সম্মোহনী ব্যবস্থা হঠাৎ করে আকাশ থেকে নেমে এসেছে অথবা আরব সমাজে অকস্মাৎ এক সাংঘাতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে–তাহলে এ কথা মোটেই ঠিক হবে না; বরং প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, এ ছিলো সে সমাজের জন্যে এক পূর্নজাগরণ এবং মানবতার নতুন জীবন লাভ। আর এই জাতির জন্যে এমন এক সত্য-প্রাপ্তি যা জাহেলী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চরিত্রের অধিকারী। আর যে বিষয়টিকে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে ইসলামের এই সামাজিক পুনর্বিন্যাস মানব রচিত প্রাচীন কোনো ক্রমধারার পদাংক অনুসরণ করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি অথবা বাস্তব কোনো বস্তুগত পরিবর্তনের ফলেও হঠাৎ করে এ জাতির জীবনে এ পরিবর্তন আসেনি।

সুতরাং মানবাধিকর প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেই অবস্থাকে সামনে রেখে চরম গুরুত্ব সহকারে উত্তরাধিকার ও সত্ত্বাধিকার আইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন শিশু এতীম ও অসহায় নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান। মানবতা প্রতিষ্ঠার তাগিদেই তাদেরকে এ অধিকার দিতে হবে। এ জন্যে নয়, যে, তারা এ অধিকার পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে! তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এ অধিকার কিছুতেই দেয়া হতো না। যেহেতু সে সময়কার যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারিশদের প্রতি না ছিলো তাদের কোনো মায়া মমতা, আর না কোনো ছিলো অনুকম্পাবোধ, তাদেরকে চরম অবহেলা করা হতো, তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের স্বর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়া হতো। চরম নিষ্ঠুর এই আচরণ রোধ করার মতো কোনো সামাজিক সংস্থা ছিলো না।

আফসোস আজ সভ্যতা গর্বী এই পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের মধ্যেও মাবতার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। কতো অসহায় নর-নারী আজ মানবতার দুয়ারে আর্তনাদ করে ফিরছে, তাদের ফরিয়াদ শোনারও কেউ নেই। এধরনের এক সংকটাবর্তে পৃথিবী যখন নিমজ্জিত, তখনই এলেন শান্তির পতাকা হাতে আরব-শার্দুল মহান নবী মোহাম্মদ (স.)। ইসলামের এ সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করতে লাগলেন তিনি নিগৃহীত মানবতাকে। এ ছিলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে মানবতার পুনর্জন্ম। এই পুনর্জন্মের আলোচনাই আল কেতাব মহান কোরআনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে; নবী (স.) প্রদর্শিত জীবন পথের প্রতিটি পদক্ষেপে ঘোষিত হয়েছে মানবতার এ বিজয় বার্তা। মহানবী (স.) আরবের উর্বর ধূসর মরুভূমিতে শিশু মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন করলেন। এ বিপ্লব কোনো ফল ফসল বা বস্তুগত কোনো কিছুর উৎপাদনমুখী সংগ্রাম ছিলো না, এ বিপ্লব অর্থনৈতিক কোনো উন্নতির লক্ষে সংঘটিত হয়নি। না এখানে প্রদত্ত হয়েছে কোনো রংগীন শ্লোগান, বরং এ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মানুষের মন মানসিকতার কেন্দ্র-বিন্দুতে, তার চিন্তাধারায় তাদের হৃদয়ানুভূতিতে এবং এইভাবেই বিশ্ব মানবতার নতুন জীবন লাভ সংঘটিত হয়েছে।

বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, কোরআনের এই জীবন পথ রচনা লগ্নে প্রয়োজন হয়েছে এক চরম সংগ্রামের, দীর্ঘস্থায়ী এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে মানুষের মনমগযের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় চিন্তাধারায় শেষ চিহ্নগুলোকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে, বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে। অবহেলিত, অধপতিত অসহায় নরনারীর জীবনের মান উন্নয়নের সুপরিকল্পিত প্রয়াসে, মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে। এটাও বাস্তব সত্য যে, জাহেলিয়াত কখনো সহজে ময়দান ছেড়ে দেয়নি, বরং তার শেষ রশ্মিটুকু নিভে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, জাহেলিয়াত ময়দানকে দখলে রাখার জন্যে তার সর্ব শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। এমনকি বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো স্থানে

জাহেলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেও সক্ষম হয়েছে অথবা বিভিন্নভাবে জাহেলিয়াতের বিধি-বিধানকে নানা প্রকার রংগীন পোশাক পরিয়ে ময়দানে হাযির করার প্রয়াস পেয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য সর্ব প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আসমান থেকে অবতীর্ণ জীবন পদ্ধতিই একমাত্র ব্যবস্থা যা পৃথিবীর সকল পর্যায়ের মানুষকে শান্তি দিতে পারে এবং এ জীবন পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মানুষের চিন্তা ভাবনার এক সুনির্দিষ্ট ধারা। এই জীবন পদ্ধতির ভিত্তিতেই বস্তু শক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায় এবং তখনই সমাজের শান্তি শৃংখলা বিধান করা ও ইনসাফপূর্ণভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনে বস্তু শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এমন কখনও হয়নি যে, কোনো বস্তু আপনা আপনি পয়দা হয়ে গেছে অথবা কোনো জিনিসের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিপরীত কোনো সুপ্ত গুণ অকারণে বদলে গেছে-অথবা কমিউনিজমের স্থপতি কার্ল মার্কসের থিওরি অনুযায়ী মানুষগুলো সব নিজে নিজেই ভালো হয়ে গেছে। বরং সকল কিছুর পেছনে মহান সেই সত্ত্বার ইচ্ছা কাজ করছে, যিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই মানুষের ধ্যান-ধারণার মধ্যে পরিবর্তন আনেন এবং জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা তাঁরই দান। প্রতিটি জিনিসকে তার সঠিক স্থানে সংস্থাপন করার প্রয়োজনে যাবতীয় বস্তুর উপায় উপাদানের মধ্যে তিনিই পবির্তন সাধন করেন। এ কথা নবী (স.)-এর দেশের বিদগ্ধ জনতার কাছে একেবারে অজানা ছিলো তা নয়, তবে তাদের কাছে একেবারেই নতুন অভিনব যে জিনিসটি মনে হচ্ছিলো তা ছিলো মানুষের ইন্দ্রিয় চেতনার উর্ধে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি। সে সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে তার অভিনবত্ব এবং সেই মহান সত্ত্বার কাছ থেকে অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে বিস্ময়বোধ। সুতরাং সেই জাগ্রত বিবেকের অধিকারী ব্যক্তিরা নবী (স.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে, যাদেরকে তিনিই সত্যানুভূতি দান করেছেন, আর দাওয়াতী কাজের সেই স্তর থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেই পর্যায়ে যখন সমাগত তখন মানুষ তীব্রভাবে অনুভব করছে যে, তারা ইসলামের আলোকে নতুন জীবন লাভ করেছে। নতুন প্রজন্মের গোটা জীবনের চেহারাই পাল্টে গেছে। জাহেলিয়াতের আমলে গড়ে ওঠা মানুষের যাবতীয় রীতি-নীতি ও ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। পুরাতনের যাবতীয় গতিধারা উত্তরণে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষ যতো কঠিনই হোক না কেন, তা আজ সমাপ্ত প্রায়, যেহেতু নতুন এ প্রজন্মের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আগত সম্মোহনী বার্তা যা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে শান্তি ও কল্যাণে ভরে দিয়েছে, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বেদনাকে বিদূরিত করেছে, আর বিবর্তনকালে সংঘটিত ত্যাগ কোরবানীর নিদারুন জ্বালা মুছে দিয়েছে। নতুন এ প্রজন্মের ধারণা বিশ্বাসে, ইসলামের আলোকে গড়ে ওঠা আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রথম ও শেষ কথা। কল্যাণমুখী এই ইসলামী সমাজের মধ্যে শান্তি বিস্তারের এ সমারোহ তাদের নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং গোটা মানব পরিমন্ডলকে শান্তির এ বন্যা প্লাবিত করতে বদ্ধপরিকর। (১) এই পর্যায়ে এসে শেষ হচ্ছে কোরআনে কারীমের সেই আয়াতের তাফসীর যা প্রশ্নকারী মোমেনের জিজ্ঞাসার জবাবে নাযিল হয়েছিলো। তাদের এ প্রশ্নের বিষয় ছিলো, সামগ্রিকভাবে নারী সমস্যা, এতীমদের অধিকার এবং দুর্বল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের অধিকার। এসব দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা শেষ করতে গিয়ে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে সত্যের সেই উৎসমূলের কথা যাঁর কাছ থেকে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে প্রেরিত হয়েছে এ শান্তির পয়গাম। এরশাদ হচ্ছে,

(১) লেখক রচিত 'হাযাদ্দিন' ও 'ফী যিলালিল কোরআন'-সূরায়ে আবাসা (আমপারা ২২তম খন্ড) দ্রষ্টব্য

'আর যা কিছু কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে সে বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত।'

এটা ভুলে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়, নয় এটা মুছে ফেলার মতো কোনো জিনিস। মানুষের মংগল বিধানের জন্যে তুমি কিছু করবে আর তা স্মরণের পাতা থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে যাবে বা সৃষ্টির রেকর্ড থেকে তা অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে! না তা হতে পারে না, আল্লাহর অবিনশ্বর রেকর্ডে তা অম্লান হয়ে থাকবে চিরদিন।

এটাই হচ্ছে সেই শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল যেখানে মোমেন তার কাজ নিয়ে ফিরে যাবে। যেখানে ফিরে যাওয়াই হয় তার বড় কামনা। একমাত্র সেই দিকেই তার নিয়ত ও প্রতিষ্ঠাকে সে পরিচালনা করে চলছে। আর এই উদ্দেশ্যেই তার সকল শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয়িত হচ্ছে। অপরের মধ্যেও এই মহান প্রেরণা জাগিয়ে তোলার জন্যে দিবারাত্র তার প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ড ব্যয়িত হচ্ছে। জীবনের সকল কাজ ও তৎপরতায় একমাত্র এই চিন্তাই তাকে সদা গতিশীল করে রাখে।

এ প্রসংগে কোন যুক্তিতে সে কি করবে, তা বলে দেয়া, কোন দিক সে যাবে সে গতিপথগুলো বলে দেয়া, বিভিন্ন গতিপথ আবিষ্কার করা বা বিভিন্ন সংগঠন স্থাপন করাই আসল জরুরী বিষয় নয়। আসল জরুরী বিষয় হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যার ওপর ভর করে সেই সব দিক নির্ণয়, পথ রচনা ও সংগঠনগুলো কাজ করে। ক্ষমতার মধ্যে তা কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত যুক্তি-বুদ্ধি, জীবন পদ্ধতি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং দুনিয়ার কোনো স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাধরের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহর যে কোনো এক বান্দার কাছ থেকে গৃহীত এ সকল ব্যবস্থা অন্য আরও বহু মানুষের তৈরী ব্যবস্থার অনুরূপ ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক। যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হোক না কেন এবং যে কোনোভাবেই যাচাই করা হোক না কেন প্রতিটি দিক বিবেচনায় দেখা যাবে মানব নির্মিত সবকিছুর মধ্যে একই প্রকার সংকীর্ণতা এবং একই প্রকার সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। বিভিন্ন ব্যক্তির তৈরী ব্যবস্থাগুলো উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এক হলেও কার্যপদ্ধতি ও অন্যান্য দিকে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে এর ফল বা পরিণ-তিও কিছুতেই এক হতে পারে না। এ কথাগুলো দ্বারা আমি আশা করি আমার মূল বক্তব্য তুলে ধরতে পেরেছি। এবং আমি মনে করি এতোটুকু আলোচনাই এ পর্যায়ে যথেষ্ট। একটু দীর্ঘ হলেও এ কথাগুলো পেশ করলাম যাতে করে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার হক আদায় করেছি বলে অনুভব করতে পারি এবং আল্লাহর বিধানই চূড়ান্ত ও সমুন্নত এবং বান্দার কথা নশ্বর-একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় কোরআন

এরপর আসছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি পদক্ষেপ পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনা। ইসলাম যে সমাজ গড়ে তুলেছে তার মধ্যে পরিবার হচ্ছে এক গভীর সমুদ্র, যার পরিচালনার মধ্যে জীবনের প্রতিটি বিষয়েই নিহিত। পরিবারকে যদি আল্লাহর আরশ থেকে আগত বিধান মতে চালানো হয়, তাতে দুনিয়াবাসী কি ভাবলো না ভাবলো তার পরওয়া না করা হয় বা দুনিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে নযর সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর বিধানকে কার্যকরী করার জন্যে বলিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়, তাহলেই ইপ্সিত ফল আশা করা সম্ভব। সেই পরিবার সংগঠন সম্পর্কে আল্লাহর বাণী,

'যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি আশংকা করে... অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞময় মহাজ্ঞানী।'

স্ত্রী-পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি বা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কি করতে হবে সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা এসেছে এবং পারিবারিক জীবনে শান্তি বিধান কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে সব বিষয়ে

বর্ণনাও এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে এসে গেছে। এখন, স্বামীর পক্ষ থেকে সীমা অতিক্রমমূলক ব্যবহার ও বাড়াবাড়ি হলে, যখন স্ত্রীর নিরাপত্তা ও মানসম্মান বিপদ গ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে এবং এর ফলে গোটা পরিবারে সর্বদিক দিয়ে অশান্তি নেমে আসতে থাকবে, তখনকার জন্যেই এ ব্যবস্থা। অবশ্যই মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল। যখন কখনও তার চেতনা ও বুঝশক্তির পরিবর্তন হয় সে সকল অবস্থায় ইসলাম মানুষের জন্যে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যখন সে অবস্থার সৃষ্টি হবে ইসলাম তার সমাধান দিয়েছে এবং শান্তি স্থাপনের জন্যে সঠিক পথ ও এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের সেই দৃঢ়তা গড়ে উঠেছে, যার রূপ রেখা ইসলাম দিয়েছিলো।

এখন যদি কোনো স্ত্রীলোক কঠিন ব্যবহার পেতে শুরু করে এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার তাকে আল্লাহর কাছে সব থেকে ঘৃণ্য হালাল বস্তু-তালাক প্রাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যায় অথবা স্বামী যদি অসন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে যোগাযোগ রাখা ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ স্ত্রীর মর্যাদাও দেয় না, তালাকও দেয় না; বরং ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়, সে অবস্থায় সে স্ত্রীলোক অথবা তার স্বামীর জন্যে এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্যে সেই স্ত্রীলোকের মোহর অথবা খোরপোষের দাবী থেকে পরস্পারিক বুঝাপড়ার মাধ্যমে কিছু কম করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে যে খরচ পত্র পাওনা আছে তার একাংশ অথবা পুরোটাই ছেড়ে দিতে পারে। অথবা এটাও করতে পারে, যদি মহিলাটির কোনো সতীন থাকে, তখন সেই সতীনের জন্যে নিজের অংশ অথবা স্বামীর সাথে রাত্রি যাপনের অধিকারকে সে (সাময়িকভাবে) পরিত্যাগ করতে পারে। অবশ্য, এটা একমাত্র তখনকার জন্যে যখন সে মহিলার প্রতি তার স্বামীর কোনো আকর্ষণ না থাকে অথবা তার খোরপোষ দেয়া বন্ধ করে দেয়। সর্বাবস্থাতেই স্ত্রীলোক তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং এ পদক্ষেপ তালাক থেকে অবশ্যই ভালো। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার অথবা পরিত্যাক্ত হবার আশংকা করে, সে অবস্থায় তাদের জন্যে কোনো সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে কোনো বাধা নেই'

এই আয়াতে সেই আপোষের কথা বলা হয়েছে যার দিকে আমরা ইংগীত করেছি। এরপরের নির্দেশে জানানো হচ্ছে যে, সংসারে কোনো ভাংগন ও বিচ্ছিন্নতা দুর্ব্যবহার বা তালাকের পরিবর্তে আপোষ সব সময়ের জন্যেই ভালো। তাই বলা হচ্ছে, 'আপোসই উত্তম', এই আপোস মীমাংসা দ্বারা শুষ্ক-কঠিন হৃদয়ে পুনরায় মোহাব্বতের মৃদু সমীরণ বয়ে যায়, ভালোবাসা আবেগে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে প্রস্তুত কঠিন হৃদয়ে আবার দাম্পত্য বন্ধন ও পাবিরিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রবল আগ্রহ জন্মায়।

মানুষের বাস্তব জীবনের সর্ব-বিষয়কে পরিশুদ্ধ করার কাজই ইসলাম প্রতিনিয়ত করে চলেছে। এ মহান ব্যবস্থা কার্যকরভাবে এবং সকল উপায়ে এ একই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে, যাতে করে মানুষের মেযাজ ও প্রকৃতির মহান যে উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়েছিলো সেই মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে সে উন্নীত হতে পারে। এই কারণেই ইসলাম তার স্বভাব ও তার প্রকৃতিগত সীমা উপেক্ষা করতে চায় না বা তার সাধ্যের বাইরে জোর করে তাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেয় না, এ কথাও বলছে না, দেয়ালে মাথা ঠুকরে মরো, আমি কিছু বুঝতে চাই না, তুমি তা পারবে কি, না পারবে ওটা আমি জানতে চাই না। এই ধরনের মানব-কল্যাণ বিরোধী ও অযৌক্তিক ব্যবস্থার নাম ইসলাম নয়।

সৃষ্টির সেরা মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ও ক্রটি বিচ্যুতি টিকে থাকবে এটা ইসলাম বরদাশত করতে রাযী নয়, এবং কদর্য চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্তেও কারও প্রশংসা করা হবে তাও ইসলাম চাইতে পারে না, 'মন চায়'-এই যুক্তিতে সে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে চালিত হবে তাও ইসলাম কিছুতেই মেনে নেয় না! ইসলাম এও চায় না আল্লাহর রশি ধরে সে হাওয়ায় উড়ে বেড়াক আর পৃ-

থিবীর মাটির সাথে তার কোনো সম্পর্ক না থাকুক, এমন-বুযুর্গি গড়ে তোলা ইসলামের কাজ নয়, এতে যদি সে গর্ব বোধ করে যে, সে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে তাহলেও ইসলাম সে অবস্থাকে স্বীকার করে না।

ইসলাম দুটি চরম অবস্থার মাঝামাঝি মধ্যম পন্থার নাম। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতির বিধান, এ বিধান বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী অথবা বলা যায়, এ বিধান বাস্তব অবস্থাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, যাতে করে সবকিছুকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়। ইসলাম মানুষের সঠিক মূল্যায়ন করে এবং তার সাথেই কাজ করে, মানুষ হিসাবে মানুষকে মূল্য দেয়; আর এই মানুষ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সেই একমাত্র সৃষ্টি যার কদম মাটিতে জমে থেকে সবকিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এবং তার আত্মা বিচরণ করতে থাকে সুদূর নীল আকাশে অথচ একটি মুহূর্তের জন্যেও দেহ ও আত্মা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় না। পৃথিবীর মধ্যে থেকেও আত্মা পৃথক হয় না বা আকাশেও উড়তে থাকে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে এই একই হুকুম অনুসারে ইসলাম, মানুষের সহযোগীতায় কাজ করছে এবং তার ক্রটি ও বৈশিষ্টগুলোকে তুলে ধরেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'মানুষের মনের কাছে কৃপণতা করাকেই প্রিয় করে তোলা হয়েছে।'

অর্থাৎ অন্তরের কৃপণতারূপ সংকট সদা সর্বদা মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে এবং মানসিক এই সংকীর্ণতা তার মধ্যে চিরদিনই থাকবে। এই কৃপণতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে–কখনও অর্থ সম্পদের জন্যে এই কৃপণতা হয়, আবার কখনও বা হয় তার পঞ্চ ইন্দ্রীয়তে, আবার কখনো এগুলোর প্রতিফলন দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনে। আবার কখনো কখনো দাম্পত্য জীবনে এই সংকীর্ণতার কারণগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। স্ত্রীর প্রতি কদর্য ব্যবহার করতে স্বামীকে উস্কানি দিতে থাকে। যার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর মোহর ও খোরপোষ দিতে বিলম্ব করে-এটা হচ্ছে আর্থিক সংকীর্ণতার বহিপ্রকাশ। এতোদসত্তেও তাদের বিবাহ-বন্ধন টিকে থাকে। আবার যদি একাধিক স্ত্রী থাকে সেখানে দেখা যায় কোনো স্ত্রী বেশী প্রিয় হওয়ার কারণে স্বামী অপর জনের হক নষ্ট করা হয়। এক জনের কাছেই রাত্রি যাপন করা হয় অপর জনকে তার জীবন ধারণ সামগ্রী থেকেও বঞ্চিত করা হয় এবং বঞ্চিত করা হয় তাকে স্বামীর আন্তরিকতা থেকেও। এটাই হচ্ছে মানসিক বা ইন্দ্রিয়গত সংকীর্ণতা, যদিও এক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকে! এই উভয় অবস্থাতে শুধু স্ত্রীই বঞ্চিত হয় এবং তাকে কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়, ফলে সমস্যার কিছুতেই সমাধান হয় না। এমতাবস্থায় আল্লাহর বিধান স্ত্রীকে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে কোনো প্রকার চাপ দেয় না তাকে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিতও করে না। তাকে অধিকার দেয় চিন্তা ভাবনা করে নিজের জীবন সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণ করার। নিজের বিষয়ে সে কি করবে না করবে তার ফয়সালা গ্রহণ করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর ঠিক সে সময়ে ইসলামী বিধান কৃপণতার ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছে। সে সময়ে অন্তরের অন্যান্য অনুভূতিকে তুলে না ধরে আর একটি প্রিয়-মধুর বচন পেশ করেছে,

'আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার করো, দয়াপূর্ণ মধুর ব্যবহার করো, দয়াপূর্ণ মধুর ভাবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সে অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করবেন।'

'এহসান ও তাকওয়া' গুণ দুটি যে কোনো কাজের জন্যেই তার মূল চালিকাশক্তি। অবশেষে এই গুণ দুটিই মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যায় এবং এ গুণটির ধারক ও বাহকদের থেকে তাদের কোনো পুরস্কার নষ্ট হয় না, কারণ যে যা করছে সেসব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন, জানেন তার প্রকাশ্য ও গোপন কাজগুলোকে। মোমেনদের অন্তরের মধ্যে এহসান ও তাকওয়া সৃষ্টি করার

জন্যে ডাক দেয়া হয় এবং যে কোনো কাজ করার সময়ে, সর্বজ্ঞ ও মহান আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ করতে বলা এমন এক আহ্বান, যার সুফল অবশ্যই আছে। আল্লাহকে স্মরণ করে কাজ করা এবং তাঁর কাছে জীবন সমস্যার সমাধানের জন্যে আকুতি পেশ করা, অবশ্যই আল্লাহর দয়ার সাগরে সাড়া জাগাবে, বরং তাঁর মেহেরবানী লাভ করার এবং দোয়া কবুল হওয়ার এই একটি মাত্র উপায় যা বিফল হওয়ার কথা নয়।

এই একক এবং একমাত্র বিধানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরের কাছে তার মানবীয় প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে অথবা তুলে ধরেছেন এমন এক উদাহরণ যা বাস্তব অবস্থাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে এবং মানুষের অন্তরের গোপন কন্দরে লুকিয়ে থাকা অনুভূতিতে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যা রহস্যময় দাম্পত্য জীবনে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বয়ে অনে। এরশাদ হচ্ছে,

'কিছুতেই তোমরা পরিপূর্ণভাবে একাধিক নারীদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না তা যতোই তোমরা চাও না কেন।'

আপোস করে চললেও সম্ভাব্য উপায়ে নূন্যতম প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে যদি ব্যর্থ হও তাহলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারো। তাই বলা হচ্ছে,

'আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সবাইকেই তাঁর মেহেরবানী দ্বারা সংকটমুক্ত করে দেবেন এবং অবশ্যই তিনি চিরদিন বিজ্ঞানময় ও প্রশস্ততাদানকারী।'

একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

তিনি অবশ্যই তার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত, তিনি জানেন যে, সে এমন ঝোঁক প্রবণতার অধিকারী যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তার ক্ষমতার বাইরে। তাই আল্লাহ তায়ালা সে ঝোঁকপ্রবণতাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা লাগাম পরানোর নির্দেশ দিয়েছেন, এমন লাগাম যা তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন বা হত্যা করার জন্যে নয়।

এই সকল ঝোঁক প্রবণতার মধ্যে একটি হচ্ছে স্বামী হিসাবে মানুষের অন্তর তার সব থেকে মনমত স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং অন্যান্যদের ওপর তাকে প্রাধান্য দেবে। এর ফলে, তার এই ঝুঁকে থাকা হবে অন্যজন বা অপরদের তুলনায় বেশী। এই ঝোঁককে সে কিছুতেই দমন করতে পারবে না, এটাকে সে মুছে ফেলতে পারেবে না বা একেবারে হত্যাও করতে পারবে না, তাহলে কী হবে? হাঁ ইসলাম এমন একটি বিষয়ে তাকে পাকড়াও করবে না যার ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং এটাকে কোনো গুনাহ হিসাবেও ধরা হবে না যার জন্যে কোনো শাস্তি দেয়া হতে পারে। তবে আল্লাহর সেই ঝোঁককে যা তার নিয়ন্ত্রণে নেই এবং যে বিষয়ের ওপর তার কর্তৃত্ব নেই তার হাতেই তার ভার দেয়া হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে তিনি কিছু হিসসা অন্যকে বা অন্যদেরকে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন; বরং স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছুতেই তারা নারীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তা যতোই তারা আকাংখা করুক না কেন, কারণ ব্যাপারটা তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা শক্তির বাইরের জিনিস, তবে যেটা তাদের ইচ্ছা শক্তির মধ্যে, তা হচ্ছে বস্তুগত জিনিসের লেন-দেনের মধ্যে ইনসাফ করা এবং বস্তুগত জিনিসের ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে ইনসাফ করা। ভরণ পোষণ সমান দেয়া এবং শারীরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার পূরণ করার এমনকি হাসিমুখে কথা বলার ব্যাপারে মুখে মিষ্টি কথা টেনে আনার ব্যাপারেও ইনসাফ করতে হবে। এই আচরণগুলো তাদের কাছে দাবী করা হয়েছে, আর এগুলোই হচ্ছে সে নিয়ন্ত্রণ যা স্বামী করতে পারে, এটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটাকে হত্যা করা নয়! এ জন্যে এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, তোমরা এক স্ত্রীর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, যার কারণে আর একজন ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।'

অর্থাৎ স্ত্রীর মর্যাদাই তার থাকে না অপরদিকে তালাক প্রাপ্তও হয় না। এর সাথে উদ্বাত কণ্ঠে ও গভীর গুরুত্বের সাথে মোমেনদের অন্তরের কাছে আবেদন করা হয়েছে, যেন এই সীমা লংঘন করা না হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি আপোসকামী হও এবং আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহকে দরদী ক্ষমাশীল হি-সাবে পাবে।'

যেহেতু ইসলাম সাধারণভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়েই কাজ করে, তাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে যেমনি এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি, তেমনি আল্লাহর মেহেরবানীর একটি ফুৎকারও বটে এবং তার যোগ্যতা ও শক্তি নিশ্চয়ই সামগ্রিকভাবে সবই আল্লাহর দান। এ জন্যে অবশ্যই তাকে প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে এবং সংশোধনী কাজে ব্রতী ও আপোষকামী হতে হবে। তাকে দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ স্থাপন করতে হবে এবং সে দৃষ্টান্ত হবে এমন বাস্তবমুখী যার পদযুগল থাকবে পৃথিবীতে এবং তার আত্মা বিচরণশীল হবে সুদূর আকাশে। এই দুই এর মাঝে কোনো বৈরীতা বা বিচ্ছেদ থাকবে না।

এটাই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের নবী (স.) ছিলেন পূর্ণাংগ মানুষের এক বাস্তব ছবি। নিজ জীবনে তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণবাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর জীবনে সুসামঞ্জস্যভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে এবং মানব প্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকে সফল গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছে।

সেই প্রিয় নবী (স.) নিজের বাস্তব কর্মপন্থা ও পারিবারিক জীবনের ব্যবহার দ্বারা ইসলামকে যে জীবন্ত রূপ দিয়ে গেছেন, তা হচ্ছে, তার স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সে সব জিনিস সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছেন যা তাঁর এখতিয়ার ছিলো। এই বণ্টনের সময়ে পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথে তিনি সে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে কাউকে কারও ওপর প্রাধান্য দেননি। এগুলো ছিলো বাহ্যিক জিনিস, যার ওপর তার কর্তৃত্ব ছিলো। এসব বিষয় তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, যে সব জিনিসের ওপর আমার কর্তৃত্ব আছে সেগুলোকে আমি সমানভাবে ভাগ করেছি। কিন্তু হে আমার পরওয়ারদেগার। আমাকে সেই সব বিষয়ে পাকড়াও করো না যার ওপর রয়েছে তোমার কর্তৃত্ব। সেখানে কিছুমাত্র আমার নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তা হচ্ছে 'অন্তর' (আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত)।

সেই অন্তরগুলো যখন শুকিয়ে যায়, দাম্পত্য বন্ধনকে অটুট রাখতে ব্যর্থ হয়ে যায়, স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যে সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে না, যার ওপর জীবন নির্ভর করে, তখন বিচ্ছেদই হয় উত্তম; কারণ ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে শেকল এবং রশি দিয়ে বেঁধে রাখে না; না তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখে ভিন্ন ধরনের এক হাতকড়া বা পায়ে শেকল পরিয়ে। ইসলাম প্রেম ও প্রীতির নিগড়ে স্বামী-স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখে, কর্তব্য-বোধ ও আত্ম সংযম এবং সম্ভ্রমবোধ তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। কিন্তু অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, পারস্পরিক ঘৃণাবোধ সম্মিলিত আকারে এই সব উপায় উপকরণকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে তখন ইসলাম তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ মন নিয়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকার মতো জীবন-যাপন করতে বাধ্য করে না। এমনও চায় না যে, বাহ্যিকাভাবে তারা একত্রিত থাকবে, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা হবে বিচ্ছিন্ন। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতের প্রশস্ত ভান্ডার থেকে তাদেরকে সংকটমুক্ত করে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রশস্ততার অধিকারী বিজ্ঞানময়।'

ওদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবানী বলে সংকটমুক্ত করে দেবেন। তাঁর নিজ ভান্ডার থেকেই তিনি তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে দেবেন, আর তিনিই তাঁর বান্দাকে প্রশস্ততা দান

করেন এবং তার বিজ্ঞান ভান্ডার ও জ্ঞানের পরিধির মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্যে উপযোগী সচ্ছলতা দিয়ে থাকেন।

আলোচ্য এ বিধান থেকে যে বিশেষ শিক্ষাটি আমরা লাভ করেছি তা হচ্ছে, আল্লাহর এ বাণী মানুষের বোধশক্তিকে তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয় এবং মানুষদেরকে পারিবারিক জীবনে সঠিক ব্যবহার করতে শেখায়। মানবতার যে চেতনা তাদের মধ্যে ঘুমন্ত রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহার করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তার সামনে সেই সব রহস্যময় সংকটের জট খুলে যায় যার সমাধান তার কাছে এক সময় দুর্বোধ্য ছিলো। মানুষ যে কাজকে অপছন্দ করার কারণে এই সংকট অত্যন্ত জটিল বলে মনে করতো এই সহজ বিধানের কল্যাণে তা সমাধান হয়ে গেলো। এ বিষয়টির অবতারণা মানুষের কল্যাণের জন্যেই। এ এমন একটি বিষয় যার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে মানুষের দুঃখর কোনো সীমা থাকে না। পারিবারিক জীবনের সংহতি থাকলে, প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে মানুষ পৃথিবীতে মান সম্ভ্রমের চরম সীমায় পৌঁছতে পারে। উন্নতি ও মান-সম্ভ্রমের পথে তার জন্যে কোনো অন্তরায় থাকে না। কিন্তু তার প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু সংকট বা সংকীর্ণতা আছে, তার সৃষ্টির মধ্যে আছে এমন হীনমন্যতার বীজ যা ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয় এবং এক সময়ে তাকে এতো বড় কঠিন সমস্যায় ফেলে দেয় যা অন্য সকল সমস্যা থেকে বড়।

এইভাবে দেখা যায় সৃষ্টির সেরা এই মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার সম্ভাবনাই বিদ্যমান থাকে। ইসলাম এই সকল সমস্যার যে বাস্তব সমাধান দিয়েছে তা মানব নির্মিত অন্য কোনো বিধান দিতে পারেনি। আলোচ্য দারসে মানুষের জীবনের সে সব সংকট সমস্যার সুন্দরতম সমাধানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু এসব বিশেষ নির্দেশাবলী দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে এসেছে, এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশ্ব বিধানের অংশ হিসেবে গোটা জীবনের জন্যে এবং যেহেতু গোটা সৃষ্টি জগতের জন্যে প্রদত্ত আইনেরও এ বিধান একটি অংশ, এ জন্যে এ বিধান আল্লাহর সৃষ্টির অন্য সবকিছুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির সবকিছু তো সেই মানুষের জন্যে যে এই বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে বাস করে এবং সবকিছু নিয়েই বাস করে। যেহেতু এই কথাগুলো আল্লাহর মহাবিধানের অন্তর্গত, এ কারণে মানুষের জন্যে প্রদত্ত আইন-কানুন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া একটা গভীর সত্য ঘটনা। এ জন্যে পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত এই বিশেষ কথা শেষে প্রাসংগিকভাবে প্রকৃতি সম্পর্কেও কথা আসছে, যার সম্পর্ক রয়েছে সমগ্র বিশ্ব বিধানের সাথে।

আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব

আল্লাহর ক্ষমা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে গোটা জগত জুড়ে, আল্লাহর কর্তৃত্বও বিদ্যমান সবখ-ানে– মানুষের জন্যে এই চূড়ান্ত নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন সকল আসমানী কেতাবে এবং দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখেরাতের পুরস্কার সবাইকেই সে একই নিয়মে দেয়া হবে, আর এইটিই হচ্ছে সেই চূড়ান্ত কথা যা সবখানে সমভাবে কার্যকর এবং এই চূড়ান্ত নিয়মের উপরেই গোটা বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে। সে সব নিয়মই সত্য যার ওপর ইনসাফ ও তাকওয়া পরহেযগারীর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। এরশাদ হচ্ছে,

‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালাই তো সবকিছুর মালিক।’

কোরআনের প্রায় জায়গাতেই দেখা যায়, নির্দেশনাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহের পর পরই আসে আযাবের আয়াত, আবার বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতের পরই এইভাবে শাস্তির ভয় প্রদর্শন রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, অথবা বলা যায় সপ্ত আসমান ও পৃথিবীর বাদশাহী একমাত্র তাঁর হাতে, এ কারণে তাঁর হুকুম না মানলে

তিনি অবশ্যই শাস্তি দেয়ার অধিকারী অর্থাৎ হুকুম অমান্য ও শাস্তি দুটি জিনিসই প্রকৃতপক্ষেই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অতএব, যিনি মালিক, তিনি বাদশাহ বা তাঁর রাজ্যের একমাত্র শাসনকর্তা। আইন রচনা ও পরিচালনার অধিকারও একমাত্র তাঁরই হতে পারে, যার ক্ষমতা তাঁর রাজ্যের সবকিছুর ওপর পরিব্যপ্ত এবং আল্লাহ তায়ালা একাই সবকিছুর মালিক। এই কারণেই একমাত্র তিনিই সকল মানুষের জন্যে আইন কানুন তৈরী করার অধিকারী। কাজেই হুকুম দান ও শাস্তির ধমক বিষয় দুটিও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এইভাবে যাদের ওপর কেতাব নাযিল হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্যেই আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রকাশিত হয়েছে, এসেছে তাকওয়া গ্রহণের হেদায়াত, আর এ কথা এসেছে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর মালিক কে তা নির্ধারণ করার পর, আর কে চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে পারে তা স্থির হয়ে যাওয়ার পর। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা, আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং বিশেষ করে তোমাদেরকেও আমি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছি আল্লাহকে ভয় করো।'

সুতরাং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন তিনিই, যাঁকে ভয় করা অন্তরের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। অপর দিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আকাংখা জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে তাদের কথাও জানাচ্ছেন যারা আল্লাহর রাজ্যের মধ্যে থেকেও ভুল পথে চলেছে তাদের ফয়সালা আল্লাহরই হাতে। তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর রাজ্য চালাতে পারেন এবং তাদেরকে বাদ দিয়েও তাঁর সফল কাজ নির্বাহ করতে পারেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা কুফরী করো তো তোমাদের জানা দরকার যে, অবশ্যই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহ তায়ালা চির অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।' আবার বলছি, সপ্ত-আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং যাবতীয় কর্মনির্বাহের জন্যে আল্লাহ তায়ালা একাই যথেষ্ট। তিনি চাইলে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে দেবেন।'

'হে মানুষ অন্যদের তিনি তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন, আর এটা করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।'

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ব্যাপারে মোমেনদেরকে তার ভয় হৃদয়ে লালন করার জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি তারা এ কথায় কর্ণপাত না করে এবং কুফরী করে চলে তাহলে তারা না কারও উপকার করতে পারবে, না ক্ষতি করতে পারবে। আল্লাহর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির কারণে তাঁর বাদশাহীতে কোনো ক্ষতি হবে না। এ জন্যে এরশাদ হয়েছে,

'আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব তো অবশ্যই আল্লাহর।'

তিনি তাদেরকে অপসারিত করতে যেমন সক্ষম তেমনি তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে তাদের স্থানে বসাতেও সক্ষম। কাজেই ভালো হওয়ার জন্যেই তাদেরকে তিনি তাকওয়া অর্জন করতে বলছেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করার জন্যেও তাকওয়া অপরিহার্য। আল্লাহর প্রিয় হওয়া এবং সবদিক দিয়ে ভালো হওয়ার একমাত্র উপায় হলো মানুষ ইসলামের নির্ধারিত আচরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়া। তখন সকল পৃথিবীবাসীর কাছেও সে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তখন গোটা সৃষ্টি তার মূল্যায়ন করতে থাকবে। অপর দিকে তার চিন্তা করা দরকার, মহান

আল্লাহকে অস্বীকার করলে, না-ফরমানী, অহংকার প্রদর্শন করলে এবং অযথা সর্বময় ক্ষমতার মা-লিক আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার অধিকারী বলে যদি সে নিজেকে মনে করে তাহলে তার পরণতি কী ভয়ংকর হতে পারে! ইসলামী ধ্যান ধারণার মধ্যে এ কথাগুলো সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে এবং প্রকৃত সত্য এবং বাস্তবতার নিরীখে যাঁচাই করে দেখলে মানুষ এর যথার্থতা অবশ্যই অনুভব করবে।

একমাত্র দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি আকাংখী যারা তাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী এ কথাগুলো বলে শাস্তির ধমকের প্রসংগটি এখানে শেষ করা হয়েছে। তারপর জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর মেহেরবানীর ভান্ডার সুপ্রশস্ত, তাঁর কাছেই রয়েছে দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানের পুরস্কার। আর যারা দুনিয়া লাভের চিন্তাকে সাধ্যানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তারাই দুনিয়ার বাইরের প্রশস্ততার দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। তাই, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'যে (শুধু) দুনিয়ার সুখ-শান্তি চায় তার চিন্তা করা দরকার।'.....

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শুনেন ও দেখেন, কে কোন উদ্দেশ্যে কী বলে এবং কে কিভাবে কি করে তা সবই তিনি দেখেন। দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় স্থানে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ একসাথে লাভ করা যাবে না বলে যদি কেউ হিম্মত হারিয়ে ফেলে তা হলে বড়ই বেওকুফী। দুনিয়া ও আখেরাতের সবখানে পুরস্কার লাভ করা যাবে না মনে করা মোটেই ঠিক নয়। ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শান্তি ও মংগল দানের যিম্মাদারী গহণ করছে। এতোদসত্তেও হতাশাবাদীদের ধারণা হচ্ছে এ দুটো এক সাথে পাওয়া যায় না, যার কারণে তারা আখেরাতের কথা মন থেকে তুলে দিয়ে শুধু দুনিয়া লাভের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা ভাবনাকে পরিচালনা করছে এবং হিংস্র জীব-জন্তু ও বহু পশুপাখীর মতো তারা জীবন যাপন করছে, অথচ মানুষের মতো জীবন যাপন করার ক্ষমতা অবশ্যই তাদের ছিলো। যমীনের বুকে পদচারণা করার সময় তারা আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখে। তারা এমন এক অদ্ভুত সৃষ্টি, যারা এই পৃথিবীর (মানব নির্মিত) আইন কানুন অনুসারে চলছে আর একই সময়ে তারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হবে বলেও মনে করছে।

অবশেষে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে জীবনের সামগ্রিক বিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর সাথে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জন্যে প্রদত্ত এ ক্ষুদ্র (?) বিধানগুলোর নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। উপস্থিত আলোচনায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব কতো বেশী তা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কেমন করে দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক জীবনের অন্যান্য বিষয়ের ওপর কতো গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। এরপর তাকওয়ার কথা বলে জানানো হয়েছে যে, সবকিছুর মূল কথা এটাই।

এ তাকওয়া যদি কোনো কওম থেকে গায়েব হয়ে যায় তাহলে সে কওমকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে সে স্থানে অন্য এমন কাউকে বসাতে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণভাবে সক্ষম, যারা তাঁর কথা মোতাবেক জীবনযাপন করছে এবং এবং যে কওম আল্লাহর বিধানকে কায়েম করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ শাস্তির কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা জানাতে চাইছেন যে পারিবারিক বিষয়টি আল্লাহর বিবেচনায় এবং গোটা জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ
اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ
الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣٨﴾

রুকু ২০

১৩৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা (সর্বদাই) ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহ তায়ালার জন্যে সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করো, যদি এ (কাজ)-টি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তা তোমরা মনে রাখবে), সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (এটা কখনো দেখবে না, কেননা), তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তায়ালার অধিকার অনেক বেশী, অতএব তুমি কখনো ন্যায়বিচার করতে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো কিংবা (সাক্ষ্য দেয়া থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রাখবে,) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার যথার্থ খবর রাখেন। ১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলের ওপর, সে কেতাবের ওপর যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেসব কেতাবের ওপর যা (ইতিপূর্বে তিনি) নাযিল করেছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করলো, (অস্বীকার করলো) তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর (পাঠানো) কেতাবসমূহ, তাঁর নবী রসূলদের ও পরকাল দিবসকে, (বুঝতে হবে) সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে! ১৩৭. যারা একবার ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, (কিছু দিন পর) আবার ঈমান আনলো, এরপর (সুযোগ বুঝে) আবার কাফের হয়ে গেলো, এরপর কুফরীর পরিমাণ তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো, (ঈমান নিয়ে তামাশা করার) এ লোকদের আল্লাহ তায়ালা কখনো ক্ষমা করবেন না, না কখনো তিনি এ ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন! ১৩৮. (হে নবী,) মোনাফেক ব্যক্তিদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব রয়েছে।

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ أَنْ
إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِينَ
وَالْكٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا
أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ
يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى

১৩৯. যারা (দুনিয়ার ফায়েদার জন্যে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অথচ (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট)। ১৪০. আল্লাহ তায়ালা (ইতিপূর্বেও) এ কেতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন দেখবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা কোনো আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (এ ধরনের মজলিসে) বসো না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়, (এমনটি করলে) অবশ্যই তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন। ১৪১. যারা সব সময়ই তোমাদের (শুভ দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা (কাছে এসে) বলবে, কেন, আমরা কি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পক্ষে ছিলাম না? (আবার) যদি কখনো কাফেরদের (ভাগে বিজয়ের) অংশ (লেখা) হয়, তাহলে এরা (সেখানে গিয়ে) বলবে, আমরা কি তোমাদের মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? এমতাবস্থায় শেষ বিচারের দিনেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) মোমেনদের বিরুদ্ধে এ কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না।

রুকু ২১

১৪২. অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়, (মূলত এর মাধ্যমে) আল্লাহই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভরেই

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق
لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى
الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ
بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

দাঁড়ায়, আর তারাও কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তায়ালাকে আসলে কমই স্মরণ করে। ১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) এ দোটানায় দোদুল্যমান, (এরা) না এদিকে না ওদিকে; তুমি সে ব্যক্তিকে কখনো (সঠিক) পথ দেখাতে পারবে না, যাকে আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ করে দেন। ১৪৪. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি (তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে) আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে (কোনো) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? ১৪৫. এ মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। ১৪৬. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা তাওবা করে এবং (পরবর্তী জীবনকে তাওবার আলোকে) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তায়ালার রশি শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশেই তাদের জীবন বিধানকে নিবেদিত করে নেয়, এসব লোকেরা অবশ্যই (সেদিন) বিশ্বাসী বান্দাদের সাথে (অবস্থান) করবে; আর অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দেবেন। ১৪৭. (তোমরাই বলো,) আল্লাহ তায়ালা কি (খামাখা) তোমাদের শাস্তি দেবেন– যদি তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা, সম্যক ওয়াকেফহাল।

তাফসীর

আয়াত-১৩৫-১৪৭

বর্তমান এ দারসটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ ধারার একটি শেকল, একটি কড়ি যার পরিচালনা রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর কুদরতের হাতে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছ মুসলমান জাতিকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা বিশ্ব-মানবের জন্যে আদর্শ হয়ে ফুটে উঠতে পারে। এমনই এক আদর্শ জাতির রূপরেখা পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তোমরাই হচ্ছে শ্রেষ্ট জাতি, যাদেরকে বের করা হয়েছে গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে।'

এ দারসের মধ্যে স্থায়ী, প্রশস্ত ও মযবুত এ জীবন ব্যবস্থার এমনই একটি বিষয় রয়েছে যার মধ্যে মানুষের মানসিক ব্যাধি নিরাময় করার লক্ষ্যে অত্যন্ত কার্যকর এক দাওয়াই-এর ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। এই ওষুধের ব্যবস্থা তিনিই দিয়েছেন, যিনি স্বয়ং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন এ জাতির জীবনের গিরি-সংকট কোথায়, কী তার জটিলতা এবং কোথায় কোথায় তার অবস্থানোপযোগী ঘাঁটি। তিনি প্রতিনিয়ত দেখছেন তার স্বভাব প্রকৃতিকে, তার প্রকৃত প্রয়োজন এবং তার চাহিদাগুলোই বা কি তা তিনি ভালো করেই জানেন! কতোটা ওষুধ তার প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ গ্রহণ করতে সে সক্ষম তাও মহান সে স্রষ্টার জানা।

সুদূর প্রসারী এ বিষয় পরিকল্পনা ইসলামী সমাজকে সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছে। এ এমই এক প্রাসাদ যা সমগ্র মানব মন্ডলীর আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়, জীবনের সকল কিছুর সমাধান মেলে এই কেন্দ্র থেকে, যেন মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামী জ্ঞানের সমুজ্জ্বল পথে নিয়ে আসা সম্ভব হয়, উপযুক্ত স্থান যেন তাকে দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি মানুষের মান মর্যাদাকে যেন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাতে পারে। এটাই হচ্ছে আলোচ্য দারসের মূল উদ্দেশ্য। এ দারসে নবী (স.)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রথম মুসলিম জামায়াতের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ জামায়াতকেই সর্ব প্রথম কোরআনে কারীম সম্বোধন করে কথা বলেছে এবং মুসলিম জামায়াতকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে এ পাক কালাম হেদায়াত দিয়েছে। এ সংগঠন- প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাদের দুর্বলতা ও শক্তির প্রতি, লক্ষ্য রাখা হয়েছে জাহেলিয়াতের পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদ ও তা সহ্য করার মতো কতোটা ক্ষমতা তাদের ছিলো-তার প্রতি। আরও লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাদের স্বভাবজাত অনুভূতির প্রতি। এইভাবে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে, এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ থেকে বাধা-বিঘ্ন দূর করে একে শক্তিশালী করা ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সত্য সঠিক আদর্শ ও পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে। সত্যের পথে টিকে থাকার জন্যে যার প্রয়োজন অপরিহার্য।

দারসটি শুরু হয়েছে মোমেন জামায়াতকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়ে, সে আহ্বানের মধ্যে রয়েছে সমগ্র মানবমন্ডলীর মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তুলনাহীন এক কষ্টকর সংগ্রাম। এমন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যা এই মোমেন জামায়াত ব্যতীত অন্য কারো হাতে কখনও প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। এই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মোমেনরা আল্লাহর সাথে সরাসরিভাবে কাজ করেছে, কাজ করেছে তারা পরম নিষ্ঠার সাথে; কোনো ব্যক্তি স্বার্থে বা ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে নয়, অথবা অন্য কোনো বিবেচনায় নয়। কোনো দলীয় স্বার্থ, জাতি অথবা কোনো রাষ্ট্রের স্বার্থেও তারা এ কাজ করেনি! এ লক্ষ্যে এমন কোনো কাজ তারা করেনি যার মধ্যে আল্লাহর ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি কাম্য নয়। এমন ইনসাফ তারা করেছে যার নমুনা আমরা একমাত্র নবী (স.)-এর জীবনেই দেখতে পেয়েছি। বস্তুত, রসূল (স.)-এর জীবনে সে সব অবস্থা সংগঠিত করে এবং তাঁর দ্বারা সেগুলোর পরিচালনা করিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইনসাফের বাস্তব রূপকে তুলে ধরেছেন। বিশেষ

করে, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যকার এক ঘটনার ফয়সালা দিতে গিয়ে নবী (স.) ইনসাফের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, (যার বিবরণ ইতিপূর্বে এসে গেছে) তা চিরদিনের জন্যে এক উজ্জ্বল নমনা হয়ে থাকবে।

মোমেনদেরকে ডাক দিয়ে 'আদল' বা ইনসাফ কায়েম করার কথা জানিয়ে দারসের সূত্রপাত হয়েছে। আদলের অবস্থাটি হচ্ছে, এ পবিত্র কোরআন অবতরণকারীই জানেন সেই কঠিন সংগ্রামের তাৎপর্য কি, যার মাধ্যমে এইভাবে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব হয়েছিলো। মানুষের মনের মধ্যে দুর্বলতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক কথা এবং একথা কারও অজানা নয়; নিজ স্বার্থের প্রতি এবং আত্মীয়স্বজনদের প্রতি দরদ-সহানুভূতি থাকার কারণে পক্ষপাতিত্ব তার মধ্যে এসেই যেতে চায়। কখনও বিরাজমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দুর্বলদের প্রতি দরদ দেখানোর উদ্দেশ্য, আবার কখনও শক্তিশালীদের পক্ষে যাওয়ার প্রবণতায় এসব দুর্বলতা আসতে চায়, কখনও দুর্বলতা আসে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি, কখনও আসে অভাবগ্রস্ত বা ধনী হওয়ার কারণে, কখনও মহব্বতের সম্পর্ক থাকায়, আবার কখনও পক্ষপাতিত্বের ঝোঁক আসে শত্রুতা থাকার কারণেও, আর এটা জানা কথা যে এসব প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করে সব প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করতে হয় এর জন্যে। সকল বন্ধনের আকর্ষণ ত্যাগ করে আত্মসংযমের এই চূড়ান্ত সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার দ্বারা মানবতার শীর্ষ স্থান অধিকার করা–এ এক ছাড়া পাঁঠাকে খাৎনা করানোর মতোই কঠিন কাজ। এটা তখনই সম্ভব যখন একমাত্র আল্লাহর রশি ধরার খেয়াল ছাড়া অন্য সকল প্রকার সম্পর্কের কথা মন থেকে তুলে দেয়া হয়।

এরপর, আলোচ্য দারসে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ডাক দিয়ে সে সকল বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনতে বলছেন, যেগুলোকে বিশ্বাস করা ঈমানের অংগ হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে তাঁর ফেরেশতা মন্ডলী, তাঁর প্রেরিত কেতাবসমূহ, তার রসূলরা এবং শেষ বিচার দিনের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। এর প্রত্যেকটিকে বিশ্বাস করা ঈমানী বিশ্বাসের মতোই মূল্যবান বলা হয়েছে। ইসলামী ধারণাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান রাখা অবশ্যই মূল্যবান। এ বিশ্বাস ও অন্যান্য যতো বিশ্বাসযোগ্য জিনিস ইসলামী যুগের পূর্বে ও পরে মানুষ পেয়েছে, সে সব কিছুর ওপরে এসব বিশ্বাসের স্থান। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি থেকেই অন্যান্য জিনিসের মর্যাদা এসেছে; প্রথম যুগের মুসলিম জামায়াতের মধ্যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক যে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে তা সে সকল বিশ্বাসের কল্যাণেই এসেছে। আর যে দল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে বাস্তব জীবনে সকল ভাল কাজ করে চলেছে তার কাছে প্রধান্যের এই মর্যাদা রয়েছে এবং সদা-সর্বদা এ মর্যাদা থাকবে। এমনকি তাদেরকেই দেয়া হয়েছে পৃথিবী ও মানবজাতিকে পরিচালনার সম্মান এবং এই-ভাবেই মুসলমানরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করবে, এই কথাটিই এই দারসের মূল শিক্ষা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কিছুতেই মোমেনদের ওপর কাফেরদের প্রাধান্য লাভ করার জন্যে কোনো পথ তিনি খুলে দেবেন না।'

এই দুটি আহ্বান জানানোর পর এই প্রসংগে বিভিন্ন কায়দায়, সেই সব মোনাফেকদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে যারা মোনাফেক অবস্থায় শেষ পর্যন্ত টিকে থেকেছে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের কুফরীর কথা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এই আক্রমণের মাধ্যেমে মোনাফেকদের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তাদের ন্যাক্কারজনক চেহারা খুলে দেয়া হয়েছে যেহেতু তারা মুসলমানদের সারিতে মিলে-মিশে থাকতো প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রং ধারণ

করতো এবং মুসলমানরা বিজয়ী হলে তারা তোষামোদপূর্ণ-মিষ্টি অথচ কপটতাপূর্ণ কথা নিয়ে সাক্ষাত করতো, আর কাফেররা বিজয়ী হলে তাদের সাথেও তারা একইভাবে সাক্ষাত করে বলতো যে, তাদের কারণেই তো ওরা (কাফেররা) বিজয়ী হয়েছে। তাদের মোনাফেকীর অন্যান্য যে সব লক্ষণ প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, তারা নামাযে শরীক হতে অলসতা করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। অন্য লক্ষণ হচ্ছে তারা চির দোদুল্যমান, তারা তাদের অবস্থানের মধ্যে এ দিকেও নয়, ও দিকেও নয়।

মোনাফেকরা এসব আক্রমণের মুখোমুখী হয়ে মুসলমানদেরকে নানা প্রকার বুঝ দিতো এবং হুশিয়ারীর জবাবে নানা ওজুহাত পেশ করতো। অবশ্য মুসলমানদের কাছে মোনাফেকদের এসব আচরণ তাদের কপটতাকে আরো প্রকট করে তুলতো, এইভাবে তাদের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেয়ে যেতো। মোনাফেকদের এই কদর্য চেহারা উদঘাটিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের প্রতিটি সারিতে তাদেরকে চিহ্নিত করে ফেলা হয় এবং তারপরই তাদের প্রতি এই আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা হয় যেন তাদের প্রতি কারো কোনো অনুকম্পা প্রদর্শনের সুযোগ না থাকে। এরপর মুসলমানদেরকে তাদের থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদর কোনো আসরেও যেন বসা না হয়, যেহেতু আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে তারা ঠাট্টা-মস্কারি করতো এবং এইভাবে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়তো। তবে মুসলমানদেরকে এ সময়ে মোনাফেকদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা যায়, মোনাফেকদের কদর্য খাসলাত যদিও প্রকাশ পেতো কিন্তু তারা মুসলমানদের গোটা সমাজে এমনভাবে মিশে ছিলো যে, মুসলমানদের পক্ষে তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে সম্পর্ক ছিন্ন করা খুবই কঠিন ছিলো।

একইভাবে, মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা মোনাফেকী খাসলাতগুলো ভালভাবে বুঝে নেয় এবং এ সকল দোষ থেকে দূরে থাকে। তাদেরকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, যেন তারা মান-সম্মান লাভ করার আশায় অথবা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য, কোনো অবস্থাতেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। ঘোষণা দেয়া হয় যে, সকল ইযযতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং মোমেনদের ওপর কাফেরদের বিজয়ী হওয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই কোনো পথ বের করে দেবেন না। আর এইভাবে মোনাফেকদের চিত্র অংকন করে দিয়ে তাদের কদর্য চেহারাকে উম্মেচিত করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের এ কদর্য চেহারা নিয়েই তারা সর্বত্র বিচরণ করতে থাকবে এবং সুনিশ্চিতভাবে স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের স্থান হবে দোযখের নিম্নতম স্তরে, যেখানে আগুনের তীব্রতা হবে অত্যন্ত বেশী। এই সকল পথনির্দেশনা ও সতর্কবাণী এতো বেশী দেয়া হয়েছে যে, সে সকল মোনাফেককে চিনতে আর বেগ পেতে হয়নি। এর দ্বারা সকল শ্রেণীর ব্যক্তি ও সকল পর্যায়ের মানুষকে ইসলামের সঠিক পদ্ধতি জেনে বুঝে, তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং এভাবে চাওয়া হয়েছে যে, তারা সাধ্যনুযায়ী নিজেদের স্বভাবকে আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত হেদায়াত অনুযায়ী গড়ে তুলুক এবং এসব মোনাফেকরদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিক, যাতে করে মোনাফেকী ষড়যন্ত্র থেকে তারা রেহাই পায় এবং নিজেদের মধ্যে থেকে মোনাফেকীর শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারে নতুন এক সমাজ কায়েম করতে পারে। যারা জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে এ কদর্য পথে ছিলো তারা সে পথ পরিহার করে সঠিক পথ ধরুক এবং সেই রকম পরিশুদ্ধ হয়ে যাক যেমন কুফরী ও মোনফেকী অবস্থার মধ্য থেকে মুসলিম জামায়াত নিজেদের স্বাতন্ত্র বাঁচিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের অবস্থানকে মযবুত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং নতুন এই 'দ্বীন'কে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে মোনাফেক ও কাফেররা বরাবর পরস্পর সহযোগিতা করেছে।

এই আলোচনা ও পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে মোনাফেকদের সাথে সংঘর্ষের সেই প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে আইনগত সেই ভিত্তি যার দ্বারা যুদ্ধ ও যোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করা হয়েছে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সর্বযুগে ও সর্বদেশে এ সংঘর্ষ চিরন্তন। এ সংঘর্ষ মুসলিম জামায়াতের শত্রুদের সাথে চিরদিন থাকবে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ও উপায় উপকরণের পরিবর্তন হলেও তাদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।

এসব কিছুর মাধ্যমে এ কয়টি আয়াতে কোরআনের সত্যতা এবং উম্মতে মুসলিমাকে পরিচালনার ব্যাপারে তার ভূমিকা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শুধু অতীতেই কোরআন এইভাবে পরিচালনা করেছে তাই-ই নয়, বরং যুগের পর যুগ ধরে চিরদিন কোরআনে কারীম উম্মতে মুসলিমাকে পরিচালনা করেছে এবং আগামীতেও একইভাবে পরিচালনা করতে থাকবে। এই কোরআন নেতৃত্ব দেবে নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে, সকল যুগে এবং সকল যামানায়।

এ দারসের সমাপ্তিতে আসছে আশ্চর্য একটি কথা, যাতে দেখানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে আযাব দিতে চান না, বরং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা আযাব দেয়ার ব্যাপারে একেবারেই তাড়াহুড়া করেন না। তিনি শুধু চান তারা ঈমান আনুক এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতের শোকরগোযারি করুক। পবিত্র সে মহান সত্তার নিজের এ গুণের কোনো প্রয়োজন নেই, নেই তাদের ঈমান ও শোকরগোযারির কোনো মুখাপেক্ষিতা, বরং তারা যা কিছু কাজ কর্ম করবে তা তাদের নিজেদের অবস্থানকে সুন্দর করার জন্যে এবং তাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে। ঈমান আনার কারণে অবশেষে তারা পরপারের যিন্দেগীর অধিকারী ও নেয়ামত ভরা জান্নাতের উপযোগী হয়ে যাবে। যদি তারা ঈমানী পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং নিজেদের মর্যাদাকে নিজেরাই মাটিতে মিশিয়ে দেয় তাহলে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, তারা নিজেদেরকে জাহান্নামের যোগ্য বানিয়ে ফেলবে, যেখানে মোনাফেকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে 'আগুনের নিম্নতম স্তরে।'

এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও... করবে সব বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা ওয়াকেফহাল।'

এখানে ডাক দেয়া হয়েছে মোমেনদেরকে। তাদের ডাকা হয়েছে নতুন এক গুনের নাম ধরে এবং এ গুণটির সমকক্ষ আর কোনো গুণ নেই; এ এমন এক গুণ যা তাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবে এবং তারাও লাভ করবে আর একটি জীবন, জীবিত হয়ে উঠবে তাদের রূহগুলো। তাদের চেতনা ও ধারণাসমূহও নতুনভাবে জন্ম লাভ করবে, তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও পুনরায় জীবন পাবে, তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জন্ম লাভ করবে যাকে কেন্দ্র করে তারা কাজ করে চলেছে, জেগে উঠবে সেই বিরাট আমানত যা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছে। সে আমানত হচ্ছে গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনার আমানত এবং মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার ফয়সালার আমানত। এই কারণেই এই গুণের নাম ধরে ডাকায় এই সম্বোধনের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে এবং এই ডাকটি অর্থবহ হয়ে উঠেছে। অতএব, ঈমানদার হওয়ার এই গুণটি থাকার কারণে তাদেরকে এতো বড় আমানতের অধিকারী বানানো হয়েছে এবং এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণেই তার মধ্যে ইচ্ছা শক্তি ও তা পরিচালনার যোগ্যতা দান করা হয়েছে যাতে সে এই মহা আমানতের বোঝা বহণ করতে পারে।

এ হচ্ছে মহা বিজ্ঞানময় পরওয়ারদেগারের প্রতিপালন নীতির স্পর্শসমূহের মধ্যে থেকে একটি মধুর স্পর্শ, যা সর্বপ্রকার কঠিন ও কঠোর ভারী বোঝাকেও হালকা করে দেয়! এরশাদ হচ্ছে,

সার্বজনিন সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোরআনের মিশন

তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও, আল্লাহর সন্তুষ্ঠি লাভের আশায় সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও, তাতে যদি বিচার তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়....।' (আয়াত ১৩৫)

সুবিচার কায়েম করাই হচ্ছে এখানে আমানত। ইনসাফ ও সুবিচারই করতে হবে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে। এটা হবে এমন সুবিচার যা পৃথিবীর বুক থেকে বিদ্রোহ ও যুলুম নির্যাতনকে প্রতিরোধ করে মানুষের মধ্যে সুবিচারের নিশ্চয়তা দেবে, যে প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দেবে, সে হকদার মুসলিম, অমুসলিম- যেই-ই হোক না কেন! মানুষের এই হক বা অধিকারের প্রশ্নে মোমেন ও গায়র মোমেনের ভেদাভেদ নেই, এ ব্যাপারে সকল মানুষ সমান। ঠিক যেমনটি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ইহুদীর মামলার ঘটনায়। এক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় ও দূরের ব্যক্তি, বন্ধু-শত্রু, ধনী-গরীব সবাই সমান।

'হিসাব গ্রহণকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা' একথা মনে রেখে এবং সরাসরি তাঁর সাথেই আদান-প্রদান হচ্ছে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে। কার পক্ষে বা কার বিরুদ্ধে রায় যাবে তা মনে করার কোনো সুযোগ নেই, নেই কোনো ব্যক্তি বা দলের বা জাতির স্বার্থ দেখার সুযোগ। বিবাদমান বিষয়ের কোনো অংশের সাথে সমাজের কে কিভাবে জড়িত আছে এ সব কোনো কিছুই দেখা যাবে না, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সত্যের সাক্ষী হিসেবে কাজ করতে হবে এবং তাঁর সার্থেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে, কোনো পক্ষ বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, নয় কোনো আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে। কোনো রেয়াত দান, কোনো সুবিধার দিকে খেয়াল করে বা বিশেষ কোনো দিক বিবেচনায় সঠিক বিচার থেকে চুল পরিমাণে যেন সরে না যাওয়া হয় তা খেয়াল করতে হবে।

'এ বিচার যদি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়, তবু সঠিক বিচারই করতে হবে।'

এ পর্যায়ে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নিজ স্বার্থ, কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের স্বার্থ জড়িত থাকলে যাতে সঠিক কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুতি না আসে তার জন্যে মনকে শাসন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ চেষ্টা বেশ কঠিন, মুখে বলা যতোটা সহজ বাস্তবে ততোটা সহজ নয়। এ কাজ করতে গেলে বিবেক খাটিয়ে এর অর্থ ও যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে। নীতিগতভাবে মেনে নেয়া যায় সহজে যদিও কিন্তু প্রমাণ করা যথেষ্ট কঠিন।

যে কথা আমরা বলছি এর তাৎপর্য একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝবে যার এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে বরং বলতে কি এ আইন প্রয়োগ করে ইসলাম মোমেনের অন্তরকে এই কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে যে, পৃথিবীতে এই সঠিক ব্যবস্থা চালু করতেই হবে এবং কোনো এক জনগোষ্ঠীকে এটার বাস্তবতা নিজেদের জীবন দিয়েই প্রমাণ করতে হবে।

এরপর এ নির্দেশ সেই নাযুক সময়ে সামাজিক ও স্বভাবগত সাধারণ চেতনার উর্ধে মন-মগযকে নিয়ন্ত্রণ করছে যখন বিচারপ্রার্থী বা প্রতিপক্ষ অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করাই যেন হক ইনসাফের দাবী বলে মনে হতে থাকে। দুর্বল সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্যে মন আকুতি জানাতে থাকে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভাব ও দৈন্যদশা মানুষের মনকে নরম করে ফেলে এবং আইনের মধ্যে ছাড় কামনা করতে থাকে। এমনই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জাহেলী যামানায় আইনকে এড়িয়ে চলা হতো। আবার বাদী বা বিবাদী সচ্ছল হলে তার সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, অথবা তার সম্পদের আধিক্য বিচারকের মনের ওপর প্রভাব ফেলে এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাক্ষীদের মধ্যে অনুকুল সাড়া পাওয়া যায় না। এসব

হচ্ছে মানুষের প্রকৃতগত চেতনা এবং সামাজিক দাবী, যা তখন অনুভূত হয়। এই সকল অবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী শ্বাসত আইন মনমগযকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যেন কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তিগত স্বার্থ, সামাজিক কোনো মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা সচ্ছলতা এবং কারো মান মর্যাদার প্রশ্নে সত্য সাক্ষ্য দান করার ব্যাপারে কোনো প্রকার বিচ্যুতি বা আপোষকে প্রশ্রয় না দেয়া হয়।

'বিবাদমান পক্ষদ্বয় ধনী-গরীব যাই হোক না কেন, সেসব বিবেচনা থেকে, আল্লাহর নির্দেশ আরো বড় আরো উত্তম।'

অত্যন্ত কঠিন এ প্রচেষ্টা। আমরা কিছুতেই একথা না বলে পারবো না যে এটা এক ভীষণ কঠিন চেষ্টা। ইসলাম বাস্তব ক্ষেত্রে যখন মোমেনদের প্রদমিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে তখন এই চূড়ান্ত কঠিন অবস্থাতেও তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে ছাড়েনি, যার ফলে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, তারা এ কঠিন নির্দেশকে বাস্তবে পালন করে দেখিয়েছে। বাস্তব জগতের কর্মক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের ব্যক্তিরা অত্যাশ্চর্য এসব আনুগত্যের নিদর্শন পেশ করেছে সারা জগতকে তারা এম-নভাবে চমৎকৃত করেছে যার নযীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাই ইসলামী আইন ও তার অনুসারীদের কৃতিত্ব।

'অতএব তোমরা ইনসাফ করার ব্যাপারে ভাবাবেগে চালিত হয়ো না।'

'হাওয়া'-কুপ্রবৃত্তি বা ভাবাবেগ এটা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, যেগুলোর মধ্য থেকে এখানে কিছু বর্ণিত হলো, মূল মানসিক আবেগের প্রতি আন্তরিক টান এবং পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি মহব্বত এটি একটি ভাবাবেগ। এর আর একটি অংশ প্রকাশ পায় অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে, বিশেষ করে তখন, যখন তার ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করা হয় বা তার প্রতি কোনো নির্দেশ জারি হয়। এও এক প্রকারের হৃদয়াবেগ। ধনী ব্যক্তির সাথে সুন্দর ব্যবহারের আদান প্রদান এক প্রকার হৃদয়াবেগ, তার ক্ষতি করার ইচ্ছা এক প্রকারের হৃদয়াবেগ, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি, সেই সময় এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করা যখন এদের সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গ আসে বা এদের প্রতি কোনো নির্দেশ জারি করা হয় তাও এক প্রকার হৃদয়াবেগ। দুশমনের প্রতি ঘৃণা, যদি সে দ্বীনের দুশমনও হয়, তবু সেটাকে প্রবৃত্তির তাড়না বা হৃদয়াবেগ বলতে হবে তখন, যখন সে কোনো সাক্ষ্যের নীচে অথবা হুকুমের আওতায় পড়ে, এইভাবে বহু ধরন ও প্রকারের হৃদয়াবেগ রয়েছে। এসবের মধ্যে কোনো মোমেনকে আল্লাহর আইন কার্যকর করতে যে কোনোটি প্রতিবন্ধক হবে বা প্রভাবিত করতে চাইবে, অথবা হক ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি খাড়া করতে চাইবে সেটাই হবে আল্লাহর বিবেচনায় 'হাওয়া' বা কুপ্রবৃত্তি।

পরিশেষে আসছে ভীতি প্রদর্শন, সতর্কীকরণ ও সঠিক সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকার কারণে ধমকি এবং এ বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে তিরস্কার।

'যদি তোমরা টালবাহানা করো, কোনো নির্দেশ পালনকে জটিল করে ফেলো অথবা কোনো নির্দেশ পালন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে যা কিছু তোমরা করবে সেসব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা খবর রাখেন।'

মানুষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যথেষ্ট যে, সে যা কিছু করছে সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা খবর রাখেন। এর দ্বারা এ বুঝ অবশ্যই সে পাবে যে, এটা মারাত্মক এক ভীতির খবর, যার কথা শোনার সাথে সাথে তার গোটা অস্তিত্বের মধ্যে প্রচন্ড এক কম্পন সৃষ্টি হবে। অবশ্য কোরআনের এ হুকুম পেশ করে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সম্বোধন করছেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খায়বার দুর্গ বিজয়ের পর, চুক্তি অনুসারে রসূলুল্লাহ (স.) যখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ওই দুর্গের ভেতরে ফল ও ফসলের অর্ধেক আদায়ের জন্যে পাঠালেন,

তখন ইহুদীরা তাঁকে ঘুষ দিয়ে একটু নরম করতে চাইলো যেন নির্দিষ্ট অংশ থেকে কম নেয়ায় তাঁকে রাযী করানো যায়। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে আমি এসেছি সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে, আর অবশ্যই তোমরা আমার কাছে কিছু সংখ্যক বানর ও শুকর থেকেও ঘৃণিত। জানো কোন জিনিসের প্রতি আমার ভালবাসা তোমাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছে? তা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে ইনসাফ নেই, তোমাদের ব্যাপারে নির্দেশিত হুকুম পালনে আমি কোনো রেয়ায়েত করবো না। তখন তারা বলে উঠলো, 'হাঁ, এই কারণে আজও আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে।'

এই সাহাবা প্রবর রসূল (স.)-এর প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে একমাত্র আল্লাহর আইন চালু করার শিক্ষা দেয়া হতো। তিনি এমন এক মানুষ ছিলেন, যিনি এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং সুন্দরভাবেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনি আরো অনেকের মতো সত্যকে নিজ ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যায়িত করলেন এবং এটা ইসলামী আইনের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ইসলামের মোহনীয় আইনের ছায়ায় সংঘটিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

সেই স্বর্ণ যুগের পর আরো বহু যুগ পার হয়ে গেছে, আমাদের পাঠাগারগুলো ফেকাহ এবং আইনের ওপর লিখিত পুস্তকরাজিতে ভরে উঠেছে, নানা বিষয় নিয়ে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন ও আইন বিষয়ক খেদমত দ্বারা মানব জীবনের অনেক সমৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু এরপর এসবের অনেক সুপারিশ ও সাংগঠনিক কাঠামো নাকচ হয়ে গেছে। তারপর মানুষের মাথা ইনসাফ সম্পর্কিত অনেক কথায় ভরে উঠেছে, সুবিচার সম্পর্কিত লম্বা লম্বা কথার খই ফুটেছে মানুষের মুখে, বহু মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং ওই সকল বিষয়ের কথাগুলোকে ধরে রাখার জন্যে ভলিউমের ওপর ভলিউম গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ইনসাফের অর্থ কি এবং তার প্রকৃত স্বাদই বা কি, মানুষের বিবেকে ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন কতোটুকু এবং মানুষকে সুদীর্ঘকাল যাবত শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা দেয়া একমাত্র ইসলামী আইন ব্যতীত অন্য কিছুতে সম্ভব হয়নি। সে সম্মোহনী আইনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো তখনকার সেই স্বর্ণ যুগে এবং পরবর্তীকালে যেসব অঞ্চলে ইসলামী আইন কানুন চালু করা হয়েছিলো সেখানেও। সেসব দেশের মানুষ ইসলামী সুবিচারের স্বাদ পেয়েছে, ইসলামের সুমহান আকিদা-বিশ্বাসে তাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরে গেছে। সেসব দেশের মানব গোষ্ঠীসমূহ ও ব্যক্তিরা ইসলামের শিক্ষা লাভে ধন্য হয়েছে।

আজকের এই নব্য সমাজের যেসব ব্যক্তি বিচার বিভাগীয় সংগঠন ও জ্ঞান গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত তাদেরকে ইসলামের ওই সুমহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবহিত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এসব আইন বিষয়ক বুদ্ধিজীবীরা ভাবছে তাদের নিকট অবস্থিত আইন ও বিচার বিষয়ক ধারা বিবরণী তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এবং নিখুঁতভাবে বিচার কাজ পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট হবে। তাদের এ ধারণা যে সুদূর অতীতের বিচার সম্পর্কিত তথ্যাদি থেকে অধুনা পৃথিবীর গবেষণালব্ধ বিষয়াদি অধিক মূল্যবান।

এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও এটা বাস্তব সত্য যে, প্রতি পদে পদে তারা জীবনের জটিলতাকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাদের ধারণায় নিজেকে তারা অনেক বড় মনে করলেও তারা আজও বহু বিষয়ের গভীরে পৌঁছুতে অক্ষম বোধ করছে। এ সকল জটিলতার সমাধানে একমাত্র ইসলামই মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছে এবং সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

অবশ্য, এসব কথার অর্থ কিছুতেই এটা নয় যে, আধুনিককালের বিচার বিভাগীয় সংগঠনগুলোকে আমরা অর্থহীন আখ্যা দিচ্ছি। না, আমরা কোনোটিরই অবমূল্যায়ন করছি না;

বরং আমরা বলতে চাই যে, শুধু সংগঠনের পর সংগঠন গড়ে তোলাই মানব জীবনের কল্যাণ বিধানের জন্যে যথেষ্ট নয় বরং আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এসব সংগঠনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। এসব সংগঠনের চেহারা ছবি, আকার-আকৃতি যাই হোক না কেন, আর যে যুগে এবং যে অঞ্চলেই তা গড়ে উঠুক না কেন, গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাকালে দেখা যাবে শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তার, যার মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী, তা সে যে যামানা বা যে স্থানেরই হোক না কেন!

ঈমানের রূপরেখা সব যুগেই সমান

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো, ঈমান আনো সেই কেতাবের প্রতি....।'

ঈমানের এই বিবরণের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, একজন মোমেনকে অবশ্য এই সকল বিষয়ের ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ বিবরণের মাধ্যমে ইসলামী ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এ ঈমানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর ওপর ঈমান আনার কথা বলে মোমেনদের অন্তরকে তাদের রবের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের কাছে এমন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন যিনি তাঁর দিকে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন, রসূল (স.)। এর পর রসূল (স.)-এর রেসালাতের ওপর ঈমান আনতে ও তাঁকে সত্যায়িত করতে বলা হয়েছে। ওই সব ব্যাপারে যা তিনি তাদের জন্যে তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে থেকে নিয়ে এসেছেন। আর এ হচ্ছে সেই কেতাবের প্রতি ঈমান, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। সেই মহান ও মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন সেই বিধানের সাথে যাকে তাদের জীবনের জন্যে তিনি পছন্দ করেছেন। সে জীবন পদ্ধতিকে তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এই কেতাবের মধ্যে; আর তিনিই তাদেরকে এর মধ্যে যা কিছু আছে তা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ কেতাবের উৎপত্তিস্থল এবং পথ ও পদ্ধতি একমাত্র একটিই। এ কেতাবের একাংশ অন্য কোনো অংশ থেকে পালন করার ব্যাপারে, কবুল করার ব্যাপারে মেনে নেয়া ও চালু করার ব্যাপারে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এ ঈমান হচ্ছে সেই কেতাবের প্রতি যা তিনি ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন। তিনি একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সকল কেতাবের উৎসমূল হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। এ কেতাবের মূলও একটিই আর তা হচ্ছে ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মুখকে ফিরিয়ে দেয়া বা আল্লাহ তায়ালা কেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া। একথা মেনে নেয়া যে, উলুহিয়্যাৎ বা সার্বভৌমত্বকে, তার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে। তারপর একথাও মেনে নেয়া যে আল্লাহর পথ মাত্র একটিই অর্থাৎ এ পথের দাবী হচ্ছে, একমাত্র তাঁর আনুগত্যই সবার জন্যে বাধ্যতামূলক এবং আনুগত্যের কাজটিকে জীবনের সকল ব্যাপারে বাস্তবায়িত করতে হবে। এসব কিছুর মধ্যে একত্ববোধ ও এক কেন্দ্রিকতা হচ্ছে এ কেতাবের মধ্যস্থিত সকল কথার মূল কথা এবং এ কেতাবের স্পষ্ট ও স্বাভাবিক দাবী। কোরআনের পূর্বে নাযিল করা কেতাব পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিলো তার সবটুকুই আল্লাহর কাছ থেকেই অবতীর্ণ ছিলো। সেখানেও একই কথার উল্লেখ ছিলো যে, মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি শুধু একটিই, তাঁর চাহিদা মানুষের নিকট একটিই, তাঁর পথও একটি। এর আশপাশে দেখা যাবে বিভিন্ন পথ কিন্তু যে পথ তাঁর কাছে মানুষকে পৌঁছে দেবে তা মাত্র একটিই।

এরপর বলা হচ্ছে যে, ঈমান আনতে হবে গোটা কেতাবের প্রতি, অর্থাৎ সমগ্র কেতাবে যা কিছু আছে, তার সবটুকুকে বিশ্বাস করে সেগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, সাথে সাথে একথাও ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, সকল অবতীর্ণ কেতাব একত্রিত

হয়ে প্রকৃতপক্ষ একটি কেতাবের রূপ নিয়েছে যাকে 'আল্ কেতাব' বলা হয়। এইভাবে সকল কেতাবের উৎসমূলকে এক ভেবে সকল কেতাবকে এক এক কেতাব মনে করাটাই মুসলমানদের আকীদা এবং প্রকৃতপক্ষে সে-ই মুসলিম যে এই অকাট্য সত্যকে মেনে নেয়। গোটা উম্মতে মুস-লিমাহ্ এই প্রশ্নে অন্য সকল জাতি থেকে স্বতন্ত্র এবং এই প্রশ্নে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই, যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই 'রব' (অর্থাৎ প্রতিপালক বাদশাহ ও মনিব) হওয়ার ধা-রণায় বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ, তাদের জীবন ব্যবস্থা এক, এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও এক। এ হচ্ছে এমন একটি চিন্তাধারা যা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মতবাদকে সমাজের বুকে মযবুতভাবে দাঁড় করাতে চায়, দাঁড় করাতে চায় এই একই মতবাদের ধারক ও বাহক হিসেবে মুসলিম উম্মাহকে গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে। এ ছাড়া অন্য যতো কথা আছে সবই নির্জলা ভুল, কারণ সত্যকে বাদ দিলে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকতে পারে?'

ঈমান আনার নির্দেশ দানের পর আসছে ঈমানের কিছু কিছু অংশ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করার কারণে এক কঠিন তিরস্কার। শাস্তি দানের পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত হেদায়াত দেয়া হয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে, অস্বীকার করবে তাঁর ফেরেশতামন্ডলীকে, তাঁর কেতাবগুলোকে, তাঁর রসূলদেরকে এবং শেষ বিচারের দিনকে, সে অবশ্য এমন ভুল পথে চলবে যা তাকে সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দেবে। নির্দেশের প্রথম ভাগে আল্লাহর প্রতি, কেতাবসমূহ ও রসূলদের প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়েছে। সেখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়নি। আল্লাহর কেতাবগুলো ফেরেশতা ও বিচার দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর ঈমানের দাবীর মধ্যে এই কেতাবগুলো শামিল রয়েছে, শামিল রয়েছে ফেরেশতাকুল ও শেষ বিচারের তিরস্কারের সাথে এ বিষয়ের ওপর তিরস্কার করাকে সময়োপযোগী মনে করা হয়েছে। যেহেতু এ স্থলে প্রতিটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করে কথা বলা হয়েছে।

'দালালুম বাঈদ'-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে সম্ভবত ভ্রান্তির আধিক্যের কারণে সত্য পথ থেকে এতো দূরে সরে যাওয়া যেখান থেকে হেদায়াতের রাস্তায় ফিরে আসার আশা আর করা যায় না এবং আদৌ ফেরা সম্ভব বলেও মনে হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে তার তো চিন্তা করা দরকার সে অস্বীকার করলেও গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি গভীরভাবে তাঁকে স্বীকার করছে, তন্মধ্যে নিজের অস্তিত্বের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ তাকে স্বীকার করে, তাঁর দেয়া নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে এবং সবাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছে। অথচ সে ফেরেশতাকুল, কেতাবসমূহ, রসূলদের এবং শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করছে। আসলে এই স্বীকৃতি দ্বারা সে প্রথম সত্যকেই অস্বীকার করছে। যে ব্যক্তি এইভাবে অস্বীকার করতে পারে বুঝতে হবে তার অস্তিত্ব বিশৃংখল হয়ে গেছে এবং সে ধ্বংসের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেছে; পৌঁছে গেছে সে বিভ্রান্তির এমন প্রান্তিক সীমায় যেখান থেকে হেদায়াতের পথে ফেরার আশা করা যায় না এবং সে আদৌ ফিরে আসতেও পারবে না।

ঈমান আনার পর কুফরী করার পরিণতি

মোমেনদের প্রতি এ দু'টি আহ্বান জানানোর পর প্রসংগক্রমে নেফাক ও মোনাফেকদের প্রতি হামলা করা হচ্ছে এবং তাদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য থেকে সে সময়কার একটি বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিয়ে কথা শুরু করা হচ্ছে যা তাদের অবস্থানকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে। তাদের এই অবস্থানটি কুফুর ও কাফের হওয়ার অবস্থার সব থেকে কাছে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফরী করেছে, এরপর তারা তাদের কুফরীকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না, না তাদেরকে তিনি সঠিক পথ দেখাবেন।'

ঈমানের পূর্বে যে কুফরী করা হয়েছে ঈমান আনার কারণে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন এবং তাদের ওই কুফরীর গুনাহ মুছে দেবেন। এখন যে ব্যক্তি আলোর দেখা পায়নি সে আলো কতো উজ্জ্বল তা না চেনার কারণে সে মা'যুর ছিলো, অর্থাৎ আলো না পেয়ে অন্ধকারে বিচরণ করার কারণে তাদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ঈমান আনার পর যদি কেউ কুফরী করে এবং বারবার তার এই অবস্থানের পরিবর্তন হতে থাকে, তখন তা এমন মহা অপরাধে পরিণত হয়ে যায়, যার কোনো ক্ষমা বা ওযর দেখানোর মতো কোনো সুযোগ থাকে না। কুফরী তো হচ্ছে একটি পর্দা, যখন এই পর্দা দূর হয়ে যায়, তখন মানব প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, পৌঁছে যায় একজন পথহারা ব্যক্তি তার সওয়ারীর কাছে, পৌঁছে যায় চারা গাছের শেকড়টি তার পানির উৎসের কাছে, তখন মানবাত্মা ঈমানের সেই স্বাদ অনুভব করতে থাকে যা সে আর কখনোই ভুলতে পারে না। কিন্তু, ঈমান আনার পর যারা বারবার মোরতাদ হতে থাকে, তারা তাদের স্বভাব-প্রকৃতিকে জেনে বুঝে ও ইচ্ছা করে মিথ্যাবাদী বানায় এবং ইচ্ছা করেই ভুল পথে চলতে থাকে। তারা পলাতক ব্যক্তির ন্যায় বহু দূরে নিয়ে যাওয়ার মতো ভুল পথে চলার কাজকে বেছে নেয়।

সুতরাং ইনসাফের দাবী হচ্ছে ওই সব মোরতাদকে আল্লাহ তায়ালা যেন শায়েস্তা করেন। ইনসাফের আরো দাবী হচ্ছে যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করা। কারণ তারাই হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যারা সঠিক পথ চিনে নেয়ার পর এবং সে পথে চলতে থাকার পরও সে পথকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তারাই সেই সব ব্যক্তি যারা নিকৃষ্ট কাজ ও অন্ধত্বকে পছন্দ করে নিয়েছে। এই নিকৃষ্ট পথকে বেছে নিয়েছে এমন এক সময়, যখন সঠিকভাবে তাদেরকে কল্যাণময় পথ ও হেদায়াতের আলোকের দিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা হয়েছিলো।

মানুষের মন যতোক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আল্লাহকেন্দ্রিক না হয়ে যাবে, ততোক্ষণ সে পার্থিব জীবনের মূল্যায়নের চাপ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী চলার প্রবণতা থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারবে না, মুক্ত হতে পারবে না প্রয়োজনের আকর্ষণ এবং দুনিয়ার সব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলার আহ্বান থেকে। সে লালসা ও কৃপণতার হাতছানি থেকে দূরে সরে আসতে পারবে না। হক ও বাতিলের সাথে সামঞ্জস্য করে চলা, সকল সুবিধা ঠিক রেখে চলা, লোভনীয় বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করার আবেগ থেকেও সে বাঁচতে পারবে না। ওইসব সাময়িক বিষয়গুলো থেকে মুক্ত হওয়ার মূল্য কি এবং প্রকৃত মর্যাদা কিসে এবং কিসে গড়ে ওঠে সেই সুউচ্চ পদে উন্নীত হওয়ার সম্মান তা কোনো দিন সে বুঝবে না। হৃদয় আল্লাহর মহব্বতে পরিপূর্ণ তাই এটা সে অনুভব করে। আল্লাহকেন্দ্রিক এই দুনিয়ার মূল্যবোধ, চাকচিক্য, ব্যক্তিত্ব, নানা ঘটনার আবর্তন, পার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা এবং ক্ষমতাধরদের মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহর মহব্বত অনুভব করে এবং সেই মহব্বতের আবেশে অন্য সব কিছু গৌণ হয়ে যায়।

এহেন আল্লাহপ্রেমিক মুসলমানদের মধ্যে নেফাকের বীজ উদ্গাত হতে পারে না এটা হতে তাদেরই যাদের ঈমান আদৌ কখনো পরিপূর্ণ ছিলো না। আর প্রকৃতপক্ষে বাতিলের মোকাবেলায় সত্য পথে টিকে থাকার জন্যে যে দৃঢ়তা প্রয়োজন, তার অভাবে যে দুর্বলতা মানুষকে পেয়ে বসে তার নামই হচ্ছে নেফাক। এ দুর্বলতা ভয় ও লালসারই ফল এবং এর সম্পর্ক হচ্ছে শয়তানের সাথে অথচ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো সাথে মোমেনের কোনো সখ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। মোনাফেকদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা গড়ে ওঠে তার কারণ হচ্ছে তারা পার্থিব সুখ সম্পদকে প্রাধান্য দেয় এবং মানুষের সম্পর্ককেই বড় করে দেখে এবং এতে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান থেকে বিচ্যুতির কোনো পরওয়া করে না। এখানকার এই আলোচনায় আল্লাহর প্রতি ঈমান

ও একনিষ্ঠভাবে সত্যের সাক্ষী হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার সাধারণ সুবিধাবাদী মানুষ হিসেবে মোনাফেকের ভূমিকা পালন করার মধ্যে একটি তুলনা পেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় এটিই। এ সকল আলোচনার উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধানকেই যেন মুসলমানরা চূড়ান্ত বিধান হিসেবে মেনে নেয় এবং এ বিধানকে কায়েম করার জন্যে যেন সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এর জন্যে প্রয়োজন তাদেরকে সঠিক ট্রেনিং দেয়া, এমনভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করা যেন তারা জাহেলিয়াতের যেসব বদ রীতি নীতি এখনও সমাজে অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোকে ইসলামী সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিতে পারে। মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা থেকে তাকে মুক্ত করাও এ দারসের আর একটি উদ্দেশ্য। এরপর দেখানো হয়েছে কেমন করে এই মুসলিম জামায়াতের সাথে মদীনার আশপাশের মোশরেক ও ভেতরের মোনাফেকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এই সামগ্রিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনার ধারা এগিয়ে গেছে।

মোনাফেকদের পরিচয়

এমনিভাবে আমরা দেখতে পারি আলোচ্য অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশের মধ্যে নেফাক ও মোনাফেকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং এই আলোচনার ধারা দিয়েই এ অধ্যায়ের আনা এবং পুনরায় কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ার কাহিনী বর্ণনা করার পর চূড়ান্তভাবে মোনাফেকদের কদর্য চেহারা তুলে ধরা হয়েছে।

এখান থেকে শুরু হচ্ছে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কায়দায় এবং যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের পরিচয় তুলে ধরার চূড়ান্ত অভিযান, যার ইংগিত ইতিপূর্বেও দান করা হয়েছে, যাতে ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ সঠিকভাবে এ বিধানের প্রতিটি কথা বাস্তবে পালন করার চেষ্টা করতে পারে, কার্যকর করতে পারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'সেই সকল মোনাফেকদেরকে, তাদের জন্যে নির্ধরিত আযাবের সুসংবাদ(?) দিয়ে দাও যারা মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু, অভিভাবকও নেতা বলে গ্রহণ করে ....।'

এসব কথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিজয়ের জন্যে কোনো পথ খুলে দেবেন না। অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে, আসলে ধোকা তো তিনিই তাদেরকে দিতে পারেন।'

ওদের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষণ হচ্ছে,

'যখন নামাযের দিকে ওরা যায়, তখন অত্যন্ত উদাসীনভাবেই যায়, যে নামায ওরা আদায় করে তা নিছক মানুষকে দেখানোর জন্যেই। ওদের অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সত্যিকারে আল্লাহকে ওরা স্মরণ করে না।'

নামাযের প্রয়োজন আছে কিনা এ ব্যাপারে ওরা সন্দিহান। আসলে ওরা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয় এসব ব্যবহারের দরুণ আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে সঠিক পথ দেখতে দেননি।

'আর যাকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথ না দেখান তার মুক্তির জন্যে তুমি কোনো পথ খুঁজে পাবে না।'

ওই হতভাগা মোনাফেকদের প্রতি আক্রমণাভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথায় স্পষ্টভাবে কটাক্ষপাত করে বলেছেন 'বাশশের' 'সতর্ক করো বা ভয় দেখাও' একথার

স্থলে ওই শব্দ 'বাশশের' (সুসংবাদ) তির্যকভাবে ব্যবহার করেছেন। মোনাফেকদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দিতে গিয়ে সুসংবাদ ব্যবহার করেছেন। এরপর, বেদানাদায়ক এ শাস্তির কারণ জানাতে গিয়ে তিনি বলছেন মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাই এর কারণ। এর আর একটি কারণ হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ওদের খারাপ ধারণা।' এরশাদ হচ্ছে,

'সুসংবাদ (?) দাও মোনাফেকদেরকে যে তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

এসব মোনাফেক তারা 'যারা মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। ওরা কি তাদের কাছে কোনো ইযযতের আশা করে? তাহলে তাদের জানা দরকার যে ইযযত সবটুকুই তো আল্লাহর হাতে।'

ওপরে বর্ণিত কাফের শব্দটি খুব সম্ভব ইহুদীদের সম্পর্কে উচ্চারণ করা হয়েছে, যাদেরকে মোনাফেকরা বন্ধু মনে করে তাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতো এবং গোপনে গিয়ে তাদের সাথে কানে কানে কথা বলতো। অনেক সময় রাত ভর জেগে জেগে মুসলিম জামায়াতকে কিভাবে বিপদে ফেলা যায় তার জন্যে সলা-পরামর্শ করতো।

অপরদিকে মহামহিম আল্লাহ তায়ালা তির্যকভাবে ও ঘৃণার সাথে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেন ওরা কাফেরদেরকে বন্ধু-মুরব্বী বা ক্ষমতাধর হিসেবে গ্রহণ করছে অথচ তারা তো ঈমানের দাবী করে? কেন নিজেদের তারা ওই স্থানে নিয়ে যায় এবং নিজেদের জন্যে তারা ওই অবস্থানকেই বা কেন গ্রহণ করছে? ওরা কি কাফেরদের কাছে মান, সম্ভ্রম ও শক্তি চায়। ইযযত তো আল্লাহ তায়ালা একান্তভাবে তাঁর নিজের হাতেই রেখেছেন। তাকেই যে মনিব মালিক ও দরদী হিসেবে মেনে নেবে এবং একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করবে, শুধু তাকেই তিনি তা দেবেন। যে শুধু তাঁর কাছে মানসম্ভ্রম ও শক্তি চাইবে এবং নির্ভর করবে শুধু তাঁরই সাহায্যের ওপর, একমাত্র তাকেই তিনি সম্মান দেবেন।

এইভাবে মোনাফেকদের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম পরিচয় পাওয়া গেলো, বরং বলা যায় বর্ণিত হলো তাদের প্রথম গুণটি। তা হলো মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। তাদের আর একটি ভুল ধারণা সম্পর্কে আগেই জানা গেছে, জানা গেছে প্রকৃত শক্তির আধার সম্পর্কে, আরো জানা গেছে যে, যারা কাফেরদের সহায়তায় মান-সম্ভ্রম ও শক্তির অধিকারী হতে চায়, তারাই মোনাফেক। এ পর্যায়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মান-ইযযত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এর জন্যে অন্য কারো কাছে প্রত্যাশী হওয়া বৃথা।

এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, মানুষের সাহায্য সমর্থন পাওয়া এবং শক্তি ও সম্মান লাভ করার উৎস একমাত্র একটিই। যদি সেই একই উৎসের ওপর নির্ভর করা হয়, তাহলে তিনি তাকে অপর সবার ওপর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব দান করেন। আরো জানা দরকার দাসত্ব মাত্র একজনেরই করা যায়, বিনা যুক্তিতে ও নির্দ্বিধায় আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর কেউ নয় এবং এটা করা হলেই মানুষের মর্যাদা বাড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে তখনই মানুষ আযাদী লাভ করে। মহান আল্লাহর দাসত্ব করে যখন কারো মন তৃপ্ত না হয়, তখন সে আরো অনেকের দাসত্ব করতে থাকে; বিভিন্ন যুক্তি যেমন, শক্তি, ক্ষমতা, ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় সে অন্য অনেক ব্যক্তির সামনে মাথা নত করে, অথচ কেউই তাকে বিপদ মুহূর্তে বাঁচাতে পারে না।

মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব যখন কবুল করে, তখন সে হয়ে ওঠে অজেয় এবং বেপরোয়া। তখনই পৃথিবীতে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখনই সে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ

করে। অপরদিকে সে যখন কোনো দাসের দাসত্ব করে তখন মূলত এর মাধ্যমে নিজেকে সে অপমান করে এবং লাভ করে এক অপমানজনক জীবন এবং তখন যে কেউই তার ওপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে দেয়।

আর ভাবনার বিষয়, মোমেন থাকা অবস্থায় কোনো সে জিনিস এমন আছে যা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের কাছে মান মর্যাদা প্রত্যাশী বানাতে পারে? আল্লাহকে বিশ্বাস করার পর কোনো মানুষকে আল্লাহর দুশমনদের কাছে মান সম্মান, শক্তি, সাহায্য চাইতে বাধ্য করতে পারে? যারা ইসলামের ধারক বাহক হওয়ার দাবী করছে এবং মুসলমান নামে পরিচিত, কেন তারা আল্লাহর শত্রুদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা কামনা করবে? এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে কোরআনে কারীম আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের মধ্যে যদি মুসলমান হয়ে থাকার জন্যে আগ্রহ থেকে থাকে, তাহলে এখনই গভীরভাবে চিন্তা করে সতর্ক হয়ে যাওয়া দরকার এবং অবিলম্বে তাওবা করে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করা দরকার, নচেত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সতর্ক বাণী ও চূড়ান্ত কথার আওতায় সে অবশ্যই পতিত হবে,

'সে অবস্থায় নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগতের সবার থেকে দায়িত্বমুক্ত।'

আর নাজাতের দায়িত্ব মহাদয়াময় আল্লাহ তায়ালা যদি পরিত্যাগ করেন, তাহলে বান্দাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

কাফেরদের কাছে ইযযত প্রত্যাশায় এবং তাদের বন্ধুত্বের আকাংখায় যে জিনিস লাভ হয় তা হচ্ছে কুফরী অবস্থায় মৃত বাপ দাদার কিছু মান বৃদ্ধি, আর একটি জিনিস গ্রাহ্যের মধ্যে আসতে পারে তা হচ্ছে মুসলমানদের সাথে বংশগত বা আত্মীয়তার সম্পর্কের মূল্যায়ন, যেমন আজও বহু মানুষ ফেরাউনের বংশ, আশূরী, ফিনিকী, ব্যাবিলন ও আরব জাহেলিয়াতের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্ববোধ করে, গর্ব বোধ করে নানা জাহেলী কায়দায়।

ইমাম আহমদ রেওয়ায়ত করেছেন, আবু রায়হানা বলেন, যে, নবী (স.) এরশাদ করেছেন, কেউ যদি গর্বভরে নিজের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে উর্ধতন নয় ব্যক্তির উল্লেখ করে এবং তাদের নাম উচ্চারণ করে তাহলে, সে হবে দশম ব্যক্তি, যে দোযখবাসী হবে।

ইসলামে সামাজিক বন্ধনের একটিই সেতুবন্ধ আর তা হচ্ছে, 'আকীদা'। এই আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ রাখা সম্ভব। ইসলামের ছায়াতলে সবাই এক জাতিতে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি শুরু হয়েছে একেবারে ইতিহাসের শুরু থেকে একমাত্র আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী হলে পৃথিবীর যে কোনো এলাকায় এবং যে কোনো সময়ে এমন জাতি গড়ে তোলা সম্ভব।

নেফাকের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উত্তম (অর্থাৎ সব থেকে কম নিকৃষ্ট) সেই শ্রেণী, যার অন্তর্গত ওই ব্যক্তি, যে এমন কোনো বৈঠকে বসে থাকে, যেখানে সে শুনতে পায় কোরআনের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে অথবা সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করা হচ্ছে, সেখানে সে কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ করে বসে থাকে, যাকে বলা যায় চোখ বুঁজে থাকা বা চাতুর্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়া, অথবা উদারতা প্রদর্শন করা অথবা স্বাধীন মতামত প্রদর্শনের সুযোগ দান করা। এইভাবে যতো প্রকার বিবেচনায় সে নীরবতা অবলম্বন করবে, সবগুলোই হবে পরাজিত মনোভাবের নামান্তর। এই হীনমন্যতা গড়ে ওঠে ওই দুর্বলমনা ব্যক্তির মধ্যে, যে তার মনের অনুভূতিকে তার ঈমানের যাত্রা পথের শুরুতেই ঢেকে রাখে, বরং বলতে হবে ঈমানী দুর্বলতার কারণেই কোনো প্রতিবাদ করতে সে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু এটা তার হীনমন্যতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। ঈমানদার প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর সৈনিক। এ সৈনিকের সামনে তার মনিবের কোনো কথাকে কটাক্ষপাত করা হবে কিন্তু সে নানা দিক চিন্তা করে ও সে বিভিন্ন বিবেচনায় চুপ করে বসে থাকবে আর এরপরও সে ভালো সৈনিক বলে বিবেচিত হবে, তা কখনও হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর সৈনিক হলে অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে, কারণ ঘৃণা প্রদর্শন একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, তাঁর দ্বীনের জন্যে, তাঁর আয়াতসমূহের খাতিরে এবং এ ঘৃণা প্রদর্শনই হবে ঈমানের লক্ষণ। তার মনিবের কথা নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করা হলে বা কোনো মিথ্যা দোষারোপ করা হলে তৎক্ষণাৎ সে তা বন্ধ করে দেবে, অবশ্যই সে ঝটিকা-বেগে তার প্রতিক্রিয়া পেশ করে অন্যায়কারীকে থামিয়ে দেবে এবং স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সে ঔদ্ধত্যকে নিস্তেজ ও নিভিয়ে দেয়ার জন্যে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার পর সে মৃত্যুকে আলিংগন করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

অতএব, কোনো বৈঠকে তার দ্বীন সম্পর্কে কোনো ঠাট্টা মস্কারি করা হতে দেখলে একজন মোমেনের কর্তব্য হচ্ছে, সে হয়তো প্রতিরোধ করবে, নয়তো সেখান থেকে উঠে চলে আসবে এবং সে বৈঠকের সংগীদেরকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকা ও চুপ থাকার অর্থ প্রথম পর্যায়েই পরাজয় স্বীকার করা। অথচ খাঁটি মোমেন হিসেবে এটা সে কিছুতেই হতে দিতে পারে না, যেহেতু সে নেফাকের সমাবেশে আছে তাই তাকেই ঈমান ও কুফরের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে তার ভূমিকা পালন করতে হবে।

মদীনায় কোনো কোনো মুসলমান মোনাফেক প্রধানদের বৈঠক ইত্যাদিতে বসতো। ওসব মোনাফেক ছিলো অত্যন্ত প্রভাবশালী। ওই সব বৈঠকে আলোচনা ও ঠাট্টা মস্কারি করে তাদের প্রভাবকে তারা টিকিয়ে রাখতো। একারণে এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত নাযিল হলে তাদেরকে ওই নীরবতার ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হলো। জানানো হলো, এসব সমাবেশে উপস্থিত ও নীরবতাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ যার দ্বারা পরাজয় স্বীকার করা বুঝায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা চাইলেন যেন তারা ওসব সমাবেশ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু ওই সময়ে ওই মেলামেশাটা একেবারে পরিত্যাগ করা হয়নি, যেহেতু ওদের বৈঠকসমূহ পুরোপুরি বয়কট করার নির্দেশ তখনও দেয়া হয়নি, যার কারণে পরিবর্তীতে তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া শুরু হয়ে গেলো, যখনই ওসব বৈঠকে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা হবে অথবা সেগুলোর সাথে ঠাট্টা মস্কারি করা হবে, তখন যেন তারা সে মজলিসকে বয়কট করে, সেখান থেকে উঠে চলে যায়। তা না করা হলে তাদের আচরণকে নেফাক বলে গণ্য করা হবে। এটা ছিলো এক ভয়ানক প্রত্যাবর্তনস্থল প্রেরণের হুমকি অর্থাৎ মোনাফেক হওয়ার অর্থ ছিলো কাফেরদের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যাওয়া এবং যে পর্যায়ে কাফের ও মোনাফেকরা রয়েছে সেই পর্যায়ে পৌছে যাওয়া। এ সম্পর্কিত আল্লাহর আয়াত,

'আর অবশ্যই তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের কাছে কেতাবের .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের মধ্যে কাফের ও মোনাফেক সবাইকে একত্রিত করে দেবেন।'

বিশেষভাবে একথাটি খেয়াল করা দরকার 'অবশ্যই তোমরা তখন ওদের মতোই হয়ে যাবে।'

এ হচ্ছে এমন একটি আযাবের হুমকি যে, এরপর ওই কাজের কদর্যতা সম্পর্কে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক ও কাফেরদের সবাইকে জাহান্নামে একত্রিত করে দেবেন।'

কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাকে পরবর্তীকালে শিথিল করা হয়েছে, সেসব সমাবেশের ওপর যেখানে আল্লাহর আয়াতগুলোকে এক কালে অস্বীকার করা হয়েছিলো এবং সেগুলোর সাথে ঠাট্টা-মস্কারি

করা হয়েছিলো। যেহেতু মুসলমানদের প্রত্যেক এলাকাতে মোনাফেকদের বৈঠক বর্জন করায় তাদের এসব কদর্য আলাপ আলোচনায় ভাটা পড়েছিলো এবং ধীরে ধীরে তা এক প্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। তবে আয়াতটিকে অথবা তার কার্যকারিতাকে এজন্যে একেবারে মওকুফ করে দেয়া হয়নি, যদি ওই সব ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি অন্য কোথাও আর কখনও হয়, তাহলে পুনরায় ওই হুকুম পূর্বের ন্যায়ই কড়াকড়িভাবেই বহাল হয়ে যাবে।

এরপর আসছে মোনাফেকদের অন্যান্য দিকের বর্ণনা এবং তাদেরকে সেখানে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ তারা এক মুখ নিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং আর এক মুখ নিয়ে কাফেরদের সাথে মিশতো। এই উভয় দলের মধ্যে তারা লাঠি ধরার কাজ করতো এবং জোঁক ও সাপের মতো হেলেদুলে বেড়াতো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা তোমাদের ওপরে বিপদ আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি তোমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আসে, তবে ওরা বলে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না.... আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্যে কোনো পথ করে দেবেন না।'

এখানে অতি ঘৃণার একটি চিত্র আঁকা হয়েছে যা শুরু হচ্ছে মোনাফেকদের সেই হিংসাত্মক কাজের প্রতিবেদন দিয়ে যা তারা মুসলমানদের দলের সাথে মিলে মিশে থেকে করতো এবং মুস-লমানদের জন্যে সব সময় বিপদ আসার অপেক্ষায় থাকতো। এসব কিছুর পরও বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন করতো। অবশেষে যখন আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসল-মানদের বিজয়ের খবর আসত তৎক্ষণাত ছুটে এসে তারা বলতো,

আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?'

ওপরের কথাটি দ্বারা তারা বুঝাতে চাইতো যে, তারা বাস্তব যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসলমানদের সাথে ছিলো। হাঁ কখনও কখনও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়তো বটে, তবে উদ্দেশ্য থাকতো মুসলমানদেরকে হীনমন্য করে দেয়া এবং মোজাহেদদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। অথবা ওপরে বর্ণিত ওদের ওই মিষ্টি কথা দ্বারা ওরা বুঝাতে চাইতো, মুসল-মানদের সাথে ওদের সম্পর্ক শুধু অন্তর ও আন্তরিকতার, আর অপরদেরকে ওরা বাস্তবে সাহায্য করতো এবং তাদেরকে নৈতিক সমর্থনও দিতো। এরশাদ হচ্ছে,

'আবার যখন কাফেরদের হিসসায় কিছু বিজয়ের ভাগ আসতো তখন তাদের কাছে গিয়ে বলতো, আমরা কি তোমাদেকে (মুসলমানদের থেকে) রক্ষা করিনি?'

একথা দ্বারা তারা বুঝাতে চাইতো যে, তারা কাফেরদেরকে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করেছে এবং তাদের বিজয়কে সমর্থন দিয়েছে; অপরদিকে মুসলমানদের পিছপা করতে সাহায্য করেছে এবং যুদ্ধের সারিতে বিশৃংলা সৃষ্টি করার কাজে সহায়তা করেছে। আর এইভাবে তারা (ধরে রেখেছে লাঠি, কিন্তু) কাজ করেছে জোঁক ও সাপের মতো। তাদের অন্তরে থেকেছে মারাত্মক বিষ এবং মুখে থেকেছে সুন্দর কথা। এতোদসত্তেও কোনো কোনো কারণে মুস-লমানরা তাদের প্রতি দুর্বল ছিলো। তাদের ভেতরটা বক্র হলেও বাহ্যিক আচার আচরণ ছিলো আকর্ষণীয় ও চটকদার, যার কারণে মোমেনরা তাদের অনেক কিছু মাফ করে দিতো। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধরে সমাজে মেলা মেশার কারণে মুসলমানরা সাধারণভাবে তাদেরকে অন্তর থেকে খারাপ জানতো না।

তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে রসূল (স.) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করলেন এবং মোমেনদেরকেও সতর্ক করে দিলেন যেন তারা ওদের

সব ব্যাপারে খেয়াল রাখে এবং অভিশপ্ত ওই শিবিরের ব্যাপারটা ভালোভাবে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তবে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে বিশ্বাস করা হতো না বা শাস্তিও দেয়া হতো না বরং আখেরাতের ফয়সালার ওপরেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, যেহেতু সেখানেই তাদের যাবতীয় পর্দা উন্মোচিত হবে এবং মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার জন্যে যে ষড়যন্ত্রের জাল তারা বিছিয়ে রেখেছে তার বদলা তারা অবশ্যই ওখানে পাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই কেয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন।'

সেখানে ষড়যন্ত্র বা ধোকাবাজি করার কোনো সুযোগই তারা পাবে না, পাবে না বিপদকাল গোপনে কারোই সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ, ভেতরের কথাকে গোপন করারও কোনো উপায় থাকবে না।

মোমেনদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি

অপরদিকে সুনিশ্চিতভাবে মোমেনরা আল্লাহর দেয়া চূড়ান্ত ওয়াদা অনুযায়ী সব কিছু পেয়ে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত হয়ে যাবে। আজকের এই গোপন ষড়যন্ত্র ও কাফেরদের সাথে তাদের যোগাযোগ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ও হিসাবের পাল্লায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না; আর কাফেরদের দাপট ও শক্তি প্রদর্শন কিছুতেই মোমেনদের ক্ষতি করতে পারবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই মোমেনদের ওপর কাফেরদের প্রাধান্য বা বিজয়লাভ করার কোনো পথ প্রস্তুত করে দেবে না।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, একথার উদ্দেশ্য কেয়ামতের দিন তারা কোনো পথ পাবে না। সেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজে মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, অতএব মোমেনদের ওপর প্রধান্য লাভ করার মতো কোনো সুযোগ মোনাফেকদের থাকবে না।

অপরদিকে আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়াতেই এ আয়াতের উদ্দেশ্য সফল হবে.... কারণ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে মোমেনদের ওপর চূড়ান্ত ভাবে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দেবেন না যদিও কোনো কোনো যুদ্ধে এবং কোনো কোনো এলাকাতে কিছু সময়ের জন্যে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে।

বাহ্যিকভাবে কোরআনের এ আয়াতের লক্ষ্য দুনিয়া বলেই মনে হচ্ছে। তবে আখেরাতের অর্থ নেয়াটা আরও বেশী উপযোগী, আর একইভাবে আখেরাতের অর্থ নেয়ায় কোনো বাধাও নেই যেহেতু নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোনো অর্থ বুঝানোর মতো শব্দ এখানে পাওয়া যায় না, আর আখেরাত সম্পর্কিত অর্থ বুঝানোর জন্যে অতিরিক্ত আর কোনো বিবৃতি অথবা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ গ্রহণ অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে চিন্তা করতে গেলেও বুঝা যায়। অবশ্য বাহ্যিক অর্থ কোনো কোনো সময় বিভ্রান্তিকর হয়। যার জন্যে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি চিন্তার দাবী রাখে।

যেখানকার জন্যেই এর প্রয়োগ হোক না কেন একথা নিশ্চিত যে, কিছুতেই কাফেরদেরকে আল্লাহ তায়ালা এমন সুযোগ দেবেন না যে, তারা মোমেনদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সত্যের বাতি নিভিয়ে দেবে, এটা আল্লাহর অকাট্য ওয়াদা, তবে এর জন্যে যে শর্তগুলো প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে, মানুষের অন্তরের গভীরে ঈমান মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এর বহিপ্রকাশ ঘটবে বাস্তব কাজে, ব্যবহারে ও তৎপরতায়– এক কথায় জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এবং বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন ও প্রচেষ্টা হবে নিছক

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এবং ছোট বড় সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহরই অনুগত্য করবে। যখন এই অবস্থা প্রদর্শন করা হবে তখনকার জন্যেই আল্লাহর ওয়াদা, 'কিছুতেই কাফেরদেরকে মোমেনদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করার কোনো সুযোগ তিনি দেবেন না।'

একথা এমনই এক সত্য, যার ব্যতিক্রম ইসলামের ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না। আমি সুনিশ্চিত ভাবে আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে বলতে চাই যে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, থাকতে পারে না, যেহেতু প্রকৃত মোমেন যে, তার কোনো পরাজয় নেই। 'যারা ঈমানের পথে দৃঢ় থেকে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করেছে তাদের পরাজয় হয়েছে' সামগ্রিকভাবে ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করেনা; তবে একটি বিষয় খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে, ঈমান বলতে কী বুঝায়? এর তাৎপর্য কী? মানুষের চেতনায় এ বিশ্বাসের অস্তিত্বই কি যথেষ্ট, না বস্তু ও কাজের মাধ্যমে এর বহিপ্রকাশ ঘটাতে হবে, ঈমানের দাবীগুলোর মধ্যে অবশ্যই এ দিকটি থাকতে হবে যে, মোমেন আল্লাহর পথে জেহাদের নিয়তে সদা-সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সকল প্রকার ভয় ভীতি ও প্রভাবকে বর্জন করে একমাত্র ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়ে দৃঢ়সংকল্প হতে হবে মুসলিম সমাজকে। এর অভাবে কোনো কোনো সময়ে ওপরে বর্ণিত ওয়াদার ব্যাতিক্রম সাময়িকভাবে দেখা গেছে। এগুলো পূরণ করে নিতে পারলে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

একবার ওহুদ যুদ্ধের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে সাময়িকভাবে মুসলমানদেরকে পরাজয়ের গ্লানি সইতে হয়েছে। কেন এমন হলো? সেখানে কি তারা রসূল (স.)-এর হুকুম অমান্য করেনি, গনীমতের মালের লোভে কি তারা নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করেনি? আবার দেখুন হোনায়েনের ময়দানের দিকে। দুশমনের অতর্কিত হামলা ও বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ মুসলমান জামায়াতকে সাময়িকভাবে হলেও বিশৃংখল করে দিয়েছিলো, কিন্তু কেন? শত্রুদের তুলনায় নিজেদের সংখ্যা ও শক্তি তিন গুন-একথা মনে জাগার কারণে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতায় কি তাদের কিছুটা বিচ্যুতি আসেনি? এসব মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে থেকে 'মুক্তি ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা'একথার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে অবিরামভাবে নিজেদের সাধ্যমতো প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার কাজ যেন মোমেনরা বরাবর করে যায় তার জন্যেই ছিলো এ সাময়িক পরাজয় সতর্কীকরণের এক চাবুক। মুসলিম জাতির পেছনের ইতিহাসের দিকে যখন আমরা গভীর দৃষ্টিতে তাকাই, তখন এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির কিছু না কিছু অবশ্যই আমরা দেখতে পাই। এগুলো আমরা বুঝি বা না বুঝি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথাই চির সত্য।

হাঁ, দুর্ভোগ কখনও কখনও আসে, আসে ঈমানের পরীক্ষার জন্যে, অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় বলে যে সত্যকে গ্রহণ করেছি বলে আমরা দাবী করেছি তার প্রতি কতোটা আন্তরিক আকর্ষণ আমাদের আছে এবং তা ধরে রাখার জন্যে কতোটা স্বীকার করার প্রস্তুতি আমাদের আছে তা পরখ করার জন্যে অবশ্যই কখনও কখনও আঘাত এসেছে, আসবে-এ পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, এর মাধ্যমে হৃদয়ে ঈমানের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো যুদ্ধের জয় পরাজয়ের পরিণতিকে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি না; আমি আত্মিক ও মানসিক পরাজয়কেই মূল পরাজয় মনে করি। পরাজয়ের গ্লানি বলতে আমি বুঝি শুধু কোনো এক যুদ্ধে হেরে যাওয়াই নয়, বরং যখন কোনো বাহিনী কোনো যুদ্ধে মার খাওয়ার পর হিম্মত হারিয়ে ফেলে ঠান্ডা হয়ে যায়, শত্রু-ভীতি তার মনের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে তাকে স্থবির বানিয়ে ফেলতে চায় এবং চতুর্দিক থেকে

তাকে হতাশা পেয়ে বসে-প্রকৃতপক্ষে তখনই সে পরাজিত হয়। কিন্তু যখন দেখা যায়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত সিংহের মতো সে গর্জে উঠেছে, ফোঁস ফোঁস করে উঠেছে তার অন্তরের বহ্নিজ্বালা, পদস্খলের চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়ায় তার সামনে গভীর বিশ্বাসের প্রকৃতি ও যুদ্ধের প্রকটিত চেহারা খুলে গেছে, বিজয়ের পথকে উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছে তখন, সে অনুভব করেছে এ আঘাতপ্রাপ্তি কোনো পরাজয় নয়, এটা দুর্গম কন্টকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে ব্যত্যাতাড়িত ঝোপ-ঝাড় থেকে লাগা কিছু কাটার কোঁচা, অথবা গিরিসংকট পরিক্রমায় অসাবধানতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ডের সাথে সাময়িকভাবে লাগা কিছু নির্দয়-হোঁচট। যতো দীর্ঘই হোক না কেন, তাকে এ পথে চলতেই হবে, এ পথে চলেই অর্জন করতে হবে সুনিশ্চিত বিজয়, তাকে বাতিলের ধ্বংস স্তুপেই সত্য সুন্দরের বিজয়-কেতন উড়াতে হবে।

এটাই ছিলো তখনকার অনুভূতি সেই আহত বীর শার্দুলদের যখন যুদ্ধ প্রত্যাবর্তিত হয়ে তারা শুনতে পেলো আল্লাহর বিঘোষিত অমিয় বার্তা, যে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্যে বিজয়ের কোনো পথ প্রস্তুত করে দেবেন না। এখানে স্পষ্টভাবে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, অবশ্যই মোমেনদের আত্মা বিজয়ী হবে এবং কাফেরদের চিন্তা ধূলিধুসরিত হবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জামায়াতকে আহবান জানাচ্ছেন যেন, তারা ঈমানের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ও বুঝে শুনে তাদের অন্তরের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করে, তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করে নীতিগতভাবে এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে। ঈমানের বাহ্যিক দাবীকে তারা যথেষ্ঠ মনে করে যেন এ নির্ভর না করে যে, এই নির্ভরশীলতা তাদেরকে তরিয়ে দেবে। ঈমান শুধু কয়েকটি কথার নাম নয়, বরং ঈমান হচ্ছে সেই বাস্তবতা, যা এই উচ্চারিত কথাগুলোর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে।

সংখ্যা ও সরঞ্জাম বিবেচনা করে কোনো কালে এবং কোনো দেশে আমাদের পক্ষে বিজয়ের কোনো চিন্তা করা উচিত নয়। যদি আমরা ঈমানের এ তাৎপর্য বাস্তবায়িত না করি, ঈমানের দাবীকে আমাদের জীবনে এবং আমাদের বাস্তব কাজে, কথায়, চিন্তা ও ব্যবহারে পূরণ না করি, অবশ্যই ঈমানের তাৎপর্য হিসেবে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, যারা আল্লাহর যমীনে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম হোক চায় না তারা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে। অতএব আত্মরক্ষার জন্যেও বটে এবং আল্লাহর সৈনিক হিসেবে তাঁর যমীনে তাঁর কথাকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে প্রতিরোধ করার উপযোগী সব ধরনের শক্তি ও সরঞ্জাম যোগাড় করতে হবে। ঈমানের তাৎপর্য এটাও যে, আমরা কোনো দুশমনের ওপর কোনো কিছুর জন্যেই নির্ভর করবো না, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো কাছে কোনো ইযযত বা মান-সম্মান চাইবো না। ঈমান ও কুফরের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত আল্লাহর এই ওয়াদা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

ঈমান হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যা কখনও দুর্বল হয় না বা কখনও ধ্বংসও হয়ে যায় না। অপরদিকে কুফুর হচ্ছে সেই মহাশক্তি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাঁর থেকে দূরে সরে যাওয়া, আর অবশ্য অবশ্যই সত্য যে, এ শক্তি কোনো সীমাবদ্ধ শক্তি নয়, নয় কেটে যাওয়ার মতো এ শক্তির বন্ধন। এ শক্তির হাত থেকে কেউ দূরেও সরে যেতে পারে না এবং এ শক্তি কোনোদিন ধ্বংস হবার নয়। সারা বিশ্বের কোনো জায়গায় এমন কেউ নেই যে, এই শক্তির উৎসের কাছে পৌঁছাতে পারে অথবা তার ওপর বিজয়ী হতে পারে।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ঈমানের তাৎপর্য ও তার বাস্তবায়ন এবং তার বাহ্যিক রূপের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে করা, এ দুটি অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং সেই অসুসারে আমাদের কাজ করতে হবে।

ঈমান এক দৃঢ় মযবুত ও স্থায়ী শক্তি, সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে যার নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে। ঈমান মানুষের ব্যক্তিসত্তার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী এক মহাশক্তি। এ শক্তির প্রভাব ও বহিপ্রকাশ দেখা যায় তার যাবতীয় তৎপরতায় ও কর্মকাণ্ডে। এ এক মহা বাস্তব ও বিরাট শক্তি। আপাতদৃষ্টিতে ভয়ংকর বলে বিবেচিত বাতিল শক্তি যখন এ মহাশক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে আসে তখন এ শক্তি তার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরিপূর্ণ দায়িত্বের সাথে কুফুরকে পর্যুদস্ত করে তার সহযোগী অন্যান্য সকল বাতিলপন্থীদের সাথে তার সম্পর্ককে কেটে দেয়। কিন্তু ঈমানী শক্তি যখন বিজয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে যায় তখন কুফরী শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তথাকথিত ঈমানী শক্তির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন এ বাতিল শক্তি তার নিজ প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে এবং সর্বত্র অন্যায় ও অবিচার ছড়িয়ে দেয়। মৌখিক ঈমানের দাবী, কিছু বাক্য বা ঈমানের কথা, কিছু কালেমা বা ঈমানের বাহ্যিক রূপ, তখন এই বাতিল শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারে না। কারণ কোনো বিষয় বা মতবাদ যখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং টিকে থাকার জন্যে সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে, তখন তা নিছক কিছু মৌখিক দাবীর ওপর অবশ্যই বিজয়ী হয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত এ শক্তি 'কুফুর' এবং মৌখিক দাবীর বিষয়টি যদি ঈমানও হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কোনো কিছুর বাহ্যিক রূপ চেহারা ও অপর কিছু বাস্তবায়ন এ দুই এর মধ্যে বাস্তবায়ন যার সেই ময়দানে টিকে থাকবে। অন্য কথায় ক্ষমতায় যে আছে সেই জয়ী থাকবে আর যে নামে আছে সে পরাজিত অবস্থায় শুধু নাম নিয়েই কোনো প্রকারে বেঁচে থাকতে পারে।

বাতিলকে পরাভূত করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চেষ্টা করা। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যখন যেখানেই সমগ্র শক্তি দিয়ে চেষ্টা করা হয় এবং নিরন্তর এই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কদাচিত মিথ্যাকে মাথা খাড়া করে থাকতে দেখা যায়। 'যখনই বাতিল শক্তির ওপর সত্য ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে মারা হয়, তখন সত্য বাতিলকে নিষ্প্রভ করে দেয় এবং অবশেষে অসত্যের পতন ঘটে।'

'আর কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে মোমেনদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে কোনো পথ করে দেবেন না।'

মোনাফেক চরিত্রের আরো কিছু চিত্র

মোমেনদেরকে নিশ্চিন্ত করতে গিয়ে তাদেরকে চূড়ান্ত ওয়াদা দেয়ার পর আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে মোনাফেকদেরকে ধিকৃত করার জন্যে। ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে যে, কাফেরদের কাছ থেকে শক্তি সাহস ও মান সম্মান লাভ করার আশায় একদল তথাকথিত মুসলমান কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং তাদেরকে দরদী ও বন্ধু মনে করতো এরা আল্লাহর কাছে চরম লাঞ্ছিত। এরপর তাদের আরো কিছু দোষের কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অসন্তোষের আর একটি অবস্থা প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহর অভিশাপে তারা সদা সর্বদা এবং সর্বত্র বে-ইযযত হবে, দুনিয়ার কোথাও এরা মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। কারণ,

'অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে, বরং তিনিই তাদেরকে ধোকা দেয়ার অবস্থায় রয়েছেন,... যাকে আল্লাহ তায়ালা ভুল পথে চালিত করেন তার জন্যে তুমি কোনো (ভাল) পথ পাবে না।' (আয়াত ১৪২)

এখানে মোমেনদের অন্তরের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আর একটি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে ধোকাবাজির কারণে, এ হতভাগা মোনাফেকদের প্রতি মোমেনদের অন্তর

ঘৃণায় কুঁচকে যায়। এ হৃদয়গুলো তো অবশ্যই জানে যে, মহান ও করুণাময় আল্লাহ তায়ালা কাউকে ধোকা দেন না। যেহেতু তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এ অন্তরগুলো আরো জানে যে, আল্লাহর জ্ঞানে এটাও আছে যে, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে, সকল মনের মধ্যেই কিছু না কিছু অন্যায়, অজ্ঞানতা, উদাসীনতা এবং কখনো বড়ো অপরাধের চিন্তাও আসে। তবুও সে হৃদয়গুলো কেন এমন করে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়, কেন তাদেরকে এতোটা নিচ মনে করে। কেন তাদেরকে এমন করে ছোট জানে? কারণ একটিই আর তা হচ্ছে ওদের ওদ্ধত্য। সর্বজ্ঞ ও পরম করুণাময় আল্লাহকেও ওরা ধোকা দিতে চায়।

আল্লাহর বাণীতে জানা গেলো ওরা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, 'আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন।' অর্থাৎ তিনি ওদেরকে সম্মানজনক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছেন। তাদের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না, যাতে করে তারা সতর্ক হতে পারতো। কোনো তিরস্কারও করছেন না যা তাদের চোখ খুলে দিতে পারতো। তাদেরকে তাদের কুপ্রবৃত্তির হাতে যথেচ্ছাচার করার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছেন যাতে করে তাদের চরম অধপতন ঘটে এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে ধোকা।

বিপদ আপদ ও অনেক প্রকারের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের শোধরানোর সুযোগ দেন, এজন্যে সেগুলো প্রকারান্তরে আল্লাহর রহমত। এর ফলে শীঘ্রই তারা ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ কাজ থেকে ফিরে আসে অথবা অনেক বিষয়, যা পূর্বে তারা খেয়াল না করার দরুন মাঝে মাঝে করতো, কখনও কখনও বড়ো বড়ো গুনাহ হয়ে যেতো, সেগুলো খেয়াল এসে যায়। এইভাবে ভুল পথে চালিত গুনাহগারদেরকে শোধরানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এটা আল্লাহ পাকের বহুবিধ রহমত ও নেয়ামতের অংশ। কিন্তু মোনাফেকী এতো বড় অপরাধ যে, এর ক্ষমা হওয়া মুশকিল। তারপর রয়েছে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার অপচেষ্টা এজন্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো ছোটখাটো শাস্তি দানের মাধ্যমে তাদের সম্বিত ফিরাতে চান না। তিনি তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন যেন তাদের পাপের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে যায় এবং কেয়ামতের দিনের তারা চরম অকল্যাণের ভাগী হতে পারে।

এরপর চলছে প্রাসংগিক আলোচনা, যাতে মোনাফেকের কিছু কদর্য আচরণ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে এগুলো জেনে মোমেনরা তাদের প্রতি আরো বেশী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে এবং তাদের প্রতি চরম ঘৃণার উদ্রেক করায় তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে দেয়। তাই, তাদের অন্যান্য চরিত্রগুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'তারা নামাযের দিকে যায় বটে, কিন্তু আন্তরিকতা নিয়ে নয়, লোক দেখানো নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার কারণে তাদের গাফলতি ও উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েই যায়। আসলে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত তারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণই করে না।'

ওরা আল্লাহর সাথে নামাযের মাধ্যমে সাক্ষাত হবে এমন আকৃষ্ট অন্তর ও ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে মসজিদের দিকে যায় না, নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথাও ওরা চিন্তা করে না, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়ার কথা ওদের মনে জাগে না। ওরা শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে নামাযে দাঁড়ায়। আর এই কারণেই তাদের নামায হয় আন্তরিকতাহীন এবং উদাসীনতায় ভরপুর। যেন কোনো দুর্বহ বোঝা বহনের কাজ করে চলেছে ওরা অথবা ভীষণ কষ্টের সাথে কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। এমনিভাবে,

আসলে তাদের অল্প কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত বাকি সবাই সত্যিকারে আল্লাহকে স্মরণ করে না। আসলে ওরা আল্লাহর কথা চিন্তা করে না, চিন্তা করে শুধু মানুষের কথা। ওরা আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয় না, ওরা তো শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই নামায পড়ে। মানুষকে দেখানোই ওদের কাজ এবং মোমেনদের সামনে নিসন্দেহে ওরা ওদের একটা নিকৃষ্ট চেহারা প্রদর্শন করে। এর ফলে মোমেনদের অন্তরে ওদের সম্পর্কে হীনতা ও ঘৃণার উদ্রেক করে। আর তাদের মর্যাদার এই অবমাননাকর অবস্থা মোমেনদের চেতনায় যখন ভেসে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে বহু দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। এ কারণে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছেদ আসে এবং কোনো আপোষ করা আর সম্ভব হতে চায় না। মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহর পরিকল্পনার অধীনেই মোমেন ও মোনাফেকদের মধ্যে এই দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

মোনাফেকদের ঘৃণার চেহারা আকঁতে গিয়ে পরবর্তীতে আরো অনেক কথা আসছে

এরা (ঈমান ও কুফরীর) দোটানায় দোদুল্যমান .... তার জন্যে তুমি কোনো পথই পাবে না।'

তাদের দোদুল্যমান এই অবস্থান, কখনও সত্যের দিকে, কখনও মিথ্যার দিকে ঝুঁকে পড়া, কোনো স্থিরতা তাদের নেই, কখন কি করবে তারা নিজেরাই বুঝে না, কাফের ও মোমেন দলে কোনোটাতেই তারা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। এমনই এক অবস্থা এটা যে কারো কাছেই ওদের মূল্য নেই, সবার নিকটেই ওরা ঘৃণার পাত্র, তাদের দেখলেই নাক কুঁচকে আসতে চায়। কতো করুণ ও অবস্থা! তাদের বিশ্রী চেহারার এই চিত্র মানসপটে একবার এঁকে দেখুন, মানব জাতির জন্যে তাদেরকে মনে হবে এক ভীষণ কলঙ্ক, তাদের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা একালে এবং পরকালেও। না দুনিয়াতে তাদের আহাজারিতে কারো মন গলবে, না আখেরাতে তাদের প্রতি কোনো অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে। ওদের এ দূষণীয় ও নড়বড়ে অবস্থা আঁকার পর যে কথাটা আসছে তা হচ্ছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পুরোপুরিই নেয়া হয়ে গেছে। এটা স্থির হয়ে গেছে যে, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনে আর কোনো সহায়তা করা হবে না। আর এই কারণেই অন্য কেউ তাদেরকে কিছুতেই হেদায়াতের পথে আনতে পারবে না এবং তাদের কল্যাণের জন্যে কেউ কোনো সোজা পথও বের করতে পারবে না যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন,

'যাকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ করবেন তার জন্যে তুমি আর কোনো পথ পাবে না।'

এ পর্যন্ত যে আলোচনা এসেছে তাতে জানা গেছে, মোমেনদের অন্তরে মোনাফেকদের দুর্বলতা, দুষণীয় অবস্থা ও নীচুতা সম্পর্কে ধারণা কতো গভীর। এরপর মোমেনদেরকে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যে সব খাসলাতের কারণে মোনাফেকদের এই চরম দুরবস্থা হবে সেই সব কদর্য খাসলাত থেকে মোমেনরা যেন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে; কোনোক্রমেই যেন ওই সব দোষ মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। আর মোনাফেকদের পথ ও পদ্ধতি যা ইতিপূর্বে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা।'

এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় সেই কারণ যার জন্যে আল্লাহর আক্রোশ অবধারিত হয়ে যায়। তাই আল্লাহর ক্রোধ ও সেই ভীষণ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে সতর্ক করা হয়েছে, যা আখেরাতে তাদের ওপর অবশ্যই নেমে আসবে। আখেরাতে যেখানে তাদেরকে থাকতে দেয়া হবে, সে জায়গা হবে যেমন ভয়ংকর, তেমনি চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থল, তেমনি হবে অপমানজনক, এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! খবরদার, মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কখনও কাফেরদেরকে বন্ধু (অভিভাবক মুরব্বী ও সাহায্যকারী) রূপে গ্রহণ করো না....।'

মোমেনদেরকেই পুনরায় ডাকা হয়েছে সেই সব গুণ বৈশিষ্ট্যসহ যা তাদেরকে মোনাফেক ও আশপাশের অন্য সবার থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে এবং যে গুণ অন্যদের চলার পথ ও পদ্ধতি, জীবনের আইন কানুন ও বাস্তব ব্যবহার থেকে মুসলমানদেরকে পৃথক করেছে এবং সে সমস্ত গুণের কারণে আল্লাহর আহ্বানে তারা সাড়া দিতে পেরেছে। সেই সব গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা কাফেরদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ডাকে সাড়া দেবে। সেই গুণের কারণেই আশা করা যাচ্ছে যে তারা মোনাফেকদের পদাংক অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাবে এবং মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ না করার ব্যাপারে হুশিয়ার হয়ে যাবে।

এখানকার এই হুকুম ওই সময়ের সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করেই দেয়া হয়েছে এমনটি মনে হয় না। কারণ, তখন তো কোনো কোনো মুসলমান ও ইহুদীদের সাথে এবং অনেক মুসলমান ও কোরায়শ কাফেরদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল ছিলো যদিও এ সম্পর্কে পুরোপুরি আন্তরিকভাবে ছিলো না এবং সদ্ভাবও ছিলো না। একারণে আমরা 'কোনো কোনো মুসলমানের সম্পর্ক ছিলো' বলছি। আর অনেক মুসলমান ছিলো যারা জাহেলী সমাজে অবস্থিত সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলো এমন কি বাপ দাদা ও সন্তানাদির সাথেও। তারা তাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথীদেরকেই একমাত্র আত্মীয় মনে করে ফেলেছিলো এবং তাদের সাথেই আন্তরিক মহব্বত কায়েম করেছিলো, যেহেতু তারা বুঝতে পেরেছিলো এটিই আল্লাহর শিক্ষা।

এজন্যেই ওই যে শ্রেণী তখনও জাহেলী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন পুরেপুরি ছিন্ন করতে পারেনি, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতারণা। তাদেরকেই জানানো হচ্ছে কাফেরদের সাথে আর কোনো প্রকার আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা যাবে না, এ দুর্বলতা হবে মোনাফেকীর নামান্তর। বরং সতর্ক করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এইটিই নেফাক ও মোনাফেকীর পদ্ধতি। এইভাবে নেফাক ও মোনাফেকীর ঘৃণ্য, কদর্য ও দুষিত ছবি আঁকার পর সতর্ক করা হচ্ছে যেন অচিরেই তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, নচেৎ ক্রোধ ও শাস্তি অনিবার্য। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি চাও তোমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্যে যথোপযুক্ত যুক্তি, ক্ষমতা ও স্পষ্ট দলীল এসে যাক?'

নিশ্চয়ই কোনো মোমেন হৃদয় এই অবস্থাটা কবুল করে নিতে রাযী হবে না; বরং এ আয়াত শোনার সাথে সাথে কম্পিত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব থেকে বাঁচার জন্যে প্রত্যেক মোমেন সতর্ক হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। সেই জন্যে জিজ্ঞাসার সুরে কথাটি স্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসার বাক্যে কথাটি পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর এই মর্মস্পর্শী বাক্য মোমেনদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তাকে সচকিত করে তোলে এবং তারা যেন সাথে সাথে অতীতের সকল সম্পর্কের মধ্যে ছেদ টেনে দেয়।

এ কথার মধ্যে আর একটি বিশেষ বাকচাতুর্য লক্ষণীয়, সরাসরি কাউকে সম্বোধন না করে ইংগিতে বলা হয়েছে যেন যারাই এসব দুর্বলতার মধ্যে এখনও লিপ্ত তারা এই সতর্কবাণীর যথার্থ মর্ম বুঝে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে নেয় এবং মোনাফেকীর গন্ধ নিজেদের জীবন থেকে দূর করে দিয়ে পাক পবিত্র হয়ে যায়।

মোনাফেকদের ভয়াবহ পরিণতি

'নিশ্চয়ই মোনাফেকদেরকে দোযখের আগুনের একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে (যেখানে আগুনের তীব্রতা হবে সব থেকে বেশী।) আর সেখানে তাদের জন্যে তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।'

'দরকিল আসফাল' সর্ব নিম্ন তলে এটা এমন একটা জায়গা যার সাথে পৃথিবীর মৃত্তিকা-গভীরের স্তরের তুলনা করা যায়, যেখানে নড়াচড়া করা বা যেখান থেকে সরে আসা কোনোটাই সম্ভব নয়। সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্যে ইচ্ছা, আগ্রহ, ভয় ভীতি, দুর্বলতা এবং আর্তনাদ প্রকাশ করা হবে, কিন্তু এতো নীচে থাকার কারণে তাদের চীৎকার কেউ শুনবে না, নিস্পেষিত হতে হবে সর্বক্ষণ, কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য আসার সুযোগ থাকবে না। মোমেনদের থেকে ফিরে গিয়ে কাফেরদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করার ফলেই এই কঠিন শাস্তি আসবে। দুনিয়ার এই অবস্থানের বদলাতেই তাদেরকে দেয়া হবে সে অপমানজনক বাসস্থান, মনের সে সংকটের কারণে দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজমান তারা, না এ দিকে, না ওদিকে কোনো দিকেই তাদের অবস্থান স্থির নয়।

দুনিয়ার জীবনে এই দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার কারণে তারা নিজেরাই তাদের খাহেশের বশবর্তী হয়ে ওই নিকৃষ্টতম স্থানের জন্যে উপযোগী করে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে। সেই কঠিন স্থানে যাওয়ার জন্যে তারা রাত দিন রীতিমত চেষ্টা সাধনা করেছে। 'আগুনের সব থেকে নিম্নস্তরে' নিজেদেরকে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিয়েছে। সেখানে কোনো প্রকারের সহযোগিতা বা সাহায্যের কোনো আশা নেই। দুনিয়ার কাফেরদেরকেই তারা দরদী বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। আজকে কোথায় সেই দরদী বন্ধুরা? কেন তারা আজ সাহায্য করতে আসে না?

হাঁ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই দয়ালু যদি কেউ নিজের ভুল বুঝতে পেরে সময় থাকতেই তাওবা করে, তাকে তিনি হতাশ করেন না। তাই ওই মহা অভিশাপ থেকে বাঁচার পথ তিনিই বলে দিচ্ছেন। যে চাইবে সে এই নাজাতের পথ গ্রহণ করতে পারবে, সুতরাং শর্ত হচ্ছে চাওয়া ও চেষ্টা করা। এরশাদ হচ্ছে,

'তবে যারা তাওবা করবে (কাফেরদের সর্বপ্রকার প্রভাব বলয় থেকে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে আসবে, ... সেই সকল ব্যক্তিই মোমেনদের সাথে থাকতে পারবে।' (আয়াত ১৪৬)

অন্যান্য স্থানে এতোটুকু বলেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, 'যারা তাওবা করবে ও সংশোধিত হয়ে যাবে তারা বদে...।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাওবা ও সংশোধন দুটি একে অপরের সম্পূরক। আল্লাহকে ধরা ও আল্লাহর জন্যেই দ্বীনকে খালেস করে নেয়া অর্থাৎ নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা' দু'টি কথা একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারণ যে আল্লাহর দিকে ফিরবে মনের আনাচে-কানাচে সে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ রাখবে না, কোনো দোমনা ভাবও থাকবে না এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তখনই তার আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁকে স্মরণে রেখে তাওবা করা ও সংশোধিত হওয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে। তাকে একমাত্র আল্লাহকেন্দ্রিক হতে হবে, শুধু তাঁকেই ধরতে হবে। মনের মধ্যে আশা সর্বপ্রকারের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এবং চারিত্রিক সকল দুর্বলতা ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে, তাহলেই আল্লাহকে ধরার কাজ একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হবে। আর একমাত্র আল্লাহ নিষ্ঠ হতে পারলেই অন্য সকল প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এইভাবে তাওবাকারীদেরকে মোমেনদের সারিতে তুলে নেয়া হবে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর নিজ শক্তি বলে তাদেরকে সম্মানিত করবেন। তারা তাদের ঈমানের প্রকাশ ঘটাবে তাদের বাস্তব জীবনের কাজে, কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে। তারা পৃথিবীতে নির্ভীক চিত্তে ঈমানের বলে বলীয়মান হয়ে চলবে। আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর সৈনিকের দাপট নিয়ে। তাহলে তারা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে এটা সবার জানা। আর তখনই সফল হবে আল্লাহর ওয়াদা, আর শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে মহাপ্রতিদান দেবেন।

মোনাফেকদের বিভিন্ন প্রকারের চেহারা উপস্থাপনের পর এবারে মুসলিম জনপদের মধ্যে তাদের কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব ছিলো সে বিষয়ে আলোচনা আসছে। সাধারণভাবে তাদের মর্যাদাকে মুসলিম সমাজে অত্যন্ত তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে এবং মোমেনদেরকে সাবধান করা হয়েছে যেন সেসব বিষয়ে মোনাফেকদের পদস্খলন হয়েছে, সেগুলো থেকে মুসলিম জনপদ বেঁচে থাকে এবং যেসব জঘন্য ব্যবহারের কারণে তারা ধিকৃত হয়েছিলো সেসব ব্যবহার যেন মুসলিম জনপদ পরিহার করে চলে। এরপর মোনাফেকদের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দেয়া হচ্ছে, যাতে করে ওদের মধ্যে তারা কিছু ভালো প্রবণতা রাখে, তারা যেন সে মর্যাদাকে কলুষতামুক্ত করার সুযোগ পায় এবং সত্য প্রিয়তা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা নিয়ে মুসলিম সমাজে নিজেদের যথাযোগ্য আসন করে নিতে পারে।

তওবার দরজা খোলা

এরপরে আসছে ওই মহা নেয়ামতের আশ্বাসবাণী যার ছোঁয়ায় মোমেন হৃদয় উজ্জীবিত হয়, যার গভীর প্রভাব হতাশ হৃদয়ে আনে আনন্দের ফলগুধারা, যার মধুর স্পর্শে নিরাশার মধ্যে জ্বলে আশার আলো। এতো কঠিন শাস্তির ভয় দেখানোর পর রহমান রহীম আল্লাহর বর্ণনার সাগরে যেন বান ডেকে উঠলো, তাঁর করুণা প্রদর্শনের মহিমা স্থির থাকতে পারলো না। তাই তিনি ডাক দিয়ে বলে উঠলেন, ফিরে এসো ফিরে এসো হে পথহারা, দিশেহারা অশান্ত আমার বান্দারা, তোমরা যদি আমার শাস্তির কথা চিন্তা করে ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হৃদয়ে আমার রহমতের দরিয়ায় অবগাহন করার জন্যে এগিয়ে আসো তাহলে কেন আমি তোমাদের শাস্তি দেবো, কিসের আমার এমন গরয তোমাদের কষ্ট দেয়ার, আমার প্রতিদানের অসীম ভান্ডার কি চির অবারিত নয় তোমাদের জন্যে, আমার কি প্রয়োজন পড়েছে তোমাদের দ্বারা আমার শক্তি-ক্ষমতা স্বীকার করানোর। তোমরা আমার পথে ফিরে এসো, এ পথ তো তোমাদের জন্যে, তোমরা আমার নেয়ামতের প্রস্রবন থেকে আকণ্ঠ পান করবে, আমার সৌন্দর্যের ভুবন থেকে আহরণ করবে তোমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তার জন্যেই তো আমার জগত জোড়া আয়োজন! আমার ফুল বাগিচা থেকে চয়ন করবে প্রাণ ভরে আর দু'হাত দিয়ে তার সুরভি বিলাবে দিকে দিকে, তার জন্যেই তো আমার সৌন্দর্যের এই সমারোহ।

কিন্তু হায়, আমাকে ভুলে আমার সব আয়োজনকে উপেক্ষা করে তোমরা মজে আছো মানব নির্মিত ব্যবস্থায়, মানুষের মনগড়া সভ্যতায়, অলীক মূর্তিগুলোর অন্তরালে লুকিয়ে আছে স্বার্থন্বেষী চক্রের হীন মনো কামনা, আর তোমরা নিরন্তর তাদের সেই কামনা বাসনার আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছো। তোমাদের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার মর্যাদাকে ভুলে গেছো। এটা কি করে ভাল হতে পারে তোমরা ভোগ করবে আমার ভান্ডার থেকে, আর গান গাইবে আমারই সৃষ্ট আসহায় অন্য কারো? আমি তোমাদের জন্যে যে নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি তার থেকে প্রাণ ভরে ভোগ করবে আর সেগুলো যে আমারই দান তা স্বীকার করে ভক্তিভরে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে নুয়ে

পড়বে আমারই সকাশে। এর থেকে বাড়তি তো আমি চাইনি তোমাদের কাছে। একথাগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আযাব দিয়ে কি করবেন বলো, তোমরা যদি ঈমান আনো ও ঈমান এনে তাঁর শোকরগোযারি করো? যে শোকরগোযারি করে, আল্লাহ তায়ালা তার যথার্থ মর্যাদাদানকারী তিনি মহাজ্ঞানী।'

হ্যাঁ, এটিই মহা সত্য কথা, তিনি তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কিই বা করবেন? তিনি তো চান তাঁরই একথা মেনে নিয়ে ও তাঁকে সবারই প্রভু, মনিব মালিক ও রুযিদাতা বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই কথামত জীবন যাপন করে সুখী হও, আর যার যা পাওনা তাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করে সবই ভাই হিসাবে বসবাস করো এ দুনিয়ায় এবং আখেরাতে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত চিরদিনের তরে ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। তাঁর আযাব তো শুধু তারই জন্যে যে তাঁকে অস্বীকার করে ও এইসব নেয়ামত যে তাঁরই দেয়া॥এটা মানতে চায় না। এটা কেমন করে হয়, রাজ্য তাঁর, মালিক তিনি, আর সেখানে পোদ্দারী করবে আর কেউ, তিনি কি ঠুটো জগন্নাথ, না কোনো আঁধার নগরীর মুকুটহীন রাজা যে, তিনি তা চুপ করে সহ্য করবেন? তাঁর আযাব তো এই সব যুক্তিবিরোধী কাজের ধারক বাহকদের জন্যেই। তাঁর কোনোই খাহেশ নাই কাউকে আযাব দেয়ার, কাউকে ডান্ডাবেড়ি পরানোর কোনো ইচ্ছা তার নেই, কাউকে ব্যথা দিয়ে তিনি কোনো মজা পান না। অথবা তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনেরও কোনো গরয নেই। মহান তিনি, সব প্রয়োজনের উর্ধে তিনি। এসো, এসো, তাঁর (মমতার কোলে শোকর ও ঈমানের পাথেয় নিয়ে, আপ্লুত হবে তুমি তাঁর ক্ষমা ও সন্তোষ লাভে। দেখতে পাবে, তোমার শোকরগোযারির মুল্যায়ন কতো, বান্দার জন্যে প্রেমময় মালিকের হৃদয় কতো উদ্বেলিত। আল্লাহ তায়ালা একথা জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন বান্দার শোকরগোযারি কবুল করেন তখন বান্দা গভীরভাবে অন্তরের অন্তস্থলে তাঁর মহব্বতের সে আবেগ অনুভব করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে শোকরিয়া আদায় করার অর্থ তাঁর সন্তোষ দান করা, আর সন্তোষ দান করার অর্থ প্রতিদান দিতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। এতো হলো আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজেকে 'শাকের' বলে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝতে চাইছেন তা একমাত্র তিনিই ভালভাবে জানেন।

এরপর সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই যদি লালনপালনকারী, নেয়ামতদাতা, মর্যাদাদানকারী এবং সমগ্র বিশ্বের সব কিছুর প্রয়োজনের উর্ধে হন, তিনি যদি তাঁর বান্দাকে সত্য জীবন যাপন করান, ঈমানী রাস্তায় চালান এবং সব কিছুর ব্যাপারে মালিকের শোকরগোযারি করান, খুশী হয়ে তাকে যথাযথ মর্যাদা দানে ধন্য করতে চান, তাহলে কেউ কি তাঁর হাতকে ধরে রুখতে পারে? কে কি বললো আর কে কি ভাবল এসব নিয়ে তাঁর চিন্তার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? তিনি তো কোনো কিছুর জন্যে কারো মুখাপেক্ষী নন, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সঠিক মূল্যায়ন করেন, তখন সেই ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নেয়ামত ধন্য বান্দা কেন তার মহান সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা, নেয়ামতদাতা ও মর্যাদাদানকারী আল্লাহর কাছে মাথা নোয়াবে না। কেন তাঁর শোকরগোযারিতে লুটিয়ে পড়বে না?

এ মহা আবেগপূর্ণ মমতার আমেজ মাখানো আওয়ায যখন আদরের সাথে বান্দার হৃদয় দুয়ারে মৃদুমন্দ আঘাত করতে থাকে, তখন কে আছে যে এ মধুর ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে।

এটাই হচ্ছে আল্লাহর সরল সঠিক ও সুন্দর পথের মহা উজ্জ্বল দিকদর্শন। মহা দানশীল, নেয়ামতদাতা কৃতজ্ঞ ব্যক্তির মূল্যায়নকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত মনযিলে মকসুদের দিকে এ দিকদর্শন পথ দেখাচ্ছে।

পঞ্চম পারার পরিশিষ্ট

এরপর আসছে এ পর্যায়ের সমাপ্তির কথা, কোরআনে করীমের ত্রিশ পারার মধ্যে এই হচ্ছে একটি মাত্র পারা। এ পারার মধ্যে একটি কর্মী বাহিনীর দু'টি বাহুর মতো প্রধানত দুই ধরনের কাজ এক সাথে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিম সমাজকে গড়ার কাজ এবং এর মধ্যে যে ভাংগন-বিপর্যয় এসেছে বা আসবে তা শোধরানোর কাজ, আরো অনেক কাজের বিবরণী এ অধ্যায়ের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, এ সমাজের সৌন্দর্য বর্ধন ও মযবুত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ, এ সমাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য জনপদের মোকাবেলায় এর উন্নতি-বিধান, এর সামাজিক সংস্কার এবং মযবুত একটি সমাজ হিসেবে গড়ে ওঠে অপরের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের কাজ এবং মানব জীবনের বিশ্ব সংগঠনের মধ্যে সু-প্রশস্ত এমন এক প্রাসাদ গড়ে তোলা যাতে সকল মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। বাস্তবিকই এ সমাজ গড়ে তুলেছিলো এমন এক আশ্রয় স্থল যা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দিক দিয়ে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিলো। জাহেলিয়াতের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা এই নতুন মানব সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অত্যন্ত সহজ সরল ও মহব্বতের সাথে গোটা বিশ্বকে উন্নতি ও অগ্রগতি এবং শান্তি ও সম্প্রীতির পথ দেখিয়েছিলো শান্তি-সমৃদ্ধি গড়ে তোলার পথে এ সমাজ চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, যা আজও সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু।

৬ষ্ঠ পারা দুটো অংশ নিয়ে গঠিত, প্রথম অংশে সূরা নেসার উপসংহার টানা হয়েছে। সূরা নেসা ৪র্থ পারার শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়েছে এবং গোটা পঞ্চম পারা ধরে তার অবস্থান। বর্তমান পারায় তার অবশিষ্টাংশ রয়েছে। আর এ পারার দ্বিতীয় অংশ সূরা মায়েদা থেকে শুরু হয়েছে। এ অংশটিই পারার প্রধান অংশ।

পারার প্রথমাংশ সম্পর্কে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। আর দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আলোচনা যথাস্থানে পরে করা হবে। এতে করে সূরা মায়েদার সামগ্রিক প্রকৃতি, পরিমন্ডল ও বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা আমার এ পুস্তকে অনুসৃত রীতি অনুসারে করতে সক্ষম হবো। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে এ জন্যে তাওফীক দান করেন।

৪র্থ পারায় এই সূরার ভূমিকায় আমি সূরার ভাবধারা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, ৬ষ্ঠ পারায় বিদ্যমান তার অবশিষ্টাংশ সেই ভাবধারা নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। অতীব সংক্ষেপে আমি তার উল্লেখ করছি।

এ সূরা ইসলামের সঠিক ধারণা সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত। জাহেলী সমাজ থেকে যে মুসলিম দলটিকে ইসলামই বাছাই করে নিয়ে এসেছে, তাদের হৃদয়ে সে নিজের সঠিক ধারণা ব্যাক্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এভাবে সে উক্ত দলটিকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে চায়। সেই সাথে তাদের বিবেক ও মনকে জাহেলিয়াতের নোংরা আবর্জনা থেকে মুক্ত করে ইসলামের নতুন ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করতে চায়।

এরপর এই নতুন ধারণার আলোকে এ সূরা মুসলিম সমাজের বিবেক, চরিত্র ও সামাজিক ঐতিহ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করে। মুসলমানদের চরিত্র ও ঐতিহ্যকে সে জাহেলিয়াতের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র ও মুক্ত করতে চায়, যেমন সে ইতিপূর্বেই তাদের আকীদা বিশ্বাস ও

ধ্যান-ধারণাকে জাহেলিয়াতের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে, এ সূরা মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে আল্লাহর নির্ভুল বিধান অনুসারে গড়ে তোলে।

এই কাজ করতে গিয়ে সূরাটি বিকৃত আকীদা বিশ্বাস ও তার ধারক বাহকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সব আকীদা বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করে এবং বিকৃতির কবল থেকে সত্যকে সংরক্ষণ করে। এসব বিকৃত আকীদার ধারক ও বাহক মোশরেকরাই হোক বা ইহুদী খৃষ্টানরাই হোক, সর্বক্ষেত্রে সে একই আপোষহীন ভূমিকা অবলম্বন করে।

এরপর এই সূরায় সাধারণভাবে সমগ্র আহলে কেতাব গোষ্ঠীর সাথে এবং বিশেষভাবে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের তুমুল বাক যুদ্ধ তুলে ধরা হয়েছে। রসূল (স.) মদীনায় আসার পর থেকে ইহুদীরাই ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কেননা ইহুদীরা উপলব্ধি করেছিলো যে, মদীনায় তাদের যে বিশিষ্ট মর্যাদা ও অবস্থান ছিলো এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও একমাত্র প্রিয় জাতি হবার দাবীদার হিসাবে তাদের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিলো, ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো। এ কারণেই তারা সম্ভাব্য যে কোনো কৌশলে ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। এ সূরা তাদের সেই প্রকৃতি ও ফন্দিফিকিরের মুখোস খুলে দিয়েছে এবং তাদের নবীদের সাথে তারা কী আচরণ করেছিলো এক এক করে সে ইতিহাস তুলে ধরেছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সত্যের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করাই তাদের চিরাচরিত রীতি– চাই সে আহ্বানকারী তাদের নিজেদের নবী, জাতীয় নেতা বা ত্রাণকর্তাই হোন না কেন।

এরপর এ সূরা মুসলিম জাতির স্কন্ধে অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব, তার ভূমিকার বিরাটত্ব, তাকে প্রস্তুত করা পবিত্র করা ও তার জীবন ও মন মগয থেকে জাহেলিয়াতের পুঁতিগন্ধ ও নোংরামি দূর করার বিজ্ঞান সম্মত পন্থা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে যথোপযুক্ত সচেতনতা ও তেজস্বীতার সাথে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় এবং এই বিরাট ভূমিকা পালনের জন্যে আপন প্রবৃত্তির সাথে ও বাস্তব ময়দানে জেহাদ পরিচালনা ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করেছে। এভাবে এ সূরা পূর্ববর্তী পারার ন্যায় চলতি পারায়ও একই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

৬ষ্ঠ পারার সূচনা হয়েছে প্রকৃতির সংশোধন, সমাজ সংস্কার, মুসলিম সমাজে আস্থা ও বিশ্বস্ততার বিস্তার ঘটানো, সামাজিক পরিমন্ডলে যুলুমের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগের অবকাশ কমানো, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনে উৎসাহ প্রদান এবং মযলুম কর্তৃক যুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানানো ব্যতীত কোনো খারাপ বিষয়ে উচ্চস্বরে কথা বলাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না- এ সংক্রান্ত বিবরণের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা যে খারাপ কথা ও কাজকে ক্ষমার চোখে দেখতে ভালোবাসেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর ইসলামী আদর্শের প্রকৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীন চিরদিনই এক, সকল নবী ও রসূল এই দ্বীনেরই পতাকাবাহী কাফেলা এবং রসূলে রসূলে ভেদাভেদ করা কিংবা তাদের আনীত বিধানে ভেদাভেদ করা সুস্পষ্ট কুফুরী। এ বক্তব্যটি প্রদত্ত হয়েছে ইহুদীদের নিন্দা প্রসংগে। কেননা তারা নিজেদের নবীদের পর আগত সকল নবীকেই নিছক হিংসা ও বিদ্বেষ বশত অস্বীকার করে থাকে।

এখান থেকে ইহুদীদের মুখোশ উন্মোচন মূলক বর্ণনা শুরু হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে কিভাবে তারা তাদের নেতা, নবী ও ত্রাণকর্তা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে বৈরী আচরণ করেছে।

এ বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, ইহুদীদের স্বভাব কতো খারাপ ছিলো এবং সত্যের আহবায়ক যিনিই হোন, এমনকি তিনি যদি তাদের শ্রেষ্ঠ নবী মূসা (আ.)ও হন, তবুও তারা তাঁর দোয়াতে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত ছিলো না। একই রকম বৈরী আচরণ তারা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মায়ের সাথেও করেছে। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর মায়ের সম্পর্কে তারা এমন জঘন্য মন্তব্য করেছে যা আল্লাহ পছন্দ করতেন না, বরং ঘৃণা করতেন। এভাবে রসূল (স.) এবং তাঁর দাওয়াতের সাথে ইহুদীদের বৈরী আচরণেরও মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার যে দাবী তারা করতো সে সম্পর্কেও কোরআন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেছে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, অত্যাচার, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বলপ্রয়োগে ফিরিয়ে রাখা, নিষিদ্ধ সুদী কারবারে নিয়োজিত হওয়া এবং অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করার মতো পাপাচারের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ইহুদী জাতিকে পৃথিবীতে কিছু হালাল জিনিস থেকে বঞ্চিত করা ও আখেরাতে কঠিন আযাব নির্ধারণ দ্বারা কিভাবে শাস্তি দিয়েছেন। কেবল মাত্র পরিপক্ক জ্ঞানী ও সত্যানুসারী মোমেনরা এর ব্যতিক্রম।

ইহুদীদের দ্বারা রসূল (স.)-এর রেসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জবাবে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, এ অপকর্ম ইহুদীদের পক্ষে অস্বভাবিক নয় এবং তা কারো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কেননা এটি মানব জাতির কাছে আল্লাহর রসূল প্রেরণের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি চিরাচরিত রীতি। হযরত নূহ, ইবরাহীম, সোলায়মান ও দাউদ (আ.) প্রমুখ নবীদের মধ্যে কতককে স্বীকার করা ও কতককে অস্বীকার করা ছিলো ইহুদীদের মজ্জাগত স্বভাব। হিংসা ও বিদ্বেষ বশতই তারা এরূপ করে থাকে। তথাপি আল্লাহ তায়ালা যে তার বান্দাদের হেদায়াতের জন্যে রসূল পাঠাবেন, সেটা শুধু স্বাভাবিক নয় বরং জরুরীও বটে। এতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ তোলার অবকাশ থাকবে না।'

সূরায় এ কথাও হয়েছে যে, ইহুদীরা রসূল (স.)-এর রেসালাতকে যতোই অস্বীকার করুক, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারা সাক্ষী রয়েছেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যারা কুফুরী, যুলুম ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বলপ্রয়োগে ফিরিয়ে রাখার মতো জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা না করা, সুপথ না দেখানো এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথে পরিচালিত করার হুমকি দিয়েছেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানব জাতিকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন যে, মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াত যদি তারা গ্রহণ না করে তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সম্রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি তাঁর রেসালাতের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন তাদের যদি ইচ্ছা হয় তারা আল্লাহর এ আহব্বান মেনে নেবে— নচেত অমান্য করবে।

এভাবে ইহুদীদের সাথে কোরআনের এ বিতর্কের অবসান ঘটেছে। তাদের পুরানো বদভ্যাস ও খারাপ স্বভাবের কথা কোরআন এখানে জানিয়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করে দিয়েছে এবং মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতকে সত্য বলে সাব্যস্ত করে মানব জাতির সামনে আল্লাহর সাক্ষ্য তুলে ধরেছে। উপরন্ত নবীদের ও হকপন্থীদের গুরু দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এভাবে একদিকে মানব জাতির ওপর আল্লাহ তায়ালা সব রকমের ওযর বা ওজুহাতের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, অপরদিকে এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানব জাতি যাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া অথবা ক্ষমার যোগ্য হওয়ার জন্যে একটা সুস্পষ্ট যুক্তি বা

প্রমাণের নাগাল পায়, তার ব্যবস্থা করা নবীদের ও নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের কর্তব্য। এটা শুধু কর্তব্য নয়, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ইহুদীদের সাথে বিতর্কের সমাপ্তি টেনে এবং হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতাকে তাদের মিথ্যা দাবীর কবল থেকে রক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা এ সূরার শেষভাগে খৃষ্টানদের সাথে বিতর্কের মীমাংসা করেছেন। হযরত ঈসা (স.)-এর ব্যাপারে তারা যে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিলো তা এই বলে শুধরে দিয়েছেন যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা মাত্র এবং আল্লাহর বান্দা হতে ঈসা (আ.)-এর কোনোই আপত্তি ও উন্নাসিকতা নেই। অনুরূপভাবে ফেরশতাদের সম্পর্কেও তিনি আকীদা সংশোধন করেছেন। তারা আল্লাহকে পিতৃত্বে ও ত্রীত্ববাদে বিশ্বাস করতো ও রুহুল কুদুসের ধারণায় লিপ্ত ছিলো।

এই পরিশুদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা এই দাঁড়ালো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মাবুদ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর সবই বান্দা। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে এটাই সর্বপ্রধান মূলনীতি, এটাই তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এ জন্যে মোমেনদের জন্যে এসেছে সুসংবাদ এবং একমাত্র আল্লাহর গোলামী করতে যাদের আপত্তি সেই অবিশ্বাসীদের জন্যে সতর্কবাণী। আর সাধারণ মানুষের জন্যে এসেছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্যে এসেছে অকাট্য দলীল ও সুস্পষ্ট জ্যোতি। তাই অবিশ্বাসীদের জন্যে কোনো যুক্তি, সন্দেহ বা ওযর আপত্তির অবকাশ নেই।

সূরাটির সমাপ্তি ঘটেছে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি বাদ পড়া বিধির আলোচনার মধ্য দিয়ে। সেটি হচ্ছে নিসন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার। ইতিপূর্বে এই সূরার উত্তরাধিকারের অন্যান্য বিধি বর্ণিত হয়েছে। কেবল এইটিই অবশিষ্ট ছিলো। যে আর্থ সামাজিক বিধিব্যবস্থার ওপর ইসলাম মুসলিম সমাজের ভিত্তি গড়তে চায়, যার ভিত্তিতে সে তাকে একটা স্বতন্ত্র উম্মাহ বা মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়, সেই বিধি ব্যবস্থারই এটা অবশিষ্টাংশ। মানব জাতি জীবনে স্বীয় বিরাট ভূমিকা তথা নেতৃত্ব ও অবিভাবকত্বের ভূমিকা পালন করার সুবিধার্থেই সে নিজের এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ পেশ করে তাকে পূর্ণতা দিতে চায়।

এভাবে এ সুরার সামগ্রিক বক্তব্য এবং বর্তমান অংশের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, এতে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ, নৈতিক ও আকীদাগত পরিশুদ্ধি, মুসলমানদের শত্রুদের সাথে লড়াই এবং মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস চলেছে। এ থেকে এটাও মনে হয় যে, মুসলিম জাতি ইসলামী আন্দোলনের সংবিধান হিসাবে এই কোরআনে উল্লেখিত সব কাজই একত্রে, সঠিকভাবে আঞ্জাম দিবে। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তারা ভারসাম্যপূর্ণভাবে ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করবে। মুসলিম জাতিকে তার যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার জন্যে যারা এ জাতির পুনর্গঠনে ইচ্ছুক, তাদের উচিত কোরআনকেই এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা। কোরআন প্রথমবার যে ভূমিকা পালন করেছিলো, সেই ভূমিকা পুনরায় পালন করতে প্রস্তুত। মানব সত্ত্বার প্রতিটি বিষয়ে, তার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কি নির্দেশ দিতে চান, তা এই কোরআনই প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দেয়, 'এর বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই এবং এটি কখনো পূরাতন হয় না' একথা স্বয়ং রসূল (স.)ই বলেছেন, যিনি কোরআন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন, এই কোরআনের বলেই তিনি কাফের, মোনাফেক ও বিকৃত আহলে কেতাব গোষ্ঠীর মোকাবেলা করেছেন এবং যিনি এরই সাহায্য মানবেতিহাসের এই নযীরবিহীন জাতি গঠন করেছিলেন।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ
وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۗءِ فَقَدْ
سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ

১৪৮. আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলা (কখনো) পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই শোনেন এবং জানেন। ১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ্যে করো কিংবা তা গোপনে করো, অথবা কোন মন্দ কাজের জন্যে যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরাও দেখতে পাবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান। ১৫০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের মাঝে (এই বলে) একটা পার্থক্য করতে চায় যে, আমরা (রসূলদের) কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে অস্বীকার করি, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়। ১৫১. এরাই হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি এ কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কোনো রকম পার্থক্য করে না, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তিনি অচিরেই অনেক পুরস্কার দান করবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মহাদয়ালু।

রুকু ২২

১৫৩. আহলে কেতাবের লোকেরা তোমার কাছে চায়, তুমি যেন আসমান থেকে তাদের জন্যে কোনো কেতাব নাযিল করো! এরা তো মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা বলেছিলো (হে মূসা), তুমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই আমাদের প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, অতপর তাদের এই বাড়াবাড়ির জন্যে তাদের ওপর

بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

প্রচন্ড বজ্রপাত এসে নিপতিত হয়েছে এবং (এ সম্পর্কিত) সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের কাছে আসার পরও তারা গো-বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতপর আমি তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (-সহ কেতাব) দান করলাম। ১৫৪. এদের ওপর তূর পাহাড়কে উঠিয়ে উঁচু করে ধরে আমি এদের কাছ থেকে (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, নগরের দ্বারপ্রান্ত দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে ঢুকবে, আমি তাদের (আরো) বলেছিলাম, তোমরা শনিবারে (মাছ ধরে আমার বিধানের) সীমালংঘন করো না, (এ ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলাম। ১৫৫. অতপর তাদের (পক্ষ থেকে এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করা এবং অন্যায়ভাবে আল্লাহ তায়ালার নবীদের তাদের হত্যা করা, (তদুপরি) তাদের (একথা) বলা, আমাদের হৃদয় (বাতিল চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত (হয়ে আছে), প্রকৃতপক্ষে তাদের (ক্রমাগত) অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই এদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে। ১৫৬. যেহেতু এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো, এরা (পুণ্যবতী) মারইয়ামের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো। ১৫৭. তাদের (এ মিথ্যা) উক্তি যে, আমরা অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল, (যদিও আসল ঘটনা হচ্ছে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শূলবিদ্ধও করেনি, (মূলত) তাদের কাছে (ধাঁধার কারণে) এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো; (তাদের মাঝে) যারা (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলো, তারাও (এতে করে) সন্দেহে পড়ে গেলো, এ ব্যাপারে তাদের অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া সঠিক কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (তবে) এটুকু নিশ্চিত, তারা তাকে হত্যা করেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ

مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾ لٰكِنِ

الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾ اِنَّآ اَوْحَيْنَآ

اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى

১৫৮. বরং (আসল ঘটনা ছিলো,) আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। (কাউকে উঠিয়ে নেয়া তার কাছে মোটেই কঠিন কিছু নয়।) ১৫৯. (এই) আহলে কেতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে (ঈসা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই কথার) ওপর ঈমান আনবে না, কেয়ামতের দিনে সে নিজেই এদের ওপর সাক্ষী হবে। ১৬০. ইহুদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে এমন অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো, এটা এই কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রেখেছে। ১৬১. (যেহেতু) এরা (লেনদেনে) সূদ গ্রহণ করে, অথচ এদের তা থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ করা হয়েছিলো এবং এরা অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করে; তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিপ্ত) কাফেরদের জন্যে আমি তাই কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের (আবার) জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, (সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দেবো।

রুকু ২৩

১৬৩. (হে নবী,) আমি তোমার কাছে আমার ওহী পাঠিয়েছি, যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি, আমি (আরো) ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম,

إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾
رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ
الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا
طَرِيقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে, (ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সোলায়মানের কাছেও, অতপর আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি। ১৬৪. রসূলদের মাঝে এমনও অনেকে আছে, যাদের কথা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বলেছি, কিন্তু এদের মাঝে বহু রসূল এমনও আছে যাদের (নাম ঠিকানা) কিছুই আমি তোমাকে বলিনি; মূসার সাথে তো আল্লাহ তায়ালা কথাও বলেছেন। ১৬৫. রসূলরা (ছিলো জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও '(জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ তায়ালার ওপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ১৬৬. কিন্তু (মানুষ যতো অজুহাতই পেশ করুক না কেন,) আল্লাহ তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা তাঁর (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানের মাধ্যমেই করেছেন, ফেরেশতারাও তো (এ কথার) সাক্ষ্য দেবে; যদিও (ওহীর) সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা (একা)-ই যথেষ্ট। ১৬৭. নিশ্চয়ই যারা (এই ওহী) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা আসলে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করলো এবং (চরমভাবে) সীমালংঘন করলো, (তাদের ব্যাপারে) এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর না তিনি তাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন! ১৬৯. কিন্তু একটি মাত্র (রাস্তাই তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে এবং তা হচ্ছে) জাহান্নামের রাস্তা, যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে; (শাস্তি প্রদানের) এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ، وَإِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০. হে মানুষরা, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক (বিধান) নিয়ে রসূল এসেছে, যদি (তার আনীত এ বিধানের ওপর) তোমরা ঈমান আনো, এতেই তোমাদের জন্যে কল্যাণ (রয়েছে), আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো,) এই আসমান-যমীনের সর্বত্র (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

তাফসীর

আয়াত-১৪৮-১৭০

কোরআন একটি নতুন জাতি গঠন করেছে। জাহেলিয়াতের আদিম ও অসভ্য সমাজ থেকে বাছাই করা মানুষগুলোকে নিয়ে সে এ জাতি গঠন করেছে। তাকে সে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়ে মানব জাতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করতে ও নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে।

অশ্লীলতা প্রতিরোধে কোরআন

জাতি গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর মধ্যে একটি ছিলো এই যে, এই নতুন জাতি ও সমাজের বিবেক এবং যে সামাজিক পরিবেশে তারা বাস করে তাকে পবিত্র ও পরিছন্ন করা এবং তার নৈতিক ও মানসিক মানকে উন্নততর করা। মুসলিম সমাজ ও জাতি যখন এই উচ্চস্তরে উন্নীত হলো, তখন সে তার আকীদা বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তরের মতোই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে নৈতিকতার বিভিন্ন স্তরেও তাকে দিয়ে তার ইপ্সিত কাজটি সমাধা করালো। তাকে তাঁর দ্বীনের রক্ষক বানালো, পথভ্রষ্ট মানব জাতির পথ প্রদর্শক বানালো এবং মানব জাতির নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে তাকে দায়িত্বশীল বানালো।

যখন সে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলো, তখন সে গোটা পৃথিবীরও শ্রেষ্ট মানব হয়ে গেলো। তাই মানব জাতির নেতৃত্ব তার কাছে স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবেই এসে গেলো। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতেও অগ্রণী হয়ে গেলো। মূলত তার এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো আকীদা ও চরিত্রে অর্জিত শ্রেষ্ঠত্বেরই ফল। ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহর শাশ্বত ও অমোঘ বিধান।

ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে পবিত্রকরণ তথা পরিশুদ্ধকরণের এই কর্মসূচিটি প্রথম এই দুটি আয়াতেই দৃশ্যমান!

'খারাপ কথা উচ্চারণ করাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না.... আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান।' *(আয়াত১৪৮)*

ইসলামী সমাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি সমাজ। তাই স্বভাবতই তার জন্যে এমন রীতিনীতি ও বিধিব্যাবস্থার প্রয়োজন, যা তার এই সংবেদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। অনেক কথা এমন আছে, যা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই বলা হয়। কিন্তু এই উভয় প্রকারের কথা গোটা সমাজের মনমানসে, চরিত্র ও ঐতিহ্যে ধংসাত্মক প্রভাব ফেলে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করে তা সমগ্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিবেকের সংকোচ বোধ ও আল্লাহভীতি না থাকলে মুখ দিয়ে অন্যায় ও ক্ষতিকর কথা উচ্চারণ করা নিতান্তই সহজ কাজ, তা যেভাবেই করা হোক না কেন। আর এ ধরনের খারাপ ও ক্ষতিকর কথা ছড়িয়ে পড়লে তা অনেক সময় সমাজের গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় তা পারস্পরিক আস্থাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে সমাজে অন্যায় ও অসত্যই বিজয়ী হয়ে গেছে বলে মনে হতে থাকে। যারা খারাপ কাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ও ঝোঁক অনুভব করে, অথচ তা করতে সংকোচ বোধ করে বা সর্বপ্রথম তা করার উদ্যোগ নিতে চায় না, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে উচ্চারিত একটি খারাপ কথা এ কাজটি করার সাহস যোগাতে পারে। কেননা সে প্রকাশ্য খারাপ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যায় একটি প্রকাশ্য দোষ হয়ে সমাজ দেহে চড়াও হয়ে বসেছে। তাই আর কোনো লজ্জাশরম বা দ্বিধা-সংকোচের বালাই থাকেনা। অনেক সময় এমনও হয় যে অন্যায়ের সাথে পরিচয় দীর্ঘ হওয়ার কারণে তার প্রতি ঘৃণা ধরে যায়। কিন্তু যখন তা বারবার ঘটতে থাকে বা বারবার তার উল্লেখ হতে থাকে, তখন তার প্রতি ঘৃণার তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবও লোপ পেতে থাকে। ফলে অন্যায়ের কথা শোনা এমনকি তা দেখাও মানুষের পক্ষে একান্ত সহজ হয়ে যায় এবং শোনা মাত্র বা দেখা মাত্র সে অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর মনোভাব আর থাকে না।

এছাড়া অনেকের সম্পর্কে অন্যায় ভাবেও কুৎসা রটানো হয়ে থাকে। খারাপ কাজের জন্যে অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। অথচ তারা কোনো খারাপ কাজে জড়িত থাকে না। কিন্তু একবার একটা খারাপ কথা রটে গেলে এবং সেই খারাপ কথার প্রকাশ্য উচ্চারণ গা সওয়া হয়ে গেলে তখন তা আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এভাবে সমাজে অনেক সময় নিরপরাধ লোককে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। দোষারোপ করতে বা অপবাদ দিতে কারো মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ বোধ করা হয়না। ফলে যে মানবিক ও সামাজিক লজ্জা মানুষের জিহবাকে খারাপ কথা উচ্চারণে বাধা দেয়।তা তিরোহিত হয়।

খারাপ কথা প্রথমত উচ্চারণ ব্যক্তিগত দোষারোপ তথা অপবাদ আরোপ বা গালাগালির আকারেই শুরু হয়। আর তা শেষ হয় সামাজিক অধপতন ও নৈতিক অরাজকতার আকারে। ফলে সমাজের লোকেরা পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।

এ সমস্ত কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সমাজে খারাপ কথার প্রসার ঘটাকে অনাকাংখিত ও অবাঞ্ছিত বিবেচনা করেছেন। এ অনাকাংখিত কাজটি শুধুমাত্র অত্যাচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার ওপর যতোটুকু যুলুম চালানো হয়েছে, কেবলমাত্র ততোটুকুর বিবরণ দিয়ে সে যালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে এই অনুমতি খারাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়ে থাকে যা একজন নির্দিষ্ট মানুষের বিরুদ্ধে করা হয়। এর উদ্দেশ্য সমাজে অত্যাচারী ও তার অত্যাচারকে পরিচিত করা, যাতে সমাজ মযলুমের সহায়তা ও অত্যাচারকে প্রতিহত করতে পারে, অত্যাচারী তার কাজের কুফল দেখে ভয় পায় এবং আর কখনো এমন কাজ করার ধৃষ্টতা দেখায় না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে খারাপ কথার উচ্চারণ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যার ওপর অত্যাচার হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কারণে অর্থাৎ অত্যাচারের কারণেই হয়ে থাকে, যার বিবরণ

মযলুম দিয়ে থাকে এবং একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেই তা উচ্চারিত হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি এই অত্যাচার চালিয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই খারাপ বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে যে উপকার সাধিত হবে, সেটাই উক্ত উচ্চারণের বৈধতা দান করবে। আর এর উদ্দেশ্য শুধু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা-নিছক প্রচার করা নয়।

মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ওপর অত্যাচার না করে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম তার সুনাম, সুখ্যাতি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখনি সে অত্যাচার করে, তেমনি ইসলাম এই সংরক্ষণ থেকে তাকে বঞ্চিত করে এবং মযলুমকে যালেমের বিরুদ্ধে খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি দেয়। খারাপ ও অশালীন কথা প্রকাশ্যভাবে উচ্চারণ করার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এটা তার একমাত্র ব্যতিক্রম।

ইসলাম এভাবেই তার ন্যায়বিচার-প্রীতি ও নৈতিকতা-প্রীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। তার ন্যায়বিচার-প্রীতি এতো নিখুঁত যে, যুলুমের সাথে সে কিছুমাত্র আপোস করে না। আর তার নৈতিকতা-প্রীতিও এতো প্রবল যে মানসিক ও সামাজিক লজ্জা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হোক এটাও সে বরদাশত করে না। অতপর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা শ্রবণকারী জ্ঞানী।'

একথাটা দ্বারা সে গোটা বিষয়টাকে স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুক্ত করে নিয়েছে। আয়াতের শুরুতেও, 'আল্লাহর প্রকাশ্যে খারাপ কথা বলাকে পছন্দ করেন না' বলে আল্লাহর পছন্দ ও না পছন্দের সাথে একে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার মনে যতো রকম উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা জাগিয়ে দিক এবং যে যতো কথা বা অভিযোগই কারো ওপর আরোপ করুক তার সবই একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যিনি সব কথাই শোনেন এবং কথার আড়ালে যে ইচ্ছা বা অভিসন্ধি রয়েছে তাও জনেন।

এরপর কোরআন শুধু প্রকাশ্য খারাপ কথা উচ্চারণের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নীতিবাচক সীমা নির্দেশ করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি, বরং ইতিবাচক সৎকর্ম বিশেষত অন্যায় কাজ ও কথাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশও প্রদান করেছে। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার গুণেরও উল্লেখ করেছে, যাতে মোমেনরা সাধ্যমতো আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সৎ কাজ করো কিংবা অন্যায়কে ক্ষমা করো, (তাহলে মনে রেখো যে) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।' (আয়াত-১৪৯)

এভাবে কোরআনী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মোমেন ব্যক্তিকে ও মুসলিম সমাজকে আরো এক ধাপ ওপরে উন্নীত করে। প্রথম ধাপে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে জানান যে, তিনি অন্যায় কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণকে অপছন্দ করেন, কেবল অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারে প্রতিকার ও সুবিচার চাওয়ার জন্যে বিবরণ দেয়া ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে মোমেনদেরকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং মযলুম ব্যক্তিকে যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতো বিচার প্রার্থনা করার ক্ষমতা থাকা সত্তেও ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারীকে বিচারে সোপর্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর এটা সমাজ বিচারের চেয়ে উন্নত স্তর।

মুসলিম সমাজ যখন প্রকাশ্যে সৎকাজ করে বা সৎকথা বলে, তখন গোটা সমাজে সততার প্রচলন ঘটে, আর যখন তার সৎকাজ গোপনে করে, তখন তাও যাতে তাদের প্রকৃতিকে সংশোধন করে এবং সমাজে ক্ষমার প্রচলন ঘটে, সে জন্যে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেয়। বস্তুত সততা প্রকাশ্যে যেমন ভালো, গোপন অবস্থায়ও ভালো। প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থাই যখন সমাজে সততারই চর্চা হতে থাকে, তখন খারাপ কথা উচ্চারিত হওয়ার অবকাশই সৃষ্টি হয় না। যে ক্ষমা

প্রদর্শন করা হবে, তা মনের হীনতা থেকে নয় বরং উদারতা থেকে এবং মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার আকাংখা থেকে উৎসারিত হবে, যিনি ক্ষমতাবান হয়েও ক্ষমাশীল।' এরশাদ হচ্ছে,

'বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।'

ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাধারণভাবে আহলে কেতাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতপর প্রথমে ইহুদীদের ও তার পর খৃষ্টানদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইহুদীরা প্রকাশ্যে খারাপ ও অশালীন কথা আলোচনা করতো। যেমন তারা হযরত ঈসা ও তাঁর মাতা মারিয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। এভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের আলোচনা সম্বলিত এই পর্বটিও উপরোক্ত দুটি (১৪৮ ও ১৪৯ নং) আয়াতে লক্ষণীয়,

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলদের প্রতি কুফুরী করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ করে এবং বলে, আমরা কয়েকজনের ওপর ঈমান আনি এবং কয়েকজনকে অস্বীকার করি।'

ইহুদীরা তাদের নবীদের প্রতি ঈমানের দাবী করতো এবং হযরত ঈসা ও হযরত মোহাম্মদের রেসালাতকে অস্বীকার করতো, আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে শুধু নবী নয়, খোদা বলেও মানতো এবং মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত অস্বীকার করতো।

কোরআন এই উভয় গোষ্ঠীর মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের সঠিক মতাদর্শ উল্লেখ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের মাঝে ঈমানই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ। এ আদর্শ নিয়েই ইসলাম আল্লাহর 'দ্বীন'। এই দ্বীন ছাড়া আর কিছুই আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন না। কেননা একমাত্র এই আদর্শই আল্লাহর একত্বের সাথে এবং আল্লাহর একত্বের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আল্লাহর এই একত্বের ধারণা স্বভাবতই তাঁর দ্বীনেরও একত্ব দাবী করে। আল্লাহ তায়ালা যখন এক, তখন তাঁর প্রেরিত রসূলদের কাছে নাযিল করা তাঁর দ্বীনও হবে এক এবং তাঁর রসূলরাও একই আদর্শের ধারকবাহক হবেন-এটাই স্বাভাবিক। রসূল বা রেসালাতের ঐক্য অস্বীকার করা তথা তার মধ্যে প্রভেদ করা মূলত আল্লাহর একত্বকেই অস্বীকার করার শামিল। মানুষের জন্যে আল্লাহর রচিত বিধানকে একই হতে হবে, মৌলিকভাবে তাতে কোনো পরিবর্তন থাকতে পারে না। কেননা সর্বকালে তার উৎস ছিলো একই। এজন্যে এ আয়াতে সেই সব লোকের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও রসূলদের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ করে এবং যারা কতক রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও কতক রসূলের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে রসূলদের মধ্যে প্রভেদ করে। আয়াতে এই উভয় শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের প্রতি অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে এবং রসূলদের কারো কারো মধ্যে তারা যে পার্থক্য করে, সেটাকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনেরই নামান্তর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, ঈমান একটা অবিভাজ্য একক। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থই হলো তাঁর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর আল্লাহর একত্বের দাবী হলো, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্যে যে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা স্থির করেছেন, তার ওপর তাদের গোটা জীবন-জীবনের কোনো অংশ বা বিভাগ নয়, বরং একক ও অবিভাজ্য গোটা জীবনই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে সকল

নবী ও রসূল যে বানী নিয়ে এসেছেন তা তাদের নিজেদের মনমস্তিস্ক থেকে নয় এবং আল্লাহর ইচ্ছা বহির্ভূতভাবে অন্য কোথা থেকেও নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে এই দ্বীনকে নিয়ে এসেছেন, তাদের সকলের ওপর ঈমান আনার দাবী হলো, তাদের সকলের প্রতি একই নীতি ও মনোভাব পোষণ করতে হবে। এই একত্বকে বিভক্ত করার কোনো অবকাশ নেই। সে অবকাশ একমাত্র সর্বাত্মক কুফুরী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের প্রতি সর্বতোভাবে অবিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা সম্ভব যদিও এ ধরনের কুফুরীতে লিপ্ত ব্যক্তিরা মনে মনে ভাবে যে, তাঁরা রসূলদের একাংশের প্রতিই অবিশ্বাস স্থাপন করছে এবং অপর অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে। এ ধরনের লোকদের সকলের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা ভয়ংকর অপমানজনক আযাব নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং এই আযাবই তাদের যথার্থ কর্মফল। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেন,

'তারাই হলো সত্যিকার অবিশ্বাসী এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

বস্তুত মুসলমান হলো তারা যাদের আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তায়ালা ও সকল নবী রসূলের প্রতি ঈমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যারা রসূলদের কাউকে গ্রহণ ও কাউকে বর্জন করে না। সকল রসূল তাদের কাছে পরম সম্মানিত এবং তারা সকলের প্রতি বিশ্বাসী, আল্লাহর কাছ থেকে আগত সকল ধর্ম যতোক্ষণ তার কোনোটাকে বিকৃত না করা হয়েছে ততোক্ষণ তাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য। যে সব ধর্মকে বিকৃত করা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছ থেকে আগত ধর্ম নয় এমন কি তার কিছু অংশ অবিকৃত থাকলেও নয়। কেননা ধর্ম বা দ্বীন ও একটা অবিভাজ্য একক। আল্লাহ তায়ালা যেমন এক, তেমনি তিনি মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা রচনা করেছেন তাও এক, আর মানব জাতির কাছে তিনি যতো নবী রসূল পাঠিয়েছেন, তারাও এই একই দ্বীন, ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন। রসূলদের এই কাফেলার কেউ অপরাপরদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নন, বরং সকলেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। এ কাফেলার নেতৃত্বে রয়েছেন হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, মোহাম্মদ প্রমুখ এই অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য কাফেলা পরস্পরে গভীর ও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। তারা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতের ধারক ও বাহক। মহান আল্লাহর কাছ থেকে আগত এই কল্যাণকর ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী। তাদের ভেতরে কোনো ভেদ, বৈষম্য বা পার্থক্য সৃষ্টির আদৌ কোনো অবকাশ নেই। সত্য দ্বীনের উত্তরাধিকার তাঁদের পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। তাদের বাইরে অন্য কোথাও যা কিছু আছে তা সত্য নয়, বরং বাতিল ও গোমরাহী।

এটাই সেই আসল 'ইসলাম', যা ছাড়া অন্য কিছু আল্লাহ তায়ালা কারো কাছ থেকে গ্রহণ করেন না। আর এই ইসলামের অনুসারীরাই সেই 'মুসলিম জাতি', যারা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের সৎকর্মের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং তাদের পক্ষ থেকে যা কিছু ভুল ক্রটি সংঘটিত হয়, তার জন্যে ক্ষমা লাভের আশা করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারাই সেই সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রাপ্য প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালু।'

আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রসূলদের ঐক্যের এই আকীদার ব্যাপারে ইসলামের এতো কঠোর ও অনমনীয় হবার কারণ এই যে, এই তাওহীদ বা একত্ববাদ ছাড়া মোমেন আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হয় না। এই তাওহীদই এই সৃষ্টিজগতের এমন সুশৃংখল, সংঘাতহীন ও সংঘর্ষহীন ব্যবস্থাপনার একমাত্র ভিত্তি। বিশ্ব জগতের যে দিকেই মানুষ দৃষ্টিপাত করুক, সর্বত্রই যে সে একই প্রাকৃতিক বিধান কার্যকর দেখতে পায়, তার কারণও এই তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব। একমাত্র এই একত্বের বিশ্বাসই মোমেনদেরকে কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে ও শয়তানের দলগুলোর বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও ঐক্যবদ্ধ দলরূপে দাঁড়াবার শক্তি যোগায়। যাদের

আকীদা বিশ্বাস বিকৃত, তাদের আকীদা বিশ্বাসের মূল উৎস যদি আল্লাহর কাছ থেকে আগত ওহীও হয়ে থাকে, তথাপি তারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। একমাত্র বিশুদ্ধ ঈমান ও আকীদার অধিকারীরাই এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে পারে।

এজন্যে 'ইসলাম'ই একমাত্র 'দ্বীন' এবং 'মুসলমানরা' সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই মুসলমানরা, যারা সঠিক ও নির্ভুল আকীদায় বিশ্বাসী এবং তদানুসারে কাজ করে। নিছক মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ বা ইসলামের কলেমা উচ্চারণকারী নয়।

এই বিশ্লেষণের আলোকে স্পষ্ট হয়েছে যে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে কিন্তু রসূলদের ওপর ঈমান আনে না, কিংবা কতক রসূলকে মানে এবং কতক রসূলকে মানে না, তারা মুসলিম কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা তারা সেই ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে, যাকে আল্লাহ তায়ালা একত্রিত করেছেন। তারা সেই একত্বকে অস্বীকার করে, যার ওপর আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রসূল ও রেসালাতের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের স্বরূপ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি বর্ণনা করার পর পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে ইহুদীদের কিছু ধ্যান ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে। এ আলোচনার শুরুতে তাদের চরিত্রের যে খারাপ বৈশিষ্ট্যটা তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, খারাপ ও বাতিল কথাবার্তা উচ্চ স্বরে বলা। এই সাথে রসূল (স.) তাঁর রেসালাতের ব্যাপারে তাদের মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। নিন্দা করা হয়েছে তাঁর কাছে তাদের নানা রকমের অলৌকিক কর্মকান্ড দেখিয়ে রেসালাতের প্রমাণ দর্শানোর দাবী জানানোর। তারপর বলা হয়েছে যে, তারা এই মনোভাবের পরিচয় ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ.) ও তার পরবর্তী রসূল ঈসা (আ.) এবং তাঁর মা মারিয়ামের প্রতিও দেখিয়েছে।

বস্তুত আসলে তারা বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ হলেও তাদের জন্মগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য একই। আয়াতে রসূল (স.)-এর সমকালীন ও ঈসা (আ.)-এর সমকালীন ইহুদী প্রজন্মকে একই চরিত্রের অধিকারী রূপে দেখানো হয়েছে। এমনকি হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন প্রজন্মও এদের থেকে পৃথক নয়। আল্লাহ তায়ালা এই চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বলেন, আহলে কেতাব তোমার কাছে দাবী জানায় যে তুমি তাদের কাছে আকাশ থেকে একখানা কেতাব নাযিল করো.....।' (আয়াত ১৫৩-১৬১)

আরবে ইহুদীরা ইসলাম ও রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের মনোভাব অবলম্বন করেছিলো। কোরআন সেই মনোভাবের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও আলোচ্য সূরায়। এখানকার আয়াত ক'টাতে যে বিবরণ দিয়েছে, তাতে কিছুটা ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তারা চরম গোয়ার্তুমির পরিচয় দিয়ে রসূলু (স.)-এর কাছে দাবী জানায় যে, আকাশ থেকে একখানা কেতাব নিয়ে এসো। অর্থাৎ এমন একখানা লিখিত পুস্তক তাদের কাছে সরাসরি আকাশ থেকে আসুক, যার সুস্পষ্ট আকৃতি থাকবে এবং যা তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে।

'তোমার কাছে আহলে কেতাব দাবী জানায়....।'

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতগুলোতে তাঁর নবীর পক্ষ থেকে এ দাবীর জবাব দিচ্ছেন এ আয়াতগুলোতে। তাঁকে ও মুসলমানদেরকে তিনি ইহুদীদের অতীতের ইতিহাস জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা তাদের সেই নবী ও নেতা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও অনুরূপ আচরণ করতো, যাকে তারা নবী মানে বলে দাবী করে থাকে। অথচ তাঁর পরবর্তী নবী হযরত ঈসা (আ.) ও

মোহাম্মদ (স.)-কে তারা অস্বীকার করে। তাদের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নতুন নয়। এটা শুধু এ যুগের ইহুদীদেরই চরিত্র নয় বরং প্রাচীন কাল থেকেই তা চলে আসছে।

তারা তাদের নেতা ও নবী হযরত মূসার আমল থেকেই এ রকম। তাদের অনুভূতি খুবই ভোতা। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিস ছাড়া তারা আর কিছুই উপলব্ধি করে না। তারা এতোই গোয়ার ও একগুঁয়ে যে, জবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থার সামনে তারা মাথা নত করে না। তারা শুধু অবাধ্যই নয়, বিশ্বাসঘাতকও বটে। তাই তারা অতি দ্রুত মত পাল্টায় ও অংগীকার ভংগ করে। শুধু মানুষের সাথে নয় বরং আল্লাহর সাথেও অংগীকার ভংগ করে ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের ধৃষ্টতার কোনো সীমা নেই, তাদের মিথ্যাচারেরও নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। তাই তারা কথা ও ওয়াদা ঠিক রাখা এবং প্রকাশ্যে খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকার কোনো প্রেরণাই অনুভব করে না। দুনিয়ার মোহ, মানুষের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটেপুটে খাওয়া। আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা কি কাজের কি কর্মফল রেখেছেন, তার তোয়াক্কা না করাই তাদের চিরাচরিত স্বভাব।

ইহুদীজাতির লজ্জাজনক ইতিহাস

পরবর্তী আয়াত থেকে যে আলোচনা শুরু হচ্ছে নিসন্দেহে তা ইহুদীদের মুখোস উন্মোচনকারী একটি প্রচারাভিযান বিশেষ। এই অভিযানের প্রচন্ডতা ও ষড়যন্ত্র ছিলো বড়ো সাংঘাতিক এবং তার মোকাবেলা করতে সেই সময়ে জোরদার প্রচারাভিযানেরও প্রয়োজন হয়েছিলো। ইহুদীদের সেই জঘন্য ষড়যন্ত্র ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আহলে কেতাব গোষ্ঠী তোমার কাছে দাবী জানায় যেন তুমি তাদের কাছে আকাশ থেকে একখানা কেতাব নাযিল করো।' (আয়াত ১৫৩)

তাদের এই গোঁয়ার্তুমীর জন্যে তোমার চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই এবং এতে কোনো বিস্ময় বা কৌতুহলেরও কিছু নেই। কেননা,

'তারা মুসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছিলো, তারা বলেছিলো আল্লাহকে আমাদের সামনে এনে দেখিয়ে দাও।'

তাদের নবী মূসা (স.)-এর হাত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে সুস্পষ্ট অলৌকিক নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখিয়েছিলেন, তা তাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পারেনি, তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি এবং নিরুদ্বেগ, শান্তি ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করতে পারেনি। এ জন্যেই তারা আল্লাহকে চাক্ষুসভাবে দেখাবার দাবী করেছিলো। এটি এমন একটি স্পর্ধিত দাবী, যা বিন্দুমাত্রও ঈমানের অধিকারী বা ঈমানের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না।

'ফলে তাদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে একটা বিকট শব্দ এসে তাদের পাকড়াও করলো।'

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তাদের সম্পর্কে মূসা (আ.)-যে দোয়া করেছিলেন তাও তিনি কবুল করলেন। সেই দোয়াটি অন্য একটি সূরায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

'যখন তাদেরকে ভূমিকম্প আঘাত করলো, তখন মূসা বললো, হে আমার প্রভু! তুমি ইচ্ছা করলে এর আগেই ওদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে বেকুফ লোকেরা যে কাজ করেছে, তার জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করে দেবে? এটা তোমার পরীক্ষা

ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি যাকে চাও এ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা গোমরাহ করো, আর যাকে চাও হেদায়াত করো। তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের ওপর রহমত করো। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। আর তুমি আমাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জীবন দান করো। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।....'

আল্লাহ তায়ালা এই দোয়ার কল্যাণে বনী ইসরাঈল জাতিকে ক্ষমা করলেন; কিন্তু তারা সে ক্ষমার মর্যাদা দেয়নি।

'অচিরেই তারা একটি বাছুর বানালো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও।'

সামেরী তাদের জন্যে এই স্বর্ণের বাছুরের প্রতিমূর্তি বানিয়ে দিয়েছে। সে মিশরের বাইরে অবস্থান করার সময় নানা ছলছুতোর আশ্রয় নিয়ে তার সহযাত্রী মিসরীয়দের স্ত্রীদের কাছে থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করেছিলো তা নিয়ে এই বাছুরের মূর্তিটি বানিয়েছিলো। আর মূসা (আ.) যেই আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যে চলে গেলেন, অমনি তারা এই মূর্তির পূজা শুরু করে দিলো। উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর কাছ থেকে নযিল হওয়া জ্যোতির্ময় ও হেদায়াতের বাণী খচিত ফলকগুলোকে গ্রহণ করার জন্যেই গিয়েছিলেন।

'অতপর আমি তার সেই ব্যাপারটাও মাফ করে দিলাম।'

কিন্তু মাফ করে দিলে কী হবে? ইহুদী ইহুদীই। কোনো ভীতিজনক অবস্থা বা বাধ্যকরণমূলক পরিস্থিতি দেখা না দিলে তাদেরকে কখনো বশে আনা যায় না। সে কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেন.

'আমি মূসাকে সুস্পষ্ট দলীল দিলাম। আমি তাদের মাথার ওপর তূর পাহাড়কে উঁচু করে ধরলাম এবং বললাম সেজদারত অবস্থায় তোমরা দরজার ভেতরে প্রবেশ করো। আমি তাদেরকে আরো বলে দিলাম যে, তোমরা কিন্তু শনিবারে বাড়াবাড়ি করো না, আমি (এসব ব্যাপারে) তাদের কাছ থেকে এক কঠিন অংগীকার নিয়েছিলাম।'

যে 'দলীল' আল্লাহ তায়ালা মুসাকে দিয়েছিলেন, তা সম্ভবত সে সকল 'ফলক'-এ বর্ণিত শরীয়ত তথা আল্লাহর বিধান। আল্লহর বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত সনদ। আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো সনদ নাযিল করেননি, আর মানুষের মনে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানের প্রতি কোনো সমর্থন বা আস্থাও থাকে না। তাই মানব রচিত আইনকে মানুষ শ্রদ্ধা করতে পারে না এবং একমাত্র পুলিশ বা জল্লাদের চোখের সামনে ছাড়া তাকে কার্যকর করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি মানবমন স্বভাবিকভাবেই অনুগত থাকে এবং প্রত্যেকের মনে তার প্রতি ভক্তি ও ভীতি বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু ঈমান বিমুখ ইহুদীরা ফলকগুলোতে যা ছিলো তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলো। এই পর্যায়ে তাদের ওপর আপতিত হলো বস্তুগত বশীকরণ ব্যবস্থা, যা তাদের উগ্র ও দুরন্ত স্বভাবের উপযোগী ছিলো। ওপরের দিকে তাকাতেই তারা দেখতে পেলো মাথার ওপর ঝুলন্ত রয়েছে পাহাড়। ফলকগুলোতে আল্লাহ তায়ালা যে সব আদেশ লিখে দিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করা ও তার কাছে নতি স্বীকার না করলে সে পাহাড় তাদের ওপর ফেলে তাদেরক পিষে মার হবে বলে হুমকি দেয়া হলো। এক হুমকিতেই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং আল্লাহর আদেশ মেনে নিলো।

'কঠিন অংগীকার' কথাটা ইহুদীদের ক্ষেত্রে আসলেই মানানসই হয়েছে। কেননা তাদের মনও ছিলো কঠিন। 'মীসাকান গলীযার' অর্থ কঠিন অংগীকার। এর আরো একটা অর্থ রয়েছে, তা হচ্ছে সুদৃঢ়, মযবুত ও অটুট অংগীকার। কোরআনের এ এক বিশেষ বাচনভংগী। ভাষা দিয়ে একটি

দৃশ্যকে এমনভাবে অংকন করে যে, তা একবারে বাস্তব ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মনে হয়। (**বিস্তারিত** ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন আমার প্রণীত 'আত্তাসওযীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' বাংলা **নাম** 'কোরআনের শিল্পগত সৌন্দর্য্য')

এই অংগীকারের মধ্যে বাইতুল মাকদেসে সেজদা দিতে দিতে প্রবেশ করা এবং জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব হিসাবে শনিবারের মর্যাদা রক্ষা করার ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু এর ফল কী দাঁড়ালো? আল্লাহর কোপানলের ভয় দূর হওয়া মাত্রই তারা সে অংগীকার ভঙ্গ করলো, আল্লাহর নিদর্শন ও বিধানকে অস্বীকার করলো, এমনকি আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করার ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখালো। অতপর চরম দম্ভ সহকারে বললো,

'আমাদের মনে কোনো উপদেশ গ্রাহ্য হয় না, কোনো কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কেননা তা বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

অতপর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে ইহুদীদের যে সকল কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন, এগুলো সবই তারা একে একে করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর তাদের অংগীকার ভংগ করা, আল্লাহর বিধান ও নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করা, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং 'আমাদের হৃদয় বন্ধ হয়ে গেছে' একথা বলার কারণে......।' (আয়াত ১৫৫)

'আমাদের হৃদয় বন্ধ হয়ে গেছে'

এ কথা বলে তারা নবীদের আহবানের জবাব দিতো, এর উদ্দেশ্য ছিলো তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে নবীদের হতাশ করে দেয়া, তাদের দাওয়াত দেয়াকে উপহাস করা অথবা দাওয়াতে কর্ণপাত না করা ও প্রত্যাখ্যান করা। তাদের উক্ত দম্ভোক্তির জবাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরীর কারণেই তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন, ফলে তারা আর ঈমান আনবে না– কিছু লোকের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

অর্থাৎ মানুষের মন স্বভাবগতভাবে বন্ধ বা নিস্ক্রীয় থাকে না, বরং তাদের কুফরীই তাদের হৃদয়কে নিস্ক্রীয় করার কারণ হয়েছে। ফলে তা কঠিন, জমাট ও আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। তার ভেতরে ঈমানের যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই এবং ঈমানের রুচিও সেখানে নেই। তাই স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনা। এই স্বল্পসংখ্যক লোকেরা তাদের কাজ দ্বারা তাদের হৃদয়কে বন্ধ ও নিস্ক্রীয় করেনি। তারা তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। ইহুদীদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী এ ধরনের ব্যক্তিরা হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও আসাদ বিন উবায়দুল্লাহ।

এই ব্যতিক্রমের উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে তাদের ওপর হালাল জিনিসগুলোকে হারাম করার অন্যান্য কারণ বর্ণনা পেশ করেছেন। হালাল জিনিসকে হারাম করে দিয়ে তাদেরকে পার্থিব শাস্তি দেয়া হয়েছে আর আখেরাতেও তাদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে আরো ভয়ংকর শাস্তি। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তাদের কুফরীর কারণে, মারিয়ামের ওপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করার কারণে এবং 'আমরা আল্লাহ তায়ালা রসূল মারিয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'॥(একথা) বলার কারণে....।' (আয়াত ১৫৬-১৫৭)

ঈসা (আ.)-এর শুলবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্য

এখানে যখনই ইহুদীদের কোনো অপকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই তাদের কুফরীর বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তারা যে অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করতো, সে বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়েও তাদের কুফরীর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যই কোনো নবীকে ন্যায়সংগতভাবে হত্যা করা হয়নি। তাই এখানে 'অন্যায়ভাবে' শব্দটি নিছক বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এখানে মারিয়ামের ওপর জঘন্য অপবাদ আরোপের বেলায়ও তাদের কুফরীর উল্লেখ করা হয়েছে। তার সতী সাধ্বী মারিয়ামের বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপ করেছে, তা ইহুদীরা ছাড়া আর কেউ মুখেও আনতে পারে না। অভিশপ্ত ইহুদী জাতি তার ওপর ইউসুফ নামক জনৈক সুতার মিস্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার অপবাদ আরোপ করেছে। তারপর দম্ভ করে এও বলেছে যে, আমরা ঈসা মাসীহকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছি। অধিকন্তু তারা তাঁর রেসালাতের দাবীর ওপর বিদ্রুপ ও টিটকারি করে বলেছে যে, আমরা আল্লাহর রসূল ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি।

এ পর্যন্ত পৌঁছে কোরআন তাদের এই দাবীর জবাব দিয়ে সত্য উৎঘাটন করে বলেছে যে....,

'অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, শুনেও চড়ায়নি...আর আল্লাহর মহাপরাক্রমশালী, মহাকুশলী।'

হযরত ঈসা (আ)-এর হত্যা বা শূলে চড়ার ব্যাপারটা ইহুদীদের জন্যে একটা গোলক ধাঁধা হয়ে আছে। খৃষ্টানরাও আন্দায অনুমান দ্বারা তাকে গোলক ধাঁধা বানিয়ে রেখেছে। ইহুদীরা তো তাকে হত্যা করেছে বলে দাবী করে, অধিকন্তু তাকে আল্লাহর রসূল বলে টিটকারিও দেয়। আর খৃষ্টানরা বলে যে, তিনি শূলে চড়ে নিহত হয়েছেন এবং সমাহিত হয়েছেন। তবে তিন দিন পর জীবিতও হয়েছেন। পরের ইতিহাস তার জন্ম ও তিরোধান সম্পর্কে নীরব। যেন তার কোনো হিসাবই নেই।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেউই এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। আল্লাহর বর্ণনা ব্যতীত এ বিষয়ে কোনো বিশ্বস্ত ঐতিহসিক বিবরণ কারো কাছেই পাওয়াই যায় না।

চার ইঞ্জীলে হযরত ঈসার গ্রেপ্তারী, শুলে চড়া, মৃত্যু, সমাহিত হওয়া ও কেয়ামতে পুনরুত্থিত হওয়ার যে বিবরণ এসছে, তার সবই হযরত ঈসার (আ.) তিরোধানের কিছুকাল পরে লিখিত। এ সমস্ত বিবরণ হযরত ঈসা ও তার শিষ্যদের সততার ওপর অবিচারের নামান্তর মাত্র। একটি ভীতিপ্রদ, গোপনীয় ও পলায়নপর অবস্থায় সংঘটিত ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ধার করে এ সব বিবরণ দিয়ে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে অনেকগুলো ইঞ্জিল লেখা হয়েছে, তবে বর্তমানে প্রচলিত চারখান ইঞ্জীল হযরত ঈসার জন্মের পরবর্তী ২য় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে গৃহীত ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। অবশ্য এগুলোর কোনোটিই সন্দেহের উর্ধে নয়।

যে আমলে ইঞ্জীল প্রণয়নের কাজ চলছিলো, সে সময়কার লেখা একটি ইঞ্জীল হচ্ছে সেন্ট 'বারনাবাসের' ইঞ্জীল। হযরত ঈসার নিহত হওয়া ও শুলে চড়ার কাহিনী সম্পর্কে এই ইঞ্জীলের বক্তব্য অন্যান্য ইঞ্জীলের বক্তব্যের বিরোধী। এতে বলা হয়েছে....,

'ইহুদার নেতৃত্ব যখন সৈন্যরা সেই ভবনটির দিকে অগ্রসর হলো, যেখানে ঈসা অবস্থান করছিলো, ঈসা (আ.) একটি বিশাল জনতার অগ্রসর হওয়ার শব্দ শুনলো। তাই সে ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘরের সাথে লেপ্টে রইলো। তার এগারো জন শিষ্য তখন ঘুমন্ত। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর বান্দার বিপদ আসন্ন দেখলেন, তখন স্বীয় দূত জিবরাঈল, মিকাঈল, রাফাইল ও উরাইলকে আদেশ দিলেন যেন ঈসাকে দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তৎক্ষণাত পবিত্র ফেরেশতারা

সেখানে এলো, দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে তারা ঈসাকে বের করে আনলো এবং তাকে বহন করে তৃতীয় আকাশে এনে রাখলো। সেখানে এমন একদল ফেরেশতার মধ্যে তাকে এনে রাখলো, যারা অনন্তকাল ধরে আল্লাহর গুণগান করে। এরপর ইহুদীরা যে কক্ষ থেকে ঈসা (আ.)-কে ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো, সেই কক্ষে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। তখনও শিষ্যরা ঘুমিয়েছিলো। বিস্ময়করভাবে আল্লাহ তায়ালা এক পরম বিস্ময় এনে হাযির করলেন। সহসা ইহুদার গলার স্বর ও চেহারা দুইই ঈসা (আ.)-এর সদৃশ হয়ে গেলো। আমরা ভাবলাম, এই হচ্ছে ঈসা (আ.)। অথচ ইহুদা আমাদেরকে জাগানোর পর খুঁজতে লাগলো, আমাদের শিক্ষক কোথায়। তা দেখে আমরা আবাক হয়ে গেলাম এবং জবাব দিলাম, জনাব আপনিই তো আমাদের শিক্ষক। এখন কি আমাদের কে ভুলে গেছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।....' (মুহাদারাতুন ফিন্ নাসরানিয়াহ।' অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ আবু যুহরা)

এভাবে কোনো গবেষকই সে ঘটনা সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। যা সংঘটিত হয়েছিলো ফজরের পূর্বে রাতের অন্ধকারে। আর এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনাটি কোনো বর্ণনার চেয়ে বিশুদ্ধ, তা কেউ বলতে পারবে না।

'যারা তাকে নিয়ে নানা মত পোষণ করে, তারা তাকে নিয়ে সন্দেহে লিপ্ত। তাদের তার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে।'

কিন্তু কোরআন অকাট্যভাবে ঘোষণা করে যে,

'তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়ায়নি।'

'তারা যে তাকে হত্যা করেনি, সেটা সুনিশ্চিত, বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।'

এখানে কোরআন বিস্তারিত তথ্য জানায়নি যে, তাকে জীবিতাবস্থায় দেহ ও রুহ সহকারে তুলে নেয়া হয়েছিলো, না মৃত্যুর পর শুধু আত্মাকে আর এই মৃত্যু কখন ও কোথায় সংঘটিত হয়েছে? কোরআন শুধু বলে যে, ওরা তাকে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, কেবল তাঁর মতো দেখতে অন্য এক ব্যক্তিকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিলো। এর অতিরিক্ত আর কোনো তথ্য এখানে জানানো হয়নি। তবে অন্য সূরায় বলা হয়েছে.....,

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা অচিরেই আমি তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেবো।'

তবে এই বর্ণনায়ও বিস্তারিত তথ্য নেই যে, তাকে তুলে নেয়ার পন্থাটা কি ছিলো এবং তার সময় কি ছিলো। তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর অনুসৃত নীতি অনুসারে আমি বিনা প্রমাণে কোনো কেচ্ছা-কাহিনী বা জনশ্রুতি মেনে নেয়ার পক্ষপাতী নই। এই ধারাবাহিক আলোচনার মধ্য থেকে যে, প্রাসঙ্গিক বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, তার অবশিষ্টাংশ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে লক্ষণীয়,

'আহলে কেতাব গোষ্ঠী প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবেই এবং কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেই।' (আয়াত ১৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাচীন তাফসীরকারকরা দু'রকমের মত ব্যক্ত করেছেন। এক দলের মতে এ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর কেয়ামতের পূর্বক্ষণে আকাশ থেকে নেমে আসার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আহলে কেতাব গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে, আর অপর দলের মতে এর অর্থ এই যে, ইহুদী বা খৃষ্টান যেই হোক না কেন স্বীয় মৃত্যুর প্রাক্কালে হযরত ঈসা সংক্রান্ত আসল তথ্য জেনে যাবে এবং তার প্রতি ঈমান আনবে, তবে সে সময় কারো জানা ও ঈমান আনায় কোনো লাভ হবে না।

আমি শেষের মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করি। আমার এ মত সমর্থনে উবাই এর কেরাত (অর্থাৎ তিনি যেভাবে কোরআন পড়তেন) তুলে ধরা যায়, যাতে আয়াতের 'কবলা মাওতিহি'র (তার মৃত্যুর আগে) স্থলে 'কবলা মাওতিহিম' (তাদের মৃত্যুর আগে) পড়া হয়েছে, যার সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে সব ইহুদী হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ইমান আনেনি এবং যারা আজও এই মতে অবিচল আছে, উপরন্তু বলে যে, আমরা তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছি, তারা কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রাণ যখন ঠোটের কাছে এসে দাঁড়াবে, তখনও দেখবে যে হযরত ঈসা (আ.)-এর রেসালাত সত্য। তাই তখন তার প্রতি ঈমান আনবে। তবে তখন ঈমান আনায় কোনো লাভ হবে না, আর কেয়ামতের দিন ঈসা (আ.) তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষী হবেন।

এভাবে কোরআন শূলে চড়ার কাহিনীর চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছে। অতপর পুনরায় ইহুদীদের বদ খাসলতগুলো এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার যে শাস্তি তারা পেয়েছে, তার বিবরণ তুলে ধরেছে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বস্তুত ইহুদীদের অত্যাচারের কারণেই আমি তাদের ওপর অনেকগুলো হালাল জিনিস হারাম করেছি.... আর আমি কাফেরদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।' (আয়াত ১৬০-১৬১)

এভাবে আলোচনার এই পর্বটিতে ইহুদী জাতির পূর্বোলিখিত অন্যান্য অনাচারের পর বাড়তি যে অনাচারগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো অত্যাচার, অনেককেই আল্লাহর পথ থেকে ফিরানো, যা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। তারা সুদ খায়॥অজ্ঞতা বশত নয় বরং নিষিদ্ধ জেনেই তারা তাতে লিপ্ত হয় এবং সুদ ও অন্যান্য অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় জনগণের সম্পদ আত্মসাত করে।

ইহুদীজাতির চরম হঠকারিতা

এসব অপকর্মের কারণে এবং ইতিপূর্বে আলোচিত বদ স্বভাবসমূহের কারণেই যে সকল জিনিস আগে তাদের জন্যে হালাল ছিলো, তা হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। এভাবে এ পর্বটিতে ইহুদী জাতির স্বভাব চরিত্র ও ইতিহাসের অজানা তথ্যগুলো তাদের ঔদ্ধত্য, গোয়ার্তুমি ও রসূলদের দাওয়াত অগ্রহ্য করা, তাদের নবী, জাতীয় নেতা ও ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে একগুঁয়েমী আচরণ তাদের অতি সহজে অন্যায় কাজ করা, নবী ও সৎলোকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য খারাপ ও কটু বাক্য উচ্চারণ এমনকি তাদের হত্যা করা ও হত্যা করার জন্যে নিজেদের গর্ববোধ করা প্রভৃতি দোষসমুহ উদঘাটন করা হয়েছে। এতে করে মুসলিম সমাজের ভেতরে তাদের রকমারি ধোঁকা ও প্রতারণার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম জনগণ ইহুদীদের কুস্বভাবসমূহ তাদের আচরণ ও চালচলন এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের দুশমনী সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারে। বস্তুত তারা ইসলাম ও মুসলমানদের আজন্ম দুশমন, চিরন্তন দুশমন এবং সর্ব যুগের ও সকল প্রজন্মের দুশমন। তারা শক্তের ভক্ত, তরবারী ও হাতুড়ি ছাড়া আর কোনো কিছুর সামনে তারা মাথা নত করে না।

ইহুদীদের এই চরিত্র ও আচরণ শুধু মদীনার প্রথম মুসলিম সমাজটির প্রতিই প্রর্দশিত হয়নি সর্বকালেই এমনটি হয়েছে। কোরআন মুসলিম জাতির শাশ্বত গ্রন্থ। তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মুসলমানদের শত্রু কারা এবং তাদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে, তবে সে অবশ্যই তা ঠিক ঠিক বলে দেবে। কোরআন ইহুদীদের সম্পর্কে যে রায় ও উপদেশ দিয়েছিলো মুসলমানরা তা মেনে নিয়েছিলো। ফলে ইহুদী জাতি মুসলমানদের অনুগত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে কোরআন যখন পরিত্যক্ত হয়ে গেলো, তখন মুসলমানরাই ইহুদীদের গোলামে পরিণত হয়ে গেলো। তারা

কোরআন সম্পর্কে গাফেল ও উদাসীন থাকার কারণে সংখ্যায় বড় হয়ে ক্ষুদ্র একটি দলের কাছে আজ তারা বারবার পরাজিত। কোরআনের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদেরকে এভাবেই ইহুদী ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হতে হবে।

তাই বলে কোরআন ইহুদীদের পক্ষাবলম্বন সর্বতোভাবে বর্জন করে না। তাদের মুষ্টিমেয় মোমেন শ্রেণীটির প্রতি কোরআন যথাযথ ইনসাফ করে, তাদের সৎকর্মের শুভ প্রতিদান নিশ্চিত করে,তাদেরকে মোমেনদের কাফেলার সাথে যুক্ত করে তাদের ইসলামী জ্ঞান ও ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং এই রায় দেয় যে মনের পরিপক্কতা ও ঈমানের পরিপক্কতাই তাদেরকে রসূল (স.)-এর ওপর তার পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল হওয়া কেতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার প্রেরণা যুগিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন,

'কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক এবং যার ঈমানদার.... আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে আমি বিরাট পুরস্কার প্রদান করবো।' (আয়াত ১৬২)

বস্তুত পরিপক্ক জ্ঞান ও প্রোজ্জল ঈমান-এ দুটো জিনিস মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের কাছে আগত সকল দ্বীনকে একই দ্বীন বলে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

যেহেতু পরিপক্ক জ্ঞান হচ্ছে সঠিক পথ চেনার উপায়। তাই হৃদয়কে আল্লাহর জ্যোতি গ্রহণের জন্যে উম্মুক্তকারী বলে ঈমানের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র এ আয়াতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন তা প্রতি মুহূর্তে মানব মনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। ভাসাভাসা জ্ঞান কুফরীর মতোই ক্ষতিকর। এই দু'টোই হৃদয়কে প্রকৃত তথ্য অর্জনে বাধা দেয়। এটি আমরা প্রত্যেক যুগেই প্রত্যক্ষ করি। যারা জ্ঞানের গভীরতার পর্যায়ে পৌঁছে এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তারা ঈমানের স্বপক্ষে অজস্র যুক্তিপ্রমাণ দেখতে পায়। আর না হোক অন্তত তার মনে বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে বহুসংখ্যক প্রশ্ন জাগবেই– সে সব প্রশ্নের একমাত্র জবাবই হলো এই বিশ্বাস যে, বিশ্বজগতের একজন মাত্র মনিব, মালিক ও মাবুদ রয়েছেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা পরিচালক এবং পরিকল্পনাকারী। তাঁর ইচ্ছা একক ও অবিভাজ্য এবং সেই ইচ্ছাই প্রকৃতির নিয়মকে এককভাবে গড়ে তুলেছে। অনুরূপভাবে যাদের হৃদয় হেদায়াতের প্রতি আগ্রহী হয় আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন এবং হেদায়াতের সাথে তাকে যুক্ত করে দেন। পক্ষান্তরে যারা বিভিন্ন রকমের তত্ত্ব ও তথ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত রাখে এবং নিজেদেরকে বৈজ্ঞানিক মনে করে, তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাই তাদের ঈমান আনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এমনও হতে পারে যে, তাদের জ্ঞানের অগভীরতা এ অপূর্ণতার কারণে তাদের মনে প্রশ্নেরও উদ্রেক হয় না। ফলে তাদের অবস্থা হেদায়াতের প্রতি অনাগ্রহী লোকদের মতোই হয়ে থাকে। এই দু'ধরনের লোকেরই অবস্থা এই যে, হয় তারা ঈমানের প্রশান্তি আন্বেষণের কোনো প্রয়োজন বোধ করে, ফলে তারা এ বিধানের একক রচয়িতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত দ্বীনের মধ্যে ভেদাভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা একটি দ্বীনকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মারফতে প্রেরণ করেছেন। এতে ভেদাভেদ বা বৈষম্যের কোনোই অবকাশ নেই।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এখানে কোরআন সেই মুষ্টিমেয় সংখ্যক ইহুদীর দিকেই ইংগিত করেছে, যারা রসূল (স.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন– এদের নাম আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে আয়াতের বক্তব্য তাদের মধ্যেই সীমিত নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য।

এই শ্রেণীর লোকদের অন্যান্য গুণও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

'তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।' বস্তুত এগুলোর সবই মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। 'অতপর তাদের প্রতিদানের উল্লেখ করা হয়েছে,

'তাদের সকলকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো।'

এর পরবর্তী আয়াতসমূহে মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আহলে কেতাব বিশেষত ইহুদীদের নীতি ও ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তারা দাবী করতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রসূল করে পাঠাননি। উপরন্তু তারা রসূলদের মাঝে ভেদাভেদ করতো এবং গোয়ার্তুমীর সাথে দাবী করতে যে, আকাশ থেকে একখানা কেতাব নাযিল করা হোক। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বলেছেন যে, রসূলের জন্যে কোনো ওহী নতুন বা অভিনব ব্যাপার নয়। এটা আল্লাহর চিরন্তন রীতি। নূহ থেকে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী ও রসূলকে তিনিই পাঠিয়েছেন। তারা সবাই নবী রসূল। সুসংবাদ প্রদান ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব দিয়ে তিনি তাদেরকে পাঠিয়েছেন। বান্দাদের ওপর দয়ার কারণেই আল্লাহ তায়ালা এ কাজ করেছেন। তা ছাড়া তারা যাতে কোনো ওযর আপত্তি তুলতে না পারে এবং হিসাবের দিন আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করা হয়, সে জন্যে এ ব্যবস্থা। সকল রসূল একই ওহীর মাধ্যমে এসেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে এসেছেন। সুতরাং রসূলদের মধ্যে পার্থক্য বা তারতম্য করা যুক্তিহীন গোঁড়ামী ও গোঁয়ার্তুমী ছাড়া আর কিছু নয়। যখন তারা অস্বীকার করে ও গোড়ামী প্রদর্শন করে তখন আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারা তাদের সাক্ষী হন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। এ কথাই বলা হয়েছে পরের আয়াতে'

'আমি তোমার কাছে ওহী নাযিল করেছি, যেমন করেছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি... ।'

ওহীর সিদ্ধান্ত ও মানবীয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা

বুঝা গেলো যে, রসূলদের এই কাফেলা এক ও অভিন্ন কাফেলা। গোটা মানবেতিহাস জুড়ে এ কাফেলার অবস্থান, তারা একই নির্দেশনা সম্বলিত একই বার্তা বহন করে এনেছেন এবং সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের একই দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। মানব জাতির সবচেয়ে মহৎ ও পবিত্র ব্যক্তিরা ছিলেন এই কাফেলায়। তারা হচ্ছেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, হারুন, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার পুত্র পৌত্ররা, ঈসা আইয়ুব, ইউনুস, সোলায়মান, দাউদ, প্রমুখ.... । কোরআনে এই সব নবীর বিবরণ রয়েছে। আবার কোনো নবীর বিবরণ কোরআনে নেই। বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, বিভিন্ন জাতি থেকে তারা আবির্ভূত হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে ও যুগে। অথচ তাদের বংশ, বর্ণ বা জাতীয়তা তাদের মধ্যে কোনোই প্রভেদ আনতে পারেনি। কেননা সবাই সেই একক মহাসম্মানিত উৎস থেকে আগত। তারা সবাই একই হেদায়াতের মশালবাহী এবং সকলেই সতর্কবাণী ও সুসংবাদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলেই মানব জাতিকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা যে কোনো বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র দেশ বা শহরের জন্যে এসে থাকুক না কেন, তারা সবাই সমান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্বযুগের সকল মানুষের সর্বশেষ নবী। তিনি হলেন মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

এদের সবাই আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পেয়েছেন। তারা যাই কিছু নিয়ে এসে থাকুন, তা আল্লাহর কাছ থেকেই এনেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যে মূসা (আ.)-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেছেন, তাও এক ধরনের ওহী। তবে এই কথোপকথন কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো, তা কেউ জানে না। কেননা একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানের উৎস হলো কোরআন আর সে এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো

তথ্য সরবরাহ করেনি। কাজেই আমরা শুধু এতোটুকুই জানি যে, ওটা একটা সংলাপ ছিলো, কিন্তু তা কি ধরনের, কিভাবে হয়েছিলো, হযরত মূসা (আ.) কোন শক্তি বা অনুভূতি দ্বারা তা গ্রহণ করেছিলেন, এ সবই অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোরআন আমাদেরকে এ সম্পর্কে কিছুই অবহিত করে না, আর কোরআন ছাড়া এ সম্পর্কে যা কিছু আছে, সে তো কেবল জনশ্রুতি, কেসসা-কাহিনী ও গুজব বই কিছু নয় এবং তার কোনোই প্রামাণ্যতা নেই।

এ সমস্ত রসূলকে আল্লাহ তায়ালা পরম দয়া পরবশ হয়ে তাঁর বান্দাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা মোমেনদেরকে শুভ প্রতিদান ও কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও গযব সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।

মানুষের সত্তায় ও বিশ্বজগতে আল্লাহর অকাট্য যুক্তি প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এতোটা বুদ্ধি দান করেছেন, যা দিয়ে সে প্রকৃতিতে ও নিজ সত্ত্বার অভ্যন্তরে সুপ্ত ঈমানের যুক্তি প্রমাণগুলো খুঁজে সহজেই বের করতে পারে। তথাপি আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর দয়াপরবশ হয়ে এবং তার বিবেক বুদ্ধি যাতে প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত না হয়, সে জন্যে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন, যারা সুসংবাদ প্রদান ও সতর্কীকরণের কাজ করবেন, যারা মানুষেকে দেখাবেন, স্মরণ করাবেন এবং মানুষের বিবেক ও স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর গোলামী থেকে মুক্তি দেবেন। বস্তুত এই প্রবৃত্তিই মানুষকে তার নিজ সত্ত্বায় ও বিশ্ব চরাচরে সত্যের প্রমাণ অনুসন্ধান করতে বাধা দেয়।

'আর আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী'

মহা পরাক্রান্ত এ অর্থে যে, তিনি বান্দাদের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহী করতে বাধ্য করতে পারেন। মহাবিজ্ঞানী এই অর্থে যে, তিনি প্রতিটি জিনিসকে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মতভাবে পরিকল্পনা করেন এবং প্রতিটি জিনিসের মান ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। কুদরত ও হেকমাত তথা অসীম ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা আল্লাহর দু'টি গুণ। এ বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জিনিসের ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে তাকে ব্যবহার করেন।

'যাতে রসূলদের এসে যাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে মানুষের আর কোনো অজুহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে'।

এই উক্তিটির মধ্যে বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে। তন্মধ্যে সংক্ষেপে তিনটে বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই,

প্রথমত, এতে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির গুরুত্ব এবং মানুষের সবচেয়ে নাযুক বিষয় আল্লাহর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে বিবেকের ভুমিকা কি তা তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষের গোটা পার্থিব জীবন এবং পার্থিব জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ঝোঁক, বাস্তবতা ও তৎপরতার ভিত্তি এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে। অনুরূপভাবে এর ওপরই নির্ভর করছে, তার পরকালীন কর্মফল এবং এটাই সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী।

মানুষের সত্ত্বা ও তার যাবতীয় ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন এবং যা তিনি মানুষদের দান করেছেন, তা তার হেদায়াত লাভ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সার্বিক কল্যাণ ও স্বার্থ অর্জনের জন্যে যথেষ্ট। ঘটনা যদি তাই হতো তাহলে তাকে তিনি শুধুমাত্র এই বিবেক বুদ্ধির কাছেই সোপর্দ করে দিতেন। সে এই বিবেক দ্বারা নিজ সত্ত্বায় ও আশপাশের বিশ্ব প্রকৃতিতে হেদায়াতের যে সব নিদর্শন এবং ঈমানের যে সব লক্ষণ নিহিত রয়েছে, তা সে নিজেই খুঁজে দেখতো। অতপর সে নিজ জীবন পরিচালনার জন্যে একটা বিধান ও উদ্ভাবন করে

নিতো এবং নিখুঁত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো। তার কাছে গোটা কোনো কালেও আর কোনো নবী রসূল পাঠাতেন না, নবী ও রসূলদের প্রেরণা ও তাদের প্রচারকে তিনি মানব জাতির জন্যে তার কাছে ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ রহিত করার উপায় হিসাবে গ্রহণ করতেন না। রসূল আগমন না করাকেও তিনি আল্লাহর কাছে মানুষের ওযর বাহানা পেশ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করতেন না। তিনি বলেছেন,

'যাতে রসূলদের এসে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে মানুষের আর কোনো ওজুহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে।'

কিন্তু আল্লাহর যেহেতু এ কথা জানা ছিলো যে, মানুষকে তিনি যে বিবেক দিয়েছেন, তা হেদায়াতের লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছার জন্যে যথেষ্ট নয় যতোক্ষণ না রসূলের নির্দেশ, সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ তার সাথে এসে যুক্ত না হয়, অনুরূপভাবে মানবজীবনের জন্যে এমন কোনো বিধান রচনায়ও পরিপক্ক নয়, যা তার সত্যিকার কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে, তাই তিনি দয়া পরবশ হয়ে, মানব জাতির কাছে নবী ও রসূল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রসূল না পাঠানো পর্যন্ত মানুষকে তার কাজের জন্যে জবাবদিহীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন,

'আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কোনো মানুষকেই শাস্তি দেবো না।'

বস্তুত এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াত থেকে স্বতসিদ্ধভাবেই ফুটে ওঠে। আর স্বতসিদ্ধ না ধরা হলেও অনিবার্য দাবীতো বটেই।

তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, মানবীয় বিবেকের কাজটা কী? ঈমান আনয়ন ও হেদায়াত লাভের ব্যাপারে তার ভূমিকা কী? মানবজীবনের আইন ও বিধান রচনায় বা তার ভূমিকা কী?

বিবেকের কাজ হলো রসূল আনীত বিধানকে আয়ত্ত করা ও উপলব্ধি করা। আর রসূলের কাজ হলো, সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ও পেশ করা এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিকে গোমরাহী আবর্জনার স্তুপ থেকে উদ্ধার করা, মানবীয় বিবেককে আপন সত্ত্বা ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি থেকে হেদায়াত ও ঈমানের নিদর্শনাবলীকে অনুসন্ধান করার জন্যে সচেতন ও সতর্ক করা। চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের নির্ভুল পদ্ধতি উদ্ভাবন, মানুষের জন্যে এমন কার্যকর জীবন যাপন প্রদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন নিশ্চিত করে।

বিবেকের কাজ এটা নয় যে, সে আল্লাহর দ্বীনের কোনটা গ্রহণযোগ্য তা স্থির করবে। আল্লাহর কাছ থেকেই বক্তব্যটি এসেছে এটা অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য না বর্জনযোগ্য, তা স্থির করা বিবেকের কাজ নয়– যদিও তার অর্থ জানার পর তার গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা তার থাকে। তার এ কথা বলার অবকাশ থাকেনা যে, এই অর্থের সাথে সে একমত নয় বা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, তা করলে সে কুফরীর শাস্তি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা সুষ্ট হেদায়াত থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বস্তুত এরূপ স্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে তার একমাত্র করণীয় এই যে তা সন্দেহাতীতভাবে তার কাছে পৌছলে এবং বিবেক তার অর্থ বুঝতে না পারলেও তাকে সে বিধি গ্রহণ করতেই হবে।

রসূলের কাছে আগত ওহী মাত্রেই মানবীয় বিবেককে সম্বোধন করে, অর্থাৎ তা বিবেককে জাগ্রত করে, আদেশ করে। তাকে পর্যবেক্ষণের সঠিক পন্থা নির্দেশ করে। এর অর্থ এই নয় যে, বিবেককে ওহী ঠিক কি বেঠিক, তা নির্ধারণের বা তাকে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা দেয়। ওহীর বিধান যখন প্রমাণিত হবে, তখন সেটাই হবে চূড়ান্ত। তখন মানবীয় বিবেকের একমাত্র করণীয় হবে তা গ্রহণ করা, তাকে বাস্তবায়িত করা এবং তার অনুগত হওয়া– চাই তা তার ভালো লাগুক বা না লাগুক।

বিবেকের ভূমিকা হলো ওহীর অর্থ ও মর্ম কী এবং আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের বিচারে তার তাৎপর্য কী, তা উপলব্ধি করা, এ পর্যন্তই বিবেকের ভূমিকা শেষ। ওহীর বিশুদ্ধ অর্থ জানার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বিবেকের নেই। কেননা ওহী আল্লাহর তরফ থেকে আসে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী গ্রহণযোগ্য না বর্জনীয় এবং সঠিক না বেঠিক সে রায় দেয়ার অধিকার বিবেকের নেই।

এই পর্যায়ে এসে সত্যের সাথে অনেক মিশ্রণ ঘটে। কেউ কেউ বিবেককে খোদার আসনে বসাতে চায়। ইসলামের বিশুদ্ধ ও অকাট্য বিধিসমূহ পর্যন্ত ভুল না নির্ভুল তা পরখ করার ক্ষমতা তারা বিবেকের হাতে ন্যস্ত করতে চায়। আবার কতেক লোক আছে, যারা বিবেককে একবারেই বাতিল ও নিস্ক্রীয় করে দিতে চায়। তারা মনে করে, হেদায়াত লাভ ও ঈমান আনয়নে বিবেকের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। আমরা যেটা একটু আগে বলেছি, সেটি হলো মধ্যম ও সঠিক পথ। সেই মধ্যম পথটি এই যে, ওহী বিবেককে সম্বোধন করে, আল্লাহর বিধান বুঝায় এবং আল্লাহর বিধানকে গোটা জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তার পথ বাতলায়। যখন ওহীর বক্তব্য বুঝে আসবে, তখন তা মেনে নেয়া, আনুগত্য করা ও বাস্তবায়িত করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না, ওহীর মর্ম না বুঝলেও তদনুসারে কাজ করতে হবে– কোরআন এ কথাই বলে। অনুরূপভাবে ওহীর মর্ম বুঝার পর তা গ্রহণ করা হবে– না বর্জন করা হবে, কিংবা তা শুদ্ধ না ভুল সে সম্পর্কে আর কোনো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হেদায়াত গ্রহণের সঠিক পন্থা এই যে, ইসলামের অকাট্য বিধিসমূহের সাথে নিজের বিবেক সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ, ক্রুটিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অথবা স্বকল্পিত 'যৌক্তিক' সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারবে না। প্রামাণ্য ওহীসমূহকে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত চেয়ে সর্বাবস্থায় নির্ভূল এবং ইসলামী দৃষ্টিভংগী নিয়ন্ত্রিত নয়–এমন ব্যক্তিগত নিয়মবিধির তুলনায় ওহীর নিয়মবিধি অধিকতর নিখুঁত। তাই ইসলামী নিয়মবিধি যখন প্রমাণিত হবে যে, তা যথার্থই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, তখন মানব রচিত কোনো নিয়মবিধির আলোকে তার যাচাই-বাছাই করা চলবে না।

বিবেক আল্লাহ নয়। তাই সে আল্লাহর ফয়সালাকে নিজের ফয়সালার আলোকে বিচার ও যাচাই বাছাই করতে পারে না।

তবে ওহীর একাধিক মানবীয় ব্যাখ্যা থাকতে পারে এবং এ ধরনের একটি মানবীয় ব্যাখ্যাকে সে অপর একটি মানবীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। এটা তার ন্যায্য অধিকার। সঠিক মূলনীতির একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ যখন রয়েছে, তখন এ ধরনের বিরোধে আপত্তির কিছু নেই। ইসলামের নিজস্ব নির্ভূল নীতিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার স্বাধীনতা মানবীয় বিবেক বুদ্ধিকে দেয়া হয়েছে। এটা বিবেকের অবাধ বিচরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র। ওহীর যখন একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে এবং ইসলামের বিশুদ্ধ মূলনীতিসমূহের আওতাধীন যখন বিচার বিবেচনা করা হয়, তখন ওহীর প্রকৃত অভীষ্ট কী এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায়, তা নির্ণয়ে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির স্বাধীনতাকে সংকুচিত করার ক্ষমতা ও অধিকার কারো নেই। ওহী যে মানবীয় বিবেককে সম্বোধন করে, তার এও একটি মর্মার্থ।

ইসলাম যথার্থই বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ব্যবস্থা। তার অর্থ এই যে, সে তার ফয়সালা ও নীতিমালা বুঝে শুনে গ্রহণ করার জন্যে বিবেক বুদ্ধিকে আহবান জানায়। এমন কোনো অলৌকিক পন্থায় তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে না, যাতে বিশ্বাস করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। ইসলাম বিবেককে সম্বোধন করে এই অর্থে যে, সে তার দৃষ্টিভংগীকে বিশুদ্ধ করে এবং তাকে তার

নিজ সত্ত্বায় ও বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান হেদায়াত ও ঈমানের উপকরণসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার আহবান জানায়, যাতে তার স্বভাব বদভ্যাস ও প্রবৃত্তির সেই সব লালসার আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়; যা মানুষের স্বভাব ও বিবেককে প্রতিনিয়তই বিভ্রান্ত করে থাকে। ওহী বিবেককে সম্বোধন করে, এর আরো একটি তাৎপর্য এই যে, সে তাকে সেই সব ওহীর ব্যাখ্যা করার অধিকার দেয়, যাতে বিবেকের চিন্তা ভাবনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে এবং আদৌ না বুঝেই তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করে না। এভাবে যখন ওহীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্পন্ন হবে, তখন মানুষের পক্ষে ওহীকে মেনে নিয়ে মোমেন হওয়া অথবা প্রত্যাখ্যান করে কাফের হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ওহীর বক্তব্য সঠিক না ভ্রান্ত, সেটা নির্ণয় করার অধিকার তার নেই এবং মোমেন থাকা অবস্থায় গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের স্বাধীনতাও তার নেই। ইদানীং এক শ্রেণীর লোক নিজেদের বিবেককে 'আল্লাহ' মানতে শুরু করেছে। তাদের বিবেক বুদ্ধি যে সব ওহীর সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করে, সেগুলোকেই গ্রহণ করে এবং যেগুলোকে গ্রহণ করে না সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। এ সব লোককেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তোমরা কি আল্লাহর কেতাবের কিছু অংশ মানবে, আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে!'

আর এ ধরনের আংশিক আনুগত্যকে কোরআন কুফুরী এবং শাস্তিযোগ্য গণ্য করেছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন বিশ্বজগত, মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলেন অথবা কোনো কিছুকে ফরয বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন সেই আদেশ বা নিষেধ যার কাছে পৌছবে, সে তার অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক তার আনুগত্য করা তার অপরিহার্য।

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা যখন বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও তদ্রুপ,.... 'তারা কি দেখতে পায় না যে, আকশ ও পৃথিবী প্রথমে যুক্ত ছিলো, অতপর আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করেছি, আর আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে তৈরী করেছি'.... 'আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন'.... 'তিনি পোড়ামাটির ন্যায় ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং জ্বিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন'

এবং সৃষ্টি জগত, প্রাণীকূল ও পদার্থসমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে আরো যা বলেছেন, তার সবই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এসব ওহীর মর্ম বোঝার পর বিবেকের এ কথা বলার অধিকার নেই যে, আমি যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, কিংবা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এ সব ওহীর বক্তব্য তার আওতায় পড়ে না। কেননা এসব বিষয়ে বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ভুল ও নির্ভুল দুইই হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যে সিদ্ধান্ত বা মত ব্যক্ত করেন, তা হয়ে থাকে নির্ভুল।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন বলেন 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারা কাফের।'....

'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও অবশিষ্ট সূদের দাবী ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাক। অন্যথায় আল্লাহ তয়ালা ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো। তবে তোমরা তওবা করলে তোমাদের আসল পুঁজি বহাল থাকবে। তোমরা অত্যাচার করবেও না, অত্যাচারের শিকারও হবে না।'..... 'হে নবী মহিয়ষীরা! তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো এবং প্রাচীন জাহেলিয়তের ন্যায় রূপ সজ্জা প্রদর্শন করে বেরিও না'.... 'আর তাদের (মুসলিম নারীদের) উচিত বুকের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা এবং নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করা।'.... এভাবে মানুষের জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে আর যে সব কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তার সবই এর আওতায় পড়ে। আল্লাহ তায়ালা এসব কথা অকাট্য সত্য ও নির্ভুল। মানুষের বিবেক

বুদ্ধির এ কথা বলার অবকাশ থাকে না যে, আমি তো মনে করি, আল্লাহর বিধানের বিপরীত, আল্লাহর অনুমোদিত বা অপছন্দনীয় বিধি-ব্যাবস্থাই কল্যাণকর। কেননা বিবেক যে জিনিসকে কল্যাণকর মনে করবে তা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে এবং তা প্রবৃত্তির লালসা, ঝোঁক বা আবেগের ফলও হতে পরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যে রায় দেন তা সর্বতোভাবে সঠিক ও কল্যাণকর না হয়েই পারে না।

আল্লাহর রচিত বিধান আকীদা বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন পদ্ধতির সমষ্টি এবং বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হোক বা না হোক, তার সবটাই মানতে হবে। কেবল ওহীর মূল পাঠ প্রামাণ্য সূত্রে হস্তগত হলে ও তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেই হয় এবং তার কার্যকারিতা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত না হলেই হয়। এরূপ ওহী সম্পর্কেও বিবেকের একথা বলার অধিকার নেই যে, আমি ওহীর বিধান থেকে কেবল আকীদা বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদতগুলোকে গ্রহণ করছি, কিন্তু এর বাস্তব জীবন পদ্ধতি তথা সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পদ্ধতিসমূহ তো যুগের অনেক পরিবর্তনের কারণে অচল ও অকার্যকর হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর বিধানকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দিতেন, তাহলে অবশ্যই তার উল্লোখ করতেন। ওহীর ভাষায় যখন কোনো সময়ের উল্লেখ নেই,তখন অবশ্যই তা তার নাযিল হওয়ার সময়ে এবং পরবর্তী যুগের শেষ মুহূর্তে অবধি একইভাবে কার্যকর থাকবে। একে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অর্থ হবে আল্লাহর বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা প্রদর্শন এবং আল্লাহর জ্ঞানকে অপরিপক্কতা ও অসম্পূর্ণতার অপবাদ দেয়ার শামিল। আল্লাহ তায়ালা এরূপ অন্যায় দাবী ও অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ কথা সত্য যে, ওহীকে কেন্দ্র করে ইজতেহাদ তথা চিন্তা গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু এই ইজতিহাদ চলতে পারে শুধুমাত্র সাধারণ মূলনীতিকে সুনির্দিষ্ট খুঁটি নাটি ঘটনায় প্রয়োগ করার জন্যে, সাধারণ মূলনীতি গ্রহণ অথবা বর্জনের ফয়সালা করার জন্যে নয়, চাই তা যে কোনো যুগে ও যে কোনো প্রজন্মে মানব রচিত যে কোনো মতবাদের আওতায় হোক না কেন।

তবে আমার এ আলোচনা থেকে এমন ধারণা করা চাই না যে, মানব জীবনের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির গুরুত্ব ও ভূমিকা বুঝি সংকুচিত হয়ে গেলো। অনাগত কালের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ওহীর সিদ্ধান্ত ও নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে চিন্তা গবেষণার বিশাল কর্মক্ষেত্র তার সামনে উন্মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ও তার সঠিক শিক্ষার আলোকে যখন কারো দৃষ্টি-ভংগী ও মানদন্ড নিয়ন্ত্রিত হবে, তখনই কেবল এই ইজতেহাদ করা যাবে। যখন চিন্তা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হবে তখন মানুষ মহাবিশ্বের প্রকৃতি,তার শক্তি ও তার পেটে সঞ্চিত উপাদানগুলো নিয়ে, মহাবিশ্বের পদার্থ ও প্রাণীকুল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যাবে। বিশ্বজগতের যে সব পদার্থ ও প্রাণীকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে এবং বিবেককে বিভ্রান্তকারী প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী অনুসারে নয় বরং আল্লাহর বিধান অনুসারে কিভাবে জীবন ও জগতের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা করবে।

মোমেনদের অপরিহার্য দায়িত্ব

এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রসূলরা ও তাদের পরে যারা তাদের রেসালাতের প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের ওপর সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের বিরাট দায়িত্ব অর্পিত। এই দায়িত্ব যতো বড়, ঠিক ততোই ভারী।

দুনিয়া ও আখেরাতে সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য রসূলরা ও পরবর্তীকালে তাদের অনুসারীদের ওপর নির্ভরশীল। রসূলদের দ্বারা মানব জাতির কাছে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের ভিত্তিতেই মানব জাতির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের শাস্তি বা পুরস্কারের ফয়সালা হয়।

বস্তুত নবী ও রসূলদের এ দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্বভাবতই এরকম। নবী ও রসূলরা তাদের দায়িত্ব কতো বড়ো, তা বুঝতেন। আর আল্লাহ তায়ালা রসূলদেরকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব ও বিরাটত্ব বুঝিয়েও দিতেন। যেমন তিনি স্বীয় নবীকে বলেছেন,

'আমি অচিরেই তোমার কাছে অত্যন্ত গুরুভার জনিত বার্তা অর্পন করবো।'

তিনি তাঁকে এ দায়িত্ব বহনে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তাও শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'ওহে কম্বলে আচ্ছাদিত ব্যক্তি! রাত্রি জাগরণ করো, তবে কিছুটা অংশ বাদে। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অথবা আরো একটু কম অথবা বেশী জাগো। কোরআনকে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পড়ো। আমি অচিরেই তোমার ওপর গুরুভার বার্তা অর্পণ করবো।'

আল্লাহ আরো বলেছেন,

'নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে কোরআন নাযিল করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রভুর ফায়সালার জন্যে ধৈর্যধারণ করো এবং তাদের মধ্যকার কোনো পাপী বা কাফেরের অনুগত হয়ো না। সকাল বিকাল তোমার প্রভুর নামোচ্চারণ কর। আর রাত্রে তাঁর জন্যে সেজদা করো এবং গভীর রাত পর্যন্ত তাঁর গুনগান করো।'

এই জিনিসটা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সচেতন করেন এবং তিনি যাতে আল্লাহর কথাবার্তার তাৎপর্য বোঝেন, সে জন্যে তাঁকে আদেশ দেন। তিনি বলেন,

'তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং তাঁকে ছাড়া আমি আর কোনো আশ্রয়স্থলও কখনো পাবো না একমাত্র আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোই আমাকে বাঁচাবে।'.... তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত, তাই তিনি নিজের মনোনীত রসুল ছাড়া আর কাউকে অদৃশ্যের তথ্য জানান না। তখন তার সামনে ও পেছনে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করেন। যাতে তিনি জানতে পারেন যে, রসুলরা তাদের বার্তা ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের কাছে সংরক্ষিত সব কিছুই তার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি বস্তুকে তিনি গুণে গুণে রেখেছেন।'

বস্তুত মানুষের জীবন মরণ, ভালো-মন্দ এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়গুলো এবং সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বমানবতার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে রসূলদের ওপর। এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। তারা যদি তাদের প্রভুর বিধান তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন এবং তার জাতি তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় জগতেই সফল হবে। আর যদি নবীরা পৌঁছে দেন, কিন্তু তারা তা বাস্তবায়িত না করে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দুর্ভোগ পোহাবেন। যদি নবীরা জনগণকে দাওয়াতই না দেন, তাহলে তারা আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করতে পারবে, আর তাদের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব পড়বে গিয়ে তার ওপর দাওয়াতের দায়িত্ব ছিলো, কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করেনি।

অবশ্য আল্লাহর রসূলরা তাদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। এই কঠিন দায়িত্ব পালন করার পর সানন্দে আপন প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছেন। নবীরা দাওয়াতকে শুধু মুখ দ্বারাই প্রচার করেননি, বরং নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দাওয়াতের পথের বাধা দূর করার জন্যে রাত দিন জেহাদও করেছেন। এই বাধা সন্দেহ, সংশয় ও গোমরাহীর আকারেও ছিলো, আবার খোদাদ্রোহী নেতা ও শাসকের আকারেও ছিলো, যারা মানুষকে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে দিতো। শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) এ কাজ করেছেন এবং শুধু মুখের ভাষা দ্বারা নয় বরং তরবারী দ্বারাও বাধা দূর করেছেন, যাতে আল্লাহর যমীনে আর কোনো অরাজকতা অবশিষ্ট না থাকে এবং কেবল আল্লাহর দ্বীনই অবশিষ্ট থাকে।'

রসূলের পর এই দাওয়াতের দায়িত্ব তাঁর মোমেন অনুসারীদের ওপর বর্তে। তাঁর তীরোধানের পর এদের পর এক বহু প্রজন্ম এসেছে এবং আসবে। আর এই সকল প্রজন্মের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব এই মোমেনদের ওপরই বর্তাবে। এই কঠিন দায়িত্ব থেকে তাদের একটুও রেহাই নেই। এ দায়িত্ব হলো মানুষকে কোনো রকম ওযর-বাহানা পেশ করার সুযোগ না দেয়া এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা। তাবলীগ ও দাওয়াত ছাড়া এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আর কোনো পথ থাকবে না, আর তাও রসূল (স.) যেভাবে করছেন অবিকল সেইভাবে করতে হবে। রসূল তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাবেন, আর জনসাধারণ যে সব গোমরাহী ও সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। স্বাভাবিক কারণেই অপরদিকে কিছু আল্লাহদ্রোহী শক্তি এমন থাকবে, যারা দাওয়াত ও জনগণের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তারা তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দিতেও চাইবে। এমতাবস্থায় যতো বাধা বিপত্তি থাক, তার ভেতর দিয়েই আল্লাহর মোমেন বান্দাদেরকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মুখ দিয়ে ও বাস্তব কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দাওয়াত দিতে হবে। এতে প্রচারকরা তাদের প্রচারিত দ্বীনের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা হবেন। সেই সাথে বাধা দূর করার কাজও সাধ্যমত করে যেতে হবে। বাতিল শক্তি গায়ের জোরে মানুষকে বিপথগামী করতে থাকবে-এটা হতে দিলে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করা যাবে না।

এটা এমন এক দায়িত্ব যা কোনো মোমেনেরই বহন না করে গত্যন্তর নেই। নচেত গোটা মানব জাতির একদিন বিপথগামী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ফলে মানব জাতি দুনিয়াতেও কোনো চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হবে, তেমনি আল্লাহর কাছে ওজুহাত খাড়া করারও সুযোগ পেয়ে যাবে। মোমেনরা কোনোভাবে এ দায় এড়াতে পারবে না এবং দোযখ থেকেও অব্যাহতি পাবে না।

সুতরাং এ দায়কে হেয় জ্ঞান করার কোনোই অবকাশ নেই।

যে ব্যক্তি নিজেকে 'মুসলমান' বলে পরিচয় দেয়, অথচ দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করে না, সে তার দাবী করা ইসলামের পক্ষে নয় বরং বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। এতে করে তার ওপর সূরা বাকারার এই আয়াত প্রযোজ্য হয়ে যায়-

'এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মাত (জাতি) হিসাবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্যে সাক্ষী হও এবং রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয়।'

ইসলামের এই সাক্ষ্য ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু হয়, অতপর পারিবারিক জীবনে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মোট কথা গোটা জীবনেই তা বিস্তৃত হয়। যে ইসলামের দিকে সে আহবান জানায়, তার বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে সে তার পরিবার থেকে শুরু করে গোটা জাতিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে। সর্বশেষে মানুষকে গোমরাহকারী ও ইসলাম থেকে বাধাদানকারী তাগুতী শক্তিকে উৎখাত করার জন্যে সে জেহাদ পরিচালনা করবে। এভাবে তার সাক্ষদানের কাজ সম্পন্ন হবে। জেহাদে মারা গেলে সে শহীদ। অর্থাৎ সে নিজের জীবন দিয়ে ইসলামের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আপন প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছে। একমাত্র এরূপ সাক্ষদানকারীই যথার্থ শহীদ।

রেসালাত মানবজাতির প্রতি আল্লাহর অপার করুণা

সর্বশেষে আমরা লক্ষ করি মানুষ নামক এই বিদ্রোহী প্রাণীটির প্রতি আল্লাহর কতো অনুগ্রহ, দয়া, করুণা ও সুবিচার, আর তিনি কী বিরাট, কত জ্ঞানী ও গুণী সত্ত্বা।

লক্ষ্য করি, এই প্রাণীটির মধ্যে সঞ্চিত শক্তিসমূহ এবং তার হেদায়াত ও গোমরাহীর যোগ্যতার প্রতি। আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বিবেক বুদ্ধির হাতে সোপর্দ করে দেননি, যদিও বিবেক একটা অতীব উচ্চাংগের হাতিয়ার এবং তার নিজ সত্ত্বায় ও প্রকৃতিতে হেদায়াত ও ঈমানের অফুরন্ত নিদর্শনাবলী বিদ্যমান। নিজের সীমাহীন জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা জেনেছেন যে, তার এই মূল্যবান হাতিয়ার বিবেক প্রবৃত্তির লালসা ও আবেগে তাড়িত হয়ে বিপথগামী হতে পারে এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায়, তাও অসম্পূর্ণতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। এ জন্যে মানবীয় বিবেকের ওপর তার হেদায়াত ও গোমরাহীর দায় দায়িত্ব চাপানো হয়নি, তবে রেসালাত ও সুস্পষ্ট বিবরণ এসে যাওয়ার পর এ দায় চাপানো হয়েছে। আর সুস্পষ্ট হেদায়াত লাভের পর তাকে জীবন রচনার দায়িত্বও তাকে দেয়া হয়নি। তাকে শুধু দেয়া হয়েছে আল্লাহর রচিত বিধান বাস্তবায়ন ও কার্যকরি করণের দায়িত্ব। এরপর অন্য সব কাজ তার ওপর সোপর্দ করা হয়েছে। তার এই কাজের জগত এক বিশাল জগত। সেখানে সে যা ইচ্ছে উদ্ভাবন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। মানুষের বিবেকবুদ্ধি ভুল করতে পারে। নির্ভুল করতে পরে, তার পদস্খলনও ঘটতে পারে, আবার পা তাঁর অবিচলও থাকতে পারে।

আল্লাহর ন্যায়বিচারের মহিমা দেখে স্তম্ভিত হই। আল্লাহ তায়ালা যদি রসূল না পাঠাতেন, তাহলে মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পারতো যে, তিনি হেদায়াতের ব্যবস্থা করেননি। যদিও মানুষের সামনে বিশ্বজোড়া এক উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ বিদ্যমান। আর তার সত্ত্বার মধ্যেও রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শনাবলী সম্বলিত আর এক সুপ্ত গ্রন্থ। সে গ্রন্থে রয়েছে আল্লাহর একত্ব, তার পরিকল্পনা ও ভাগ্য নির্ণয় এবং তার জ্ঞান ও শক্তির বিবরণ। মানুষের প্রকৃতিতেও রয়েছে তার স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়া ও তার প্রতি প্রত্যয় পোষণের এক অদম্য আগ্রহ। আর বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সত্ত্বায় আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের যে দলীল প্রমাণ রয়েছে তাতে রয়েছে চমৎকার মিল, সাদৃশ্য ও সমন্বয়, আর তাকে এমন এক বিবেক দান করা হয়েছে, যা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। এ সব সত্তেও আল্লাহ তায়ালা যেহেতু জানেন যে, উল্লেখিত মানসিক শক্তিগুলোতে আকস্মিকভাবে এমন দুর্বলতা বা বৈকল্য আসতে পারে, যা সে শক্তিগুলোকে বিকৃত, নষ্ট ও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে, অথবা তাতে ভুলভ্রান্তিরও অবকাশ থাকতে পারে তাই তিনি মানুষকে প্রকৃতি ও বিবেকের প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, তার পরিবর্তে তিনি তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে হেদায়াত লাভের অন্যান্য উপকরণ৷যা কখনো নষ্ট বা বিকলও হয়ে যেতে পারে, তার ওপর নির্ভর করতে না হয় এবং রেসালাতের মাধ্যমে সত্যের যে মানদন্ড পাওয়া যায়, তার দ্বারা মানুষ যাতে সেই উপকরণগুলোকে সজ্জিত করতে পারে। এর পরই মানুষের অনুসরণ, আনুগত্য ও মৌখিক স্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে, হয় সে সকল উপকরণের প্রামাণ্যতা রহিত হবার আশংকা এবং আযাব তার জন্যে অনিবার্য হয়ে যাবার আশংকা।

আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, মানুষ নামের এই দুর্বল ও অসম্পূর্ণ প্রাণীটিকে আল্লাহ তায়ালা পরম দয়া ও করুণার বশে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন এবং তাকে এই বিশাল পৃথিবীর খেলাফত দান করেছেন। এ পৃথিবী আল্লাহর দৃষ্টিতে যতো ছোটই হোক। মানুষের দৃষ্টিতে প্রকান্ড, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হয়ে, এটুকু ব্যবস্থাও করেছেন যে, মানুষকে তার সত্ত্বায় লুকায়িত পথ প্রদর্শক স্বভাবের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কেননা ওগুলো তো মাঝে মাঝে বিকৃত হয়ে যায়। তাকে তাঁর সুপথ প্রদর্শন বিবেকের হাতেও সোপর্দ করা হয়নি। কেননা তা কখনো কখনো পথভ্রষ্টও হয়। বরঞ্চ তিনি একের পর এক রসূল পাঠাতে থেকেছেন। অথচ মানুষ ক্রমাগত সেই রসূলদের সাথে বিদ্রোহাত্তক আচরণ করেছে এবং তাদের অবাধ্য থেকেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ সব অপরাধের জন্যে সাধারণত এই দুনিয়ায় পাকড়াও করেন না। এই অবাধ্যতার কারণে রসূলদের হেদায়াত থেকে তাকে বঞ্চিতও করেন না।

ভেবে অবাক হতে হয় যে, প্রভুর তো এগুলোর কোনোই দরকার নেই এবং দয়া-করুণা এ অনুগ্রহ ও হেদায়াতের কোনো প্রয়োজন নেই যে, কিন্তু আল্লাহকে চেনার জন্যে তার আশেপাশে বিদ্যমান উপকরণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, এগুলো তার খুব একটা কাজে আসবে না, যতোক্ষণ তা আল্লাহর বিধানের আলোকে সংশোধিত না হয়। তাই এসব উপকরণকে নিস্প্রয়োজন মনে করা হলো এবং আল্লাহ তায়ালা রেসালাত ও ওহীর বর্ণনা না আসা পর্যন্ত তার জন্যে শাস্তি বরাদ্দ করলেন না। সে ঠিক সেই শিশুর সাথে তুলনীয়, যার পায়ে একটু শক্তি হওয়া মাত্রই বয়স্কদের হাত সরিয়ে দিয়ে দূরে হেঁটে যায় এবং আছাড় খায়। তবে উদাহরণের এই শিশু অধিকতর অনুগত ও সুপথপ্রাপ্ত। কেননা সে যখন বয়স্কদের হাত সরিয়ে দিয়ে স্বাধীন হবার চেষ্ট করে তখন তার ভেতরকার সুপ্ত শক্তি পরখ করে এবং পেশী ও স্নায়ুকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী বানায়। কিন্তু এ যুগের যে স্বেচ্ছাচারী মানুষ আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে চলতে চায়, তার যতো সুপ্ত শক্তি ও ক্ষমতাই থাকনা কেন, আল্লাহর হেদায়াতের প্রয়োজনীয়তা থেকে সে কখনোই অমুখাপেক্ষী নয়। এই হেদায়াতের পথ অবলম্বন না করলে সে পথভ্রষ্ট হবেই।

যারা দাবী করে যে, বড়বড় বুদ্ধিমান লোকেরা রসূলের পথ প্রদর্শন ছাড়াও রসূলের পর্যায়ে পৌছাতে পারে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ধোকাবাজী বা বিভ্রান্তি ছড়াতে না চাইলেও নিজেরা যে ভুল ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত,তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিবেক রেসালাতের সহায়তায় নির্ভুল দৃষ্টিভংগী অর্জন করতে পারে। এরপরও সে যদি ভুল করে, তবে তা হবে ঘড়ির ভুল সময় দেয়ার মতো, যা পরিবেশের প্রভাবে সংঘটিত হতে পারে এবং পুনরায় তাকে শোধরানো যায়। এটা কখনো সংশোধনের উর্ধে নয়।

এটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, রেসালাতের সাহায্য নিয়ে যে কাজ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা করা যায়, রেসালাতের সাহায্য না নিয়ে তা করা যায়না। সুতরাং মানবীয় বিবেক বুদ্ধির রেসালাতের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ইতিহাসে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে, মধ্যম পন্থী বিবেকগুলো রেসালাতের সাহায্য নিয়ে যতোখানি উর্ধে উঠতে পারে।বড় বড় দুর্লভ বিবেকগুলোর কোনো একটি বিনা সাহায্যেই ততোখানি উর্ধে উঠতে পেরেছে।

প্লেটো ও এরিষ্টটল নিসন্দেহে অতি উচ্চাংগের বুদ্ধিমত্ত্বার অধিকারী ছিলেন। অনেকে একথাও বলেন যে, এরিষ্টটল ছিলেন মানবেতিহাসের সব চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অবশ্য আল্লাহর হেদায়াত বর্জিত লোক হিসাবেই এ কথা খাটে। আমরা যখন ইলাহ বা মাবুদ সংক্রান্ত তার ধ্যান-ধারণা পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, একজন সাধারণ মুসলমান যখন আল্লাহর রসূলের পথ নির্দেশ অনুসারে চালিত হয়, তখন তার যে চিন্তাধারা তৈরী হয়, এরিষ্টটলের ধারণার সাথে তাকে দূরতম সম্পর্কও নেই।

প্রাচীন মিসরের আখনাতুন তাওহীদ বিশ্বাসের নাগাল পেয়েছিলেন, যদিও হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইউসুফের দাওয়াত ও নবুওত দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তবে আখনাতুনের আকীদায় যে, ফাঁক ও যে সব উদ্ভট কেচ্ছা-কাহিনীর অস্তিত্ব ছিলো, তাতে তার তাওহীদ বিশ্বাস ও একজন সাধারণ মুসলমানের তাওহীদ বিশ্বাসে অনেক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইসলামের নিরংকুশ আধিপত্য বিরাজ করতো, তখন রসূলের গড়া লোকদের মধ্যম মানের নৈতিকতার নমুনা ছিলো। গোটা মানবেতিহাসের অমুসলিমদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ও বিরল ধরনের চরিত্রবান লোকদেরকেও তাদের সমকক্ষ হতে দেখা যায় না।

অপরদিকে আমরা যখন ইসলামের আইন সামষ্টিক বিধি ব্যবস্থার তুলনা করি, তখন ইসলামের সমতুল্য কোনো মতবাদ বা বিধি ব্যবস্থা দেখতে পাই না। ইসলামের আইন ও বিধিব্যবস্থায় যে উচ্চাংগের বৈশিষ্ট সমন্বয় ও ভারসাম্য বিদ্যমান, তা আর কোনো ব্যবস্থায় কখনো দেখতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ইসলাম যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো,সে ধরনের শান্তিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত সমাজ তৎকালে বা তার আগে ও পরে পৃথিবীর কোথাও দেখতে পাই না।

সভ্যতার বস্তুগত মানই সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র মাপকাঠি নয়। বস্তুগত সভ্যতার উপকরণসমূহের বিকাশের সাথে সাথে উক্ত সভ্যতারও বিকাশ লাভ করে। কেননা সে উপকরণাদির বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটে বিকাশমান বিজ্ঞানের কল্যাণে। কিন্তু জীবনের মান বিচারের মাপকাঠি হলো জীবনের সকল দিক, বিভাগ উপকরণাদি ও পরিবেশের সাথে তার সমন্বয় ও ভারসাম্য, চাই যে কোনো যুগ বা সময়েই তার মান বিচার করা হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে ভারসাম্যই জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি আনে। ভারসাম্যই সকল মানবীয় শক্তি সামর্থকে এমনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়, যাতে কোনো একটি দিক চাপা পড়ে না যায় কিংবা কোনো একটি দিক স্ফিতও না হয়। ইসলামী যুগে জীবনে যে ভারসাম্য বিরাজ করতো, রসূলের আনুগত্যহীন মানবজাতি কোনো কালেই সেই পর্যায়ের ভারসাম্যে উন্নীত হতে পারে না। বিশৃংখলা ও ভারসাম্যহীনতা অনৈসলামিক জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট। অনৈসলামিক জীবনে যখনই কোনো দিক উজ্জ্বল হয়, তখন তা অন্য কয়েকটি দিককে তিমিরাচ্ছন্ন ও শ্রীহীন করেই উজ্জ্বল হয় আর অনৈসলামিক জীবনের কোনো দিক যখন অতিমাত্রায় স্ফীত হয়, তখন অন্য দিকগুলোকে ধ্বংস করেই তা স্ফীত হয়। আর সমগ্র মানবজাতি তখন ঘোর দুর্ভাগ্য ও অশান্তিতে ধুকতে থাকে। (আমার রচিত 'ইসলাম ও সভ্যতার সমস্যা' বইটি দ্রষ্টব্য)

যালেমরা কখনো হেদায়াতের আলো পায় না

১৬৫ নং আয়াত পাঠ করে আমার মনে যে চিন্তা ও ভাবের উদ্ভব হয়েছিলো, এ পর্যন্ত তাই আলোচনা করলাম। এবার পরবর্তী ১৬৬ নং আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে চাই,

'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমার কাছে যে ওহী নাযিল করেছেন সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতেই নাযিল করেছেন, আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

অর্থাৎ আহলে কেতাব যখন শেষ নবীর নবুওতকে অস্বীকার করেছে, তখন তোমার বিচলিত হবার কিছু নেই। ওরা অস্বীকার করে করুক। আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারা তোমার নবুওতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। বান্দাদের জন্যে রসূল প্রেরণ আল্লাহর এক শাশ্বত রীতি, তারা সুসংবাদ দেবে ও সতর্ক করবে, যাতে মানুষের আর কোনো ওযর বাহানা করার অবকাশ না থাকে। আহলে কেতাব মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্ববর্তী নবীদেরকে এবং ইহুদীরা ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী নবীদেরকে স্বীকার করে আর খৃষ্টানরাও তাদেরকে ও ঈসা (আ.)-কে স্বীকার করে তবে ঈসা (আ.)-কে তারা ইলাহ বা খোদা বানিয়ে নিয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা নিজেই যখন সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং ফেরেশতারাও যখন সাক্ষ দিচ্ছেন, যাদের ভেতরে ওহীবাহক ফেরেশতারাও রয়েছে,তখন আহলে কেতাবের কথাবার্তা সবই বাজে ও বৃথা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তখন তার কোথাকার কে? আল্লাহর সাক্ষ্যই তো এ ব্যাপারে যথেষ্ট।

এই সাক্ষ্য দানের মধ্য দিয়ে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, যাতে ইহুদীদের হঠকারিতা ও ধাপ্পাবাজীতে তিনি মর্মাহত না হন। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকেও প্রবোধ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা মদীনায় আসার পর ইসলামের সূচনা লগ্নেই ইহুদীদের এমন কঠিন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখী হয়ে বিচলিত না হয়। বস্তুত কোরআনের এই স্থানটিতে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করার জন্যে যেরূপ জোরদার ভাষায় কথা বলা হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক ছিলো। (আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে ইহুদীদের মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের পরই এসছে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি ও হুংকার,

'যারা কুফরী ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষেকে দূরে ঠেলে দেয়ার অপকর্মে লিপ্ত.... আর এ কাজ আল্লাহর কাছে নিতান্ত সহজ।' (আয়াত ১৬৭, ১৬৮ ও ১৬৯)

উল্লেখিত গুণাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ যদিও অনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো সর্বপ্রথম ইহুদীদের ওপরই প্রযোজ্য। হযরত মূসা (আ.) এর আমলের ইহুদীই হোক, মদীনায় ইসলামের অভ্যুদয়কালের ইহুদীরাই হোক, কিংবা তাদের পরবর্তী কালে আমাদের সময়কাল পর্যন্ত আগত ইহুদী প্রজন্মগুলোই হোক, সর্বকালের সকল ইহুদীই, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যাতিক্রম ছাড়া ইসলামের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন।

এই সকল ইহুদী এবং তাদেরই মতো যারা কুফুরী ও ইসলামের পথ থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টায় নিয়োজিত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর হেদায়াত এবং জীবনের নির্ভুল সরল সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। চিন্তায়, আদর্শে, আকীদায়, কাজে, চরিত্রে সামাজিকতায়, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে এমনভাবে বিপথগামী হয়ে গেছে যে, তাদের আর সুপথে ফিরে আসার আশা করা যায় না।

১৬৮ নং আয়াতে তাদের কুফুরীর বৈশিষ্ট্যটির পুনরুল্লেখ করে তার সাথে অত্যাচারকেও যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

'যারা কুফুর ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে-'

কুফুরী স্বয়ং একটি জঘন্য অত্যাচার। এটি সত্যের ওপর অত্যাচার, নিজের সত্ত্বার ওপর অত্যাচার এবং গোটা মানবতার ওপর অত্যাচার। কোরআন বিভিন্ন সময়ে কুফুর ও শেরেককে যুলুম বা অত্যাচার বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যেমন সূরা লোকমানে বলেছে'

'নিশ্চয়ই শেরেক একটি মারাত্মক যুলুম।'

সূরা মায়েদায়-

'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না তারা অত্যাচারী।'

এর পূর্ববর্তী আয়াতে এ ধরনের লোকদেরকে কাফের বলা হয়েছে। (সূরা মায়েদায় যথাস্থানে দ্রষ্টব্য) আহলে কেতাব শুধু শেরেকের অত্যাচারেই লিপ্ত হয়নি, বরং সেই আল্লাহর পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার যুলুমেও লিপ্ত হয়েছে। এভাবে তার কুফরী ও অত্যাচার উভয়টিতেই লিপ্ত হয়েছে। আর এজন্যেই আল্লহ তায়ালা স্বীয় ন্যায়বিচার দ্বারা তাদের চূড়ান্ত প্রতিফল নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

'যারা কুফুরী ও যুলুমে লিপ্ত তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে সুপথও দেখাবেন না। তবে কেবল জাহান্নামের পথ দেখাবেন-'

অর্থাৎ এজাতীয় লোকদেরকে ক্ষমা করা আল্লাহর রীতি নয়। কেননা তারা ইতিমধ্যেই গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে বহু দূর চলে গেছে। তারা তাদের জন্যে ক্ষমার সকল দুয়ার রুদ্ধ করে দিয়েছে। হেদায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে।

'আর এটা আল্লাহর কাছে একটা সহজ কাজ।'

কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত। তাঁর মধ্যে ও বান্দাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই যে, ন্যায়সংগত কর্মফল দান তার জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। আর তার এ কাজকে কঠিন করে দিতে পারে এমন শক্তিও কোনো বান্দার নেই।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলতো যে, 'আমরা তো আল্লাহর ছেলে পেলে ও প্রিয় পাত্র'। তারা বলতো নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের বেশী আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না।' তারা বলতো, 'আমরা আল্লাহর মনোনীত জাতি।' কোরআন তাদের এই সব দাবী খন্ডন করতে এসেছে। তাদেরকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। তারা আল্লাহর বান্দার বেশী কিছু নয়। ভালো কাজ করলে ভালো এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাবে। মন্দ কাজ করে তাওবা করলে ক্ষমা পাবে। তওবা না করলে শাস্তি ভোগ করবে।

এ জন্যেই এ সকল বক্তব্যের পর সমগ্র মানবজাতির কাছে উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে যে, এই রসূল মানবজাতির মনিব প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে সে কল্যাণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ও তার মতো লোকদের মুখাপেক্ষী নন। তবে তিনি তাদের ওপর ক্ষমতাশালী। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁর। তিনি সব কিছু জানেন এবং নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে তা বাস্তবায়িত করেন। ১৭০ নং আয়াতে উদাত্ত আহবান লক্ষণীয়,

'হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে সত্য নিয়ে রসূল এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনো। তোমাদের কল্যাণ হবে। আর যদি অস্বীকার করো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'

এই আহবানের আগে আহলে কেতাবের সকল মিথ্যা প্রচার খন্ডন করা হয়েছে। ইহুদীদের গোটা ইতিহাস জুড়ে যে বদস্বভাব ও বদ খাসলাতের প্রকাশ ঘটেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের গোয়ার্তুমির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি যে ঈসা (আ.) তাদের শুধু নবী ছিলেন না বরং তাদের জাতীয় নেতা ও ত্রাণকর্তা ছিলেন, তাঁর সাথে পর্যন্ত তারা জঘন্য আচরণ করেছে। ইতিপূর্বে আসা সকল রেসালাত বা নবুওতের চূড়ান্ত পূর্ণতা সাধনের স্বাভাবিক দাবিই ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা নবী ও রসূল পাঠাবেন এবং সর্বশেষে মোহাম্মদ (স.)-কে সারা বিশ্বের নবী হিসাবে পাঠাবেন। ইতিপূর্বে যেসব নবী আসতো, কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা জাতির জন্যে আসতো। তাই সবার শেষে এমন একজন নবী আসা অপরিহার্য ছিলো যিনি সারা বিশ্বের নবী হবেন, সমগ্র মানবজাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবেন, 'যাতে মানুষ কোনো ওযর বাহানা না করতে পারে।' এই শেষ নবী যদি সমগ্র মানবজাতির নবী না হতেন, তা হলে কোনো না কোনো প্রজন্ম বা মানব গোষ্ঠী আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতো এবং নিজেদের ঈমান না আনারা পক্ষে ওযর বাহানা করতে পারতো, তাই সর্ব যুগের সকল মানুষের জন্যে নবী পাঠানো দ্বারা এই অভিযোগ ও ওযর বাহানার পথ রুদ্ধ হলো। আর এটি হলো সর্বশেষ রেসালাত বা নবুওত। সুতরাং ঈসার পর আর কোনো নবীর আগমনের কথা অস্বীকার করা আল্লাহর ন্যায় বিচারের সাথে বেমানান হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর আগেই মানুষকে শাস্তি দেবেন। কাজেই এই সার্বজনীন সর্বশেষ নবুওত আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর পরম দয়া ও পরম সুবিচার। তাই আল্লাহর এ উক্তি যথার্থ প্রতীয়মাণ হয় যে, 'আমি তোমাকে সর্বজগতের করুণা স্বরূপই প্রেরণ করেছি।' অর্থাৎ দুনিয়ার জন্যেও করুণা, আখেরাতের জন্যেও করুণা।

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ

إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ

وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ

إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ١٧١ لَّن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أَن

يَكُونَ عَبۡدٗا لِّلَّهِ وَلَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ

وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيۡهِ جَمِيعٗا ١٧٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

১৭১. হে কেতাবধারীরা, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং (ঈসার ঘটনা নিয়ে) আল্লাহ তায়ালার ওপর সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা চাপিয়ো না; (সে সত্য কথাটি হচ্ছে এই যে,) মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ছিলো (একজন) রসূল ও তার এমন এক বাণী, যা তিনি মারইয়ামের ওপর প্রেরণ করেছেন এবং সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঠানো এক 'রূহ', অতএব (হে আহলে কেতাবরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আনো, আর (কখনো) এটা বলো না যে, (মাবুদের সংখ্যা) তিন; এ (জঘন্য মিথ্যা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, (এটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা; তিনি তো একক মাবুদ; আল্লাহ তায়ালা এ (মূর্খতা) থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর কোনো সন্তান থাকবে; এ আকাশ ও ভূমন্ডলের সব কিছুর মালিকানাই তো তাঁর, আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

রুকু ২৪

১৭২. (ঈসা) মাসীহ কখনো (এতে) বিন্দুমাত্রও নিজেকে হেয় মনে করেনি যে, সে হবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, আল্লাহ তায়ালার একান্ত ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও (একে লজ্জাকর মনে করেনি); কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করা সত্যিই লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) সে অহংকার করে (তার জানা উচিত), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত (করে দন্ডাজ্ঞা দান) করবেন। ১৭৩. যেসব মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (সেদিন) তিনি তাদের এর জন্যে পুরোপুরি পুরস্কার দেবেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা আল্লাহ তায়ালার বিধান মেনে

اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا
بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

নেয়া লজ্জাজনক কিছু মনে করলো এবং অহংকার করলো, তাদের (সবাইকেই) আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তি দান করবেন, (সেদিন) তারা আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমিই তোমাদের কাছে উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি। ১৭৫. অতপর যারা (সে জ্যোতি দিয়ে) ঈমান আনলো এবং তাকে শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। ১৭৬. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (বিভিন্ন বিষয়ে) ফতোয়া জানতে চায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যার মাতা পিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, (এ ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে সে বোনটি সে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক হবে, অপরদিকে সে যদি নিসন্তান হয়, তাহলে সে তার বোনের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে; (আবার) যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তারা দুই বোন সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশের মালিক হবে; যদি সে ভাইবোনেরা কয়েকজন হয়, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে; আল্লাহ তায়ালা (উত্তরাধিকারের এ আইন-কানুন) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে (মানুষের উদ্ভাবিত বন্টন পদ্ধতিতে) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই সম্যক ওয়াকেফহাল।

তাফসীর

আয়াত-১৭১-১৭৫

আলোচ্য আয়াতটি মূলত খৃষ্টানদের সম্বোধন করেই বলা হয়েছে। যেমনি করে আগের অংশটিতে বলা হয়েছিলো ইহুদীদের লক্ষ্য করে, অবশ্য এরা উভয় দলই আহলে কেতাবদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এদের উভয় দলের কাছেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাব পাঠিয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য বক্তব্য এদের উভয়কে সম্বোধন করে হতে পারে।

আগের আলোচনায় কোরআন মারিয়ামের পুত্র ঈসা ও তার সম্মানিত মায়ের পবিত্রতার কথা বলছে, তা ইহুদীদের আরোপিত অভিযোগসমূহের জবাব এবং ঈসা মসীহের শূলবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে যে সব ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হতো সে সম্পর্কেও সেখানে কথা বলা হয়েছে।

এবারের আলোচনায় বলা হচ্ছে, ঈসা মসীহ সম্পর্কে খৃষ্টানদের সীমাহীন বাড়াবাড়ি সম্পর্কে। এখানে তাদের বলা হয়েছে, কিভাবে তাদের ধারণা বিশ্বাসে মূর্তি পুজার মতো বাতিল চিন্তাধারা ঢুকে গেছে, কিভাবে তাদের আকীদা বিশ্বাস গ্রীক, রোমান প্রাচীন ও হিন্দুদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কোরআন এই খৃষ্টান সম্প্রদায়সহ অন্যান্য আহলে কেতাবদের ধর্মীয় বিশ্বাসের রহস্য উদঘাটন করছে, যা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা থেকে তাদের বিশ্বাস ও আকীদায় ঢুকে পড়েছিলো। অপর দিকে আরব উপদ্বীপে নবী ইবরাহীমের অনুসারীদের ভেতর যে সব শেরেক ও মিথ্যা ধ্যান ধারণা প্রসারিত হয়েছিলো তার কুপ্রভাবও তাদের মধ্যে এসে গিয়েছিলো। জাহেলী যুগের সব কয়টি ধ্যান ধারণা আস্তে আস্তে তাদের ও দ্বীন ধর্মের অংশ বনে গেলো, কিন্তু ইসলাম এসে খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করলো, শুধু তাদের একারই নয়, পূরো মানব জাতির সামনে সঠিক বক্তব্য পেশ করলো এবং মানব জাতির যাবতীয় বিশ্বাসকে অপব্যখ্যা, ভূল ব্যাখ্যা, মিশ্রণ সংমিশ্রণ ও সব ধরণের বাড়াবাড়ি থেকে পবিত্র করতে চাইলো।

ঈসার জন্মের আগে গ্রীক দেশের দার্শনিক এরিষ্টটল ঈসা (আ.)-এর জন্মের পরে ইসকান্দারিয়ায় দার্শনিক প্লেটো এবং এদের উভয়ের মধ্যবর্তি আরো যেসব দর্শন ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভিন্ন দেশে নিখুঁত তাওহীদ বিশ্বাস নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বাতিল ধারণা ছড়িয়ে আসছিলো। ইসলাম তার সব কয়টির পরিশুদ্ধি করেছে, সব কয়টি আকীদাকেই সংশোধন করতে চেয়েছে। এভাবে তাওহীদকে পরিচ্ছন্ন করে তাকে তার সনাতন পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে তাহচ্ছে 'তাসলীছ কিংবা ত্রিত্ববাদ' এবং নবী ঈসার আল্লাহর পূত্র হওয়া সম্পর্কিত বিষয়টি, কোরআন এই বিষয়টিকে স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছে। কেননা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ একটি ধারণার মাধ্যমেই আল্লাহর একাত্ববাদ সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ইসলামের আগমনের সময় খৃষ্টানদের মাঝে নানা ধর্মীয় দল উপদল সত্তেও তাদের সবার মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস এই ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা এক, তবে তার একত্ব তিন পর্যায়ে পরিবেষ্টিত পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এবং মসীহ আল্লাহর পুত্র। অতপর বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানদের মাঝে মতবিরোধ ছিলো মসীহ সম্পর্কে। তিনি অতিন্দ্রীয় সম্পন্ন, না মানবীয় প্রকৃতি সম্পন্ন? কিংবা এই উভয় অস্তিত্ব নিয়েও তিনি 'ত্রিত্ববাদের' অংশ, আবার এটাও ছিলো বিতর্কের বিষয় যে, তিনি কি তার পিতার মতোই আদিম, না তাকে পরে সৃষ্টি করা হয়েছে, এভাবেই এদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে নানা দল-উপদলের সৃষ্টি হতে থাকলো এবং একদলের ওপর আরেক দলের যুলুম অত্যাচার চলতে থাকলে দীর্ঘদিন ধরে (সূরায়ে মায়েদার বর্ণনাতে এ বিষয়ে আরো বিষদ আলোচনা আসছে) ইতিহাসের অধ্যয়নের ফলে এটা এই সত্যটি

পরিস্কার হয়ে যায়, খৃষ্টীয় মতবাদের প্রথম সময়ের দিকে এই ত্রিত্ববাদের, মসীহর আল্লাহর পুত্র হওয়া ও মারিয়াম সম্পর্কিত একাধিক ধারণা বিশ্বাস কোনোটারই অস্তিত্ব ছিলো না, এসব ধারণা বিশ্বাস করে আস্তে আস্তে খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করেছে এবং দেশে বিদেশে মূর্তির পূজারীরা যখন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে তখন তারা তাদের মূর্তি পূজার এই ধারণাও খৃষ্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তারা আগে থেকেই তিন খোদার ওপর বিশ্বাস করতো (উসুরেস, ইযমা ও হুয়েস)।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের ওপর রোমানরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত অবিচার চালিয়েছে। এর প্রতিটি স্তরে খৃষ্টানদের মাঝে একত্ববাদে বিশ্বাসী একটি দল ছিলো যারা ত্রিত্ববাদে কখনো বিশ্বাস করেনি, ওদিকে তাদের ধর্মীয় গীর্জা হামেশাই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে সাধারণ খৃষ্টানদের মতামত গড়ে তুলতে। মাঝে মাঝে তারা এমনটিও বলতো যে, যেদিন পর্যন্ত আসমান যমীন ও তার যাবতীয় গোপনীয়তার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলা না হবে সেদিন পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী আকীদা বিশ্বাসে যথার্থতা পরিস্কার হবে না। তাদের একজন এই আকীদার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ ও জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এটা বুঝতে পেরেছি, আমরা আশা করি ভবিষ্যতের মানুষেদেরও যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করবো।ঠিক যেদিন আসমান যমীনের যাবতীয় গোপন কিছুর ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে।

আমরা এখানে খৃষ্টানদের ইতিহাসের সে সব অধ্যায় ও তার আভ্যন্তরীণ বিষয়ের বর্ণনায় নিবিষ্ট হতে চাই না যার মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের ধারণা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং কিভাবে একত্ববাদের ধারণা আস্তে আস্তে তাদের থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মূলত এই সূরায় বর্ণনা প্রসংগে আমরা এখানে কোরআনের আয়াতটির ব্যাখ্যাই পেশ করতে চাই, যাতে করে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এই আয়াত কিভাবে একত্ববাদের ধারনা পেশ করে এবং সে সব ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে যা খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

খৃষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদের অভিশাপ

এটা হচ্ছে বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আর তাদের এই ধরনের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের মাত্রা এ পর্যন্ত পৌছে যায় যে তারা আল্লাহর ব্যাপারেও অসত্য ও অশোভনীয় কথাবার্তা বলতে শুরু করে যে, আল্লাহর একজন পুত্র রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তিনজনের একজন।

পরবর্তী সময়ে খৃষ্টানদের মাঝে চিন্তার উত্থান-পতনের যতোগুলো পর্যায় এসেছে এর প্রতিটি পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঈসা (আ.)-এর খোদার পুত্র হওয়া ও ত্রিত্ববাদের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের প্রজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ও প্রকৃতিগত মেধার ভিত্তিতে তারা হামেশাই আল্লাহর সাথে তার কল্পিত পুত্রের সম্পর্ক নিরূপনের জন্যে নানা ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করতে থাকে। কেউ বলেছে, আসলে দুনিয়ায় অন্যন্য মানুষের জন্ম যেভাবে হয় এই পুত্রের জন্ম সেভাবে হয়নি বরং তা হচ্ছে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার একটি স্নেহের সম্পর্ক, আবার আল্লাহ তায়ালা তিনজনের একজন এ কথার ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করে যে, এটা হচ্ছে আসলে বিভিন্ন অবস্থায় আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী। কিন্তু এ চেষ্টা করেও এরা এদের এসব ব্যাখ্যাকে কোনোদিন মানুষের সাধারণ জ্ঞানের কাছে গ্রহণীয় করতে সক্ষম হয়নি বরং সব সময়ই একে এমন রহস্যময় বানিয়ে পেশ করে যে, এ সত্য সেদিন জানা যাবে যেদিন আসমান যমীন ও তার অভ্যন্তরীণ সব কিছুর সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে।

আল্লাহ সোবাহানাহু ওয়া তায়ালার অস্তিত্ব যাবতীয় শেরেক ও সামঞ্জস্য থেকে পবিত্র। তার স্রষ্টা হওয়ার মানেই হচ্ছে, তিনি সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র এবং এই বিষয়টি প্রকৃতগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, স্রষ্ঠা ও সৃষ্টি, মালিক ও অধিনস্থের মাঝে একটা বৈপরিত্ব থাকবে, আল্লাহর কোরআনে সে কথাই বলছেন।

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ তিনি পাক পবিত্র, তার সন্তান থাকবে কিভাবে? আসমান যমীনের যেখানে যা আছে তা তো তার জন্যেই।'

আর ঈসা (আ.)-এর জন্মের ব্যপারটা যদিও মানুষের স্বভাবজাত নিয়মের বাইরে এমন এক পদ্ধতিতে পিতা ছাড়া তার জন্ম হয়েছে, যা মানুষের কাছে মোটেই পরিচিত নয় কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি সীমার ভেতরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়-এ পর্যায়ে মানুষের জ্ঞান যতোটুকু সে নিয়মই আল্লাহর কাছে একমাত্র নিয়ম নয়, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তার পরীক্ষাও তিনি নিজে করেন এবং যেভাবে যখন চান সে পরীক্ষা প্রয়োগ করেন, তাঁর সে ইচ্ছা শক্তির কোনো শেষ নেই-তাঁর ওয়াদা অসীম!

আল্লাহ তায়ালা সোবহানাহু তায়ালা মসীহ সম্পর্কে বলছেন,

ঈসা (আ.) আল্লাহর রসূল। সে ঠিক সেই পর্যায়েরই এক রসূল যেমনি রয়েছেন আল্লাহর অন্যান্য রসূলরা॥নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মোহাম্মদ (স.) যাদের বিভিন্ন সময়ে মানর জাতির হেদায়াতের জন্যে বাছাই কারে পাঠানো হয়েছিলো।

এর নিকটতম ব্যাখ্যা এই মনে হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে নিজের একটি সরাসরি 'আদেশ' দ্বারা পয়দা করেছেন। এ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ সুচক (কুন) 'হয়ে যাও' তাঁরপর সাথে সাথে তা (ফায়াকুন) হয়ে যায়। এই আদেশ সুচক শব্দটিই তিনি মারিয়ামের ওপর প্রয়োগ করলেন, ফলে বাপের ভূমিকা ছাড়া ঈসা (আ.) তার মায়ের গর্ভে এসে গেলেন, আর এটাই ছিলো সন্তান জন্মের সে নিয়ম যার সাথে দুনিয়ার মানুষ পরিচিত ছিলো না, তাছাড়া এতে আশ্চয্যন্বিত হবার মতো কিইবা আছে, মানুষ ছাড়া অন্য সব কয়টি সৃষ্টিকে তো আল্লাহ তায়ালা এমনিই 'আদেশ সুচক শব্দ' দ্বারা অস্তিত্ব দান করেছেন এই শব্দ দ্বারাই 'যা ছিলো না' তা হয়ে গেলো এভাবেই একটু ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হলো। এটাকেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন॥এ হচ্ছে তার কাছ থেকে একটি 'রূহ'। একটি মাটির কাঠামোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব 'রূহ' ফুকলেন, ফলে তা মানুষের পরিণত হয়ে গেলো, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে ঠিকঠাক করে নেবো এবং তাতে আমার 'রূহ' ফুক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদারত হয়ে যেও।'

হযরত ঈসার বর্ণনা প্রসংগে বলা হলো,

'যে মহিলা যে তার সতীত্বকে সংরক্ষণ করেছে আমি তার ভেতরে আমার 'রূহ' ফুকে দিয়েছি।'

এই আদেশ সূচক শব্দটি কোরআনে তখনো এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে হযরত আদম সৃষ্টির সময় যে 'রূহ'র কথা বলা হয়েছে হযরত ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারেও সে রূহর কথাই বলা হয়েছে।

আহলে কেতাবদের এমন একজনও নেই যে বিশ্বাস করে যে হযরত আদম ছিলেন 'খোদা' অথবা আল্লাহর বিভিন্ন পর্যায়ের এক পর্যায়। তাহলে একইভাবে সৃষ্টির পর আদম যখন 'খোদা' হতে পারলেন না তখন হযরত ঈসা 'খোদা' হয়ে গেলেন কিভাবে, উভয়ের মধ্যে 'রূহ' তো

আল্লাহর হুকুমেই এসেছিলো এবং এদের উভয়ের সৃষ্টিই হয়েছিলো একটি 'রূহ' ফুক দেয়ার মাধ্যমে, অথচ হযরত আদম তো মাতাপিতা দু'জন ছাড়াই এসেছেন, আর হযরত ঈসা (আ.) এসেছেন শুধু পিতা ছাড়া। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের মতো আল্লাহ তায়ালা তাকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে গেলো।

'কি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এটা! আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং মাখলুকাতের স্রষ্টা তিনি তার সমগ্র সৃষ্টি জগতকে একটি আদেশ সূচক শব্দ 'হয়ে যাও' দ্বারা পয়দা করলেন, ঈসা (আ.)-কেও সেভাবে বানালেন। এই মূর্তি পুজারীর দল হযরত ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারটা নিয়ে অযথা একটা হুলস্থুল সৃষ্টি করে নিয়েছে, অথচ কোরআনে উভয় ঘটনাই অত্যন্ত যুক্তির সাথে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছে।

সত্যিকার কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে পিতামাতা ছাড়াই নিজস্ব 'রূহ'ফু দিয়ে পয়দা করেছেন এবং তাকে ও মানুষদের সাধারণ জন্মের জানাশোনা পদ্ধতি ছাড়াই তাকে জীবন দান করেছেন। একইভাবে তিনি তার 'রূহ' ফুকে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কেও পিতা ছাড়া জীবন দিলেন, আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সমগ্র মাখলুকাতের স্রষ্টা, তিনি হযরত ঈসাকেও পিতা ছাড়া জীবন দিলেন। এই সাধারণ কথাটিকে কিভাবে জটিল করে কখনো তাকে খোদা, কখনো খোদার পুত্র, কখনো তিন জনের একজন ইত্যাদি অযথা কাল্পনিক চিত্র বানানো হলো, অথচ আল্লাহর অস্তিত্ব এই সব অহেতুক ও অযথা কথাবার্তার চেয়ে অনেক বেশী পবিত্র, তার মর্যাদা অনেক উচুঁ।

'অতপর তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং এটা বলো না যে, (মাবুদ) তিনজন, (এসব অলিক ও ভ্রান্ত কথাবার্তা থেকে) তোমরা দূরে থেকো, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম।

এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের ওপর ঈমান আনার উদ্বাত্ত আহবান। এই রসূলদের মাঝে রসূল হিসেবে হযরত ঈসাও আছেন, আছেন শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)।

তাই বলা হচ্ছে, তোমরা এসব ফালতু কথা-বার্তা থেকে ফিরে এসো, কেননা এ বর্ণনার পর এটা দিবালোকে মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন এক মাবুদ। এটা প্রমাণ করে যে, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা হিসেবেও একক এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও তার এই একত্ব বিরাজমান, তাঁর সৃষ্টির পদ্ধতির মাঝেও এই একত্ব রয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির সব কিছু একটি আদেশ সূচক শব্দ 'হয়ে যা' দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর এটা এমন এক সত্য মানবীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞাও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং অনুভূতি ও অনুশীলনও একথা স্বীকার করে নেয় যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ দুটো বিপরীতমূখী কথা এবং কখনো স্রষ্টাকে সৃষ্টির মতো কিছু হওয়া উচিৎ নয়, আবার তিন-এ এক হওয়া অযৌক্তিক ও অলিক কেননা, 'তিনি পাক পবিত্র, পবিত্র এ ধারণা থেকে যে, তার সন্তান থাকবে!'

জন্মের ক্রমবিকাশ হচ্ছে বিনাশের প্রাথমিক লক্ষণ এবং তা বংশের আকারে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, অথচ আল্লাহর মর্যাদা অনেক বড়ো, তার এমন কোনো প্রয়োজন নেই যে, অস্থায়ী বিনাশী সৃষ্টির মাঝে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবেন। তাঁর অস্তিত্ব তো অনন্ত দিনের অনাদিকালের,

'আসমান-যমীনের যেখানে যা কিছু আছে সব কিছুই তো তার-এককভাবে তার।'

মানুষের জন্যে এটাই যথেষ্ট এবং শোভনীয় যে, তারা আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করবে, যে সম্পর্ক হয় মাবুদ এবং তাঁর গোলামের মধ্যে, তিনি এমন মাবুদ যিনি তাঁর বান্দাদের দেখা

শোনা করেণ, তাঁর এ দেখাশোনার জন্যে তাদের মধ্যে এক পুত্র রেখে তাকে মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই; বরং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা সর্বাবস্থায় এখানে বিদ্যমান রয়েছে ও থাকবে।

'কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

এর মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শুধু সত্যের দিক নির্দেশনা ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কথাই বর্ণনা করে না; বরং মানুষদের এ সান্ত্বনাও প্রদান করে যে তার যাবতীয় প্রয়োজন যাবতীয় বিষয় আসয়সমূহের একক দেখা ও রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালাই সম্পাদন করেন।

বর্ণনা এগিয়ে চলেছে মানুষের আকীদা বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে। এ কথা আবার পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও একক। তাঁর একত্বই এটা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট যে অন্য সমস্ত কিছুই হচ্ছে মাখলুকাত তথা সৃষ্টিজগত, অপর কথায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক একটাই এবং তা হচ্ছে শুধু বন্দেগীর, আনুগত্যের এখানে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতেও পারে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব একক, এই সার্বভৌমত্ব ও খোদায়ী সব কিছু-সব সৃষ্টির ওপরই পরিবেষ্টিত।

কোরআন এখানে খৃষ্টানদের সেই আকীদা বিশ্বাসের ও সংশোধন করতে চায় এবং তারই পাশাপাশি তাদের সে সব জাহেলী ধ্যান ধারণা ও ভ্রান্তি অপনোদন করতে চায় যেখানে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সন্তান মনে করার মতো ফেরেশতাদেরও আল্লাহর সন্তান মনে করে। তারা আরও মনে করে, এরা সবাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ও খোদায়ীতে তেমনি অংশীদার ঠিক যেমনি অংশীদার হযরত ঈসা (আ.) নিজে।

ইসলাম এখানে আল্লাহর একত্বের স্বপক্ষে অতি বেশী গুরুত্বারোপ করেছে এবং সেই মূল সত্যটাই বার বার বোঝাতে চাইছে যে, এই সার্বভৌমত্বে কারো কোনো অংশ নেই, এর সাথে কারো কোনো সদৃশ্য সম্ভব নয়। কেননা তাঁর মতো কেউই নেই, তাঁর কল্পনাও সম্ভব নয় আর আল্লাহর অস্তিত্ব তাঁর অস্তিত্বের ধারণার মতো কিছুই নেই, থাকতেও পারে না। এটা অস্তিত্বের মূলগত দিক থেকে যেমন সত্য, তার যাবতীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারেও সত্য। কোনো বস্তুই মূলগতভাবে তার অন্যান্য পরিচিতিতে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কোনো ক্ষেত্রেই তার সমকক্ষ হতে পারে না, এভাবেই ইসলাম স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে এবং বলেছে যে, এই সম্পর্ক হচ্ছে শুধু এবাদত ও বন্দেগীর। এই সার্বভৌমত্ব ও খোদায়ী এককভাবে আল্লাহর জন্যে এবং তিনি ছাড়া সব কয়টি সৃষ্টির জন্যেই হচ্ছে বান্দেগীর বিধান। কোরআনে করীম অধ্যয়ন করলে তার মাধ্যমে তাওহীদ অথবা একত্ববাদের ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। মূলত কোরআন এই একত্ববাদের সব কয়টি বৈশিষ্ট্যকেও আমাদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরেছে যে, তার কোনো ব্যাপারে সামান্য দ্বিধা-সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না।

ইসলাম বলে, এ মৌলিক সত্য নিয়েই মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে রসূল পাঠিয়েছেন। সব নবী রসূলরাই আল্লাহ তায়ালা এই দাওয়াতের কথা মানুষেদের বলেছেন। প্রত্যেক রসূলের দাওয়াত ছিলো।হযরত নূহ থেকে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত, সব কয়জন নবীই একই কথা ভাষায় বিভিন্ন জাতির কাছে এসে বার বার বলেছেন প্রত্যেক নবীর মধ্যেই ছিলো একই দাওয়াত,

'হে আমার জাতি, তোমরা এক মাবুদের বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।'

একথা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে, প্রতিটি আসমানী কেতাবেও দ্বীনের মূল শিক্ষায় আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর বান্দাদের তাঁর প্রতি আনুগত্যের একথাগুলো এতো পরিষ্কার করে বর্ণনা করার পরও এসব কেতাবের ধারক বাহকরা কিভাবে সে দ্বীনের মূল শিক্ষা, তাওহীদ তথ্য একত্ববাদকে তাদের মনগড়া ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত করে ফেললো এবং কিভাবে তারা এই অযৌক্তিক ও অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে গেলো যে, আল্লাহর ছেলেমেয়ে রয়েছে, অথবা এটা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তিনজনের একজন, তাওহীদের এতো নিখুঁত ধারণা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মূর্তি পুজা শেরেকের এই জাহেলী ধারণা কিভাবে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়লো? একদিকে আল্লাহর সার্বভৌম খোদায়ী অপর দিকে মানুষের বন্দেগী ও আনুগত্য, এই দুই সত্যের মাঝামাঝি কোনো তৃতীয় কিছু নেই।নেই কোনো তৃতীয় পদ্ধতি, এখানে আল্লাহর সাথে বান্দার বন্দেগী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সম্পর্ক নেই, এটাই হচ্ছে নিয়ম, এটাই হচ্ছে এখানকার নীতিমালা। মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনের মধ্যে কখনো কোনো ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতোক্ষণ এই সত্যটা তার দিল ও দেমাগে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যাবে, যে তারা সৃষ্টি এবং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাদের স্রষ্টা। তারা অধীন এবং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাদের মালিক, তাদের সবার সাথেই আল্লাহর এই সম্পর্ক বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনো পিতা-পুত্র, পিতা পুত্রী অথবা কোনো শেরেক বা সংমিশ্রণের অবকাশ নেই। হাঁ এখানে কোনো সৃষ্টি যদি তাঁর স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়তে কিংবা মযবুত করতে চায় তাহলে তাকওয়া, নেক আমল তাকে করতে হবে এবং একমাত্র এই পন্থায়ই সহজে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক মযবুত হতে পারে।

মানুষের মানবীয় জীবন ধারা, তার যাবতীয় কর্মকান্ড কখনো কোনো সুস্থ মানদন্ডের ওপর দাঁড়াতে পারে না, যতোক্ষণ জাতি ও সম্প্রদায় হিসাবে তাদের মনে এই ধারণা সত্যটি বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, তারা সবাই মিলে মূলত একই আল্লাহর বান্দা, সেই পরাক্রমশালী আল্লাহর সমীপে তাদের সবার আচরণও একই ধরণের হতে হবে, যেন গোটা মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দার মধ্যকার যাবতীয় মনগড়া সম্পর্ক ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়ে যায়, যা যুগে যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা নিজেরা নিজেদের মতো করে কিছু কিছু অধিকার বানিয়ে রেখেছিলো, তাওহীদের এই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ধারণা সমাজের সবার মনে বদ্ধমূল না হওয়া ব্যতিরেকে এই সমাজে কোনো দিনই কোনো সাম্য ও একতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মূলত তাওহীদের খালেস আকীদা নিছক কোনো শুষ্ক আকীদাই নয়; বরং তা হচ্ছে সমাজে ব্যবস্থার মূল ভিত্তি-সমাজের সব কয়টি মানুষের সাথে একের অন্যের সম্পর্কের মূলনীতি নির্ধারণকারী মানব সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠরও মূলনীতি এটি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জন্মটাই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা। মালিকের বন্দেগীর মাধ্যমে তাকে অন্য ধরনের সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তির ঘোষণা প্রদান করে। ইসলামের ইতিহাসে এটা কখনো হয়নি যে, কোনো ধর্মীয় গীর্জার প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে তাকে চিরতরে নিজেদের পরাধীন করে রাখা হয়েছে। এখানে আল্লাহর পুত্র এই দোহাই দেয়া কিংবা তিনজনের একজন তাই তাঁর অধীনতা মেনে তিতে হবে।এ কথা বলে কখনো মানব সন্তানের স্বাধীনতা হরণ করা হয়নি, অথবা অমুকের ছেলে কিংবা মানুষ যেহেতু তিন জনের একজন, এর কোনো কিছু বলেও ইসলামের আওতায়

কখনো কোনো মানুষকে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়নি। ইসলামী ইতিহাসে এমনটিও কখনো ঘটেনি যে কোনো একটি ধর্মীয় পবিত্রতার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা এই দাবী করলো যে, তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা-আল্লাহর ক্ষমতারই ছায়া বিশেষ এবং তিনিই তাকে এ ক্ষমতা চালাবার দায়িত্ব দিয়েছেন, যা যাবতীয় আইনের আওতাবহির্ভূত।

এই ধরনের পবিত্র ক্ষমতা কোনো এক সময় গীর্জার পাদ্রীদের কাছেও ছিলো, এর দায়িত্বশীল লোকেরা নিজেদের এই পবিত্রতার মালিক বলেও ধারণা করতো। ইউরোপে দীর্ঘদিন তারা খোদার পুত্রের ওজুহাত দিয়ে কিংবা তিনজনের একজনের নামে এই ক্ষমতা ব্যবহার করেছে, এমনকি এই ক্ষমতালম্বীরা ইসলামী ভুখন্ডকে এই ওজুহাতেই বিধ্বংস করতে উদ্যত হলো, কিন্তু যখন মুসলিম দেশ সমূহ থেকে তারা পুনরায় নিজেদের দেশে ফিরে গেলো, দেখা গেলো এই পবিত্র ধর্মীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহও তাঁরা নিজেদের সাথে করে নিয়ে গেলো। অতপর তাদের মধ্যে মার্টিন লুথার কিং, জিভলের মতো নামী-দামী ব্যক্তিরা এই পবিত্র ধর্মীয় ক্ষমতার সংশোধনে এগিয়ে এলো যা মূলত ছিলো ইসলামের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি, বিশেষ করে এই মূলনীতিটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য যে ইসলামে মানুষের জন্যে কখনো খোদায়ী ক্ষমা ও ধর্মীয় পবিত্রতার মর্যাদা সংরক্ষিত নেই। বরং এখানে সবাই হচ্ছে আল্লাহর একই ধরনের বান্দা। ইউরোপের ধর্মীয় সংস্কারবাদীদের এটা ছিলো বড় প্রেরণা তাদের এই সংস্কার আন্দোলনের ওপর এটাই ছিলো বেশী প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়।

অতপর কোরআন এখানে এসে হযরত ঈসা মসীহর খোদার পুত্র হওয়া-পবিত্র আত্মার খোদায়ী ধারণা অথবা তিনজনের একজনের খোদা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত কথা পেশ করছে, কোনো অবস্থায় কোনো পর্যায়ে এদের কারোই আল্লাহর বিশাল সার্বভৌমত্বে কোনো অংশ থাকার প্রশ্নই আসে না। একথা বলিষ্ঠভাবে বলার পর কোরআন দ্বিধাহীন ভাষায় এভাবে কথাগুলো পেশ করছে যে, মারিয়ামের পুত্র ঈসা আল্লাহর বান্দা এবং ঈসা কখনো আল্লাহর বন্দেগী করতে সংকোচ কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করেনি, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সমস্ত ফেরেশতারাও সবাই আল্লাহর বান্দা, তাঁরাও কখনো আল্লাহর বান্দা হতে সংকোচ করেনি বরং এরা সবাই সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর বন্দেগী করেছেন। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে এক জায়গায় জড়ো করবেন, সেদিন যারা যারা আল্লাহর বন্দেগী করতে দ্বিধা করেছে, যারা নিজেদের আল্লাহর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেনি তাঁরা সবাই তাদের সামনে এক কঠিন ও ভয়াবহ আযাবকে অপেক্ষমান দেখতে পাবে। অপরদিকে যারা আল্লাহর বন্দেগীকে নিজেদের জীবনে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে আনুগত্যের বন্ধনকে দৃঢ় করেছে, তাদের সেদিন মহা পুরস্কারে ভুষিত করা হবে।

নিসন্দেহে হযরত ঈসা মসীহ এ ব্যাপারে কখনো মিথ্যা অহমিকায় ভোগেননি যে তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরিচয় দেবেন, উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন নবী ও রসূল, তিনি ভালো করেই এটা জানতেন যে, বান্দা ও মালিকের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত তফাতটা কোথায়? এ দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটো বিষয়। নবী হিসেবে তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এই সৃষ্টি জগতকে কে সৃষ্টি করেছেন, আর সে সৃষ্টি কি করে স্রষ্টার সমান হবে, অথবা স্রষ্টার কোনো একটি বৈশিষ্ট্যেরও সমতুল্য হবে? সৃষ্টি সৃষ্টিই স্রষ্টা স্রষ্টাই, এর একের সাথে অপরের কোনো মিল সাদৃশ্য কিছুই সম্ভব নয়। তিনি রসূল হিসেবে ভালোভাবেই এটা জানতেন যে, আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের বিষয়টা তাঁর মর্যাদাকে খাটো করেনি বরং আল্লাহর ঘনিষ্টতম ফেরেশতা জিবরাঈলসহ অন্যান্য সব

নবীদের আল্লাহর আরো নিকটতম করে দিয়েছে, এর চাইতে আশ্চর্যের কথা কি হতে পারে যে, স্বয়ং মসীহ তো নিজে আল্লাহর বন্দেগী করে তাঁর বান্দা হতে যেখানে ভালোবাসেন, সেখানে তাঁর অনুসারীরা তাকে বান্দার স্থান থেকে খোদার স্থানে পৌঁছে দিতে চায়, যেটা মসীহ নিজে কখনো চাননি এবং নিজেরাও খোদার বন্দেগী থেকে ফিরে আসেনি।

সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক

'যে ব্যক্তিই আল্লাহর বন্দেগী করা থেকে....।'

তাই বলে এদের গর্ব-অহংকার ও আল্লাহর বন্দেগী করা থেকে সংকোচ কোনোটাই শেষ বিচার দিনের জন্যে এদের একত্রে জড় করা থেকে আল্লাহ তায়ালাকে বিরত রাখতে পারবে না। তিনি সেদিন সৃষ্টির ওপর এককভাবে ক্ষমতাবান হবেন, সেদিন তিনি এই অহংকারী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর অনুগত বান্দাদের একত্রিত করবেন। অতপর যারা মূল সত্যকে চিনে নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে অর্থাৎ 'ভালো' কাজ করেছে৷সত্যিকার অর্থে আনুগত্য স্বীকার করার অপরিহার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে ভালো কাজ৷তাই যারা এ 'নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরোপুরি এর বিনিময় আদায় করে দেবেন এবং আপন অনুগ্রহ দিয়ে সে বিনিময় আরো বাড়িয়ে দেবেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার একক আনুগত্য ও আনুগত্যের স্বীকৃতি এই কারণে চান না যে, তাঁর সত্যিকার অর্থে মানুষের আনুগত্যের আসলেই কোনো প্রয়োজন, কিংবা মানুষের এই আনুগত্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও কোনো বৃদ্ধি ঘটে, তাঁর সম্রাজ্যের কোনো শোভাও এর ফলে বৃদ্ধি হয়না। বরং তিনি তো তাদের আনুগত্য এ জন্যেই চান, যেন মানুষরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার তফাৎটুকু বুঝতে পারে, কারণ সত্যটুকু জানতে পারলেই মানুষ সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও জীবনের জন্যে চিন্তাধারা সংশোধন করে নিতে পারবে। কেননা এই সত্যটুকু না জানতে পারলে সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও জীবনের কর্ম প্রবাহ কোনো দিনই কোনো সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির যথার্থ পরিচয় জানার ওপরই মূলত সবকিছু নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা চান এই সত্যটুকু তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করুক, মানুষের মনে তাওহীদের খালেস ধারণা যেন বদ্ধমুল হয়ে যায়, যাতে করে তারা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের গোলামী থেকে বের করে এনে আল্লাহর বন্দেগীতে প্রবেশ করিয়ে দেবে। মানুষ যেন এ কথা জেনে নিতে পারে যে এই বিশ্ব-জগতের সর্বত্র আসমান যমীনের প্রকৃত মালিক ও বাদশাহ কে? এবং এই বাদশাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে যেন মানুষের মাথা নত না হয়। কারণ সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই বান্দা এবং এভাবেই সে আল্লাহ তায়লার প্রদত্ত জীবন বিধানের পূর্ণ আনুগত্য করে এটা জেনে নেবে যে, তার জীবনের জন্যে কর্মসূচী দানের ক্ষমতা আর কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ এটা জেনে নেবে যে, গোটা সৃষ্টির সবই আল্লাহর। তাই সবার ওপর তার অবস্থানকে তাঁর বুঝতে হবে, যতো বড়ো যালেম ও অবিচারীই হোক না কেন তার সামনে নিজেকে কখনো হেয় মনে করে না, বরং যারা আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় না তাদের মোকাবেলায় সে নিজেকে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ভাববে। সেজদার সময় মাথা এক আল্লাহর সামনেই অবনত করবে, রুকুর জন্যে বাঁকা হলেও তা হবে এক আল্লাহর সামনে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ করবে না।

আল্লাহ তায়ালা এটাও চান যে, মানুষ সৃষ্টি হিসেবে এ কথাটা ভালো করে বুঝে নেবে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কখনো বংশ ও আত্মীয়তার বন্ধন দিয়ে তৈরী করা যায় না; বরং তা একমাত্র

তাকওয়া ও নেক আমল দ্বারাই সম্ভব এবং তার যাবতীয় নেক কাজ সে এ জন্যেই করবে যে, এর ফলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। আল্লাহ তায়ালা এটাও চান, যেন মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ও বান্দার দায়িত্বের এ অনুভূতিটুকু বুঝে নিতে পারে, যাতে করে সৃষ্টির কেউ কখনো স্রষ্টার দাবী করতে না পারে, আর কখনো কারো মনে আল্লাহর সাথে কিংবা তার কোনো গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের সাথে শেরেক করার ধৃষ্টতা না জাগে এবং সব ব্যাপারে সে যেন মূল স্রষ্টা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। এসব কিছু আল্লাহ তায়ালা এ জন্যে চান যেন তাওহীদের এই ভিত্তিমূলের ওপর মানুষের জীবন কাঠামো দাঁড়াতে এবং পরিশোধিত হতে পারে।

এই মহান সত্যের গভীর অনুভূতি, বান্দার দৃষ্টি সবসময় আল্লাহর প্রতি এবং এককভাবে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকা, তার সন্তুষ্টিতে সদা তুষ্ট থাকা, আমল আখলাকে তাকওয়ার ও পরহেযগারীর নীতি অবলম্বন করা এবং সে মোতাবেক জীবন ধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং জীবন ব্যবস্থা তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে গ্রহণ না করা৷মূলত এর সব কয়টি কাজই হচ্ছে মানব জাতির জন্যে এক মহান কল্যাণের, সম্মানের ও মর্যাদার ব্যাপার। সর্বোপরি এ পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমেই যমীনে তার যথার্থ স্বাধীনতা, ইনসাফ ও বরকত সুনিশ্চিত হবে। যার ফলে গোটা মানব সমাজটাই হয়ে উঠবে সুন্দর ও সুমহান। এই দুনিয়ায় তাকে এসব নেক কাজের জন্যে আল্লাহর দানের কোনো কুল কিনারা নেই। তার দান পুরস্কার অনন্ত অসীম।

এই আলোকেই আমাদের দেখতে হবে যে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার এই বিশ্বাসটিকে ইসলাম কতো সুস্পষ্ট করে আমাদের সামনে পেশ করেছে এবং একথাও বলেছে যে, যুগ যুগ ধরে সব কয়জন নবী রসূলের দাওয়াতের এই ছিলো মূল কথা। তাওহীদের এই ভিত্তি নিয়েই সর্বকালে নবী রসূলরা দাওয়াত দিয়েছেন। পরে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কখনো কখনো জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত ধারণা এই তাওহীদের সাথে এসে মিশে গেছে। এমন অবস্থা যখনি দেখা দিয়েছে তখনি ইসলাম আবার নতুন নবীর মাধ্যমে তাওহীদের খালেস আকীদাকে যাবতীয় জাহেলী ধারণা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়৷এই খালেস তাওহীদের ধারণা ছিলো মানবতার জন্যে এক নতুন জনমের মতো, কেননা এর ফলে মানুষ অন্য সব ধরনের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে এক নতুন মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছে। তাকে তাওহীদের কতিপয় 'থিউরী'ই শেখানো হয়নি, এই থিউরীর ওপরই তার জীবনের ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করা হয়েছে। মূলত যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা প্রকারান্তের হাজারো গোলামীর জিঞ্জির নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে নেয়, যার কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না, কখনো তারা তাদের নফস ও প্রকৃতির গোলামী করে, কখনো আবার অলীক, অহেতুক গল্প কাহিনীর দাসত্ব করে, নিজেদের মতোই আরেক মানুষের সামনে মাথানত করে, অত্যাচারী ও অবিচারী সন্ত্রাসী শক্তির সামনে নতজানু হয়ে পড়ে, অতপর নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাদেরই শেখানো পদ্ধতি, তাদের মূল্যবোধ, তাদের আইন ও তাদেরই চলন বলনের গোলামী করতে শুরু করে। অথচ এক আল্লাহর আনুগত্য করলে তাকে এ ধরনের বহু খোদার গোলামী করতে হতো না।

দুনিয়ার জীবনে তারা আল্লাহর বন্দেগী করতে দ্বিধা করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের অবস্থাটা হচ্ছে কি, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সবার সামনে মাথা নত করে, অথচ এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করতেই তাদের অনিহার ফলে দুনিয়ার জীবনে তাদের ওপর এই অপমান ও লাঞ্ছনা নেমে আসে চারদিক থেকে। আর আখেরাতে! সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ভয়াবহ আযাবে নিক্ষেপ করবেন, তারা সেই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে কোনো সাহায্যকারী কিংবা বন্ধু কিছুই সেদিন পাবে না।

বর্তমান যুগে খৃষ্টানরা যেভাবে তাওহীদের ধারণাকে জাহেলিয়াতের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে এবং তারা যেভাবে খাটি তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের সামনে খালেস তাওহীদের ধারণা পরিস্কার করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাওহীদ সম্পর্কিত অন্যান্য আহলে কেতাব ও মোশরেকদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো পরিস্কার করে দিতে চান, যাতে করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত কেউই তাওহীদের খাঁটি আকীদা বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়ানো কিংবা তাতে জাহেলী ধ্যান ধারণা প্রবেশ করানোর সুযোগ না পায়।

কোরআনের সম্মোহনী শক্তি

এখান থেকে শুরু হয় গোটা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে আহবান জানানো। এর আগে বর্ণিত আহবানগুলো ছিলো আহলে কেতাবদের জন্যে। এখন যেহেতু দুনিয়ার আর কোনো নবী রসূল আসছেন না, তাই শেষ নবীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তার পাঠানো সুস্পষ্ট কোরআনের দিকে মানুষদের দাওয়াত দিচ্ছেন! এই 'কোরআন' হচ্ছে একটি উজ্জ্বল আলোকে বর্তিকা যা যাবতীয় অন্ধকার ও সন্দেহকে দূরিভূত করে দেয়, অতপর সে আলোকে যারা পথ চলতে শুরু করে তারা অচিরেই এর বিনিময় স্বরূপ আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভ করবে এবং তারা এই সঠিক পথে চলার জন্যে হামেশাই এই আলোক দেখে এগুতে পারবে।

'হে মানুষ তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে 'বুরহান' এসেছে।'

এই কোরআন মানব সন্তানের জনে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'বুরহান' বহন করে নিয়ে এসেছে।

এই বাক্য দেখেই বোঝা যায় যে, এই উন্নত ভাষা আল্লাহরই কালাম, যে কোনো মানুষই এর মাঝে দিয়ে আল্লাহর কালাম ও মানুষের কথার তফাৎ বলে দিতে পারে। বক্তব্য-বক্তব্যের ভাষা-তার শিক্ষাগত সৌন্দর্য সবকিছুই এখানে ভিন্নতর, আর এ বিষয়গুলো এখানে এতোই স্পষ্ট যে, এটা সেই মানুষের হৃদয়ও আকৃষ্ট করে, যারা একটি কথাও আরবী ভাষার বুঝতে পারে না, শোনামাত্রই তারা বলে ওঠে যে, হাঁ এটা কোনো মানুষের কথা হতে পারে না।

আমরা একবার জাহাজে করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে যাচ্ছিলাম, জাহাজের পীঠেই আমরা জুমার নামায আদায় করলাম, আমরা ৬জন ছিলাম বিভিন্ন আরব দেশীয় মুসলমান, বাকীদের ভেতরে অধিকাংশ ছিলো জাহাজের কর্মচারী। আমি জুমার খোতবা পড়লাম, যার ভেতরে বেশ কয়টি কোরআনের আয়াত শামিল ছিলো, আমরা যখন নামায পড়ছিলাম তখন আশে পাশের সব কয়জন বিদেশী যাত্রীই তা পর্যবেক্ষণ করছিলো।

নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের কয়েকজন লোক এসে এ নামাযের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা বললো। এদের ভেতর ছিলেন একজন যুগোশ্লাভিয়ার মহিলা, যিনি কমিউনিষ্ট দেশ থেকে পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেয়ার জন্যে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং অশ্রুসজল চোখে আমাদের দিকে তাকালেন এবং ভাংগা ইংরেজীতে বললেন, আমি তোমাদের একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সবচাইতে আশ্চর্যজনক ব্যাপার যা আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে, তোমরা যে ভাষা ব্যবহার করছো তার এক শব্দও কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু তবুও বক্তার বক্তব্যের কিছু কিছু সুরে ও সুরের মূর্ছনায় আমি এতো বেশী প্রভাবিত হয়েছি যে, আজ পর্যন্ত কোনো ভাষা আমার মধ্যে এতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তার কথায় আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুরেলা বাক্যগুলোর কথা বলছেন, তা ছিলো মূলত কোরআনেরই আয়াত এবং তার মনে যে গভীর রেখাপাত করেছে তা ছিলো কোরআনেরই প্রভাব।

আমি এ কথা এ জন্যে বলছি না যে, যে কোনো ব্যক্তিই যে আরবী বোঝে না কোরআন শুনলে তার মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া হবে, তবে আমি বলতে চাই যে, কোরআনের আয়াতের একটা বাহ্যিক প্রভাব আছে, আছে এর প্রতিক্রিয়া। যা শ্রোতার মনে এক আমুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, এটা কিন্তু কোরআনের কালাম ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যাবে না।

আরবী ভাষা ভাষী যাদের আছে কোরআন নাযিল হয়েছিলো তাদের এই ভাষা, একটা বিশেষ সাহিত্য জ্ঞান ছিলো। এর নিয়ম-পদ্ধতি ও ভাষাগত সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা ওয়াকেবহাল ছিলো, তারা হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাযিল হওয়া এই কেতাবের ভাষা, এর উন্নত সাহিত্য মান ও সুদূর প্রসারী প্রভাব যখন দেখতো তখন সাধারণ আরবী ভাষার সাথে সহজেই কোরআনের পার্থক্য তাদের চোখের সামনে ধরা পড়তো।

আখনাস বিন শোরায়ক, আবু সুফিয়ান বিন হারব ও আবু জাহল বিন হিসাম ব্যক্তিরা গোপনে কোরআন শুনতে গিয়ে কিভাবে একের কাছে আরেক জন যে ধরা পড়ে, তার ঘটনা সবার জানা। এই ঘটনা এ জাতীয় অনেকগুলো ঘটনার একটি মাত্র, যারাই তখন আরবী ভাষা জানতো, এর সাহিত্য সম্পর্কে জানতো, তারা কোরআনের তেলাওয়াত শুনলে সহজেই বলে দিতে পারতো যে, এটা কোনো মানুষের ভাষা নয়, এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক কালাম!(১)

যাদের এই জ্ঞান ছিলো তারা সহজেই চিনে নিতে পারতো যে, এতে কোন ধরনের আলোকবর্তিকা রয়েছে এবং কোন ধরনের আকর্ষণ এই কালামে রয়েছে। এটা হচ্ছে কোরআনের বাহ্যিক ভাষাগত মাহাত্ম, কিন্তু এর পেশকৃত ধ্যান ধারণা, আকীদা বিশ্বাস, নিয়ম কানুন সর্বোপরি তার উপস্থাপিত জীবন বিধানও হচ্ছে এক অভিনব ব্যাপার, তা স্বয়ং এক একটি 'বোরহান' আলোক বর্তিকা, যা প্রমান করে যে এটা সত্যিই আল্লাহর কালাম, কোনো মানুষের কথা নয়। এটা এমন ব্যাপার, যা কোনো মানুষের উৎপাদন কিংবা তার উপস্থাপন হতে পারে না।(২) বলা হয়েছে,

(১) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সীরাতে ইবনে হিশামে' পৃঃ ৩৩৭ (প্রকাশক আল মাকতাবুত তুজ্জারিয়া) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলছেন, আমার কাছে মোহাম্মদ বিন মুসলিম বিন আবি শেহাব আয যাহরী বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবু জাহল বিন হিশাম, আখনাস বিন শোরায়ক বিন আমর বিন ওয়াহাব সাকাফী এই কয়জন আরব নেতা রসূল (স.)-এর কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্যে বাইরে আসে, সে সময় আল্লাহর নবী তার ঘরে নামায পড়ছিলেন। এরা সবাই আলাদা আলাদা জায়গায় এসে কোরআন শুনতে লাগলো, তাদের এক জন আরেকজনের খবর জানতো না, এভাবেই তারা রাত কাটিয়ে দিলো। যখন সকাল হলো, তারা যার যার মতো রওনা দিলো। রাস্তায় তাদের একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হয়ে গেলো, তারা একে অপরকে খুব তিরস্কার করলো, একজন আরেকজনকে বললো, আর এখানে এসো না, যদি তোমাদের কোনো লোক তোমাদের দেখে ফেলে তাহলে তাদের কাছে তোমাদের কোনই মূল্য থাকবে না। তারপর এই বলে তারা চলে গেলো, আবার যখন রাত হলো, তারা সবাই আবার একইভাবে এখানে হাযির হলো, আবার রাত ভর তারা রসূল (স.)-এর মুখে কোরআন শুনলো। সকাল হলে সবাই চলে গেলো। রাস্তায় আগের মতোই তাদের দেখা গেলো, আগের বার যা যা বলেছে আবার তা তারা বললো এবং সবাই চলে গেলো। আবার একইভাবে ভোরে ফেরার সময় সবার দেখা হয়ে গেলো, এরপর তারা নিজেদের মধ্যে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো যে, আমরা এই স্থান ত্যাগ করবো না যতোক্ষণ না আমরা ওয়াদা না করবো যে আমরা এখানে আর কখনো ফিরে আসবো না। তারপর এই মর্মে তারা ওয়াদাবদ্ধ হলো এবং বাড়ী বাড়ী ফিরে গেলো।

(২) এই বিষয়টি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এই কেতাবের ভূমিকা, সূরায়ে আল হুজুরাত ২৬নং পারা, সূরায়ে যারিয়াত ২৭ পারা, সূরা আছর আমপারা,
আরো দেখুন, এই লেখকের কেতাব 'হাযাদ্বীন'- মোহাম্মদ কুতুবের 'মানহাজ তারবিয়াতিল ইসলামিয়া', মোহাম্মদ সাদীকের 'আশহাজ তারবিয়াত ফিল কোরআন'। (এই তাফসীরের ভূমিকা আপনি পাবেন তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন ১ম খন্ডে। সূরা আছর পাবেন আমপারায়, বাকী দু'টো সূরা হুজুরাত ও যারেয়াত পাবেন ১৯ খন্ডে।-সম্পাদক)

'আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নূর।'

কোরআন করীম এমন এক নূর যার ভেতরে সব কিছুর মূলতত্ত্ব সঠিকভাবে দেখা যায় এবং এই নূরের জ্যোতিতে কোনটা হক, কোনটা বাতিল এটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। এর মাঝে কোনটার সাথে কোনটার তফাৎ কোথায়, কোনটার বৈশিষ্ট্য কি তাও এ নূর আমাদের বলে দেয়। ওদিকে মানুষের অন্তরের গহীন কোণ থেকে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সর্বত্র 'হক'কে এতোই পরিষ্কার করে তুলে ধরে যে, এর ফলে আর কোনো প্রতারণা কিংবা সত্যের গোপনীয়তার অবকাশ থাকে না। সত্য যখন দিনের আলোর মতো তার সামনে পরিস্ফুটিত ও পরিষ্কার হয়ে যায় তখন এমন এক সময় আসে যখন তার মন বলে ওঠে যে, এই ধরনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার পথ থেকে আমি দূরে রইলাম কি করে?

অতপর যখন এইভাবে কোনো মানুষ কোরআনের পরিমন্ডলে কিছুদিন জীবন অতিবাহিত করে, আস্তে আস্তে যখন কোরআনের উপস্থাপিত মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা দিয়ে সে প্রভাবান্বিত হয় এবং কোরআনে বর্ণিত কথাগুলো সে অনুধাবন করতে শুরু করে তখন সে টের পায় যে, যে সব ধ্যান-ধারণা এতোদিন পর্যন্ত তার কাছে পরিষ্কার ছিলো না, তাই এখন তার বুঝে আসতে শুরু করেছে। তার মনে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছুই যেন তার জন্যে সহজ হয়ে যাচ্ছে। জটিল জটিল বিষয়গুলোও তখন তার কাছে মনে হয় যেন সহজ করে তার মনে ঢেলে দিচ্ছে।

'আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নূর পাঠিয়েছি।'

যখন আমি এই বাক্যটি পড়ি এর ব্যাখ্যার জন্যে আমি কোনো ভাষা খুঁজে পাই না। এই আয়াতের ব্যাখ্যা শুধু তার পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব। যাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন বুঝার জ্ঞানে ধন্য করেছেন এবং যাকে এমন কল্যাণ তিনি দান করেছেন যার ফলে কোরআনের ভাষা থেকে সে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা রাখে এবং যার নিজের জীবনে সে ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আল্লাহর রজ্জুকে অব্যাহতভাবে ধরে রাখা মূলত আল্লাহর ওপর ঈমান আনারই বাস্তব ফলশ্রুতি। যখন ঈমান পরিশুদ্ধ হয়ে গেলো-মানুষের প্রকৃতি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান জেনে নিলো এবং এও জেনে নিলো যে, বান্দাকে শুধু আল্লাহর আনুগত্যই করতে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার সামনে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া ও তার রশিকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। সে তখন এটা বুঝতে পারে যে, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তিনি ছাড়া ক্ষমতা ও রহমতের দ্বিতীয় কোনো উৎস নেই, এ অবস্থায় যখন কোনো মানুষ উন্নীত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে তার অনন্ত রহমত ও অসীম দয়ার হকদার বানিয়ে দেন। এই দয়া ও করুণা তার জন্যে উভয় জগতেই সুনিশ্চিত ভাবে এসে যায়। কেননা ঈমান হচ্ছে সেই মরুদ্যানে নাম, যেখানে দুপুরের কড়া রোদের মতো জাহেলিয়াতে বিদগ্ধ হয়ে মোসাফের প্রশান্তির জন্যে এসে আশ্রয় নেয়। এই মূলনীতির ওপরই মানুষের স্বাধীনতা ও তার মর্যাদা নির্ভর করে-যা তার সামাজিক জীবনের সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধান করে। কেননা ইসলাম মানুষকে আল্লাহর বান্দা ও অন্য সব কিছুর মালিক বানিয়ে দেয়। মানুষের এই মর্যাদা ও মূল্য পৃথিবীর আর কোনো বিধানে পাওয়া যাবে না, মানুষকে তার অবস্থানটা ভালো করে জেনে নিতে হবে, একবার আল্লাহর বন্দেগী স্বীকার করার সাথে সাথেই সে দুনিয়ার অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধান্য পেয়ে গেলো। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগীর রশিতে আঁকড়ে দেয়। এভাবেই মানুষ এক পর্যায়ে গিয়ে ওটা অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহর বন্দেগী করা ও অন্যদের বন্দেগী অস্বীকার করার অর্থ কি?

আল্লাহর মাবুদ হওয়ার একত্ব ও মানুষের তার বন্দেগী করার একত্ব সব কিছু মিলে সমাজকে একই ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

সেই সমাজে সব ধরনের সার্বভৌমত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে, কোনো মানুষের জন্যে কোনো নিয়ম কানুন ও বিধান রচনার ব্যাপারে সেই সার্বভৌম ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারোই অধিকার নেই, সব মানুষ এক আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর বান্দা হিসেবে সে এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারোই সে অধীন নয়

'এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে তার দিকে সঠিক পথ দেখাবেন'।

এই যে 'তার দিকে' শব্দটি! আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা কী বোঝাতে চান? এ হচ্ছে একটি ক্রমান্বয়ে অগ্রসরমান অবস্থার নাম, যখন মোমেন ব্যক্তি তার হৃদয়ে আল্লাহর বন্দেগীকে অংকণ করে নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন এবং তাঁর পথে চলাকে তিনি মোমেনের জন্যে সহজ করে দেন। ধীরে ধীরে তাকে তিনি নিজের দিকেই পথ প্রদর্শন করেন, বাস্তবেও সে এটা বুঝতে পারে যে, সে আস্তে আস্তে আল্লাহর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, আসলে এটা হচ্ছে এমন এক অনুভুতি যার স্বাদ সে নিজে না পেলে কখনো অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এভাবেই এই সূরাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে সেসব পারিবারিক সম্পর্ক ও তার বিধি বিধানের বর্ণনা দ্বারা-যা দিয়ে এই সূরার আলোচনার শুরু হয়েছে। সেখানে সামগ্রিক সামাজিক যিম্মাদারী ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, এই প্রসংগে বহু ধরনের সামাজিক সংগঠন ও তার নিয়ম কানুন ও বলা হয়েছে। এখানে শেষের দিকে এসে 'কালালার' বর্ণনা দিয়ে মূল আলোচনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা হযরত আবু বকর (রা.) সহ অধিকাংশ ফেকাহবিদদের মতানুযায়ী এমন এক ব্যক্তি যার নিজের কোনো ছেলে নেই, আবার তার পিতাও নেই।

এপর্যায়ের কিছু আলোচনা সূরার প্রথম দিকে আলোচিত হয়েছে, এ সম্পর্কিত বাকী বিধানগুলো এখানে আলোচিত হচ্ছে, যে এই বিশেষ ব্যক্তিটির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কী করতে হবে।

'যদি কোনো 'কালালা' ব্যক্তি এভাবে মরে যায়...।'

উত্তরাধিকারের এই বর্ণনায় সাথে সূরার আলোচনা শেষ হয়ে যায়। শেষের দিকে এটা বলা হচ্ছে, জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে, সমস্ত অপরিহার্য দায়গুলো-চাই তা অর্থনৈতিক ব্যাপারে হোক কিংবা অর্থনীতির বাইরের কোনো বিষয় হোক-তা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রদর্শিত জীবন বিধান মোতাবেক হতে হবে।

'সবকিছু' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন– তা উত্তরাধিকারের বিষয় হোক কিংবা ভিন্ন কোনো বিষয় তা পারিবারিক বিষয় হোক, কিংবা সামাজিক, অথবা অন্য যে কোনো ধরনের বিষয়েই হোক– এর প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, এই নাম হচ্ছে হেদায়াত আর বাইরের পথ হচ্ছে গোমরাহী ও পথভ্রষ্ঠতা। মানুষের জীবনের জন্যে এ দুটোই হচ্ছে পথ, এর মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। আল্লাহ তায়ালা কি সুন্দর কথাই না বলেছেন, এই সত্যের বাইরে যা কিছু আছে তা হচ্ছে 'গোমরাহী'!

এক নযরে
তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহ্‌যাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আবাসা
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা মোতাফ্ফেফীন
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়াহ
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আদ দোহা
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল মাউন
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

AL-QURAN ACADEMY LONDON

إكاديمية القرآن لندن